প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

সম্পাদনা
প্রণব বিশ্বাস

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন · প্রবীর সেন
মুদ্রণ . চয়নিকা প্রেস

গ্রন্থস্বত্ব
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

শব্দগ্রন্থন . পাইকা ফটোসেটার্স
৯৩ এম. জি. রোড, কলিকাতা-৭০০০০৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট ৩০/২ বি, হরমোহন ঘোষ লেন কলিকাতা ৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চ্যাটার্জী কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচি

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মধ্য কলকাতার তালতলা অঞ্চলের এক বর্ধিষ্ণু, উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯০৭ সালের ২৩ নভেম্বরে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মা প্রফুল্লনলিনী দেবী। দশ ভাইবোনের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ চতুর্থ।

'বাঙালি মমতা ভরা' রাশভারী পিতা শচীন্দ্রনাথ ছিলেন শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক এবং কিছুদিনের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলার। বাবার কাছেই শুদ্ধ সংস্কৃত আর ইংরেজি উচ্চারণের পাঠ নিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ, হয়ত অলক্ষ্যেই। আর তাঁরই প্রভাবে নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ গড়ে উঠেছিল সাহিত্য, রাজনীতি, সাংবাদিকতা এমনকী সদালাপেও।

হীরেন্দ্রনাথের প্রথানুগ পাঠ শুরু হয়েছিল তালতলা হাইস্কুলে। ১৯২২এ হীরেন্দ্রনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে হীরেন্দ্রনাথ পড়তে গিয়েছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলা সরকারের বৃত্তি নিয়ে। এদেশে এবং বিদেশে নানা কৃতিত্বে, বৃত্তি-পুরস্কারে উজ্জ্বল তাঁর ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনে পেয়েছেন বহুগুণী শিক্ষকের স্নেহসান্নিধ্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন পাঠরত তখন বার্ট্রান্ড রাসেলের *Roads To Freedom* পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আজও অবলীলায় মুখস্থ বলতে পারেন বইটির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। সেদিনের মুগ্ধতা বিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরে বহুব্যাপ্ত হয়েছে পরবর্তী জীবনে—'জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা' আজও তাঁর অনন্তপার।

'ব্যারিস্টারি' সনদ নিয়েও শেষপর্যন্ত 'ব্যারিস্টার' হতে মন চায় নি তাঁর। অধ্যাপনা করেছেন অন্ধ্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে রিপন (সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে।

১৯৩৬এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন হীরেন্দ্রনাথ। পার্টি তখন 'Popular Front' নীতি গ্রহণ করেছে। হীরেন্দ্রনাথ পার্টির নির্দেশে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯৩৬এ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A.I.C.C.)-র সদস্য ছিলেন ১৯৩৮-৩৯ সালে; ঐ সময় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪০এ নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে তিনি ছিলেন সভাপতি।

সাংবাদিকতা ও লেখালেখির হাতেখড়ি ছাত্রজীবনেই। পরবর্তী কালে সম্পাদনা সূত্রে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত থেকেছেন *গণশক্তি, জনযুদ্ধ, স্বাধীনতা,* People's War, Indo-Soviet Journal, Calcutta Weekly Notes প্রভৃতি পত্রপত্রিকার সঙ্গে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অবিশ্রান্ত লিখে চলেছেন সেই তিরিশ দশক থেকেই। অনুবাদ

করেছেন অজস্র। তাঁর মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে।

হীরেন্দ্রনাথ F. S. U (সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তেমনই P. W. A (প্রগতি লেখক সংঘ)-র অন্যতম স্থপতি। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে যেমন কর্মসূত্রে তিনি ঘনিষ্ঠ তেমনি একাত্ম বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও।

বাগ্মী, সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ 'পার্লামেন্টারিয়ান' হিসেবে বিশেষ ভাবে পরিচিত। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে পরপর পাঁচটি সাধারণ নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছেন।

মুখবন্ধ

"মিত্র ও ঘোষ"-এর পক্ষ থেকে শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায় যখন আমার একটি রচনা সংগ্রহ তিনখণ্ডে প্রকাশ করার প্রস্তাব দিলেন তখন একটু আশ্চর্য হলেও অবিলম্বে সম্মত হলাম। এই সুবিদিত প্রতিষ্ঠানের দু'জন প্রাণপুরুষ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষকে ১৯৩৭ থেকে আমি জানতাম। উভয়েই সুলেখক ও একান্ত সজ্জন। তাঁদেরই সতীর্থ সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য "মিত্রালয়" স্থাপন করে আমাকে দিয়ে লেখান *'গ্রীসের পুরাকাহিনী'* আর ইংরাজিতে অনুবাদ করান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'মন্বন্তর'* ("Epoch's End")। সবিতেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি।

বলতে গেলে পঁচাত্তর বছর আগে থেকে দুটো ভাষায় অজস্র লিখে চলেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় লেখা (আর সম্পাদনা) দিয়েই ছাপার অক্ষরে হাতে খড়ি। অধিকাংশ রচনাই তাৎক্ষণিক, সঞ্চয়নযোগ্য অবশ্যই নয়। তাছাড়া আমি জানি যে, আমি 'জাত-লিখিয়ে' নই। লেখার ঝোঁক এসেছে স্বদেশসেবার তাগিদে আর সেজন্য সাংবাদিকতাগন্ধী দোষ হয়তো থেকে গিয়েছে। এটা কৃত্রিম বিনয় নয়। কিছু লেখা কথঞ্চিৎ সাহিত্যরসসিক্ত হলেও হতে পারে আর কুণ্ঠার সঙ্গেই বলছি যে আমার ধারণায় নিজের 'পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়' হিসাবে "তরী হতে তীর" সাহিত্যপদবাচ্য হওয়া সম্ভব। ষাট বছর ধরে ছড়িয়ে পড়া বহুবিধ বিষয়ে আমার রচনা বাছাই করে একত্র তিন খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থায় আমি তুষ্ট।

সাংসারিক ব্যাপারে আমার অনীহা ও অসামর্থ্যের ফলে আমার পরিবার-পরিজনকে অনেক ক্লেশ আর দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয়েছে। কতটা তার প্রশমনের ক্ষমতা রাখে আমার বহুবিধ কর্মব্যাপৃতি তা জানি না। তবু জানি যে এই প্রকাশন ব্যাপারে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছি। আত্মীয়দের মধ্যে সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় আর সুমিত মুখোপাধ্যায় সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছে; সুমঙ্গলের বহুদিন ধরে প্রত্যাশা ছিল যে আমার এবম্বিধ রচনাসংগ্রহ যেন প্রকাশ হয়। এদের কাছে আমি ঋণী। তবে সবচেয়ে আমি কৃতজ্ঞ শ্রীমান প্রণব বিশ্বাস-এর কাছে। প্রীতিভাজন এই বন্ধু বহুদিন থেকে আমার লেখার অনুরাগী আর তার প্রচারে খুবই আগ্রহান্বিত। একেবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিপুল পরিশ্রমে তিনি রচনাগুলির সন্ধান করেছেন আর গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনাও করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা নেই। প্রায় ষাট বছর ধরে লেখার স্তূপ থেকে বাছাই করা আর যথাসম্ভব কালানুক্রমে সাজানোর মেহনৎ মনের টান বিনা কেউ করতে পারে না।

পাঠককে দয়া করে রচনাগুলির প্রথম প্রকাশকালের দিকে নজর দিতে অনুরোধ করছি। স্থানকালপাত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ সচেতন না থাকলে বহু পুরানো লেখা হয়তো বা

বিরক্তি আর বিরূপতা ঘটাতে পারে। আরও বলে রাখি যে, অনিবার্যভাবে কিছু তথ্য ও চিন্তার পৌনঃপুনিকতা পাঠকমনে ক্লেশ সঞ্চার করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে লেখা বলে সমসাময়িক অবস্থান স্মরণ করতে হতে পারে। পৌনঃপুনিকতার অন্য হেতু হল যে নিজেই বলি "কানু ছাড়া গীত নাই"—এটা ভগবদ্‌ভক্তিভরে বলছি না, বরং বলছি যে দেশাভিমানী মন নিয়ে কৈশোরে আহৃত গান্ধীচিন্তা থেকে মার্ক্‌স্‌বাদে উত্তরণের 'ছারপোকা' আজও রেহাই দেয়নি, আর আজও আমি অনুতাপহীন মার্কসপন্থী।

নানা বিষয়ে লেখা এখানে আছে। যদিও সর্ব আশা করি আছে আমার প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। এর কারণ এই যে মার্ক্‌স্‌বাদের তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ড জিজ্ঞাসু মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়, দিনযাপনের সর্বস্তরে ছাপ ফেলার শক্তি রাখে আর সৃষ্টি করে প্রায় যেন ধর্মের মতো অনতিক্রম্য নিষ্ঠা ও কর্তব্য-চেতনা। লিখতে লিখতে মজা পেল স্মরণ করতে যে বহুকাল আগে আচার্য রাধাকৃষ্ণন্ Oxford-এ বলেছিলেন : "Cut out your 'class war' stuff and I am a Communist!" (" তোমরা শ্রেণীদ্বন্দ্ব' নিয়ে বক্‌বকানি ছেড়ে দাও, তাহলে আমিও কম্যুনিস্ট!") আমিও বলি : "আপনি যদি ধর্মের আধিভৌতিক বিশ্বাতীত অবাস্তব অথচ মোহনীয় মায়া কাটাতে পারেন তো আমিও আপনার সঙ্গে ধার্মিক বলে নিজেকে ঘোষণা কর্‌ব!" ঔদ্ধত্য থাকলেও আমার উক্তিতে প্রত্যয়ের পরোয়ানা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলি যে নিজেকে আমি ছাপার অক্ষরে "যথেষ্ট ভালো কম্যুনিস্ট নই" বলে বর্ণনা করেছি আর ফলে ১৯২৮ সালে লোকসভায় নির্বাচনে জয়ী হলেও বিপন্ন হতে হয়েছিল।

অবিস্মরণীয় কবি সমর সেন একবার লেখেন যে 'বিপ্লবী' পত্রিকার সম্পাদক হওয়া সহজ; তবে বিপ্লবী হওয়া একেবারেই সহজ নয়। যথার্থ বিপ্লব ঘটলে আমাদের মতো অনেকে কে কোথায় থাকব, তা ভাবতে গেলে ধাঁধায় পড়তে হয়। রক্ত দেখলে, বিশেষত নিজের রক্ত দেখলে যাদের মূর্ছার উপক্রম হয় তারা সংগ্রামকালে কী ভূমিকায় থাকবে বলা কঠিন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-এর রচনায় আছে তাদের কথা যারা চাষী-মজুরের লড়াইয়ে "কাঁদা" দেখেই বলে ওঠেন : " মোরা চাষী নই, চাষীর ব্যারিষ্টার!" এজন্যই হয়তো আমার মনে প্রায়ই ঘোরে Oxford-এ ১৯৩০ সালে Bernard Shaw-এর স্বমুখে শোনা বক্তৃতার উপসংহার : I am impatient for the Revolution. I shall be jolly happy if the Revolution happens tomorrow. But being an average coward, I wish you make the Revolution in as gentlemanly a manner as possible." অনুবাদ করছি না কারণ ভাষার সৌন্দর্যের লাঘব ঘটবে, আর তাছাড়া আজকাল তো দেখি শিক্ষিত বাঙালি মাতৃভাষার চেয়ে ইংরেজিকে ওপরে তুলে থাকেন!

বর্তমান যুগের দুই পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কথঞ্চিৎ সান্নিধ্য আমার জীবনের এক আশীর্বাদ। এদের চারিত্র্য, কর্মযোগ ও প্রেরণা আমার মার্কসবাদী প্রত্যয়ে

বিপুল সহায় হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের নামও এ-প্রসঙ্গে মনে আসছে। রবীন্দ্রনাথ একশোবছর আগে "মূঢ় ম্লান মূক" জনতাকে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন : "মুহূর্ত তুলিয়া শির / একত্র দাঁড়াও দেখি সবে / যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে / যখনই দাঁড়াবে তুমি, তখনই সে পলাইবে ধেয়ে, পথকুক্কুরের মতো!" সহজ সরল ভাষায় বিষাদ প্রকাশ করেছেন : "এ জগতে হায় / সেই বেশি চায় / আছে যার ভূরি ভূরি / রাজার হস্ত করে সমস্ত / কাঙালের ধন চুরি!" গান্ধীজী অহিংসাব্রতী হয়েও নিজেকে "তোমাদের চেয়ে খাঁটি কম্যুনিস্ট আমি" বলেছিলেন কম্যুনিস্টদের। এটা নিঃসন্দেহ যে তিনি ছিলেন অহিংসার পূজারী; কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে একদা (১৯২৮) "লাল সর্বনাশ আর বিপ্লব" ("red ruin and revolution") বলে বর্ণনা করেছিলেন; জাগ্রত, উদ্দীপ্ত জনশক্তিকে বারবার অভ্যুত্থান থেকে বিরত করেছেন; একবার তবু দেশভাগের সম্মুখীন হয়ে বলেন যে তিনি একেবারে ক্লান্ত, অবসন্ন, আশাহীন, তাই যদি কেউ পারে তো বিপ্লব করুক! এ-সব সত্ত্বেও সন্দেহ নেই তাঁর মূল জনকল্যাণাশ্রয়ী সত্তা বিষয়ে। প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে লেগে আছে আমার স্মৃতিতে ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে রাজদ্রোহের অপরাধে ছ'বছরের যে কারাদণ্ড গান্ধী পেয়েছিলেন, তার অব্যবহিত পূর্বে বিচারকের সামনে বিবৃতি যার অল্পাংশ উদ্ধৃত করছি : "আমি আগুন নিয়ে খেলছি আর মুক্তি পেলে আবার খেলব। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল আইনের নামে জনগণের শোষণ। কোনো বাক্‌চাতুর্য আর সংখ্যাতাত্ত্বিক জাদুকরী উড়িয়ে দিতে পারে না দেশের অগণিত বুভুক্ষু জরাজীর্ণ, অস্থিচর্মসার জনগণের সাক্ষ্যকে। শহরবাসীদের অকিঞ্চিৎকর আর কলঙ্কিত যে একটু স্বাচ্ছন্দ্য, তা কেনা হয়েছে মানুষের শোষণ দিয়ে। শোষকদের মুনাফা থেকে যৎকিঞ্চিৎ 'দালালি' পেয়েছে শহরবাসীদের একাংশ। আমি নিঃসংশয় যে ইংল্যান্ড এবং ভারতের শহরবাসীদের দাঁড়াতে হবে ঈশ্বরের দরবারে—যদি আকাশে ঈশ্বর থাকেন—তাদের বিচার হবে মানবিকতার বিরুদ্ধে ইতিহাসে তুলনাহীন এই পাপকর্মের জন্য..."।

কেউ হয়তো বিদ্রূপ করবেন এই উদ্ধৃতির জন্য কিন্তু তবুও বল্‌ব 'বুর্জোয়া' শব্দটির (তখন প্রায় অজ্ঞাত) অর্থ হল 'bourg' ('শহর')-এর বাসিন্দা। শব্দটির অনুপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাছাড়া ভারতের সেই উত্তাল মুহূর্তে এমন প্রদীপ্ত উচ্চারণ আজও চমকে দিতে পারে। বর্তমান দুনিয়াতে হয়তো ফিদেল কাস্ত্রো ছাড়া কোথাও কোনো কম্যুনিস্ট কণ্ঠ এভাবে ধ্বনিত হবার চিহ্ন নেই। একই ভাষায় অবশ্য নয়, কিন্তু ভিন্ন সুরে আজকের পরিস্থিতিতে তুলনীয় নির্ঘোষ আশা করাই বাতুলতা।

এবার শেষ করি। 'উৎসর্গ' শব্দটি ব্যবহার করছি না, তবে এই রচনাসংগ্রহ প্রকাশকালে স্মরণ করছি কয়েকজন পরম সুহৃদকে। তিনজন প্রয়াত; প্রথম, কবিকুলভূষণ মনস্বী বিষ্ণু দে, যিনি ছিলেন বহু বর্ষ ধরে "সর্ব চিন্তা কর্ম আর আনন্দের" অংশীদার; দ্বিতীয় হলেন পার্লামেন্টে আমার সবচেয়ে সেরা 'দোস্ত্'—হায়দরাবাদের অভিজাতবংশীয় সাদাৎ আলী খান্, যে অল্পকাল মন্ত্রী হয়েছিল আর মারা গিয়েছিল

তুরস্কে ভারতের রাষ্ট্রদূত অবস্থায়; তৃতীয় হলেন কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডে আমার সবচেয়ে নিকট, সদাহাস্যময় অজাতশত্রু সহচর দিলীপ বসু। জীবিতেরা হলেন বাংলাদেশের তেজস্বী মনস্বী আচার্য আহ্মদ্ শরীফ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'জরীপ' যার কীর্তি। আর দ্বিতীয় হলেন সবার পরিচিত দেশব্রতী আজিজুল হক, যার অনির্বাণ বিপ্লব চেতনা আর মানবিক মমতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বার্ধক্যজনিত বাক্‌বাহুল্যের জন্য মার্জনা চাইছি। রচনাগুলির বিচারভার সমর্পণ করছি সহৃদয় পাঠকদের হাতে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৪২) এঙ্গেলস এর 'অ্যান্টি ড্যুরিং' গ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধ লিখে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রাবন্ধিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। অল্পদিনের মধ্যেই পরিচয়ে (বৈশাখ ১৩৪৩) হীরেন্দ্রনাথ লিখলেন এমিল বার্নস-এর গ্রন্থের সমালোচনা। অবশ্য তাঁর লেখালেখির শুরু সেই বিশের দশকেই, যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ও কলেজ পত্রিকার সম্পাদক। তিরিশের মাঝামাঝি (১৯৩৬) থেকে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত করেন।

সেই তিরিশের দশকের শেষদিকে এদেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের গঠনপর্বে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখনী মার্কসবাদ ও রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর প্রয়োজন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করে আদর্শের আহ্বান পৌঁছে দিতে পেরেছিল সেদিনের নবপ্রজন্মের মনে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন, স্পেনের লড়াই, লেখকদের আন্তর্জাতিক ব্রিগেড, হিটলারের আবিসিনিয়া আক্রমণ, ভারতে শ্রমিক আন্দোলন, সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা, সোভিয়েত রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান থেকে শুরু করে অস্ট্রোমার্কসিজমের বিড়ম্বনা কোন বিষয়ে না লিখেছেন তিনি তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনীতে, ইংরেজি আর বাংলায়?

চল্লিশের দশক সারা পৃথিবী জুড়েই উত্তাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের সোভিয়েতভূমি আক্রমণ, প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও সোভিয়েত বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ, হিরোসিমা নাগাসাকিতে অতর্কিত আণবিক আক্রমণ, পূর্ব ইউরোপের বিস্তৃত এলাকায় সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভ্যুদয় এবং এদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান, ৪২এর আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের গুণগত পরিবর্তন ও জনযুদ্ধে রূপান্তর, Friends of Soviet Union গঠন, উগ্রজাতীয়তাবাদের নির্মম আক্রমণে তরুণ লেখক সোমেন চন্দের মৃত্যু, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পতাকার নীচে দেশের প্রায় সকল অগ্রণী লেখক শিল্পী চিন্তানায়কদের সমবেত হওয়া, গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা, দাঙ্গা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা, উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু; এবং লক্ষ করার বিষয় এইসব জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনায় হীরেন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট তাঁর সূচিমুখ লেখনীতে। অন্যদিকে F.S.U. থেকে I.P.T.A.—এই প্রতিটি কর্মকাণ্ডের তিনি অগ্রনায়ক। জনযুদ্ধ ও People's War-এ সে সময় প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর মননশীল লেখায় আর ব্যাখ্যায়, অন্যদিকে বিভিন্ন ঘটনার প্রতিবেদন বা Report অন্য মাত্রা পেয়েছে তাঁর লেখনীতে।

অনুবাদক হীরেন্দ্রনাথকেও আমরা এই পর্বে যেন অন্য তাৎপর্যে দেখতে পাই। এই সময়পর্বে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মন্বন্তর* (*Epoch's End*), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (*Boatman of the Padma*), নির্বাচিত রবীন্দ্ররচনা (*Your Tagore for Today*), রমেশচন্দ্র সেনের সাদা ঘোড়া প্রভৃতি রচনা।

পাঁচের দশক থেকে টানা পঁচিশবছর হীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় সংসদে উজ্জ্বলতম প্রতিনিধিদের

একজন। জওহরলাল নেহরুর সময়ের বা তার অব্যবহিত পরের সংসদ, দূরদর্শনের সৌজন্যে অন্দরমহলে পৌঁছে যাওয়া আজকের সংসদ, গুণগত ও চরিত্রগত দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ, তা সে শিক্ষানীতি, বিদেশ বা প্রতিরক্ষা ভাবনা কিংবা জনস্বাস্থ্য অথবা অন্য যে কোনো বিষয়েই হোক না কেন ছিল বিবিধার্থেই ব্যতিক্রমী, তথ্য, বিশ্লেষণ, যুক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া আবেগ আর সাহিত্যগুণে অনন্য। সেই সব ভাষণের কোনো সংকলন তো এখনও করা সম্ভব হল না। এই না হওয়াতে আমাদেরই ক্ষতি।

নিজের লেখা নিয়ে হীরেন্দ্রনাথের একটা কুণ্ঠা আছে। তাঁর আশঙ্কা যেহেতু তাঁর অধিকাংশ রচনাই তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজনে লেখা এবং দ্রুত লেখা (যা আজও তিনি লিখে থাকেন) তাই তাঁর লেখায় প্রায়শই এসে পড়েছে 'সাংবাদিকতাগন্ধী দোষ'। কিন্তু পাঠক লক্ষ করেন তাঁর প্রবন্ধের নিজস্ব রীতি, শব্দ ব্যবহারে তাঁর ভিন্নতা এবং গতিময় গদ্যের এক বিশিষ্ট ভঙ্গি।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কিছুটা একক, অধ্যয়নে আকৃষ্ট, আত্মসচেতন আর হয়ত সে জন্যই সংশয়, দ্বিধা আর চিন্তাজ্বরে অকালকাতর কৈশোর কেটেছে তাঁর—বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে। বাড়ি ভরা বই আর সাময়িক পত্রের নিবিড় সান্নিধ্যে কেটেছে তাঁর কৈশোর-যৌবনের দিনগুলো। *ভারতী, সাহিত্য, মানসী,* পুরোনো *বঙ্গদর্শনের* পাশাপাশি *আর্যাবর্ত, সাধনা, নারায়ণ, বিচিত্রা, সবুজপত্র, প্রবাসী আর ভারতবর্ষ*। *নারায়ণে* তখন হয়ত লিখছেন বিপিনচন্দ্র পাল, *সবুজপত্রে* রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Dawn Magazine* আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের *Modern Review* তাঁর আকৈশোর সঙ্গি। কৈশোর থেকে যৌবনের সেই দিনগুলোতে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে উঠেছিল তাঁর মনোভূমি।

তালতলা হাইস্কুল থেকে অক্সফোর্ড পর্যন্ত ব্যাপ্ত তাঁর ছাত্রজীবন উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। কত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সমাবেশ তাঁর চারপাশে, তাঁর যৌবনের দিনগুলোতে,— আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার, হুমায়ুন কবির, নীরেন্দ্রনাথ রায়, চিন্মোহণ সেহানবীশ, রাধারমণ মিত্র, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যামিনী রায়, হিরণকুমার সান্যাল, সজ্জাদ জহীর বা কে নয়? কমিউনিজমে দীক্ষা, জীবনের নানাদিকে অদম্য কৌতূহল, চিন্তাবিদদের অবিরল সান্নিধ্য এই পরিপ্রেক্ষিত ভুলে গেলে প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথকে তেমনভাবে হয়ত বোঝা যাবে না।

বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *'পরিচয়'*এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নিবিড়তা সূচনাপর্ব থেকেই এবং এখনও সে সম্পর্ক ততটাই নিবিড় যদিও সুধীন্দ্রনাথ *'পরিচয়'*এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন সেই কবে। অন্যবন্ধু বিষ্ণু দে'র উৎসাহে প্রকাশিত *'সাহিত্যপত্র'* অনেক পরিবর্তনের পথ ধরেও যতদিন পর্যন্ত সচল ছিল, হীরেন্দ্রনাথের মানসিক সংযোগ ততদিন পর্যন্তই ছিল অব্যাহত।

হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রায়শই বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন সাময়িক পত্র বা সাহিত্য পত্র থেকে চয়ন করা প্রবন্ধের সংগ্রহ। এবং সম্ভবত এজন্যই পরিমার্জনার তেমন কোনো অবকাশ তিনি নেননি। বানানে প্রথমে তিনি কিছুটা বুঝি প্রাচীনপন্থী, রেফের পরে দ্বিত্ব ব্যবহার করেন। রুশ সর্বদাই রুষ, চাষী, রাজী, গরীব প্রভৃতি শব্দ অনেকদিন পর্যন্ত 'ঈ'কার প্রবণ। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় তাঁর গদ্যে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রায় কোথাও নেই।

কিছু কিছু শব্দ ও শব্দবন্ধ যেন তাঁর একান্ত নিজস্ব। 'প্রমুখ' শব্দ প্রচলিত অর্থে কখনই তিনি ব্যবহার করবেন না, 'প্রকৃত প্রস্তাবে' শব্দবন্ধ ফিরে ফিরে আসবে, এটা যেন অবধারিত।

সমাসবদ্ধ ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে তিনি অকৃপণ। অনৃতবাদন, উৎসৃষ্ট, অনন্তপার, নিদিধ্যাসন ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করি তাঁর গদ্যে—যা অন্যমাত্রা সংযোজিত করে তাঁর লিখনভঙ্গিতে।

তিনখণ্ডে তাঁর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৪'র মধ্যে প্রকাশিত তাঁর পাঁচটি প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে প্রবন্ধ নির্বাচন করা হয়েছে—গ্রন্থ প্রকাশের কালানুক্রমিকতাকে অনুসরণ করে। অনুবাদ রচনা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। একান্ত তাৎক্ষণিক রচনা যা আজকের দিনে তার পরিপ্রেক্ষিত হারিয়েছে কেবলমাত্র সেইসব প্রবন্ধকে সংকলনের বাইরে রাখা হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথের কোনো কোনো প্রবন্ধ তাঁর একাধিক গ্রন্থে সংকলিত। সেক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশের সময়কেই অনুসরণ করা হয়েছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমেই লেখা নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও 'সম্পাদক'কে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন তিনি তাঁর স্বভাবসৌজন্যে। পুরো সংগ্রহের বানান সংস্কার করে আজকের দিনে প্রচলিত রীতির কাছাকাছি আনতে চেয়েছি, সেও তাঁর সস্নেহ অনুমোদন নিয়েই। এরপর অসংগতি যা থাকল তা একান্তই আমার অনবধানতাজনিত।

ছোটোবেলা থেকে শোনা 'হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' নামটি বরাবর আমাদের সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধা আদায় করেছে, কিছুটা বুঝে, অনেকটাই না বুঝে। '৬৭ সালে উত্তাল খাদ্য আন্দোলনের উত্তাপ নিয়ে শুরু হয়েছিল সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসেছে ভাঙন, পার্টি হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। আমাদের সেই ছাত্রাবস্থায় লক্ষ করেছি হীরেন্দ্রনাথের *Gentle Colossus* নিয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ, উত্তপ্ত বাদানুবাদ। নির্বাচনের কাজে একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে যে ভাষায় ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিল ও তাড়া খেয়ে ফিরতে হয়েছিল তার স্মৃতি সহজে ভোলার নয়। অন্যদিকে একই সময় শুধু হীরেন্দ্রনাথ বা সোমনাথ লাহিড়ীর দলের পক্ষে এসেছি বলে বাড়তি সমাদরের স্মৃতিটুকু আজও অম্লান (মনে আছে, সেই অচেনা ভদ্রলোক নিজেকে 'অকমিউনিস্ট' বলে চিহ্নিত করেছিলেন)। উজ্জ্বলতম সাংসদ, সুপণ্ডিত, ইংরেজি ভাষায় প্রবাদপ্রতিম দক্ষতা, জওহরলাল নেহরুর কাছের মানুষ, ছাত্রজীবনে সব পুরস্কার আর বৃত্তি তাঁর একার জন্য নির্ধারিত—ইত্যাদি নানান কথা শুনতে শুনতে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ছিল 'বিপুল বিস্ময়'। সেদিন ভাবতেও পারিনি কোনো একদিন তাঁর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হব। দায়িত্বটা নিতে দ্বিধা আর সংকোচ এখনও আমার কম না। কিন্তু সম্পাদনার দায়িত্বটা স্বয়ং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন বলে 'না' বলাটা সম্ভব হয়নি নিজের সীমাবদ্ধতার কথা জানা সত্ত্বেও।

এছাড়া বলতেই হয় সৌরীন ভট্টাচার্যের কথা। প্রতিনিয়ত উৎসাহ, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপযুক্ত তথ্য দিয়ে শুধু যে সাহায্য করেছেন বা 'গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা'র পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন তাই নয়, প্রায় বাধ্য করেছেন কাজটা করতে।

সাহায্য পেয়েছি শঙ্খ ঘোষ, সুতপা ভট্টাচার্য, শুভ বসু, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অরুণ দে যে কতরকমভাবে সহায়তা করেছেন সেটা লিখে বোঝানো যাবে না। এছাড়া আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন, ভবানী সেন স্মৃতি পাঠাগার ও ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সংবাদপত্র বিভাগ)র সহায়তার কথা।

'চক্ষুষা কাণঃ'র প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি তুলে দিয়েছেন রঞ্জন সাধুখাঁ। কবি বিষ্ণু দে ও পি. সি. যোশীর সঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছবিটি পেয়েছি উমা সেহানবীশের কাছে। অন্যদুটি ছবি ব্যবহার করতে দিয়েছেন মঞ্জু মুখোপাধ্যায়। এঁদের কাছেও আমি ঋণী।

মিত্র ও ঘোষের সবিতেন্দ্রনাথ রায় ও মণীশ চক্রবর্তীর সহায়তার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রাখছি।

আর অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা আলাদা করে কী-ই বা বলব? কোনো শব্দই তাঁর স্নেহ আর প্রশ্রয়ের তুল্যমূল্য হতে পারে না।

উৎসর্গ

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের
করকমলে—

ভারতে জাতীয়তার জন্ম

রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা সাধারণত বলে থাকেন যে সমগোষ্ঠী ও সমস্বার্থভাব, অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবর্তমানে জাতীয় ঐক্যবোধের উদ্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয়তার এই সব উপাদান লক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু জাতীয়তার মূল কারণ হচ্ছে বহুজনের আত্মীয়ভাব (''we feeling''), সে আত্মীয়ভাব যে-উপায়েই উদ্ভূত হোক না কেন। ফরাসি মনস্বী রেণাঁ বলেছিলেন যে জাতীয়তার সংজ্ঞা দিতে হলে জাতীয়তাবোধের কথাই বলতে হয়, মিলনগ্রন্থির যে কী উপাদান তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যে কারণেই হোক, আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ থাকলেই আমরা নিজেদের একজাতি বলে প্রচার করতে পারি।

কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের চিন্তা, আমাদের বোধ, সমাজনিরপেক্ষ নয়। জাতীয় ঐক্যের বাস্তবক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে আমরা জাতীয় ঐক্যের কথা ভাবতে পারি না। এই কারণেই দেখা যায়, ইতিহাসে জাতীয়তার জন্ম হয়েছে বিলম্বে। যে-কোনো ছাত্র বলতে পারবে, আমরা যে-অর্থে 'জাতি' কথাটি ব্যবহার করি, সে-অর্থে জাতির উদ্ভব সম্প্রতি হয়েছে। লর্ড অ্যাক্টন বলেছেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পোল্যান্ডকে যখন প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া আর রাশিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, তখন থেকে জাতিবোধের পত্তন হয়েছে। তাঁর মত যে আমাদের মেনে নিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই; কিন্তু জাতিবোধ যে ইতিহাসে বহু পূর্বে দেখা দেয়নি, তা নিঃসন্দেহ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বিশেষ ভৌগোলিক, রাষ্ট্রিক, ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সেখানে জাতীয়ভাবের উৎপত্তি হয় বটে; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে জাতীয়তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার তেমন প্রয়োজন ছিল না। বিপ্লবের তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে সামন্তশাসনের ভগ্নস্তূপ থেকে ফরাসি জাতীয়তার জন্ম হয়। জার্মান জাতিবোধের প্রথম প্রকাশ হয় নেপোলিয়ানের আক্রমণ, প্রাশিয়ার প্রতিরোধ চেষ্টায় আর ফিখ্‌ট্যে প্রভৃতির বক্তৃতাতে। তারপর ইটালিয়ান, শ্লাভ প্রভৃতিরা জাতিসত্তার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে উনবিংশ শতক হচ্ছে জাতীয়তার যুগ; প্রাচ্যদেশগুলিও তার ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি।

আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ কখন ও কীভাবে দেখা দিয়েছে, এ প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। অবশ্য যাঁরা আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিরোধী বা সাফল্যে আস্থাহীন, তাঁরা বলে থাকেন যে, এদেশে জাতীয়তার উপাদানসমূহের একান্ত অভাব আছে। তাঁদের মতে ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা ভৌগোলিক আখ্যা মাত্র; সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থায়, শিল্পোৎপাদন-পদ্ধতিতে বহু বৈষম্যের ফলে জাতীয় ঐক্যবোধ সম্ভব হয়নি, বৈচিত্র্য হয়েছে জাতীয়তার প্রতিবন্ধক।

এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তা অন্তত ভারতের আধুনিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য দেখতে না পাওয়া হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির অভাবের পরিচয়; যে শুধু গাছ দেখে, বন দেখে না, তাকে অন্ধ বলা চলে। ভারতের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠ লেখক আলোচনা করেছেন। বিশেষত ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ''The Fundamental Unity of

India'' ও ''Nationalism in Hindu Culture'' পুস্তকে বহু উদাহরণ দেখিয়ে ঐ ভ্রান্ত মত খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের তীর্থ, দেবায়তন, চৈত্য, পূত নদনদী, প্রাচীন হিন্দুদের ভৌগোলিক জ্ঞান, জন্মভূমি-প্রীতি— এ সবই দেশের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের সাক্ষ্য দেয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় থেকে মারহাট্টাদের যুগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে ঐক্যসূত্রের সন্ধান অনেকে পেয়েছেন। প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের মতো অনেকে আবার আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রিক জাতিবোধ সম্বন্ধে ব্যস্ত হয়নি, সংস্কৃতি বিষয়ে জাতিবোধ বহুদিনই ছিল, পশ্চিমের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়েছে। ''The Soul of India'' পুস্তকে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ইয়োরোপে জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য, আর এদেশে হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর মৈত্রী; মুসলমান শাসনে ভারতীয় ঐতিহ্য ব্যাহত হয়নি, ইংরেজ শাসনে হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের দিকে লক্ষ রেখে আমাদের দেশের ইতিহাস পড়লে মনে হয়, ঐরকম মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করা যায় না। বিপিনবাবু প্রভৃতি লেখকের সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ''wish fulfilment''; তাঁরা মনে মনে যা চেয়েছেন, তাকে ঐতিহাসিক পোশাক পরিয়েছেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, বহুকাল ধরে সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃতি বিষয়ে ঐক্য চলে এসেছে; দ্রাবিড়দেশেও কোনো বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়নি। কিন্তু একথা স্বীকার করলেও আমরা আজ ভারতীয় জাতীয়তা বলতে যা বুঝি, তার উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে পারব না। হিন্দুস্থান শুধু হিন্দুর বাসভূমি নয়; ভারতের জাতীয়তা শুধু হিন্দুর জাতীয়তা নয়। হিন্দু-ভারতে জাতিবোধের বহু উপাদান আছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুদের রক্তের তফাৎ না থাকলেও ধর্মবৈষম্য, জাতিভেদ, বিজয়গর্ব আর অত্যাচারের স্মৃতি মিলে দুই সমাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় জাতিবোধের জন্ম কবে হল, এ প্রশ্নের উত্তর শুধু হিন্দু-ভারতের ইতিহাস দিতে পারবে না।

অনেকের মতে পাশ্চাত্য সংস্পর্শ হচ্ছে আমাদের জাতীয়তাবাদের মূল কারণ। ব্যাপক অর্থ ধরলে এ মতকে মানা অসঙ্গত নয়। ন্যাশনালিজ্‌মের যে কোনো স্বদেশি প্রতিবাক্য নেই, তা বহুবার শোনা গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুলপ্রচারিত ''ন্যাশনালিজ্‌ম্'' বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, জাতীয়তা শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী নয়, বিশ্বমানবের সভ্যতার পক্ষেও হানিকর। ইংরেজ শাসনের ফলেই—যে ভারতে জাতীয়তা দেখা দিয়েছে, তাঁর এই কথাটিই আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। অনেকেরই মতে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের জাতিবোধ জাগিয়েছে; এখানে জাতীয়তার প্রথম যুগে ম্যাগ্‌না কার্টা, হ্যাম্পডেনের বক্তৃতা, ডেনমানের রায় ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি প্রায়ই দেখা যেত। আরো বলা চলে যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিতশ্রেণী নিজেদের বক্তব্য পরস্পরকে বোঝাতে পারত, ইংরেজি সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট অপভ্রংশ তারা ধার করতে পেরেছিল, আর পাশ্চাত্য ইতিহাস থেকে জাতীয়তা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে সংস্কার সাধনের জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিল, এমনকি তারা শীঘ্রই বুঝেছিল যে, স্বায়ত্তশাসনের অভাবে সমাজের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারও সম্ভব হয় না। ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করলে আর একদিক থেকে দেখা যায়, বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলন আরম্ভ হয়, ধর্মের আবরণ সত্ত্বেও জাতিবোধ দেশে অগ্রসর হতে থাকে।

কিন্তু সহজে জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলবে আশা করা ভুল। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তার উদ্ভব হয়েছে বলা চলে না। প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষিতেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এতই দৃঢ়প্রত্যয় ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে যথার্থ স্বাদেশিকতা ও জাতিবোধ একরকম অসম্ভব ছিল। পরবর্তী যুগে শিক্ষিতেরা শাসনসংস্কারের জন্য আবেদন আরম্ভ করেন, সিভিল-সার্ভিসের বড়ো চাকরিতে দেশের লোকের প্রবেশাধিকারের জন্য ব্যস্ততা দেখান, লাটবেলাটের কাউন্সিলে সভ্যপদের জন্য আন্দোলন করেন। কিন্তু তাঁদের জাতিবোধ তখনো অসম্পূর্ণ; তাঁরা তখনো দেশের শাসনব্যবস্থার কর্তৃত্বের দাবি করেননি। যে-জাতীয়তা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের সংকল্প ও উদ্যোগ করে না, সে জাতীয়তা হচ্ছে পঙ্গু। বিদেশি প্রভুত্বকে অপসারণের কথা প্রচার করার সময় থেকেই জাতীয়তা পূর্ণাঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। শিক্ষিতেরা যখন বুঝল যে শাসনকর্তৃত্ব বিদেশির হাতে থাকায় তাদের শ্রেণীস্বার্থের হানি হচ্ছে, তখনই তারা যথার্থ জাতীয়তাবাদী হতে লাগল, তখনই রাষ্ট্রব্যাপারে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ফলপ্রদ হল। ইংরেজি শিক্ষা ভারতে জাতীয়তাবাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে বটে; কিন্তু এক বিশেষ অর্থনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যেই সে প্রভাব সম্ভব হয়েছে।

* * *

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সাভারকার প্রমুখ কয়েকজন তথাকথিত 'সিপাহীবিদ্রোহকে' জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলেছেন; কিন্তু তাঁদের মতকে অত্যুক্তি বলতে হবে। বিদ্রোহ যে ইংরেজ প্রভুত্ব দূর করার প্রথম বিরাট প্রচেষ্টা, ভারতের জাতিবোধের প্রথম প্রকাশ, তা বলা ভুল নয়। ১৮৫৭ সালের পূর্বেই বাংলা-বিহারের সাঁওতালদের মতো অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তখন সমস্ত উত্তর-ভারতের চাষীরা বিক্ষুব্ধ ছিল; কেবল পল্লীসমাজের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসন-শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত ছিল বলে তারা একত্র হয়ে বিদ্রোহ করার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। তাদের অভাব ছিল নেতৃত্বের। পররাজ্যগ্রাসপটু ইংরেজ সরকারের চাতুর্য ও শক্তি যে সব সামন্ততান্ত্রিকদের অপ্রসন্ন করেছিল, তারাই অসহায় প্রজামণ্ডলীর অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্বস্থান অধিকার করেছিল। বিদ্রোহে যে উত্তর-ভারতের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল তা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু জাতীয়তার প্রথম প্রকাশ হিসাবে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে দারুণ অপরিণতির লক্ষণ অনেক ছিল। অধিকাংশ নেতার উদ্দেশ্য ছিল মোগল ও মারহাট্টাদের সামন্ততন্ত্রী শাসন পুনরুদ্ধার করা; অথচ সামন্তশাসনে জাতীয়তার প্রসার অসম্ভব। সামন্ততন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানত নিজাম ও শিখেরা ইংরেজের শক্তি দেখে কাপুরুষের মতো বিদেশির পক্ষ সমর্থন করেছিল, আর তাদের প্রতিপক্ষ দেশে পাশ্চাত্য প্রভাব ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার উপদ্রব দেখে ইতিহাসের চাকাকে আটকে রাখার বৃথা চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো ইংরেজ রাজত্বে ভেঙে গিয়েছিল; ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে নতুন জীবনের সাক্ষাৎ তখনো পায়নি। কিন্তু নির্মম পরাজয় সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা এক বিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল; ইংরেজ আমলে কৃষির অবনতি, লোলুপ সাম্রাজ্যগর্বীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয় শিল্পের বিনাশ, জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি, অনভ্যস্ত বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি নানা অসন্তোষকে তারা একত্র করেছিল। তাই আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে সিপাহীবিদ্রোহের গুরুত্ব খুব বেশি।

* * *

কয়েকজন লেখক আমাদের জাতীয়তার উদ্ভব সম্বন্ধে অর্থনৈতিক কারণের আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই বর্ণনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেননি, মুখ্য-গৌণ বিচার করেননি, ইতিহাসের কোনো ঘটনাই যে আকস্মিক নয়, সেকথা বোঝার চেষ্টা করেননি। সাধারণত বলা হয়, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত ও ভ্রমণ সুখের হওয়ায় প্রাদেশিক সংকীর্ণতার স্থলে জাতীয় ঐক্যবোধ সম্ভব হয়েছে, সুদূর সীমান্তেও ভারতবাসী তার ভারতীয়ত্ব অনুভব করতে পেরেছে। বিরাট দেশের মধ্যে এই ঐক্যবোধ বিস্তারের ফলে আর এদেশকে একটা ভৌগোলিক আখ্যামাত্র বলা চলে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবর্ষে আরো মূলগত পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে "নিউ-ইয়র্ক ট্রিবিউন" পত্রে কার্ল্ মার্ক্স্ ভারতে ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, হিন্দুস্থানের সমাজবিপ্লবে ইংরেজ শত অপরাধ সত্ত্বেও ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।

লালা লাজপত রায় তাঁর বিখ্যাত "Young India" পুস্তকে বলেছিলেন, ভারতীয়দের সহজাত দেশপ্রেমের চেয়ে ইংরেজের শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থা, তাদের সংবাদপত্র, আইন আদালত, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, স্টীমার প্রভৃতি জাতীয়তাস্ফুরণে কম করেনি। অর্থাৎ হয়তো অজ্ঞাতসারেই ইংরেজ জাতীয়তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে। একটু লক্ষ করলেই আমরা বুঝব যে, ভারতে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের জাতীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রথম যুগে ভারতীয় শিল্পকে নষ্ট করলেও ইংরেজ পরে এখানে আধুনিক কারখানা বসাতে বাধ্য হয়েছিল। কংগ্রেস প্রথমে নিতান্ত নরমপন্থী ছিল; কিন্তু যখন ক্রমেই বিদেশি ধনিকদের শোষণনীতি পরিস্ফুট হতে লাগল, যখন ভারতবাসী বুঝল যে দেশের শিল্পে তাদের অধিকারে বিদেশি হস্তক্ষেপ করে চলেছে, তখনই কংগ্রেসের সুর গরম হল, জাতীয় অনুভূতি প্রবলতর হল। ১৮৫৩ সালে মার্ক্স্ লিখেছিলেন, "বিলাতের কারখানার মালিকেরা সস্তায় তূলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল জোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে-দেশে লোহা আর কয়লার খনি আছে, সে দেশের যানব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্তন হলে সেখানে আর যন্ত্রনির্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজ-কে-রোজ যা দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যেসব শিল্পের সঙ্গে রেলপথের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কলকারখানার অগ্রদূত হবে।" এখানে বৈজ্ঞানিক শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের বহু বাধা সত্ত্বেও, মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সফল হয়েছে। ভারতের জাতীয়তা বাস্তবিক তখনই জন্ম নিল যখন এদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী বুঝল যে দেশের শাসনকর্তৃত্ব না থাকলে শিল্পোন্নতির ফল পরহস্তগত হতে বাধ্য।

এ কথা মনে রাখলে আমরা জাতীয়তাবাদের উপর রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজী, বামনদাস বসু প্রভৃতির অর্থনৈতিক প্রবন্ধাদির প্রভাবের কারণ জানতে পারব। কী ভাবে বহুদিন ধরে বিদেশিয়রা এদেশের অর্থ লুটে নিয়ে গেছে, তার পরিচয় পেয়ে জাতীয় আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছে। ইংরেজ শাসনে দেশের টাকা বিদেশে ক্রমাগত চালান হয়েছে। ইংরেজদের আগে যারা ভারত জয় করেছিল, তাদের সময় অন্তত দেশের টাকা দেশেই

থাকত। নানা ফন্দিতে ইংরেজ এদেশের টাকা বিলাতে পাঠিয়েছে; তারা ভারতবর্ষের উপর যে সরকারি দেনা চাপিয়েছে, তার অধিকাংশই আমাদের ঘাড়ে নেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এ ছাড়া অবশ্য আছে বিদেশি ব্যবসায়ীর মোটা মুনাফা, গঙ্গার দু-ধারের পাটকলগুলো দেশি কুলিদের দেড়শো টাকা দিলে অন্তত বারশো টাকা স্কটল্যান্ডে পাঠিয়ে থাকে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে দেশের টাকা বাইরে যাওয়া সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। তাছাড়া সিপাহীবিদ্রোহের পর থেকে এদেশে ইংরেজ সৈনিকের সংখ্যা খুব বাড়ানোর ফলে মিলিটারী বাজেট ফেঁপে ওঠে, বিদেশিশাসন আমাদের তখন আরো অসহ্য লাগে।

* * *

বিদেশিশাসন শুধু-যে আমাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিচ্ছে তা নয়, আমাদের সত্তাকে পর্যন্ত হস্তগত করছে—এই ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। কংগ্রেস তাই আর পূর্বের মতো কেবল দেশের লোকের জন্য কতকগুলো চাকরি দাবি করে ক্ষান্ত হল না; কংগ্রেস চাইল অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা, দেশের আয়ব্যয়ের উপর কর্তৃত্ব। স্বদেশি শিল্পের উন্নতির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হল। অন্য দিকে দেখা যায় যে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ইংল্যান্ড থেকে, বিশেষত ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আমদানি সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাকুল ছিল; এমনকি আমদানির উপর শুল্ক বসানো হলেও ল্যাঙ্কাশায়ারকে সাহায্য করার জন্য দেশি সুতা ও কাপড়ের উপর বিশেষ কর চাপিয়েছিল। আরো লক্ষ করা প্রয়োজন যে ল্যাঙ্কাশায়ারের দরকারি তুলা সরবরাহের জন্য ইংরেজ সরকার পূর্তকার্যের ব্যবস্থা প্রধানত পাঞ্জাবের মতো যেখানে তুলা উৎপন্ন হয় এমন প্রদেশে করেছে। কিন্তু জাতীয়তার শক্তিকে বেশি দিন আটকে রাখা চলেনি; নানা উপায়ে এখানকার লৌহশিল্পকে সাহায্য করে আর কিছুকাল ধরে ল্যাঙ্কাশায়ারের কর্তাদের অগ্রাহ্য করে, দেশি কাপড়ের কলগুলিকে দেশ সাহায্য করেছে।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতিটি প্রধান আন্দোলনের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চলেছিল, তার স্বদেশি আন্দোলন বলেই প্রসিদ্ধি বেশি। মহাযুদ্ধের সময় যে-অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল, তারই ফলে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে জনসাধারণের যোগদান সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৯-৩০ সালে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সংকট আরম্ভ হয়; আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অর্ধেক হয়ে যায়, রূপার কদর কমার ফলে গরীব চাষীমজুরের সামান্য সঞ্চয় তুচ্ছ হয়ে পড়ে, আর সরকারি মর্জিতে টাকার দর বাঁধা হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় যে মহাত্মা গান্ধী আবার ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রকে সন্ত্রস্ত করতে পেরেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে ইংরেজি শিক্ষার প্রচার, ভারতীয়ে আর ইংরেজে চাকরি নিয়ে ঝগড়া, রেলে স্টীমারে ইংরেজের হাতে ভারতীয়ের লাঞ্ছনা, অস্ত্র আইন—প্রভৃতি ব্যাপারকে অর্থনৈতিক সম্বন্ধে না ফেলতে পারলে জাতীয়তার জন্ম বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে না। প্রকৃত জাতীয়তার পক্ষে দরকার শুধু জাতীয় ঐক্যবোধ নয়, জাতির বাস্তব স্বার্থের সঙ্গে সে ঐক্যবোধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মাত্র ঐক্যবোধে যদি জাতীয়তা গঠন করা চলত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী যে স্বার্থনিরপেক্ষ ঐক্যবোধ প্রচার করেছেন, তা বিফল হত না। তাঁদের প্রচার ব্যর্থ হওয়ার একটা কারণ এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁরা যে একটা

বিশেষ আধ্যাত্মিক লক্ষ দেখেন, তাকে ধরাছোঁয়া যায় না; আর আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভারতবাসীদের যে প্রায় একচেটে অধিকার, তা বিশ্বাস করা শক্ত। তা ছাড়া হিন্দু অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে এই মার্জিত ভারতপ্রীতির যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, তার ফলে মুসলমানদের পক্ষে ঐ ধরনের জাতিবোধ অনুভব করা বিশেষ দুরূহ। একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানকে একত্র আনা যাবে। ঐই আন্দোলনের ফলে আমরা দেখেছি যে আমাদের জাতীয়তা এ পর্যন্ত অর্থনীতির বাস্তব ভিত্তি বিনা সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারেনি; সুতরাং আজো জাতীয়তার সঙ্গে দেশের জনগণের স্বার্থের কী সম্পর্ক তা পরিষ্কার না করতে পারলে আমাদের মুক্তি-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর সর্বত্রই মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা হয়েছে। আমাদের দেশেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। বিদেশির শোষণনীতি তাদের জাতিবোধকে জাগ্রত করেছে, মুক্তি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ করেছে। কিন্তু ক্রমেই জাতীয় আন্দোলন এমন এক স্তরে উপস্থিত হচ্ছে যখন দেশের জনগণ কেবল বিদেশি নয়, স্বদেশি ধনিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছে, জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের ভার অর্থবানদের হাতে ছাড়তে রাজি হচ্ছে না। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি অধ্যায়েই তাই তদানীন্তন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপক ও বলীয়ান করতে হলে একথা ভুললে চলবে না। সুতরাং আজ হিন্দু-ভারতের ঐক্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন কম; যে দুর্জ্ঞেয় আধ্যাত্মিকতাকে ভারতীয় জীবনের সারবস্তু বলে প্রচার করা হয়, সেকথা না বলাই বোধহয় শ্রেয়। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি ও আদর্শ প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই নির্ণীত হয়ে থাকে। মানুষ অবশ্য ইতিহাসের হাতে কলের পুতুল একেবারেই নয় : "Men make history, but not as they please"।

ভারতবর্ষ ও কার্ল্ মার্ক্স্

বিখ্যাত অধ্যাপক ল্যাস্কি একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের জটিল সমস্যা সমাধানে মার্ক্স্বাদের প্রয়োগ করতে হলে সূক্ষ্ম উদ্ভাবনীশক্তির খুবই প্রয়োজন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো সুফল আশা করা যায় না। পশ্চিম ইয়োরোপের পণ্ডিতম্মন্য 'সোশালিস্টদের' মুখে এরকম কথা শুনে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্কের এক কাগজে মার্ক্স্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এবং তাঁর আজীবন সহকর্মী এঙ্গেল্সের সঙ্গে চিঠিপত্রে ভারতবর্ষের কথা নিয়ে যে আলোচনা তিনি করেছিলেন, তাতে আমাদের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিলাতের 'সোশালিস্ট' মহল যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাবে, তাতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই।

১৮৪৮ সালে কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্স্ ভারতবর্ষে ও চীনদেশে নতুন বাজার আর ব্যবসার আড্ডা তৈরি হওয়ার ফলে ধনিক ব্যবস্থার বিকাশে যে-প্রভাব পড়বে

সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন; ঐ বৎসর ইয়োরোপের নানা দেশে বিপ্লবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোথাও তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন ইয়োরোপের বাইরে— এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাতে ধনিক উৎপাদনী ব্যবস্থার প্রসারে। এ বিষয়ে মার্ক্স্-এঙ্গেল্সের কয়েকটি মূল্যবান চিঠি আছে। ১৮৫৮ সালের ৮ই অক্টোবরে মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্কে লেখেন :

"বুর্জোয়া সমাজ আবার যেন দ্বিতীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য দিয়ে চলেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে তার জন্ম, আর এবার তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে বলে আমি মনে করি। বুর্জোয়া সমাজের প্রধান কাজ হচ্ছে সারা দুনিয়াতে নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য বাজার সৃষ্টি করা আর সেই বাজারের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। কিন্তু পৃথিবী গোল; তাই আর নতুন বাজার তৈরি করার জায়গা নেই। এখন আমাদের সামনে সমস্যা হচ্ছে এই : ইয়োরোপে বিপ্লব আসন্ন, আর তা সাম্যবাদী রূপ নিতে বাধ্য; কিন্তু এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাতে বুর্জোয়ারা যদি প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকে তো এই ছোট্ট ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট তারা করবেই।"

এ কথা মার্ক্স্ বলেছিলেন প্রায় আশি বছর আগে; অনেকেই আজ তার যাথার্থ্য বুঝছেন। ইয়োরোপ দুনিয়ার সর্বত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে বলেই বুর্জোয়া-ব্যবস্থা মরেও মরছে না। ভারতবর্ষের মতো তাঁবেদারী দেশই হচ্ছে তাই সাম্রাজ্যবাদের আসল খুঁটি। এই তাঁবেদারী দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিপন্ন পর্যুদস্ত না হলে ইয়োরোপের জনসাধারণও বুর্জোয়াদের কবল থেকে মুক্তি পাবে না। আমাদের ভবিষ্যতে কী ঘটবে ভেবে অনেক সময় আমরা ইয়োরোপের দিকে চেয়ে থাকি; কিন্তু ইয়োরোপেরও ভবিষ্যৎ আমাদের চেষ্টা, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের গণশক্তির উপর নির্ভর করছে। দুনিয়ার যারা সর্বহারা, তাদের আন্দোলন সর্বদেশে একই সূত্রে গ্রথিত রয়েছে।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের প্রাচীন পল্লীব্যবস্থা (Village System) ভেঙে গেছে। এর মূলগত কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে মার্ক্সের চিন্তাধারা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১৮৫৩ সালে এঙ্গেল্স মার্ক্সকে এক চিঠিতে লেখেন যে প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সেখানে ভূমিস্বত্ব কখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়নি। ইয়োরোপে রোমান, টিউটন, কেল্ট, শ্লাভ প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, কিন্তু সেখানে ক্রমে সামন্ততন্ত্র ও ভূম্যধিকারীশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। প্রাচ্যদেশে কেন তা হয়নি, বোঝাবার জন্য এঙ্গেল্স্ আরো বলেন যে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে, সেখানে সাহারা থেকে আরব, পারস্য, তাতার হয়ে এশিয়ার সর্বোচ্চ অধিত্যকাগুলি পর্যন্ত বিরাট মরুভূমি বিস্তৃত হয়ে আছে বলে কৃষিকর্মের সুবিধার জন্য জলসেচের ব্যবস্থা অবশ্য-প্রয়োজন ছিল, আর সে ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিল সরকার কিংবা পল্লীসঙ্ঘ; কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা অসাধ্য ছিল। তাই দেখা যায় যে, এশিয়াতে অতি প্রাচীন কাল হতে মোটের উপর তিনটি সরকারি বিভাগ চলে এসেছে—রাজস্ব, যুদ্ধ এবং পূর্তকার্য।

পল্লীব্যবস্থায় প্রত্যেক ছোটো গ্রামেরই স্বতন্ত্র জীবনধারা ও শাসনশৃঙ্খলা ছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিলাতে পার্লামেন্টে পেশ করা একটা পুরানো সরকারি রিপোর্ট থেকে মার্ক্স্ একটা লম্বা উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

"ভূগোলের দিক থেকে দেখলে— একটা গ্রামে আছে কয়েক শো বা কয়েক হাজার একর চাষের জমি আর পোড়ো জমি। রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে দেখলে— সেই গ্রামের সঙ্গে একটা সমবায় বা পৌরসঙ্ঘের সাদৃশ্য বোঝা যাবে। প্রধান বাসিন্দা বা পটেল গ্রামের সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করেন; গ্রামবাসীদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাও তদারক করেন আর খাজনা আদায় করেন; গ্রামের মুহুরির কাছে থাকে চাষবাসের হিসাবদপ্তর; একজন বা দুজন গ্রামবাসী ফৌজদারী ব্যাপারের ভার নিয়ে থাকেন, আর পথিকদের এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নিরাপদে পৌঁছে দেন; একজন গ্রামের চৌহদ্দি স্থির রাখেন, দরকার হলে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেন; পুকুর নালা ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক চাষের জন্য জলবিলির ব্যবস্থা করেন; ব্রাহ্মণের উপর দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভার থাকে; গুরুমহাশয় ছেলেমেয়েদের হাতে-খড়ি দেন; জ্যোতিষী পাঁজি দেখে শুভ অশুভ দিন স্থির করেন। সাধারণত এই কয়জন কর্মচারী গ্রামের কাজ চালিয়ে যান; তাঁদের সংখ্যা কোথাও বেশি, কোথাও বা কম। স্মরণাতীত কাল থেকে এই রকম সাদাসিধে ভাবে গ্রামের শাসন চলে এসেছে। গ্রামের চৌহদ্দি নিয়ে অদলবদল অতি কদাচিৎ হয়েছে। আর যুদ্ধ বা মহামারিতে দেশ বিধ্বস্ত হলেও গ্রামের জীবন বিশেষ বদলায়নি। একই নাম, পরিমিতি, চিন্তাধারা, গোষ্ঠীবর্গ পর্যন্ত বহুকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন নিয়ে গ্রামবাসীরা ব্যতিব্যস্ত হয়নি; গ্রামের অস্তিত্ব যত দিন অক্ষুণ্ণ ততদিন রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন তাদের বিচলিত করতে পারেনি, গ্রামের অন্তর্ব্যবস্থায় কোনো বিকৃতি ঘটেনি। এখনো গ্রামের মোড়ল পটেল; ঝগড়া নিষ্পত্তি, সাজার ব্যবস্থা আর খাজনা আদায়ের ভার তার হাতে।"

ভারতবর্ষের এই সমাজব্যবস্থা ইংরেজ বণিকের আবির্ভাবের ফলে সমূলে উৎপাটিত হতে আরম্ভ হল। আরো বহু বিদেশি ভারত আক্রমণ করেছিল, কিন্তু কোনো জাত এমন নিদারুণভাবে এখানকার জীবন-ব্যবস্থায় ওলট-পালট এনে দেয়নি, ইংরেজের মতো কেউ শুধু বিদেশিই থেকে যায়নি, এদেশে মাত্র কিছুকাল কয়েকজন বাস করে এখানকার দৌলত বিদেশে রপ্তানী করায়নি। তাই মার্ক্সের ভাষায় বলা যায় :

"এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষের দুর্গতি পূর্বের তুলনায় শুধু বিভিন্ন প্রকৃতির নয়, বহু গুণ তীক্ষ্ণ ও তীব্রও বটে। এর কারণ কেবল এশিয়ার আর ইয়োরোপের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দানবীয় সংযোজন নয়; ঐ সংযোজন ইংরেজের বিশেষত্ব নয়, ওলন্দাজ শাসনের অনুকরণ মাত্র।— অবিরাম গৃহবিবাদ, আক্রমণ, পরাজয়, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দরুন ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের কাছে জটিল ও সংহাররূপে দেখা দিলেও এ সমস্ত ঘটনা সমাজের বহিরাবরণ স্পর্শ করে গেছে মাত্র, আমূল পরিবর্তন আনেনি। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় সমাজের আসল কাঠামো ভেঙে গেছে। এখনো তা নতুন করে গড়ে ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। ভারতবর্ষ তার প্রাচীন জীবন হারিয়ে ফেলেছে, নতুন জীবনের সন্ধান পায়নি। ইংরেজ শাসনে হিন্দুস্থান ঐতিহ্যচ্যুত হয়েছে, তার অতীতের সঙ্গে সংস্রব হারিয়েছে। এখনকার ভারতীয় জীবনে তাই শুধু-যে বিষাদ আছে তা নয়, একটা বিশেষ রকম অবসাদও মিশে রয়েছে।"

ইংরেজ শাসনের এই সংহার-মূর্তির বর্ণনা মার্ক্স্ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ১৮১৩ পর্যন্ত সোজাসুজি লুণ্ঠন চলেছিল— পূর্বতন শাসকরা যে পূর্তকার্য ও জলসেচের ব্যবস্থা করেছিল, ইংরেজ আমলে তা অবহেলিত হল, নষ্ট হল লুঠের নেশায় তখন ইংরেজ মশগুল।

এদেশের মাল যাতে বিলাতে না ঢোকে—এমনকি ইয়োরোপের কোনো দেশে না যেতে পারে—সে জন্য আইন করে আমদানি বন্ধ হল কিংবা বেজায় বেশি হারে মাশুল বসানো হল। ইংরেজের ভূমিস্বত্ব আইন এখানে কায়েম হল, ইংরেজের ফৌজদারী আইন এল।

উনিশ শতক হল ধনিকতন্ত্রের মরশুমের সময়। ১৭৮৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত আইনকানুনের অদলবদলের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এদেশে ব্যবসাতে একচেটিয়া অধিকার নষ্ট হল। ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের লীলাক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। আর ইংরেজ পুঁজিদারদের মুনাফা বাড়াবার জন্য এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা হল। তাই দেখা যায় যে, ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে বিলাত থেকে এদেশে আমদানি মালপত্রের দাম বাড়ল ৩,৮৬,১৫২ পাউন্ড থেকে ৮০,২৪,০০০ পাউন্ড। ১৭৮০-তে বিলাতের মোট রপ্তানির মাত্র বত্রিশ ভাগের এক ভাগ ভারতবর্ষে আসত; ১৮৫০ সালে তা চারগুণ বৃদ্ধি পেল। যে-বস্ত্রব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন হল ভারতবর্ষ, বিলাতের লোকসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ সেই ব্যবসা থেকেই জীবিকা উপার্জন করতে লাগল; বিলাতের রাজস্বের একদ্বাদশাংশ এল বস্ত্রব্যবসায় থেকে। ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পকে নির্মমভাবে নির্মূল করার ফলেই বিলাতের এ সমৃদ্ধি সম্ভব হল।

১৮৫৩ সালের ১০ই জুন তারিখের 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন' পত্রে মার্ক্স্ লিখেছিলেন : "১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিলাত থেকে ভারতে সূতা রপ্তানি ৫,২০০ গুণ বেড়েছিল। ১৮২৪ সালে ভারতবর্ষে দশ লক্ষ গজ বিলাতি কাপড় আমদানি হত কি না সন্দেহ; অথচ ১৮৩৭ সালে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ গজেরও বেশি আমদানি হয়েছিল। ঐ সময়েই ঢাকার লোকসংখ্যা দেড়লক্ষ থেকে বিশ হাজারে নামল। শুধু যে বস্ত্রশিল্পের পীঠস্থানগুলিরই পতন হল তা নয়, ফল হল আরো ভয়াবহ। সারা হিন্দুস্থানে কৃষি ও শিল্পকর্মের মধ্যে যে যোগসূত্র ছিল, তা ইংরেজদের বিজ্ঞান আর বাষ্পযন্ত্র একেবারে ছিন্ন করে দিল।"

"বিলাতের কার্পাসশিল্পে যন্ত্র প্রচলনের ফল ভারতবর্ষের পক্ষে ভয়াবহ হল। ১৮৩৪-৩৫ সালে বড়োলাট দেশের অবস্থা সম্বন্ধে জানালেন, 'বাণিজ্যের ইতিহাসে এরূপ দুর্গতির তুলনা নেই। তাঁতিদের হাড়ে হিন্দুস্থানের মাটি সাদা হয়ে যাচ্ছে'।

কৃষি ও শিল্পকর্মের অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ ছিল এদেশের পল্লীব্যবস্থার আশ্রয়। ভারতীয় সমাজের খুঁটি ছিল চরকা আর তাঁত। সেই দেশে ইংরেজ ঢুকে তাঁত ভাঙল, চরকাকে নষ্ট করল। ইংরেজ এল অবশ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য; কিন্তু তার আসার ফলে একটা বিরাট সমাজবিপ্লব এদেশে আরম্ভ হয়ে গেল। পুরানো শিল্পপ্রধান শহরগুলো নষ্ট হল, শহরের লোক গ্রামে গিয়ে ভিড় বাড়াবার ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে যে সরল সামঞ্জস্য ছিল তাও নষ্ট হল। কৃষিকর্ম ছাড়া উপার্জনের উপায় বন্ধ হল বলে জমির উপর চাপ বেড়ে গেল, চাষ করে কোনোক্রমে কায়ক্লেশে দিন গুজরান করা শক্ত হয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত গ্রামের সেই অবস্থা রয়েছে, চাষীদের দুর্গতির সীমা নেই। সরকার কেবল খাজনা আদায় করেই চলল, কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য সামান্য প্রয়াসও করল না। ১৮৫০-৫১ সালে দেখা যায় যে খাজনা ১ কোটি ৯৩ লক্ষ পাউন্ড, অথচ নদীনালা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড খরচ হল। মার্ক্স্ তাই 'ক্যাপিটালে' এই অবস্থার উল্লেখ করে বললেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে উৎপাদন-ব্যবস্থার উন্নতি প্রায় অসম্ভব; আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, তাদের কোনো রকমে বেঁচে থাকতে হবে, সভ্য জীবনের কোনো পরিচয়ই তারা পাবে না। ঐ সময় সম্বন্ধে মার্ক্স্ আরো লিখলেন : 'ইংরেজ পুঁজিদারদের মূলধনের উপর সুদ

ইত্যাদিতে ভারতবর্ষ বিলাতে বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউন্ড কর পাঠাচ্ছে। এটা হল 'সুশাসনের' দাম! তাছাড়া ইংরেজ রাজপুরুষেরা তো বেতন থেকে বাঁচিয়ে অনেক টাকা দেশে পাঠাচ্ছে, আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা লাভের বেশ খানিকটা অংশ খাটাবার জন্য ফেরৎ দিচ্ছে।"

কিন্তু ভারতের প্রাচীন পল্লীব্যবস্থার পতনে মার্ক্স্ অশ্রু বিসর্জন করতে রাজি হননি। বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে সকল দেশে জনসাধারণের যে দারুণ দুর্গতি ঘটেছিল, তার বর্ণনা অবশ্য মার্ক্সের মতো কেউই দিতে পারেনি। কিন্তু তিনি জানতেন যে পল্লীব্যবস্থার মতো প্রাচীন সমাজ-আদর্শ ইতিহাসের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক, তাকে নির্মমভাবে অপসৃত করা ভিন্ন উপায় নেই। আমাদের দেশে অনেকে আছেন যাঁরা আগে চলতে চান না, কেবল চেয়ে থাকেন পিছনের দিকে, আবার পুরানো চরকা-তাঁতের যুগে ফিরে যেতে চান। তাঁদের পক্ষে মার্ক্সের কথা বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার :

"অসংখ্য নিরীহ, শ্রমশীল, কুলপতি-শাসিত পল্লীসমাজ ছিন্নভিন্ন হল, প্রাচীন জীবনধারা ও জীবিকানির্বাহের বংশপরম্পরাগত ব্যবস্থা নষ্ট হল, যন্ত্রণার অবধি রইল না। এ ঘটনায় আমরা দুঃখ পাই নিশ্চয়, কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে, এই নিরীহ পল্লীসমাজগুলিই ছিল প্রাচ্য স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের যথার্থ ভিত্তি, এরা মানুষের মনকে ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখত, এদের শাসনে মানুষ হত নিষ্ক্রিয়, কুসংস্কার ও প্রাচীন বিধিনিষেধের দাস, নিজের মহিমা ও পৌরুষ সম্বন্ধে উদাসীন। আমরা ভুলতে পারি না যে তাদের ছিল এক প্রকার বর্বরসুলভ অহমিকা; তাদের অনুরাগ ছিল শুধু খানিকটা জমির উপর; সাম্রাজ্যের পতন, অকথ্য অত্যাচার, জনহত্যা ইত্যাদি তাদের কাছে প্রাকৃতিক ঘটনার মতো লাগত, বিচলিত করত না; অথচ তাদের প্রতি 'কৃপাদৃষ্টি' দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে তারা ছিল একান্ত অসহায়। আমরা ভুলতে পারি না যে এই নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অশ্রদ্ধেয় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ারূপে উৎকট, লক্ষহীন অনাচারের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। নরহত্যা পর্যন্ত হিন্দুস্থানের ধর্মানুষ্ঠানে প্রবেশ করেছিল। আমরা ভুলতে পারি না যে, এই ক্ষুদ্র সমাজগুলিকে জাতিভেদ ও দাসপ্রথা কলুষিত করে রেখেছিল, সেখানে মানুষ পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধককে পরাভূত করার চেষ্টা না করে তার বশ্যতা স্বীকার করত। অচঞ্চল, অন্ধ নিয়তিতে বিশ্বাস সামাজিক উদ্যোগ ও উন্নতিপ্রচেষ্টাকে নিষ্পিষ্ট করত, প্রকৃতিপূজার বিধানে মানুষের অধঃপতন সূচিত হত, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ নতজানু হয়ে হনুমান ও গোমাতার অর্চনা করত।"

তাই ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের পদ্ধতিকে মার্ক্স্ জঘন্য আখ্যা দিলেও বলেছিলেন : "এশিয়ার সমাজব্যবস্থায় আমুল বিপ্লব না এলে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে অভীষ্ট সাধন সম্ভব কিনা? যদি না হয় তবে শত অপরাধ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবে ইংল্যান্ড অজ্ঞাতসারেই ইতিহাসের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে।"

মার্ক্স্ ১৮৫৩ সালে বলেছিলেন : "ভারতে ইংরেজের কাজ ছিল দু-রকমের— এশিয়ার সনাতন সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা, আর সেখানে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তি স্থাপন করা। — ভারতবিজেতাদের মধ্যে ইংরেজই প্রথম সভ্যতায় অধিক অগ্রসর বলে হিন্দু সংস্কৃতির কাছে বশ্যতা মানেনি। এবং ইংরেজ এসে দেশের সমাজকে ভেঙেছে, শিল্পকে নির্মূল করেছে, সমাজের যা-কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ছিল তার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেছে। তাদের ভারতশাসনের ইতিহাসে এখনো শুধু ধ্বংসেরই বর্ণনা আছে, ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পুনর্গঠন চেষ্টা প্রকাশ হতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুনর্গঠন আরম্ভ হয়ে গেছে বলা যায়।"

'পুনর্গঠনের' লক্ষণ মার্ক্স্ কোথায় দেখেছিলেন?— এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন :

(১) "মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে সুদূর-বিস্তারী ও সুসংহত রাষ্ট্রিক ঐক্য। আর ইংরেজের অস্ত্র ভারতবর্ষের উপরে যে ঐক্য চাপিয়েছে, তা এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফের কল্যাণে দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।"

(২) "স্বরাজ অর্জনে আর বিদেশি আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় যাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সেই ভারতীয় সৈন্যদলকে ইংরেজ গড়ছে, অস্ত্রশিক্ষা দিচ্ছে।" (মার্ক্স্ লিখেছিলেন অবশ্য ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের পূর্বে; ঐ ঘটনার ফলে ইংরেজদের সামরিক কর্তৃত্ব কঠোরতর করা হয়, আর ভারতের সৈন্যদলের এক-তৃতীয়াংশ হয় গোরা।)

(৩) 'স্বাধীন সংবাদপত্র' (১৮৩৫ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৮৭৩ থেকে সাম্রাজ্যতন্ত্রের সংকটের পরিচায়করূপে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সংকোচ আইন প্রবর্তিত হয়)।

(৪) "ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্বের প্রবর্তন, যার বৈপ্লবিক ফলাফল অবশ্যম্ভাবী।"

(৫) "অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অল্প কয়েকজন ভারতীয়কে কলকাতায় শিক্ষা দিচ্ছে বলে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী আর দেশশাসন ব্যবস্থায় সুদক্ষ এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে।"

(৬) "বাষ্পযানের কল্যাণে ভারতবর্ষ ও ইয়োরোপের যোগাযোগ দ্রুত ও নিয়মিত হয়েছে। ভারতবর্ষের পঙ্গুতার যে প্রধান কারণ ছিল বিদেশের সংস্রব বর্জন, তা থেকে দেশ উদ্ধার পেয়েছে।"

মার্ক্স্ বলেছিলেন যে, ভারতের অগ্রগতি নিয়ে বিলাতের শাসকসম্প্রদায় বিশেষ মাথা ঘামায়নি। "সেখানকার অভিজাতশ্রেণী চেয়েছিল দেশটাকে ঘটা করে জয় করতে, পুঁজিদাররা চেয়েছিল লুঠ করতে, আর কারখানার মালিকরা চেয়েছিল সস্তায় নিজেদের মাল বেচার সুবিধা জোগাড় করতে।" কিন্তু ক্রমে মালিকরা বুঝল যে, নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই ভারতবর্ষে সামান্য কিছু শিল্পোৎপাদন দরকার, আর তাই দেশের মধ্যে রেলে যাতায়াত এবং জলসেচ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে মার্ক্স্ ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন :

"আমি জানি যে বিলাতের কারখানার মালিকরা সস্তায় তুলা ও অন্যান্য কাঁচা মাল জোগাড় করার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করতে চেয়েছে। কিন্তু যে দেশে লোহা আর কয়লা উৎপন্ন হয়, সে দেশের যানব্যবস্থায় একবার যন্ত্রের প্রবর্তন হলে সেখানে আর যন্ত্র নির্মাণকে প্রতিরোধ করা যায় না। একটা বিরাট দেশে রেলপথের শাখাপ্রশাখা বজায় রাখতে গেলে রোজ-কে-রোজ যা দরকার তা সরবরাহের জন্য কারখানা চাই। এর ফলে যে-সব শিল্পের সঙ্গে রেলের কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাদের চাহিদা মেটাবার জন্য কলকব্জার প্রচলন বাড়বে। তাই রেলপথের ব্যবস্থা সত্যই ভারতবর্ষে আধুনিক কল-কারখানার অগ্রদূত হবে। যে পুরুষানুক্রমিক কর্মভেদ ছিল জাতি-ভেদের ভিত্তি, রেলপথ বিস্তারের ফলে আধুনিক শিল্পের প্রবর্তন হওয়ায় তা নষ্ট হবে, ভারতের প্রগতির ও গণশক্তির পথের যে চরম অন্তরায় ছিল তা অপসৃত হবে।"

যদি কারো মনে ধারণা হয়ে থাকে যে, মার্ক্স্ তো ক্রমাগত ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সুপারিশই করে চলেছেন, তবে সে ধারণা হাস্যকর হবে। ভারতের গণশক্তি জাগ্রত না হওয়া

পর্যন্ত নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে না। ইংরেজ শাসন শুধু তার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন করেছে, বিদেশি শাসন এসে অত্যাচার অনাচার করে পুরানো সমাজের কাঠামো না ভেঙে দিলে তা সম্ভব হত না। কিন্তু বিদেশি শাসনের কাজ সেখানেই শেষ; ভারতের গণশক্তিই ভারতের ভবিষ্যৎকে গড়তে পারে। তাই মার্কস্ বলেছিলেন :

"ইংরেজ বুর্জোয়াশ্রেণী যা করতে বাধ্য হচ্ছে, তাতে গণসাধারণের দাসিত্ব মোচন বা সামাজিক অবস্থার উন্নতিও হবে না। সেজন্য শুধু দেশের উৎপাদনীশক্তির সংবর্ধন নয়, সে শক্তিকে গণসাধারণের করায়ত্ত করা প্রয়োজন, ইংরেজ শাসনে এই উভয় ব্যবস্থার বাস্তব ভিত্তি নিশ্চয় স্থাপিত হবে। কিন্তু কোথাও কি বুর্জোয়াশ্রেণী এর বেশি কিছু করেছে? তারা কি কখনো মানুষকে রক্ত আর পঙ্কিলতা আর দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে না টেনে সমাজের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে? যতদিন বিলাতের শ্রমিকেরা শাসকশ্রেণীকে নিষ্কাসিত না করে, কিংবা ভারতীয় জনসাধারণ আত্মশক্তিবলে ইংরেজদের শাসন-শৃঙ্খল চূর্ণ না করে— ততদিন ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভারতবর্ষের সমাজক্ষেত্রে যে নতুন বীজ বপন করেছে তার ফল ভারতবাসী পাবে না। তবু আমরা নিশ্চিন্ত মনে সেদিনের প্রতীক্ষা করতে পারি যখন শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, সেই বিশাল, চিত্তাকর্ষক দেশের পুনর্জীবন আসবে, যে দেশের শান্ত অধিবাসীরা প্রিন্স সলটিকভের ভাষায় 'ইতালিয়ানদের চেয়ে মার্জিত ও নিপুণ, যারা বশ্যতা স্বীকার করলেও নিজেদের সৌম্য আভিজাত্য হারায়নি, যারা স্বাভাবিক শৈথিল্য সত্ত্বেও যুদ্ধে অসাধারণ বীর্য দেখিয়ে ইংরেজ নায়কদের আশ্চর্য করেছে, যাদের দেশ হচ্ছে আমাদের ভাষা— আমাদের ধর্মের উৎস, যাদের জাটদের মধ্যে প্রাচীন জার্মান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকের মূর্তি আমরা দেখতে পাই।"

আজ বিশ্বব্যাপী সংকটের দিনে আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস ভারতবাসীর উপর যে দায়িত্ব চাপিয়েছে আর তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—'যা নেই ভারতে, তা নেই জগতে'—এ প্রবাদের মূলে শুধু স্বদেশ সম্বন্ধে একটা মোহ নেই, আছে অকাট্য সত্য। দুনিয়ার দৌলত আছে আমাদের দেশে। তাই যুগ যুগ ধরে দুনিয়ার দস্যুরা লুঠের আশায় এখানে এসেছে, জেঁকে বসে রাজত্ব ফেঁদেছে। এমন দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব হচ্ছে সত্যই একটা তাজ্জব ব্যাপার। সকল ভারতবাসীর সমৃদ্ধির সংস্থান এদেশে রয়েছে, অথচ দারিদ্র্যের তাড়নায় দেশবাসী আজ মুমূর্ষু। ভারতবাসীরা গরীব, কিন্তু ভারতবর্ষ গরীব দেশ নয়।

সকলেই জানেন যে দুশোবছর আগেও বিদেশিরা এদেশের অতুল ঐশ্বর্য দেখে গেছে। ১৭৫৭ সালে বাংলার পুরানো রাজধানী মুর্শিদাবাদ দেখে ক্লাইভ বলেছিল যে, মুর্শিদাবাদ লন্ডনের মতোই বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও জনাকীর্ণ শহর; তফাৎ শুধু এই যে, মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠীরা লন্ডনের ধনকুবেরদের চেয়ে অধিক ঐশ্বর্যশালী। ১৭ ও ১৮ শতকে বিদেশি পর্যটকরা

ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে যে সম্পদ লক্ষ করেছিল আজ আর তার অস্তিত্ব নেই। ফরাসি তাভের্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়, এদেশের ক্ষুদ্রতম গ্রামেও চাল, ময়দা, মাখন, দুধ, সিম ও নানাবিধ শাকসবজি, চিনি ও বহু প্রকার মিষ্টান্ন অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। বাদশাহ্ আওরংজেবের প্রধান চিকিৎসক ইতালিবাসী মানুচী ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের ঐশ্বর্যের উচ্ছসিত বর্ণনা রেখে গেছেন। বাংলা দেশেই ইংরেজ আমলের প্রথম পরখ হয়েছিল; বাংলার দারিদ্র্যের আজ আর সীমা নেই। তাই এই বাংলাদেশ সম্বন্ধে মানুচী কী বলেন দেখা যাক :

"মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের খ্যাতি ইয়োরোপে সবচেয়ে বেশি। বাংলার মাটির উর্বরতা অসাধারণ, আর বাংলা থেকে বিদেশে প্রচুর মালপত্র রপ্তানি হয়ে থাকে। মিশরের তুলনায় এদেশ একেবারেই নিকৃষ্ট নয়; এমন কি রেশমি ও সূতী কাপড়, চিনি আর নীল উৎপাদনে বাংলা মিশরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ফল, শস্য, ডাল, মস্‌লিন, রেশমি ও স্বর্ণখচিত বস্ত্র— সবই এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়।"

আন্দাজ ১৬৬০ সালে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার বাংলা দেশ সম্বন্ধে লেখেন : "দু-বার বাংলায় ভ্রমণ করে আমার ধারণা হয়েছে যে বাংলাদেশ মিশরের চেয়ে ঐশ্বর্যশালী। এখান থেকে রেশমী ও সূতী কাপড়, চাল, চিনি, মাখন ইত্যাদি প্রচুর রপ্তানি হয়। ধান, গম, শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যাতায়াতের সুবিধার উদ্দেশ্যে কোনো এক সুপ্রাচীন যুগে রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বহু যত্নে অসংখ্য খাল কাটা হয়েছিল।"

ইংরেজ আমলের আগে এদেশের অবস্থা খুব ভালো ছিল না প্রমাণ করার জন্য সিভিলিয়ান মোরলন্ড কোমর বেঁধে লেগেছিলেন; "India at the Death of Akbar" আর "From Akbar to Aurungzeb", এই দুই-এ তার নমুনা মিলবে। কিন্তু তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে গ্রামের লোকদের মাথাপিছু গড় আয় তখন থেকে কিছু বদলায়নি। বিদেশি বাণিজ্য, জাহাজ তৈরি ব্যবসা আর বস্ত্রশিল্প থেকে যে-আয় হত, তা এদেশেই থেকে যেত, এ কথা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে। সিভিলিয়ান সাহেবের আরো স্মরণ করা উচিত, গত তিনশো বছরে ইয়োরোপের সব দেশে সমৃদ্ধি কতগুণ বেড়েছে, অথচ তাঁর নিজেরই হিসাব অনুসারে তিনি বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে আকবরের যুগের তুলনায় আজকের ভারতবাসীদের আয় প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে, বাড়েওনি, কমেওনি।

১৯১৮ সালে সরকারি শিল্প-কমিশনের রিপোর্টের প্রথমেই ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে ভারতবর্ষের শিল্পবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। "আধুনিক শিল্পব্যবস্থার জন্মস্থান পশ্চিম ইয়োরোপে যখন অসভ্যদের বসবাস ছিল, তখনই শাসকদের ঐশ্বর্য ও কারিকরদের শিল্পকৌশলের জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বহু শতাব্দী পরে যখন পশ্চিমের দুঃসাহসী ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষে প্রথম উপস্থিত হয়, তখনো শিল্পবিকাশের দিক থেকে এদেশ ইয়োরোপের অগ্রগামী জাতিদের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল না।..." ইংরেজ শাসন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তৎকালীন জগতের মানদণ্ড অনুসারে ভারতবর্ষে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি ঘটেছিল; এ হচ্ছে সর্বত্র স্বীকৃত অবিসম্বাদী সত্য।

আধুনিক বিধানে শিল্পোন্নতির পূর্ণ সম্ভাবনা যে এদেশে ছিল, তাও অকাট্য।

শিল্প-কমিশনের সভাপতি, ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে প্রধান বিশেষজ্ঞ সার টমাস হলান্ড বলেছেন যে তাম্র, পিত্তল, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ভারতবর্ষ বহুদিন অগ্রসর হয়ে

রয়েছে। সুতরাং এ কথা বলা অন্যায় হবে না যে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সংস্থান এদেশে ছিল।

এ ছাড়া সোনা, রূপা, ম্যাঙ্গানিজ্, সিসা, কয়লা, তেল ইত্যাদি ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। অবশ্য ব্রহ্মদেশ ছিল তেল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র, আর ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেখানে সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি আরো কায়েম করে তেলের মতো একটা বিশেষ দরকারি মালের সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু ভারতবর্ষের নানা জায়গায় যে তেল ভূগর্ভেই রয়ে গেছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সে সব জায়গায় তেল বার করে নেবার ব্যবস্থা হলে যথেষ্ট তেল দেশের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৮৯৪ সালে ভারত সরকারের অর্থনীতি বিশারদ স্যার জর্জ ওয়াট্ লিখেছিলেন যে পূর্তকার্য বাড়িয়ে আর যানবাহনের সুব্যবস্থা করে কৃষিপদ্ধতি ও প্রকরণের উন্নতি ঘটিয়ে অতি সহজে এদেশের উৎপাদিকাশক্তি অন্তত দেড়গুণ বাড়ানো যেতে পারে। তখন থেকে উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার উপায় অনেক বেশি উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রয়ে গেছে।

ভারতের ভূতত্ত্ববিভাগের বড়োকর্তা স্যার এড্উইন্ প্যাস্কো ১৯৩১ সালে লন্ডনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে এদেশে প্রভূত কয়লা (প্রায় ৩৬০০ কোটি টন) মজুদ আছে; আর ইস্পাত তৈরির জন্য বিশেষ দরকারি ম্যাঙ্গানিজ ধাতু পৃথিবীতে যত উৎপন্ন হয় তার এক-তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ সরবরাহ করতে পারে।

১৯২৯ সালে ভূতত্ত্ববিভাগের উচ্চকর্মচারী সিসিল জোনস্ হিসাব করেছিলেন যে, অসংস্কৃত লৌহ এদেশে যত আছে, এর চেয়ে বেশি পাওয়া যায় একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং ফ্রান্সে। ডক্টর রজনীকান্ত দাস "The Industrial Efficiency of India" পুস্তকে দেখিয়েছেন যে, এই সম্পদের ব্যবহার প্রায় হয় না বললেই চলে; অগ্রগামী দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে এর প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ অপচয় হয়ে থাকে। অনেক সময় বলা হয় যে কাছাকাছি কয়লার খনি না থাকার দরুন অসংস্কৃত লৌহকে সংস্কৃত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিভাগের বড়োকর্তা ডক্টর সিরিল ফক্স্ দেখিয়েছেন যে, কলকাতা থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণ আর ৪০০ মাইল পশ্চিমের মধ্যে প্রায় ২০০০ কোটি টন উৎকৃষ্ট অসংস্কৃত লৌহ পাওয়া যায়। আর এখান থেকে ১২৫ মাইলের মধ্যে অনেক কয়লা খনিও রয়েছে। ভূতত্ত্ববিভাগ থেকে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে, টাকার টানাটানির দরুন ভাল করে খনিজদ্রব্যের সন্ধান তারা করতে পারে না। ডক্টর সিরিল ফক্স্ সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ববিদ্ সম্মেলনে গিয়ে এ বিষয়ে সোভিয়েট ভূতত্ত্ববিদ্‌দের প্রতি সরকারের আনুকূল্য লক্ষ করেছিলেন; এদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাও একাধিকবার বলেছেন। সুতরাং এখন আমরা এদেশের খনিজসম্পদের যে হিসাব পাই তা একেবারেই সম্পূর্ণ নয়, ভারতবর্ষের যে ঐশ্বর্য ভূগর্ভে প্রোথিত রয়েছে তার পরিমাণ এখনো হয়নি। কিন্তু সামান্য যা হয়েছে, তা থেকেই সরকারি ভূতত্ত্ববিভাগ বলতে পারে যে বর্তমান লোহা-ইস্পাতের কারখানাগুলিকে অনেক বেশি বাড়ানো সম্ভব। যাকে বলা হয় Key Industries—সেই মৌলিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন এখনই এদেশে সম্ভব।

জলের শক্তি দিয়ে যন্ত্র চালাবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সর্বত্র হতে পারে, সর্বত্র কারখানা বসিয়ে দেশের সম্পদকে বহুগুণ বর্ধিত করা যেতে পারে। একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ভারতবর্ষের মতো এত বেশি water power নেই। অথচ এখানে

কবি বিষ্ণুদে ও পি. সি. যোশীর সঙ্গে

নব্বই বছর বয়সে

তার ব্যবহার করা হয় শতকরা মাত্র তিন ভাগ, সুইট্‌জারল্যান্ডে হয় শতকরা ৭২ ভাগ, জার্মানিতে শতকরা ৫৫ ভাগ, ইতালিতে ৪৭ ভাগ, ফ্রান্সে ও জাপানে ৩৭ ভাগ আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৩৩ ভাগ। —টিকা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষিকর্মে ও যন্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষ আজ অতি পশ্চাদ্‌পদ, তাই এদেশ এত দীনহীন। আমাদের দেশের অপরিসীম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে অবহেলা করা হয়েছে বলেই আজ এই অবস্থা। এর জন্য দায়ী হচ্ছে নিশ্চয়ই এদেশের বিদেশি শাসনব্যবস্থা। ভারতবর্ষের আছে অতুল সমৃদ্ধি, আর ভারতবাসীদের আছে অন্নবস্ত্রের অনটন— ইতিহাসের এই পরিহাসের কারণ কী?

ভারতবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক আয় কত? এ প্রশ্নের উত্তর একেবারে নির্ভুল ভাবে দেওয়া এখনো সম্ভব নয়। কিন্তু ১৮৬৮ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আমাদের বার্ষিক আয়ের হিসাব করার চেষ্টা কয়েকবার হয়েছে। এই হিসাবগুলির তারিখ বিশেষ মনে রাখা দরকার, কারণ ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের দামে অনেক অদলবদল হয়েছে। পুরানো হিসাবের মধ্যে কয়েকটির কথা অনেকেই জানেন। ১৮৬৮ সাল সম্বন্ধে দাদাভাই নওরোজী হিসাব করেছিলেন, আমাদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি টাকা। ১৮৮২ সালে সরকারি উদ্যোগে ব্যেরিং (যিনি পরে হয়েছিলেন লর্ড ক্রোমার) এবং বারবুর হিসাব করেছিলেন, জনপ্রতি আয় ছিল ২৭ টাকা। ১৮৯৯ সম্বন্ধে ডিগ্‌বি সাহেবের হিসাব ছিল ১৮ টাকা। ১৮৯৭-৯৮ সম্বন্ধে বড়োলাট লর্ড কার্জন বলেছিলেন যে, ভারতবাসীদের জনপ্রতি বার্ষিক আয় হচ্ছে ৩০ টাকা। প্রায় একশো বছর ইংরেজ রাজত্বের পর এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো রাজকর্মচারীর মুখ থেকেই এরকম স্বীকারোক্তি মিলেছে।

১৯১১ সাল সম্বন্ধে সরক্যারি শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক ফিন্‌ড্‌লে শিরাজ বার্ষিক আয় হিসাব করেছিলেন ৪৯ টাকা। ১৯১২-১৩ সম্বন্ধে বে-সরকারি অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও জোশীর হিসাব অনুসারে আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪।৷০ টাকা। ১৯২১-২২ সম্বন্ধে অধ্যাপক শা ও খাম্বাটা হিসাব করেন ৭৪ টাকা। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ১৯০০ সালের তুলনায় ১৯১২ সালে জিনিসপত্রের দাম শতকরা প্রায় ২৫ টাকা বেড়েছিল, এবং ১৯১২ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে আরো প্রায় ডবল বেড়েছিল। আবার ১৯৩১ থেকে দাম কমতে থাকে এবং ক্রমে ১৯৩৬ সালে ১৯১২ সালের যে-রকম অবস্থা ছিল তার কাছাকাছি গিয়ে পড়ে।

সাইমন কমিশন অনেক চেষ্টার পর স্থির করেছিল যে, ১৯২১-২২ সালে এদেশের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল ১১৬ টাকা। অর্থনীতিবিদ্‌রা বলেন যে, এ হিসাবে অনেক গলদ আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের হয়ে প্রাণপণে ওকালতি করতে গিয়েও সাইমন কমিশন যে-হিসাব করেছিল, তা থেকে এই দাঁড়ায় যে এদেশের লোকের দৈনিক আয় ১৯২১-২২ সালে ছিল বড়ো জোর পাঁচ আনা। তখন থেকে ১৯৩৬ এর মধ্যে কৃষিজ দ্রব্যের দাম প্রায় অর্ধেক পড়ে যায়; সুতরাং ১৯৩৬-এর ঐ পাঁচ আনা দাঁড়াবে দশ পয়সায়।

আরো মনে রাখতে হবে যে, এ হিসাব হচ্ছে গড়পড়তা। এদেশ থেকে ইংরেজ ধনিকদের খাটানো মূলধনের সুদ, কলকারখানায় বিদেশি অংশীদারদের লভ্যাংশ, বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক আর হৌসের মুনাফা ইত্যাদি অবশ্য বেরিয়ে যায়, কিন্তু সে সব টাকা এদেশের লোকে না পেলেও এ হিসাবে ধরা হয়েছে। তাছাড়া ভারতবাসীদের মধ্যেই আয়ের বিষম তারতম্য রয়েছে। "**Wealth & Taxable Capacity of India**" পুস্তকে শা ও খাম্বাটা দেখিয়েছেন যে,

এদেশের শতাংশের মাত্র একাংশ লোক পায় দেশের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ; লোকসংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশ পায় মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও অল্প। সুতরাং জনসাধারণের গড়পড়তা আয় উক্ত হিসাবের চেয়ে অনেক কম হতে বাধ্য। সাইমন কমিশনের হিসাব অনুসারে বিলাতের জনপ্রতি বার্ষিক আয় ১৩৯২ টাকা; সুতরাং যে শ্রমিক-পরিবারে আছে স্বামী-স্ত্রী আর তিনটি পুত্র-কন্যা তার আয় হওয়া উচিত ৬৯৬০ টাকা। অথচ আসলে দেখা যায় যে অধিকাংশ শ্রমিক-পরিবারের ভাগ্যে ঐ সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও জোটে না। এ অবস্থায় আমাদের দেশের জনসাধারণের আয় হিসাব মাফিক যে নয়— তা সহজেই বোঝা যাবে।

১৯২৮ সালে ভারতবাসীদের বার্ষিক জনপ্রতি আয় সম্বন্ধে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির হিসাব ছিল ৪২ টাকা। ১৯৩৮ সালে অর্থসচিব স্যার জেম্‌স গ্রিগের মতে আয় ছিল জনপ্রতি ৫৬ টাকা। অধ্যাপক শা এবং খাম্বাটার কথায় এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শুধু দিনে দু'বার অন্নগ্রাস এ আয়ে চলে বটে কিন্তু বস্ত্র মেলে না, আচ্ছাদন মেলে না, আমোদ-প্রমোদ তো মেলেই না— আর যে-অন্ন মেলে তা হচ্ছে সবচেয়ে দীনহীন ও সব চেয়ে কম পুষ্টিকর।

১৯৩৫ সালে ইংরেজ সরকার জেলের কয়েদীদের খাবারের জন্য খরচ করেছিল গড়ে ১০৫ টাকা— অর্থাৎ সরকারি হিসাবে এদেশের চাষীদের যা আয় তার আড়াই গুণেরও বেশি। বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের অবস্থা চাষীদের চেয়ে ভালো, কিন্তু ১৯২৩ সালে তাদের খাওয়ার খরচের যে এক সরকারি হিসাব নেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে কয়েদীদের খাওয়ার খরচ তার চেয়ে বেশি।

এ পর্যন্ত প্রায় কেবল সরকারি হিসাবেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। এবার ইংরেজ ব্যবসাদারদের হিসাব দেখা যাক। তাদের হিসাবে বেশি ভুল থাকা উচিত নয়, কারণ তারা নিজের লাভের জন্য কোথায় কত খরিদ্দার আছে তা জানতে চায়, আর যত্ন করেই খোঁজ-খবর নেয়। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডন টাইম্‌সের একটা Trade and Engineering India Supplement প্রকাশিত হয়েছিল। এতে দেখা যায়, ব্যবসাদারদের হিসাবে এদেশে প্রায় ৬০০০ পরিবার আছে যাদের বার্ষিক আয় হচ্ছে লক্ষ টাকার উপর; ২,৭০,০০০ পরিবারের বার্ষিক আয় হচ্ছে ৫০০০ টাকা; ২,৫০,০০০ পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় হচ্ছে ১০০০ টাকা; সাড়ে তিনকোটি পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ২০০ টাকা; আর বাকি অন্যান্য পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় মাত্র ৫০ টাকা।

বার-বার বহু সরকারি রিপোর্টে স্বীকারোক্তি রয়েছে যে এদেশের অধিকাংশ লোকের সামান্য অন্নবস্ত্রেরও সংস্থান নেই। সরকারি চিকিৎসাবিভাগের বড়োকর্তা স্যার জন্ মেগ্ ১৯৩৩ সালের রিপোর্টে বলেছিলেন যে, এখানকার লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩৯ জন একরকম ভালো খেতে পায়; বাংলাদেশের অবস্থা আরো শোচনীয়, তাই এখানে ভালো খেতে পায় মাত্র শতকরা ২২জন।

অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই— এই হচ্ছে আমাদের দেশের জনসাধারণের অবস্থা। ভারতবর্ষের যেসব জায়গায় কারখানা বসেছে, খনি খুঁড়ে ধনিকের শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে, সেখানেই মজদুরদের দুর্দশার সীমা নেই। ১৯৩১-এর আদমসুমারিতে দেখা যায় যে বোম্বাই শহরের জনসংখ্যার শতকরা ৭৪ জনের মাথা গুঁজবার জায়গা ছিল মাত্র একখানি ঘর। কিছুকাল আগে এক সরকারি হিসাব অনুসারে দেখা গিয়েছিল, বোম্বাইয়ের মজদুরদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন এক-ঘর বাসায় থাকে, প্রায়ই এক ঘরে দুই পরিবার বাস করে, কখনো

কখনো ৭/৮টি পরিবারও একত্র একটিমাত্র ঘরে থাকতে বাধ্য হয়। করাচি, আহ্‌মদাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ, ঝরিয়া, হাওড়া, কলকাতার শহরতলী আর বস্তি সর্বত্রই ঐ একই অবস্থা। দরিদ্রনারায়ণের সেবা এই ভাবেই এদেশে হয়ে এসেছে।

বোম্বাইয়ের সরকারি 'লেবর গেজেটে' ১৯২২ এর সেপ্টেম্বরে এক লেডি ডাক্তারের বিবৃতি প্রকাশ হয়েছিল। তা থেকে এইটুকু উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে: "একটি 'চলের' তিনতলায় দৈর্ঘ্যে ১৫ আর প্রস্থে ১২ ফুট এক ঘরে আমি দেখলাম যে, ছটি পরিবার একত্র বাস করছে। আমার খবর যে ভুল নয় তার প্রমাণ এই যে, ঘরে ছটি আলাদা উনান ছিল। প্রশ্ন করে জানলাম, ঐ ঘরে বাস করে সর্বসমেত ৩০ জন প্রাণী। যে-ছজন স্ত্রীলোক ঐ ঘরে বাস করত, তাদের মধ্যে তিনজনের তখন সন্তান সম্ভাবনা লক্ষ করলাম। শুনলাম যে ঐখানেই নাকি প্রসবের ব্যবস্থাদি করতে হবে। চট ঝুলিয়ে প্রত্যেক পরিবার নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করে থাকে।"

এই হচ্ছে যে-দেশের অবস্থা সেখানে যে যমরাজের প্রকোপ খুবই— তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ২৩.৬; বিলাতে প্রায় তার অর্ধেক, ১২.৩।

শিশুমৃত্যুর হার সারা ভারতবর্ষে হাজারকরা ১৬৪; বিলাতে মাত্র ৫৭। শহরের অবস্থা এ বিষয়ে গ্রামের চেয়েও খারাপ। কলকাতা শহরে একবৎসর বয়স হবার আগে হাজারকরা ২৩৯টি শিশুর মৃত্যু ঘটে, বোম্বাইয়ে ২৪৮, মাদ্রাজে ২২৭। গরীবদের প্রতি যমরাজের যে বিশেষ পক্ষপাত, তার প্রমাণ এই যে, বোম্বাই শহরে যারা একটি ঘরে বাস করে তাদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ৫৭৭; যারা দুটো ঘর নিয়ে আছে, তাদের মধ্যে ২৫৪; আর হাসপাতালে ব্যবস্থা ভালো বলে হার হচ্ছে ১০৭।

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ-ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬৬ লক্ষ। তার মধ্যে ৩৮ লক্ষের বেলায় মৃত্যুর কারণ দেওয়া আছে— জ্বর। এই জ্বর, কিংবা বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদির আসল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। স্থিতধী পণ্ডিতেরাই একথা বলছেন, হুজুগকারীরা নয়।

এই দারিদ্র্যের প্রকোপ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে আজকের তুলনায় ৩০/৪০ বৎসর পূর্বের অবস্থা যে ভালো ছিল, তা অনেকেই বলে থাকেন। ১৯২৭-২৮ সালে বাংলায় স্বাস্থ্যবিভাগের বড়োকর্তা ডাক্তার বেন্ট্‌লী বলেছিলেন যে, বাংলার চাষীরা যা খায় তাতে একটা ইঁদুর পাঁচ হপ্তা বাঁচে কিনা সন্দেহ, আর এই কারণে নানারকম ব্যায়রামকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই। ১৯৩৩ সালে সারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে এই কথাই বলা হয়েছিল।

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশের এই অবস্থা— সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক বিপ্লবী পরিবর্তন বিনা কি এ সমস্যার সমাধান আছে?

দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ৎ

প্রায় এগারো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমাদের সম্রাটবংশীয় খ্রীস্টান পাদ্রিরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন, ডিফিকালটিস্ যে কী-রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেছেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না— কারণ বিশেষ করে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে। ভুলে যান তাঁদের শাসনচন্দ্রেও কলঙ্ক খুঁজে বের করতে বড়ো চশমার দরকার করে না।"

ভারতে উন্নতিসাধনের দুরূহতা-যে কত বেশি, সে সম্বন্ধে সরকারি প্রোপাগাণ্ডা বহুকাল থেকে চলে আসছে, আজো তার প্রতিধ্বনি পার্লামেন্টের কত বক্তৃতায় হরদমই মিলছে। আমরাও ভাবি যে ব্যাপার কঠিন তো বটেই, নইলে আমাদের দশা এমনই-বা হবে কেন?

আগেকার জাঁদ্‌রেল ইংরেজরা বেশ জোর গলাতেই বলত যে এ দেশটার অস্তিত্ব শুধু ভূগোলের পাতায়। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ, এখানে থাকে নানা জাতি, তাদের ভাষা আলাদা, ধর্ম আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা। এদেশ যখন স্বাধীন হতেই পারে না, তখন ইংরেজ শাসন ছাড়া উপায় কী?

এদেশের লোক যখন স্বরাজ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের জাতিসত্তা প্রমাণের চেষ্টা করল, তখন মহাপ্রভুদের সুর একটু বদলালো। স্বাধীনতার লড়াইকে যখন একদম দাবিয়ে রাখা সম্ভব হল না, তখন তারা আবার বলতে শুরু করল যে শুধু ইংরেজ শাসনের গুণেতেই এদেশে একজাতিবোধ দেখা দিয়েছে। অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী কিন্তু সে কথা মেনে নিয়ে ইংরেজ শাসনকে বাহবা দিতে রাজি হল না।

সম্প্রতি পার্লামেন্টে কয়েকটি বক্তৃতায় এম্‌রি সাহেব ভারতীয় "সমস্যার" দারুণ দুরূহতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। সাইমন কমিশনের বহুল প্রচারিত রিপোর্টে এই দুরূহতার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। রিপোর্ট প্রকাশের মতলবও সহজে হাসিল হয়েছিল। এমনকি সোশালিস্ট কাগজ "নিউ লীডারে" নেভিনসন্ সাহেবের মতো প্রগতিবাদী বলে পরিচিত সাংবাদিক লিখলেন যে, যেখানে ৫৬০টি করদরাজ্য আছে, ২২২টি ভাষার যে দেশের লোক কথা বলে, যেখানে দশকোটি লোক অস্পৃশ্য, সেখানকার উপযোগী শাসনতন্ত্র খাড়া করা প্রায় একরকম অসম্ভব। পাঠকদের তিনি বললেন যে, যারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভাবে, তারা যেন নিশ্চয়ই এ রিপোর্টটি পড়ে; আর যে পড়েনি, সে যেন ঐ বিষয়ে মুখ খোলার দুঃসাহস না দেখায়। সাইমন কমিশনের বৃত্তান্ত-যে প্রায় বেদবাক্যের সামিল, মোটামুটি এই হল তাঁর কথা। ইংরেজ "সোশালিস্টরাও" এই রিপোর্ট আনন্দে লুফে নিয়ে স্থির করলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার একেবারেই যখন অযোগ্য, তখন ও ব্যাপার নিয়ে বৃথা মাথা ঘামানোর দরকার তাঁদের নেই; দেশটা তাঁবে থাকলে বরং বড়োলোকদের মুনাফা থেকে অতি সামান্য কিছু তাঁদেরও পকেটে আসবে।

এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরি করতে হলে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা, মুষ্টিমেয়

বড়োলোকদের কাণ্ডকারখানা, ইংরেজ ধনপতিদের প্রভুত্ব আর লাভের অঙ্ক মোটা করার প্রয়াস, গণ-আন্দোলনকে নষ্ট করার নানা ফন্দি— এ সমস্ত বিষয়ে কিছু বলার দরকার করে না। আমরা-যে অতি অধম, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটিতেই-যে আমরা নিপুণ, আর ইংরেজদের শাসনগুণেই যে একটু মানুষ হয়ে উঠছি— এ কথা বললেই রিপোর্ট সার্থক হয়।

ধরা যাক যে, সাইমন কমিশনকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল; তাহলে তারা নিশ্চয়ই সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে একটা সুনিপুণ ও সঠিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করত। পক্ষপাতশূন্য রিপোর্টে সব কথাই নির্ভুল হত, আর আমেরিকা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই পড়তাম :

"যুক্তরাষ্ট্রকে সাধারণত এক দেশ বলা হয়, কিন্তু সেখানে নানা জাতি ও বহু ধর্মাবলম্বী বাস করে। একমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে প্রায় একশো আলাদা জাতের লোক থাকে। সেখানে ইতালিয়ান এত বেশি আছে যে, ইতালিয়ান শহর হিসাবে নিউইয়র্ক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। তেমনই অত বেশি ইহুদী বা অত বেশি কাফ্রী অন্য কোনো ইহুদী বা কাফ্রী শহরে বাস করে না। নানা ধরনের লোক কাছাকাছি থাকে বলে প্রায়ই খুব সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামা আর খুন খারাপী লেগেই থাকে। আদিম অধিবাসীরা ছাড়া উটাতে আছে মরমণরা, মিনেসোটায় থাকে ফিনরা, মিসিসিপি নদীর ধারে ধারে মেক্সিকানরা বসতি করেছে, আর পশ্চিম উপকূলে বহু জাপানি এসে রয়েছে। বাইরের কোনো এক নিরপেক্ষ শক্তির উচিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শাসনের ভার নেওয়া।"

এর মধ্যে প্রত্যেকটি তথ্যই নির্ভুল। কিন্তু আমেরিকার বিদেশি শাসন বরদাস্ত নয়। সাইমন কমিশনের ভারত-বিবরণীর প্রত্যেক তথ্য নির্ভুল নয়। কিন্তু বিদেশি শাসনের সমর্থন হিসাবে সে বৃত্তান্ত সবাই মেনে নেবার জন্য উৎসুক!

চার্চিল সাহেব তাঁর চমকপ্রদ বক্তৃতায় বলেছিলেন, ইংরেজ যদি কখনো ভারতবর্ষ ছেড়ে যায় তো সেখানে শুধু রক্তপাত আর ধ্বংসলীলা চলবে। আজ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান, ফরাসি, সুইডিশ, আইরিশ ইত্যাদির বংশধরেরা বাস করছে, তাদের সম্বন্ধে আগে বলা হত যে, তাদের মধ্যে বৈষম্য বড়ো বেশি, তেলে-জলে কখনো মিশ খেয়ে থাকতে পারে না। তখন যারা স্বাধীন আমেরিকার আসন্ন পতন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে সংকোচ করেনি, তাদেরই উত্তরাধীকারীরা ভারতের অনৈক্য বিষয়ে বক্তৃতা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

ভিনসেন্ট্ স্মিথের মতো সাম্রাজ্যগর্বী ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, ভারতবষের ইতিহাসে সর্বদাই একটা ঐক্যসূত্রের দর্শন পাওয়া যায়। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। এদেশের সযত্নলালিত বিরোধ সত্ত্বেও গত বিশ বৎসরে যে গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সে আন্দোলন হচ্ছে ভবিষ্যতের পূর্ণতর ঐক্যের পূর্বাভাষ।

অতীতের বোঝা যে আমাদের লঘু, তা একেবারেই নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমাদের অযোগ্যতার প্রমাণ হিসাবে যে বোঝার কথা বারবার শোনানো হয়, সে বোঝাকে আরো ভারী করছে এখনকার শাসনব্যবস্থা। দেশের লোকে দেশের ভার না নিলে সে বোঝার চাপ দূর হবে না।

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ লেগে থাকলে বিদেশি শাসকদেরই সুবিধা। কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন হিন্দুর দেশ, তেমনই মুসলমানেরও দেশ। পাকিস্তানের সমর্থন করতে গিয়ে একজন মুসলমান নেতা সম্প্রতি বলেছিলেন যে, এদেশ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানেরই বেশি, হিন্দু মরলে তার দেহ

পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আর মুসলমান জীবনে মরণে এদেশকেই আঁকড়ে থাকে, মরবার পরও তার দরকার এদেশের মাটি। পাকিস্তান হোক বা না হোক, এ দেশের দৌলত বাইরের লোক যখন নিয়ে যাচ্ছে, তখন হিন্দু-মুসলমানের একজোট হয়ে এর প্রতিকারের চেষ্টা না করলে চলে না। সেই একজোট হওয়ার চেষ্টা সরকার বাহাদুরের মনোমত যখন নয়, তখন একজোট ওঠা একটু দুরূহ বই কি?

জাতের বিড়ম্বনায় এদেশ বিড়ম্বিত তো বটেই, কিন্তু অস্পৃশ্য বা অনুন্নত জাতির লোকসংখ্যা যে কত, তার হিসাবও বড়ো তাজ্জব। দেশের লোক যখন তেমন জাগেনি, তখন সাধারণত বলা হত যে, তাদের সংখ্যা হচ্ছে তিন কোটি। স্বদেশি আন্দোলনের পর ভ্যালেন্টাইন চিরল্ বললেন, পাঁচ কোটি। ১৯২৯ সালে শ্রীমতী অ্যান্স্টে তাঁর প্রামাণ্য বই-এ লিখলেন, ছয় কোটি। দু'বছর পরে স্যার জন কামিং কয়েকজন সিভিলিয়ানের লেখা কতগুলো প্রবন্ধ সম্পাদন করলেন; তাতে বলা হল, তিন থেকে ছয় কোটি। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা গেল, ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। কিন্তু ঐ রিপোর্টেই বলা হল যে, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ আর বিহার-উড়িষ্যাতে অস্পৃশ্যতা প্রথার প্রচলন কম। আর ঐ তিন প্রদেশেই অস্পৃশ্যের সংখ্যা দেখানো হল ২ কোটি ৮০ লক্ষ। এরকম বিচিত্র তথ্যের মূল্য খুব বেশি নয়।

অবশ্য অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের একটা নিদারুণ অভিশাপ। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টায় সরকার সাহায্য কখনো করেনি। অস্পৃশ্যদের আলাদা নির্বাচন-ব্যবস্থার জন্য শুধু সরকার খুবই খেটেছে। এগারো বৎসর আগে নিখিল ভারত অনুন্নত জাতি সম্মেলনে সভাপতি ডক্টর আম্বেদকার ঠিকই বলেছিলেন, "আমাদের দুর্গতি নিয়ে ইংরেজ প্রচার করছে বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আমাদের উন্নতি সাধন নয়, ভারতের রাষ্ট্রিক অগ্রগতি রোধ করাই তার উদ্দেশ্য।" "আমাদের অভাব-অভিযোগ দূর করতে হলে চাই আত্মশক্তি, নিজের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করা চাই। স্বরাজ না হলে তা সম্ভব হবে না।"

বক্তৃতা আর প্রচার চালিয়ে জাতের বিড়ম্বনা দূর করা যাবে না। আধুনিক শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক শাসনের পত্তন হলেই জাতের শিকল বিকল হয়ে যাবে। ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্ক্স্ লিখেছিলেন : "ভারতের প্রগতি ও শক্তির পথে প্রধান বাধা হচ্ছে জাতিভেদ প্রথা। আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় যে বংশগত শ্রমবিভাগ জাতিভেদের ভিত্তি, তা অপসৃত হবে।" আর ১৯২১ সালে সেন্সস্ রিপোর্টে মার্ক্সের কথারই সমর্থন পাওয়া যায় : "জামসেদপুরের মতো জায়গায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে কারখানাতে পাশাপাশি কাজ করছে। অন্যের জাতি বা ধর্ম নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা নেই।"

এদেশে যে বহু ভাষা চলিত আছে, তা আমাদের শাসকরা প্রায়ই মনে করিয়ে দেন। ভাষার সংখ্যাও দরকার মাফিক বাড়ানো হয়েছে। ১৯০১ সালের সেন্সস বলে যে ভারতবর্ষে ১৪৭টি ভাষা প্রচলিত ছিল। বিশ বছর পরে ভাষার সংখ্যা বেড়ে হল ২২২! কোনো নূতন ভাষাভাষী অঞ্চল ইতিমধ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবু যে কী করে এ বৃদ্ধি ঘটল, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এক পুরুষে এতগুলো ভাষা "উৎপাদন" করার ক্ষমতা তাজ্জবই বটে।

আসলে ২২২টি বিভিন্ন ভাষা এদেশে চলে বলা হচ্ছে শুধু একটা রূপকথা।

একটু খোঁজ করলেই দেখা যায় যে, ২২২-এর মধ্যে ১৩৭টি হচ্ছে 'তিব্বতী-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর'। তার মধ্যে ১০৩টির এক তালিকা "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়রে" দেখা যায়। তালিকাটির কয়েকটি অংশ খুবই প্রণিধানযোগ্য :

ভাষার নাম	ভাষা-ভাষীর সংখ্যা
কাবুই	৪
আন্দ্রো	১
কাসুই	১১
ভ্রাণু	১৫
আকা	২৬
তেরং	১২
নোরা	২

ভাষাতাত্ত্বিকরা চিরকাল বলে এসেছেন যে, অন্তত দুটো মানুষের মধ্যে কথাবার্তা না চললে ভাষা সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু আন্দ্রোভাষা বলেন মাত্র একজন মহারথী; নোরা সে তুলনায় খুবই জনপ্রিয়!

সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রোপাগাণ্ডা কৌশল ধরা পড়ে যায় যখন ঐ ২২২ ভাষার খোঁজ নিতে যাই। এর মধ্যে ১৪৫টি ভাষা আছে যা কোনো ভারতীয় ব্যবহার করে না। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে আর ব্রহ্মদেশ ও চীনের সীমান্তে এদের প্রচলন। এদের অধিকাংশকে ভাষা বলা চলে না, তারা বড়ো জোর উপভাষা মাত্র। এই দলের মধ্যে একমাত্র ভাষা হচ্ছে ব্রহ্মদেশের ভাষা।

১৯৩১ সালের সেন্সসে ভাষার সংখ্যা কমে ২০২-এ দাঁড়িয়েছে। নেহাৎ অবিবেচক কয়েকজন ইতিমধ্যে মারা যাওয়ার ফলেই বোধহয় এ অবনতি ঘটছে!

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এ ভাষাসমাবেশে যেন মড়ক লেগে গেছে। ভারতীয়দের অনৈক্য প্রমাণ করার জন্য যে ভাষাবৈচিত্র্যের কথা প্রচার হত তার অধিকাংশ (১২৮) হচ্ছে কেবল ব্রহ্মদেশের। কিন্তু সাম্রাজ্যতন্ত্রের যেই দরকার পড়ল যে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে, অমনি অম্লানমুখে প্রচার আরম্ভ হল যে, ব্রহ্মদেশে ভাষার ঐক্য খুবই স্পষ্ট, বাকি ১২৭টি "ভাষাকে" যেন বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। প্রভুদের মহিমা সত্যই অপার!

ব্যবসার সুবাদে এদেশের দৌলত লুটে নেবার সময় ভাষাবাহুল্যের কথা বিদেশি বণিক নির্বিবাদে ভুলে যায়। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকায় বাণিজ্য বিষয়ক ক্রোড়পত্রে (১৯৩৯) যারা ভারতবর্ষে মাল রপ্তানি করে, তাদের পরামর্শ দিতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন যে, অনেক ভাষা সেখানে চলে মনে করে ভড়কাবার কারণ নেই, দরকারি হচ্ছে কয়েকটা ভাষা মাত্র। উত্তর ও মধ্যভারতে যে প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে, তা সেন্সস্ রিপোর্ট স্বীকার না করে পারেনি।

পার্লামেন্টের বিতর্কে বা প্রবন্ধের যুক্তিতে ভারতের ঐক্য প্রমাণ বা অপ্রমাণ হবে না। গত বিশ বৎসর ধরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে সে ঐক্যের সন্ধান মিলছে। বাঁধন যতই শক্ত হোক, তা টুটবেই; এবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

কেমন করে টুটবে, তার আলোচনা এখানে দরকার নেই। সোভিয়েট দেশে পৃথিবীর "সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ" স্বচক্ষে দেখে এসে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার "এনর্মাস্ ডিফিকাল্‌টিজ্" অতিক্রমণের যে বৃত্তান্ত তাঁর স্বদেশবাসীকে শুনিয়েছিলেন, সে বৃত্তান্ত আমাদের ভরসা দেবে, অনুপ্রেরণা দেবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন :

"শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে— এখানে তাই হল; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে— পদাতিকের অধম যারা ছিল, তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।"

অদূর ভবিষ্যতে কি আমাদের এই দেশ সম্বন্ধেও এমনই কথা বলা চলবে না?

"অস্ট্রো-মার্ক্‌সিজ্‌মে"র বিড়ম্বনা

সম্প্রতি বিখ্যাত "অস্ট্রো-মার্ক্‌সিস্ট্" নেতা অটো বাউয়েরের মৃত্যু হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম ইউরোপে যাঁরা চিন্তাশীল ও কর্মঠ সমাজতন্ত্রী নেতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে এখন শুধু কাউট্‌স্কি জীবিত রইলেন।

কাউট্‌স্কি, বাউয়ের, হিলফারডিং প্রভৃতির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ; এককালে কাউট্‌স্কি মার্ক্‌স্‌বেত্তাদের শিরোমণি ছিলেন, মহাযুদ্ধের বৈপ্লবিক সংঘাত তাঁকে বিপথগামী করায় সাম্যবাদী আন্দোলনেরই ক্ষতি হয়েছিল। বাউয়ের জীবনের শেষ পর্যন্ত গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন; ফ্যাশিজ্‌ম্ সম্বন্ধে তাঁর লেখা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। কিন্তু এঁদের পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা থাকলেও সাম্যবাদী আন্দোলনের দিক থেকে এঁদের কাজের বিচার করতে গেলে কঠোর সমালোচনাই করতে হবে। বাউয়েরের জীবন হচ্ছে সোশাল-ডেমোক্রাসির দারুণ বিড়ম্বনার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মৃতের নিন্দাবাদ অকর্তব্য; কিন্তু সমালোচনা আর নিন্দাবাদ সমার্থক নয়। আর বাউয়েরের মতো যাঁরা আজীবন আন্দোলন করে গেছেন তাঁদের কাজ সম্বন্ধে মতামত স্থির না করাই অন্যায়; তাঁদের সাফল্য-অসাফল্যের আলোচনা আন্দোলনকেই সাহায্য করবে।

বাউয়ের ছিলেন দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের একজন পুরোধা; লেখক হিসাবে অতি অল্প বয়সেই তাঁর প্রসিদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের যে কঠিন পরীক্ষা হয়েছিল, তাতে দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের দুরপনেয় জাড্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। লেনিনের নেতৃত্ব তখন যাঁরা মানতে রাজি হননি, তাঁদের হাতে সাম্যবাদী আন্দোলন যে দারুণ আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাতের ফলাফলে এখনো আমাদের ভুগতে হচ্ছে। মার্ক্‌স্‌কে ঘষে-মেজে নেবার যে-চেষ্টা একশ্রেণীর জার্মান পণ্ডিত আরম্ভ করেছিলেন, তার জের এখনো মেটেনি। অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী নেতার মতো বাউয়ের উগ্র-জাতীয়তার কাছে হার মেনেছিলেন। তিনি মহাযুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দেন এবং সরকারি সম্মান লাভ করেন।

যুদ্ধের সময় রুশফৌজের হাতে বাউয়ের বন্দী হন। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রুশদেশে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল, আর নভেম্বরে যে বলশেভিক বিপ্লব হয়েছিল, তিনি সে দুই বিপ্লবেরই দর্শক ছিলেন। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের মতো বলশেভিক বিপ্লবের গরিমা সম্বন্ধে

তিনি অন্ধ ছিলেন না, চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে থাকার দরুন সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় যে নিদারুণ কঠোরতার প্রয়োজন হয়েছিল তাও তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু তবুও তিনি স্থির করলেন যে, প্রলেটেরিয়ট শ্রেণীর একাধিপত্যের ফলে সাম্যবাদী গণ-শাসনের প্রবর্তন না হয়ে ব্যুরোক্রেসির প্রাদুর্ভাব হবে। এরূপ ধারণার ফলেই সাম্যবাদী পণ্ডিত হলেও বৈপ্লবিক সংকটের সময় বাউয়ের প্রভৃতি সাম্যবাদী আন্দোলনকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে এসেছিলেন।

মহাযুদ্ধের পর সমস্ত ইয়োরোপে বিপ্লবের আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৯ সালে লয়েড জর্জ, উডরো উইলসন, হার্বার্ট হুবার প্রভৃতি লেখায় ও বক্তৃতায় 'ইয়োরোপ বলশেভিক হয়ে যাচ্ছে' এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বলশেভিক বিপ্লব যাতে রুশদেশ থেকে কোথাও না ছড়াতে পারে, রুশদেশেও যাতে বলশেভিক শাসনের পতন হয় সেজন্য পূর্ব ইয়োরোপের "স্বাস্থ্যরক্ষার" জন্য নূতন রাষ্ট্র স্থাপন করে একরকম "দড়ি" (Cordon sanitaire) বেঁধে দেওয়া হয়। আর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে একযোগে নানা দিক থেকে আক্রমণ করে, বিদ্রোহী বলশেভিক-বিরোধীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। মধ্য আর পূর্ব ইয়োরোপে বিপ্লবকে রোধ করার জন্য দু'বছরের মধ্যে প্রায় ১৪ কোটি পাউন্ড ধার দেওয়া হয়, যুদ্ধের পর যে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে সেখানে বলশেভিক বিপ্লব আগতপ্রায় হয়েছিল, তাকে সরাবার ব্যবস্থা হয়। ধনতন্ত্রের পক্ষে এর চেয়ে লাভে টাকা খাটানো ইতিহাসে কখনো হয়নি বলা চলে। তবুও হাঙ্গেরিতে কয়েক মাস বলশেভিক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ব্যাভেরিয়াতে সোভিয়েট শাসন স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর বিপ্লবের আশঙ্কা দূর হয়নি। বিপ্লবকে সুদূরপরাহত করতে সাহায্য করেছিলেন সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল। বাউয়েরের দায়িত্ব এ ব্যাপারে কম নয়। কিন্তু একলা তাঁকে দোষ দেওয়া অন্যায় হবে। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার নূতন প্রজাতন্ত্রের শাসনভার বুর্জোয়া ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল একজোট হয়ে গ্রহণ করেছিল। বাউয়ের হলেন পররাষ্ট্র সচিব, আর তাঁর সহকর্মী ডয়েচ্ হলেন সমর সচিব।

"The Austrian Revolution of 1918" নামে বাউয়েরের যে বই আছে, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন যে তখন অস্ট্রিয়ান পল্টনের বিপ্লবী মনোভাব খুবই পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সৈনিকরা নিজেদের বিপ্লবের অগ্রদূত মনে করে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। পথে ঘাটে সর্বত্র "সোভিয়েট শাসন চাই", "প্রলেটেরিয়ন ডিক্‌টেটরশিপের জয় হোক্" রব শোনা যাচ্ছিল। কোনো বুর্জোয়া সরকারের পক্ষে জনগণের সে বিক্ষোভ ও উৎসাহকে রোধ করা অসম্ভব ছিল। বুর্জোয়া সরকার যদি বিপ্লব দমনের উদ্যোগ করত তাহলে সপ্তাহের মধ্যেই গণশক্তি তাকে বিধ্বস্ত করে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করত।

এই অবস্থায় গণশক্তির দাবিকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে আনার ক্ষমতা একমাত্র সোশাল-ডেমোক্রাটদের ছিল। সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলকে জনসাধারণ বিশ্বাস করত। সুতরাং ঐ দলই অস্ট্রিয়ান সৈনিকদের শান্ত করে বৈপ্লবিক ব্যগ্রতাকে দমন করতে পারত। সোশাল-ডেমোক্রাটদের বাদ দিয়ে কোনো বুর্জোয়া সরকার খাড়া করা অসম্ভব ছিল; তাই সোশাল-ডেমোক্রাটরা বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল।

এসব কথা বাউয়েরের বই থেকেই পাওয়া যায়। জার্মানিতে যেমন সোশাল-ডেমোক্রাটরা

বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালি করে সাম্যবাদী আন্দোলনকে বহুকালের জন্য পঙ্গু করেছিল, অস্ট্রিয়াতেও তাই ঘটল। অবশ্য বাউয়ের ও তাঁর দলস্থ সকলে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার মতো ছোটো দেশে প্রলেটেরিয়ন বিপ্লব সম্ভব হলেও তা শীঘ্রই নিশ্চয় পরাভূত হত। কিন্তু হাঙ্গেরি ও ব্যাভেরিয়ায় সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; জার্মানি ও ইতালিতে বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রায় সাফল্য লাভ করেছিল, নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতাই তাদের অসাফল্যের প্রধান কারণ। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, ব্যাভেরিয়া এই তিন দেশে সোভিয়েট শাসন স্থাপিত হলে মধ্য-ইয়োরোপ, তথা সমগ্র ইয়োরোপের ইতিহাস বদলে যেতে পারত। তার বদলে দেখি যে অস্ট্রিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাসি হাঙ্গেরি, ব্যাভেরিয়াকে কিছুমাত্র সাহায্য করল না। তার ফলে যখন সেখানে ক্রূর ধনতান্ত্রিকরা রক্তের বন্যায় বিপ্লবকে ডুবিয়ে দিল, তখন বাউয়ের প্রভৃতি, অস্ট্রিয়া ঐ অনাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে, নিজেদের অভিনন্দন করতে আরম্ভ করলেন। এই বলে তাঁরা অবশ্য কিছুকাল জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলেন; কিন্তু বুর্জোয়ারা-যে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়নি, তা পরিষ্কার বোঝা গেল ১৯৩৪ সালে; "অস্ট্রো-মার্ক্সিস্ট"দের বিড়ম্বনা তখন সম্পূর্ণ হল। মহাযুদ্ধের পর শান্তিস্থাপনের প্রশংসা তাঁরা নিয়েছিলেন; কিন্তু সে শান্তি স্থায়ী হল না। অস্ট্রিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন পঙ্গু হয়ে গেল, অস্ট্রিয়ার বিপ্লবী জনসাধারণের কষ্টের অন্ত রইল না। যখন বিজয় তাদের প্রায় করায়ত্ত ছিল, তখন বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের ফল অস্ট্রিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের দারুণ পরাজয়। কূটবুদ্ধিতে বুর্জোয়াদের হারানো বড়ো সহজ নয়; তাই অস্ট্রিয়ার "মার্ক্সিস্ট"রা বুর্জোয়া প্রভুত্বেরই পথ পরিষ্কার করে দিল, ১৯৩৪ থেকে আজ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার যে অতি অপ্রীতিকর ইতিহাস চলেছে, তার দায়িত্ব বাউয়ের ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলকে নিতে হবে। ১৯২১ সালের "Bolshevism or Social Democracy ?" পুস্তকে সাম্যবাদী নেতা হিসাবে বাউয়েরের অকৃতিত্বেরই প্রমাণ মিলবে।

জার্মানিতে সোশাল-ডেমোক্রাসির বিড়ম্বনার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় যে, সেখানে কম্যুনিস্টরা সাম্যবাদী ঐক্যের পথে বাধা দিত, কিংকর্তব্য নির্ধারণে তাই অনেক মুশকিল হত। এ কৈফিয়তের সত্যাসত্য আলোচনার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অস্ট্রিয়াতে সে রকম কোনো ওজর খাটে না। অস্ট্রিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন সব দেশের তুলনায় ভালো ছিল। যে দেশের লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ, সেখানে ডেমোক্রাটিক দলের সভ্যসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ; এরা সকলেই চাঁদা দিত, নামমাত্র সভ্য ছিল না। ভিয়েনা শহরে ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন, আর ভিয়েনার বাইরে শতকরা ৪০ জন ঐ দলকে সমর্থন করত। কম্যুনিস্ট দল ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের নিশ্চেষ্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে একত্র সংগ্রামের ব্যবস্থা করেছিল বটে; কিন্তু জার্মানির তুলনায় কম্যুনিস্ট দলের সভ্যসংখ্যা খুবই কম ছিল। সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে (অন্তত ১৯৩৪-এর পূর্ব পর্যন্ত) কোনো রকম ভাঙনের চিহ্ন দেখা যায়নি। "Tactical Lessons of the Austrian Catastrophe" (১৯৩৪) বলে এক পুস্তিকায় বাউয়ের নিজে স্বীকার করেছিলেন যে কম্যুনিস্টদের সংখ্যা এত কম ছিল যে, সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের দারুণ পরাভবের দায়িত্ব একমাত্র সোশাল-ডেমোক্রাটদেরই নিতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বাউয়ের ও তাঁর সহকর্মীদের "বামপন্থী" বলেই খ্যাতি ছিল। সে জন্য তাঁদের বিশেষ করে "Austro Marxist" বলা হত। ভিয়েনার

মিউনিসিপ্যালিটি অধিকার করে শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁরা অনেক ব্যবস্থা করেছিলেন। ভিয়েনার "কার্লমার্ক্‌স্‌হফ্‌" প্রভৃতি শ্রমিক-আবাস দেখার জন্য দেশদেশান্তর থেকে লোক আসত। পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীরা ভিয়েনার নাম করে গর্ব করত। "অস্ট্রো-মার্ক্সিস্ট" নেতাদের "সততা" সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ ছিল না, এখনো সেরকম সন্দেহের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সততা বা অকাপট্য যাই হোক না কেন, আমরা লেনিনের ভাষায় বলতে পারি যে, বিপ্লবী-আন্দোলনের পক্ষে "sincerometer" (অকাপট্য মাপবার যন্ত্র)-এর কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে কর্মপদ্ধতির কার্যকারিতার আলোচনা। সেদিক থেকে দেখলে বিচারফল বাউয়ের ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধেই যাবে।

"বামপন্থী" বাউয়ের কিছুকাল হাম্‌বুর্গ থেকে এক নূতন ইন্টারন্যাশনাল ("Two & a half") চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হল। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের অটল নিশ্চেষ্টতাই জয়ী হল; বাউয়েরকে হার মানতে হল।

অস্ট্রিয়ার সোশালিস্টরা বাউয়েরের নেতৃত্বে "বামপন্থা" অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল। "Der Kampf" (সংগ্রাম) বলে তাঁর কাগজ দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের মোড়ল ব্রিটিশ লেবর পার্টির চেয়ে অনেক বেশি "অগ্রসর" কর্মপদ্ধতি সমর্থন করত। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও বামপন্থী সহানুভূতিই যথেষ্ট নয়। যে বাস্তব ভিত্তির উপর লেনিন তাঁর দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাকে অগ্রাহ্য করা সাম্যবাদীর পক্ষে আত্মঘাতী। বাউয়েরের নেতৃত্বের যখন পরীক্ষা এল, তখন তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ১৯২৭ সালে ফ্যাশিজ্‌মের প্রসার সম্বন্ধে সরকারের ঔদাসীন্য দেখে অস্ট্রিয়ার শ্রমিকরা যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, তখন সোশাল-ডেমোক্রাটিক নেতারা, বিশেষত ভিয়েনার বিখ্যাত মেয়র সাইত্‌স্‌ ক্রুদ্ধ জনতার মধ্যে গিয়ে তাদের শান্ত করেন। হাঙ্গামায় একশো স্ত্রীপুরুষের প্রাণ যায়; তার মধ্যে পুলিশ ছিল মাত্র পাঁচজন! গণতন্ত্র ও শান্তির নামে সোশাল-ডেমোক্রাটরা ফ্যাশিজ্‌মের রক্ষাকর্তা হিসাবেই কাজ করেছিলেন।

গণশক্তির উপর বাউয়ের প্রভৃতির সত্যই কোনো আস্থা ছিল না। পার্লামেন্টে সভ্যসংখ্যা সম্বন্ধেই তাঁরা বেশি মনোযোগ দিতেন। তাই দেখা যায় যে, ১৯৩১ সালে উল্লসিত হয়ে অস্ট্রিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল রিপোর্ট দিল যে, পার্লামেন্টে দলের সংখ্যাধিক্য হয়েছে, সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা নিয়ে শ্রমিকদের আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ("The purely political problems have ended with the complete victory of the working class."— Report to the Vienna Congress of the Second International, July, 1931.)

খর্বকায় ডলফ্যুস্‌ যখন একাধিপত্য স্থাপন করলেন, তখন জার্মানির মতো অস্ট্রিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটরা তাঁকে সমর্থন করেছিল। "The Social Democrats made every imaginable effort to avert a violent issue. Again and again we offered to agree to the granting of extraordinary powers to the Government for a period of two years, all that we asked in return being the most elementary legal freedom of action for the Party and the Trade Unions." এই হচ্ছে বাউয়েরের নিজের কথা। জার্মানিতে যেমন ব্র্যুনিংকে সোশাল-ডেমোক্রাটরা সাহায্য করেছিল, এমনকি "lesser evil" হিসাবে হিটলারের সঙ্গে মিটমাটের বৃথা চেষ্টা করেছিল, অস্ট্রিয়াতে একরকম সেই ব্যাপারেরই পুনরভিনয় হয়েছিল।

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মরিয়া হয়ে নেতাদের নিশ্চেষ্টতা সত্ত্বেও জনসাধারণ সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তখন অতিরিক্ত বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। নেতারা তখন তাদের সমর্থন করেছিলেন, বাউয়ের নিজে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরই দোষে জনসাধারণের পরাজয় ঘটল। এই সময় অস্ট্রিয়ার গণশক্তি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল, সকল সাম্যবাদীর কাছে তা খুবই গৌরবের বিষয়। কিন্তু শুধু বীরত্বেই সাফল্য মেলে না, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নেতৃত্বেরই সেখানে অভাব ছিল।

"Austrian Democracy under Fire" পুস্তিকায় বাউয়ের স্বীকার করেন যে, ১৯৩৩ সালে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে গণশক্তির বিজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সোশাল-ডেমোক্রাট নেতারা সে লড়াই ঘটতে দেননি। এগারো মাস বাদে যে অন্তর্যুদ্ধ তাঁরা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তাই বেধে গেল, "under conditions that were considerably less favourable to ourselves. It was a mistake— the most fatal of our mistakes." ("Democracy under Fire" by Otto Bauer.)

১৯৩৪ থেকে বাউয়ের চেকোশ্লোভাকিয়াতে বাস করছিলেন; প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে; শেষ পর্যন্ত ভুল স্বীকার করলেও "অস্ট্রো-মার্ক্সিজ্‌ম্"কে তিনি ছাড়তে পারেননি। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ; গণতন্ত্র ও শান্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল বিপুল। কিন্তু দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের কর্ম পদ্ধতি বদলাতে তিনি পারেননি, তেমন চেষ্টাও করেছেন বলে জানা নেই। মার্ক্স্‌বাদের কদর্থ করলে যে বিড়ম্বনা ঘটে, তাঁর জীবন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মানুষ খুনের ব্যবসা

কিছুকাল আগে একজন হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে, ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে সর্বসমেত খরচ হয়েছিল আট হাজার কোটি পাউন্ড। ঐ টাকাটার অপব্যয় না করে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খরচ করার মর্জি যদি কর্তাদের হত, তাহলে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম আর রুশদেশের প্রত্যেক পরিবারকে পনেরো বিঘা জমির উপর সাত হাজার টাকার এক বাড়ি আর আড়াই হাজার টাকার আসবাবপত্র দেওয়া চলত। এ ছাড়া যা উদ্‌বৃত্ত থাকত, তা থেকে যে যে শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষের বেশি সেই রকম প্রত্যেক শহরে দেড়কোটি টাকা দিয়ে লাইব্রেরি আর তিনকোটি টাকা খরচ করে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা যেত। ১৯৩৫ সালে লীগ অফ্ নেশন্‌সের হিসাব অনুসারে যুদ্ধ-সজ্জার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ খরচ করেছিল মোট ৮৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড। পাঠক যদি রোজ দু'পাউন্ড (অর্থাৎ সাতাশ টাকা) খরচ করে যান, তাহলে ঐ টাকা নিঃশেষ হতে দশ লক্ষ বৎসরেরও বেশি লাগবে। ঐ টাকাকে মোহর করে নিয়ে যদি কেউ প্রতি সেকেন্ড একটা করে গুণতে থাকে, তাহলে ২৬ বৎসর ধরে তাকে গুণে যেতে হবে। এই দারুণ অপব্যয় হয়ে থাকে যুদ্ধ আর যুদ্ধের আশঙ্কার দরুন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছে, তাদের তৈরি ঐশ্বর্যের এই হচ্ছে পরিণাম।

সে ঐশ্বর্যের একটু ভাগ চাওয়া হচ্ছে তাদের পক্ষে এক অতি ভীষণ অপরাধ! সে ঐশ্বর্য যারা উপভোগ করছে, তাদের মধ্যে এক দলের কথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন। তারা কামান, বন্দুক, গুলি, বারুদ, বিষগ্যাস, সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধের এরোপ্লেন তৈরি করার কারখানার মালিক। যত বেশি মানুষ যত বেশি যন্ত্রণা পেয়ে লড়াইয়ে মরে, তাদের মুনাফার হার সেই অনুপাতেই বেড়ে থাকে। খ্রীস্টানদের প্রার্থনায় ভগবানের কাছে রুটি চাওয়া হয়েছে, প্রথম যারা খ্রীস্টান ছিল তারা মোটের উপর গরীব ছিল বলে; আজকের যুদ্ধব্যবসায়ীরা সে প্রার্থনাকে বদলেছেন, তাঁরা রোজই ভগবানের কাছে আর্জি পাঠাচ্ছেন যাতে পরমকারুণিক জগদীশ্বর অন্তত মাঝে মাঝে ছোটখাটো একটা যুদ্ধের ব্যবস্থা করেন।

যুদ্ধের অস্ত্রসরবরাহ যাদের ব্যবসা, দেশভক্তি বা নীতিবুদ্ধি তারা জলাঞ্জলি দিয়েছে। ঐ ব্যবসায় সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে জার্মানির ক্রুপ্। ক্রুপের কামান প্রথমে জার্মানিতে তেমন আদর পায়নি। ১৮৫৬ সালে ক্রুপের দালালরা মিশরের খেদিভের কাছে ছত্রিশটা বিক্রয় করার পর প্রাশিয়ার টনক নড়ে, আর তখন থেকে ইয়োরোপের বাজারে ক্রুপের অগাধ প্রতিপত্তি শুরু হয়। ১৮৬৬ সালে ক্রুপের কারখানা থেকে নিরপেক্ষভাবে প্রাশিয়া আর অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধের মালমশলা সরবরাহ করা হয়। ঐ বৎসর ৯ই এপ্রিল তারিখে প্রাশিয়ার সমর-সচিব ক্রুপের কাছে চিঠি লেখে যে, তাঁর অনুমতি না হলে অস্ট্রিয়াকে মাল দেওয়া চলবে না। স্বদেশভক্ত ক্রুপ এ ব্যবস্থায় রাজি হল না, কিন্তু স্বদেশ-ভক্তির প্রমাণ হিসাবে ব্যবস্থা করল যে, ভবিষ্যতে অস্ট্রিয়াকে কামান পাঠানোর সময় প্রাশিয়ান সরকারকে গোপনে জানানো হবে, মাঝ-রাস্তায় সেগুলো আটকাবার ভার রইল প্রাশিয়ার উপর। প্রাশিয়ার রাজভক্ত প্রজা ক্রুপের ব্যবসায়ী নীতিবুদ্ধির মান রাখা হল, দেশভক্তিও বাঁচল, আর ক্রুপের পকেটে দু-পক্ষ থেকেই টাকা এল!

১৮৭০ সালে প্রাশিয়া আর ফ্রান্সের মধ্যে লড়াই বাধবার কিছু আগে ক্রুপ ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়নের কাছে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব গোপনে পাঠিয়েছিল। নেপোলিয়ন ক্রুপের কারখানায় কোনো ফরমাস দেননি বটে, কিন্তু ক্রুপের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম্মান, লিজন অফ অনারের ক্রস্ পাঠিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালের আগে ক্রুপ মহানন্দে সকল দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছিল। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল, তখন ইংরেজদের কামান দাগা হচ্ছিল জার্মান ক্রুপের মাল-মশলা নিয়ে। ক্রুপের আবিষ্কারের লাইসেন্স নিয়ে ভিকার্স আর অন্যান্য ইংরেজ কারখানা দারুণ লাভের ব্যবসা চালাচ্ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ব্যবসায়ীরা দেশভক্তির প্রবল বন্যায় নিজেদের লাভের চিন্তাকে ভাসিয়ে দিতে রাজি হয়নি। হল্যান্ড আর সুইডেন দিয়ে তারাই ক্রুপকে লোহা, তামা, নিকেল প্রভৃতি বেচছিল, তা দিয়ে জার্মানির সমরাস্ত্র তৈরি হবে বলে। আর জার্মান ক্রুপ্ সুইট্‌সারল্যান্ড দিয়ে ফ্রান্সে ইস্পাত পাঠাচ্ছিল, ফ্রান্সের যুদ্ধায়োজনকে সাহায্য করার জন্য ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার প্রিন্স উইলিয়ম (যিনি পরে হয়েছিলেন জার্মানির কাইজার, প্রথম উইলিয়ম) ক্রুপের এসেনস্থ কারখানায় গিয়ে ঐ ধুরন্ধরের স্বদেশ-প্রেমের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৩৬-এ হিটলার তার বন্ধু ক্রুপ ফন্ বোলেনের অতিথি হয়ে এসেনের কারখানা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ করেন। জার্মানিতে অদলবদল অনেক হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু নশ্বর পৃথিবীতে ক্রুপ যেন অবিনশ্বর হয়ে বিরাজ করছে। ক্রুপ সম্বন্ধে আরো অনেক খবর পাওয়া যাবে সম্প্রতি প্রকাশিত এক বই-এ : তার নাম হচ্ছে Blood and Steel : the Rise of the House of Krupp by Bernhard Menns.

বাণিজ্যের বিশুদ্ধ রীতি অনুযায়ী অস্ত্র-ব্যবসায়ীরা শত্রু-মিত্র ভেদ করে না। বুয়র যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানি ভিকার্স নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করেছিল। মরক্কোতে যখন আবদেল করিম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন তার অস্ত্রশস্ত্র আসত ফরাসি কারখানা থেকে। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের তৈরি 'মাইন্' ব্যবহার করে ইংরেজ জাহাজকে ডোবানো হয়েছে। দার্দানেলিসে তুর্কীরা ইংরেজ কামান নিয়ে ইংরেজ যোদ্ধাদের হারিয়েছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানের বন্ধু ইংল্যান্ড নির্বিকারভাবে উভয় পক্ষকে যুদ্ধের মাল-মশলা পাঠিয়েছিল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে রকম মৈত্রী আছে, তা অন্যক্ষেত্রে অনুকরণ হলে সুখের বিষয় হত। ফরাসি শ্নাইবের-ক্র্যজো, চেক্ স্কোডা, জার্মান ক্রুপ, ইংরেজ ভিকার্স আর্মস্ট্রং—এরা সকলে যেন এক মহামহীরুহের শাখা মাত্র। যুদ্ধের গুজব রটালে তাদের মুনাফা বেড়ে চলে; যুদ্ধ লাগিয়ে আর যুদ্ধের আশঙ্কা ছড়িয়ে বেড়াতে তাদের দালালদের জুড়ি নেই।

এক অতি বিখ্যাত দালাল ছিলেন স্যার ব্যাজল্ জ্যাহারফ। গ্রীককুলোদ্ভব এই অদ্ভুতকর্মা ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উপাধি পেয়েছিলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র গুণ ছিল অস্ত্রশস্ত্রের দালাল হিসাবে আশ্চর্য দক্ষতা। সকল দেশের সকল যুদ্ধ-ব্যবসায়ে তাঁর হাত ছিল; মহাযুদ্ধের সময় ও পরে তাঁর প্রভাব ছিল বিশাল। হঠাৎ গ্রীক সরকারকে নূতন আবিষ্কার 'সাবমেরিন' বেচে অন্যান্য শক্তির টনক নাড়িয়ে এর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত নানা দেশের নানা সম্মান ভূষিত হয়ে জ্যাহারফের মৃত্যু হয় কয়েক বৎসর আগে। মানুষ মারার ব্যবস্থাকে উন্নত করাই ছিল এঁর জীবনের মহৎ ব্রত। ধনিক সমাজ এঁর মতো লোকেরই সম্মান করে!

আর এক ধুরন্ধর হচ্ছেন স্যার হেনরি ডেটারডিং। ইনি জাতে ওলন্দাজ হলেও ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছেন। কারণ হচ্ছে এই যে, আমেরিকান স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য ইনি খাড়া করেন রয়েল ডাচ্‌শেল বলে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট অধিকারস্থ তেলের খনিগুলি হস্তগত না করতে পারায় এঁর ক্ষোভের সীমা নেই। সোভিয়েট-বিরোধী চক্রান্তে আর হিটলারের সমর্থনে এঁর মতো প্রভাবশালী কর্মী আর নেই বললেও চলে।

জার্মান আর ফরাসি পুঁজিদারদের পরস্পর মৈত্রীর ফলে ঐ দুই দেশের সীমান্তে ব্রিয়ে উপত্যকায় যে লোহার খনি ছিল তার উপর মতলব করে বোমা ফেলা হয়নি। জার্মান এরোপ্লেন থেকে ফরাসি খনির উপর বোমা পড়েনি; ফরাসি এরোপ্লেন থেকেও জার্মান খনির উপর বোমা পড়েনি। এই ব্যাপারের কথা বহুদিন গোপন থাকার পর ফরাসি পার্লামেন্টে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। দু'পক্ষের সেনাপতিরাও যে পুঁজিদারদের কাছ থেকে পুরস্কার পাননি, তা নয়। অথচ যেখানে বোমা ফেললে চার বছরের যুদ্ধ দু-বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত, সে জায়গাটাকে প্রায় পবিত্র মনে করে বাদ দিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অর্থলোভ স্বাদেশিকতাকে যে কতদূর নিষ্প্রভ করে দিতে পারে, লক্ষ লক্ষ নির্দোষকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই অদ্ভুত ঘটনা। যাঁরা এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর চান, তাঁরা Union of Democratic Control কর্তৃক প্রকাশিত Patriotism Limited নামে এক পুস্তিকা যেন পড়ে দেখেন।

অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কুকর্মের কথা নানা দেশের অনুসন্ধান সমিতির কাছে ধরা পড়েছে। কিন্তু কখনো অনুসন্ধানের যা সিদ্ধান্ত, সে অনুসারে কাজ আজো হতে পারেনি। কারণ, অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের পশ্চাতে রয়েছে সমস্ত পুঁজিদারের দল, আর যে-যুদ্ধ হচ্ছে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কাছে ভগবানের প্রসাদ, তা ধনিক সমাজের চিরন্তন সহচর। ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ না হলে যুদ্ধের নিপাত নেই, লোভসর্বস্ব অস্ত্র-ব্যবসায়েরও বিলোপ হবে না।

রুশ বিপ্লব ও লেনিন

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি তারিখে জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিনের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চুয়ান্ন বৎসর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু জীবনের মাপকাঠি শুধু বয়স নিশ্চয়ই নয়। লেনিন বলশেভিক দলকে গড়েছিলেন; সোভিয়েট বিপ্লবের তিনি ছিলেন কর্ণধার; কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন, গুরু ছিলেন। যে অবদান তিনি রেখে গেছেন ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

কায়মনোবাক্যে বিপ্লবী আন্দালনে যোগ দিয়েছিলেন বলে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এক রকম চাপা পড়ে গিয়েছিল। রোজনামচা লেখার মতো অবসর বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না, আত্মজীবনী রচনা করতে বসার মতো অহমিকাও তাঁর ছিল না। সাম্যবাদী বিপ্লব ছিল তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন; কিন্তু কোনোকালেই স্বপ্নবিলাসী ছিলেন না বলে তিনি সারাজীবন কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও আমরণ সহকর্মী ক্রুপ্‌স্‌কায়ার লেখা "লেনিনের কথা" পড়ে দেখলে তা বোঝা যাবে। তাঁর কোনো কোনো চিঠি থেকে মনে হয় যে এজন্য হয়তো তাঁকে কয়েকটি গভীর অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে দমন করে রাখতে হত। কিন্তু সে আলোচনায় নেমে লেনিনের জীবনের ভাববিলাসী ব্যাখ্যা করলে তাঁর স্মৃতির প্রতি অসম্মানই দেখানো হবে। লেনিনের জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় (unity of theory and action), যা হচ্ছে মার্ক্‌স্‌বাদের একটা প্রধান অঙ্গ। তাঁর এক প্রধান গ্রন্থ "রাষ্ট্র ও বিপ্লবের" ক্রোড়পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "বিপ্লব সম্বন্ধে লেখার চেয়ে আসল বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি প্রয়োজন ও সুখকরণ"; এ বইটি তিনি লিখেছিলেন ১৯১৭ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে।

ইতিহাসে আর কোনো মহাপুরুষ বহুজনের উপর নেতৃত্ব করেও আত্মপ্রসাদ-লালসাকে এমন অবলীলাক্রমে অবজ্ঞা করতে পেরেছেন বলে জানি না। তাই তাঁর স্মৃতির সম্মান করতে হলে তাঁর মতের দৃঢ়তা, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, সামান্য ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি, বিপ্লব আন্দোলনকে যারা বিপথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করে তাদের প্রতি নির্মম মনোভাব— ইত্যাদি বিপ্লবী গুণের কথা স্মরণ করতে হবে।

মানুষ লেনিন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর আজীবন বন্ধু ম্যাক্সিম গর্কি পর্যন্ত খানিকটা ভাববিলাস করে ফেলেছেন। সে ভুল এড়িয়ে গেলেই আমরা তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনের অবদান বুঝতে পারব। স্টালিন একবার বলেছিলেন যে, নেতৃত্ব কায়েম করার জন্য কোনো রকমের আড়ম্বর করতে লেনিনের অতি বড়ো শত্রুও তাঁকে দেখেনি। তাঁর চেহারা কিছু অসাধারণ ছিল না; বড়ো বড়ো আত্মম্ভরী নেতাদের মতো দেরি করে সভায় এসে নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করা তাঁর কোষ্ঠীতেই লেখা হয়নি; বাগাড়ম্বরে সকলকে হকচকিয়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। যথাসময়ে সভায় পৌঁছে, সকলের সঙ্গে সাধারণভাবে আলোচনা করে, যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের বক্তব্য পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ তিনি করতেন। আর তাঁর ছিল অসাধারণ চরিত্রবল; আলোচনায় হার হলেও যেমন তিনি ব্যতিব্যস্ত হতেন না, জিত হলেও তেমনি অতিরিক্ত উৎফুল্ল হতেন না; কাজে যাতে গাফিলতি না ঘটে, সেদিকেই তাঁর লক্ষ সর্বদা থাকত। ১৯০৯ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বলশেভিক দলে বেজায় ভাঙন ধরেছিল; বড়ো বড়ো নেতারা নৈরাশ্যের সুর ধরেছিলেন, দলকে শুধু আইনসঙ্গতভাবে চালানোর একটা চেষ্টা দলের মধ্যে হচ্ছিল। সেই সংকট সময়ে লেনিন একা দল আর দলের মতবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য লড়েছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিত হয়েছিল। আবার দেখা যায় যে ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তাঁকে লড়তে হয়েছিল সাম্যবাদী দলের প্রাক্তন নেতাদের সঙ্গে। মহাযুদ্ধের হিড়িকে তাঁদের বৈপ্লবিক বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, পুঁজিবাদের বহুরূপী আকর্ষণে তাঁরা সাম্যবাদকে কাজের ক্ষেত্রে বর্জন করছিলেন। তখন প্লেখানভ, কাউট্স্কি প্রভৃতি বহুমানভাজন নেতার বিরুদ্ধে তিনি প্রচার চালিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করেননি, কারণ তাছাড়া সাম্যবাদী আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোনো উপায় ছিল না। জনসাধারণের যেমন তিনি নেতা ছিলেন, তেমনি জনসাধারণের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। রুশদেশে নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে তাঁকে আর তাঁর অনুচরদের জার্মান গোয়েন্দা বলে কুৎসা করা হত। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী ইংরাজ-ফরাসির তাঁবে থেকে লড়াই চালাবার জন্য ব্যগ্র ছিল, নিঃস্ব চাষী-মজুরদের জোর করে টেনে এনে লড়াইয়ে লাগাচ্ছিল, আর পশ্চিম ইয়োরোপের "সুসভ্য" সোশালিস্টরা নিজেদের দেশের পুঁজিবাদী সরকারের পক্ষে লড়াইকে সমর্থন করছিল। তখন লেনিন সাম্যবাদী আন্দোলনের এই আত্মঘাতী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন; সোভিয়েট গণতন্ত্র স্থাপন করে দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের যে ঘাঁটি তৈরি করলেন, তা তাঁর কর্মবীরত্বের নিদর্শন হয়ে রইল। জনসাধারণ কী চায়, সে সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলেই এরকম দুঃসাহস দেখাবার জোর তাঁর হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে যুবক লেনিন "আমাদের কর্মসূচী" নাম দিয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে মার্ক্স্‌বাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রবন্ধটিতে এক জায়গায় আছে : "আমাদের বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হবে, অনেকে বলবেন যে, আমরা সাম্যবাদী দলকে নিষ্ঠা-সর্বস্ব ধর্মযাজকের দলে পরিণত করেছি, 'সত্যধর্ম' থেকে বিচ্যুতির নামে যাঁরা স্বাধীন চিন্তা করেন তাঁদের 'ধর্মভ্রষ্ট' অপবাদ দিচ্ছি। এসব কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু আমরা তাকে শুধু প্রলাপ মনে করি। তাদের কথায় কোনো সত্য নেই, এক তিলও সত্য নেই। বিপ্লবী চিন্তাধারা না থাকলে শক্তিমান্ সোশালিস্ট দল অসম্ভব... যদি আমরা মার্ক্স্‌বাদের সত্যতা সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাস হয়ে বিরোধীদের অযথা আক্রমণকে প্রতিহত করি, মার্ক্স্‌বাদকে খর্ব করার সকল চেষ্টাকে ব্যাহত করি, তাহলে যে আমরা সমালোচনামাত্রেরই শত্রু, তা প্রমাণ হয় না। এমন কি, আমরা মনে করি না যে মার্ক্স্‌বাদ এখনই একেবারে সর্বাঙ্গপুষ্ট হয়ে উঠেছে; আমরা শুধু বিশ্বাস করি যে, সাম্যবাদীরা জীবনের পিছনে না পড়ে থেকে যে-বিজ্ঞানের বলে

নানাদিকে অগ্রসর হতে পারবেন, সেই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে মার্ক্‌সের মতবাদ। আমরা মনে করি যে, বিশেষ করে রুশদেশে সাম্যবাদীরা মার্ক্‌স্‌বাদকে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ করবেন, কারণ মার্ক্‌স্‌বাদ শুধু মোটামুটি সমাজব্যবস্থা ও তার রূপান্তর সম্বন্ধে কয়েকটি বিধির কথা বলেছে, যার প্রয়োগ ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স বা জার্মানিতে বিভিন্নরূপেই ঘটবে।"— এ কথাগুলো মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা দূর করবে।

মার্ক্‌স্‌বাদের "ভেজাল" সম্বন্ধে লেনিন সর্বদাই খুব সতর্ক থাকতেন। তাই বহুবার তিনি যেসব "নেতা" ধনিকদের সঙ্গে শান্তিতে থাকার আশায় মার্ক্‌স্‌বাদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচারে ব্যস্ত হতেন, তাঁদের যথার্থ রূপ প্রকট করে দিতেন। তাই তাঁর শিষ্য, স্টালিন একবার যথার্থই বলেন যে "গোলাপজল ছড়িয়ে কখনো বিপ্লব করা চলে না, আর রেশমের দস্তানা হাতে চড়িয়ে লড়াই করা চলে না।" উনিশ শতকের শেষে ইংরেজ ফেবিয়ান্‌দের প্রভাবে পড়ে মার্ক্‌স্‌বাদী পণ্ডিত বেণ স্টাইন্‌ সাম্যবাদকে মেজে-ঘষে "ভদ্রস্থ" করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষণস্থায়ী প্রসারে ভুলে স্থির করেছিলেন যে, পার্লামেন্টের মারফৎ গরম বক্তৃতায় সাম্যবাদকে আহ্বান করে ধীরে-সুস্থেও বস্তুটির আমদানি করা চলবে; আর বিপ্লব ব্যাপারটা ভুয়ো, একেবারে অ-দরকারি। আবার বহুকাল ধরে যিনি মার্ক্‌স্‌বেত্তাদের শিরোমণি বলে পরিচিত ছিলেন, সেই বিরাট পণ্ডিত কাউট্‌স্কির পদস্খলন ঘটল ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময়; যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করলেন। নিজের দেশের বড়োলোকদের স্বার্থ যে সাম্যবাদী আন্দোলনের পক্ষে পরম হানিকর, তা বুঝতে চাইলেন না। কাউট্‌স্কির বিরুদ্ধে লেনিন নির্দয়ভাবে প্রচার চালাতে পশ্চাদ্‌পদ হননি। আবার যখন হিল্‌ফারডিং প্রমুখ কয়েকজন "অতি-সাম্রাজ্যবাদের" (Ultra-imperialism) নামে মার্ক্‌স্‌বাদের কদর্থ করতে লাগলেন, নিজেদেরই অন্তর্দৃষ্টির কথা ছাড়া যাক, দূরদৃষ্টিরও অভাব দেখালেন, বিপ্লবভীরুর মতো ধনিকবাদের সাময়িক সাফল্য দেখে মার্ক্‌স্‌বাদ থেকে বিচ্যুত হলেন, পরোক্ষভাবে ধনিকদের অনুচর হয়ে কাজ করলেন, তখন তাঁদের কষাঘাত করেছিলেন লেনিন। রুশদেশে লেনিনের গুরু ছিলেন প্লেখানভ; কিন্তু তিনিও যখন ১৯১৪ সালে স্বাদেশিকতার মোহে পড়ে সাম্যবাদ থেকে বিপথগামী হয়েছিলেন, তখন লেনিন তাঁর সম্বন্ধে নির্মম সমালোচনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। পরে আবার ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ, বুখারিন, রাডেক প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর মতভেদ হয়েছিল। প্রতিবারেই তিনি মার্ক্‌স্‌বাদের যথার্থ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বিপথগামীদের মার্জনা করা বিপ্লবী লেনিনের স্বভাব ছিল না।

মার্ক্‌স্‌বাদী দর্শনকে যাঁরা বিকৃত করার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে লেনিন ছিলেন খড়্গহস্ত। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের পণ্ডিতধুরন্ধররা যখন মার্ক্‌স্‌বাদের বিপ্লবী সত্তাকে নির্জীব করে রাখছিল, সাম্যবাদী সমাজ অবশ্যম্ভাবী বলে সাম্যবাদীদের বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে নিষ্প্রয়োজন বলে প্রচার করছিল, তখন লেনিন তাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত অভিযান চালিয়েছিলেন; ধনিক সমাজ যে আপনা থেকেই ধ্বংস হবে না, তাকে-যে গণশক্তিবলে ধ্বংস করতে হবে, তা সকল সাম্যবাদীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

লেনিন শুধু সাম্যবাদের ব্যাখ্যাই করেননি, সাম্যবাদের পরিধির বিস্তারও ঘটিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাজ হয়েছিল মার্ক্‌স্‌বাদকে ইতিহাসের নূতন অধ্যায়ের পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, সাম্যবাদকে যাতে ধনিক সমাজের নূতন বিন্যাসে অক্ষুণ্ণভাবে প্রয়োগ করা চলে, তার চেষ্টা। স্টালিন যাকে লেনিনবাদ বলেছেন, তার সংজ্ঞা তাই হচ্ছে : "সাম্রাজ্যবাদ আর প্রলেটেরিয়ন বিপ্লবের যুগে মার্ক্‌স্‌বাদ।"

লেনিন দেখিয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার যায়গায় এসেছে একচেটে অধিকার (Monopoly), আর এসেছে— ব্যাঙ্কের পুঁজি আর শিল্পের পুঁজি একত্র মিলে যাওয়ার ফলে ফিনান্স-ক্যাপিটালের রাজত্ব, পুঁজিদারী সামন্ত-গোষ্ঠীর সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের একাধিপত্য ক্রমে প্রকট হচ্ছে, ফ্যাশিজ্‌মের নগ্নরূপ পরিগ্রহ করছে, প্রধান সাম্রাজ্যতন্ত্রগুলি সাম্রাজ্যের মুনাফার সামান্য অংশ দিয়ে উচ্চ স্তরের শ্রমিকদের অন্তত কিছুকাল সন্তুষ্ট করতে পারলেও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে ধনিকতন্ত্রের মৌলিক অন্তর্বিরোধের—ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের—নিরাকরণ ঘটছে না। মূলধনের শক্তি বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রাচীন রীতি অনুসারে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন আর পার্লামেন্টকে ব্যবহার করে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করার আশা নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া ধনিকবাদ সর্বত্র সমানভাবে বিকাশ পায়নি বলে যেসব বণিক শক্তি সম্প্রতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে প্রাচীন ও বলশালী ধনিকরাষ্ট্রের মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা চলেছে। মহাযুদ্ধ বিনা তার অবসানেরও উপায় নেই। আবার পরাধীন দেশগুলিতেও নূতন ধনিকশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী উদ্ভব ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শ্রমিক আন্দোলনও জেগে উঠেছে, সর্বত্র বিপ্লবী পরিস্থিতি হাজির হচ্ছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ধনিকবাদের শেষ স্তর, চূড়ায় আরোহণের পর পতন ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই। সাম্রাজ্যতন্ত্র অবশ্য বিপ্লবীদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিমান। কিন্তু তার মারাত্মক দোষ হচ্ছে অনৈক্য। সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পর বিরোধের শান্তি নেই, আর বিপ্লবীদের হাতিয়ার হচ্ছে আন্তর্জাতিক ঐক্য। বিপ্লবীদের অস্ত্র হল মার্ক্‌স্‌বাদ, আর ১৯১৭ থেকে তাদের পুরোধা হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্থাপনার সময় থেকে ধনিকরা অক্লান্ত প্রচার করে এসেছে যাতে দুনিয়ার শ্রমিক-আন্দোলন সোভিয়েটের শত্রু হয়ে পড়ে, আর ধনিকদের কর্তৃত্ব বজায় থেকে যায়। এই সেদিন পর্যন্ত তাই সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক ঐক্য ভাঙার জন্য সোভিয়েট-বিরোধ প্রচার দারুণভাবে চলেছে, আর যথারীতি দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের নেতারা ধনিকদের অনুচর হয়ে সোভিয়েট-বিদ্বেষের বিষোদ্‌গার করছেন। এ বিষয়ে লেনিনের মৃত্যুদিনে আমাদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার।

লেনিন চেয়েছিলেন যে সাম্যবাদী দল যেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব করে, শ্রমিকশ্রেণীর লেজুড় হয়ে পড়ে না থাকে। দল হবে গণশক্তির সমরবাহিনী, শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। জনসাধারণ সকলেই দলের অন্তর্ভুক্ত যে হবে, তা নয়, কিন্তু তারা যেন দলের নেতৃত্বে নিশ্চিন্ত নির্ভর করতে পারে, দলকে যেন তারা নিজেদের জিনিস বলে মনে করে। দলের সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যকে লঙ্ঘন করতে দেওয়া হবে না, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর যে-একাধিপত্য ধনিকযুগ থেকে সমাজকে সাম্যবাদের যুগে নিয়ে যাবে, তার প্রধান অস্ত্র হবে এই দল, রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করবে এই দল। সুবিধাবাদী ও চক্রান্তকারীদের তাই দূর করতে হবে, সম্পূর্ণ-স্বাধীন আলোচনার পর দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও যারা বিবাদ-বিসংবাদ চালাবে, তাদের যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হবে। "যে সব নেতারা বিপ্লবী কর্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধা করবেন, তাঁদের দূর করলে শ্রমিক-আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন দুর্বল না হয়ে শক্তিমান হয়ে উঠবে।" লেনিনের গড়া-দল সোভিয়েট ইউনিয়নে নূতন সমাজ সৃষ্টি করবার চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করেছে, ট্রট্‌স্কির মতো যাঁরা আত্মম্ভরী ভাববিলাসের মোহে বিপ্লবী সেজেছিলেন আর পথের সন্ধানের জন্য সগর্বে নির্ভর করেছিলেন শুধু পাণ্ডিত্য ও চমকপ্রদ বাগ্মিতার উপর, তাঁদের

বিষম পদস্খলনের শাস্তি দিয়েছে। লেনিনের বিধান সাম্যবাদী দলমাত্রেরই-যে কত প্রয়োজন, বিপ্লবী অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষ্য দেবে।

*　　*　　*

লেনিন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন স্কুলমাস্টার, আর তাঁর মা ছিলেন এক ডাক্তারের মেয়ে। জার তৃতীয় আলেক্‌জান্ডারকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টায় অভিযুক্ত হয়ে তাঁর দাদার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। লেনিনের জীবনে এ ঘটনা অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে তিনি কখনো আমল দেননি; মজদুরসংস্থাকে হাতিয়ার করে নতুন দুনিয়া গড়ার কাজই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লবের সময় তাঁর এ ব্রতের উদ্‌যাপন হল।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সময় ছাত্র-আন্দোলনে লেগেছিলেন বলে আঠারো বৎসর বয়সে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। প্রায় দু'বছর পরে তিনি ফিরে আসার অনুমতি পান। আইন পরীক্ষা পাশ করার পর সামারা বা বর্তমান কুইবিশেভ্ শহরে তিনি কিছুকাল আইন ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁর নাম মাত্র ছিল। আসলে তিনি সাম্যবাদ ও শ্রমিক-আন্দোলনে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

১৮৯৫ সালে রুশদেশের বাইরে গিয়ে তিনি প্লেখানভ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ সাম্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে শ্রমিক-আন্দোলনে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮৯৬ সালটা লেনিন জেলে কাটান। ১৮৯৭ থেকে তিন বৎসরকাল তাঁকে পূর্ব সাইবিরিয়াতে আটক থাকতে হয়। এই নির্বাসনের সময় তিনি তাঁর সহকর্মী ক্রুপ্‌স্‌কায়াকে বিবাহ করেন। আর তখনই রুশদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার জন্য মালমসলা সংগ্রহ করেন। ১৯০০ সালে তিনি সুইটজারলান্ডে গিয়ে সেখান থেকে রুশদেশে প্রচারের জন্য 'ইস্‌ক্রা' বা' 'স্ফুলিঙ্গ' নামে বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশ করেন। যে লেনিনবাদের কথা আগে বলা হয়েছে তার প্রথম প্রচার এই কাগজের মারফৎ হতে থাকে।

১৯০৩ সালে বেলজিয়মের ব্রাসেল্‌স্ শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে লন্ডনে গিয়ে রুশ-সাম্যবাদীদের দ্বিতীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল। এই সময় তাদের মধ্যে দারুণ মতভেদ চলছিল। মতভেদের ফলে দুটো দলের সৃষ্টি হল। যারা সংখ্যায় কম ছিল, তারা মেন্‌শিভিক্— ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে একটা আপোষ মেনে নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যারা বেশি ছিল তাদের বলা হল বল্‌শেভিক্। লেনিন এই দলের নেতা হলেন।

১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশের পরাজয়ের পর একটা বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন চারিদিকে চাষী-মজুরদের মধ্যে ধর্মঘট চলে। ১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে নিরস্ত্র শ্রমিকরা যখন মিছিল করে তাদের অভাব অভিযোগ জানবার জন্য সেন্টপিটার্সবার্গের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন জারের পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়, অনেকে হতাহত হয়। এই বৎসরই রুশদের নানা জায়গায় মজুরদের পঞ্চায়েত বা সোভিয়েট মিউনিসিপ্যালিটি দখল করে মজুররা শহর চালাতে আরম্ভ করে। কিন্তু বিপ্লব সেবার সফল হয়নি, সোভিয়েট-আন্দোলনও নষ্ট হয়েছিল।

অসাফল্য সত্ত্বেও ১৯০৫ সালের বিপ্লব থেকে যে-শিক্ষা পাওয়া গেল লেনিনের নেতৃত্বে রুশদেশের সাম্যবাদীরা সে শিক্ষা প্রয়োগ করল ১৯১৭ সালে।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত লেনিন আবার রুশদেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু রুশ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করার গুরুভার তিনি কখনো পরিত্যাগ করেননি। এই সময় রুশ পার্লামেন্ট বা ডুমার মধ্যে কয়েকজন বলশেভিক্‌কে পাঠিয়ে বিপ্লবের কাজে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা তিনি করেছিলেন। দলের মধ্যে কেউ কেউ এ পদ্ধতির নিন্দা করেন, বলশেভিক্‌দের কাছে 'ডুমা' একেবারে অস্পৃশ্য হওয়া উচিত বলে প্রচার করেন। কিন্তু লেনিন ও দলের অধিকাংশের মত হল এই যে, বিপ্লবকে সফল করতে হলে পার্লামেন্টের মতো বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। মার্ক্‌স্‌বাদ একটা বাঁধা বুলি নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগই হচ্ছে সাম্যবাদীদের কর্তব্য।

এই সময় অপর অনেকে চাইলেন যে কেবল খোলাখুলি ভাবে আন্দোলন চালানোই উচিত, জারের সরকারের চোখ এড়িয়ে যাবার জন্য দল যে গোপন কাজকর্ম করত তা বন্ধ করাই ঠিক। কেউ কেউ আবার জনসাধারণকে বিপ্লব ব্যাপারে নিরুৎসাহ দেখে সন্ত্রাসবাদের পুনর্জীবনের চেষ্টায় লাগলেন। এই দুই দলের বিরুদ্ধে লেনিনকে লড়তে হয়েছিল।

তাছাড়া এই সময় লেনিন কেবলই যাঁরা মার্ক্‌সের মতে ভেজাল ঢোকাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের মত খণ্ডন করার জন্য ছোটো-বড়ো বই লিখে যাচ্ছিলেন। মার্ক্‌সবাদের যথার্থ ব্যাখ্যা ও সেই অনুসারে কাজ লেনিন সারা জীবন করে গেছেন। জ্ঞানবীর ও কর্মবীরের এমন সমাবেশ কখনো দেখা গেছে বলে জানা নেই।

১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন ইয়োরোপের সমস্ত দেশে শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই পদস্খলন ঘটল। অলীক দেশভক্তির মোহে পড়ে তাঁরা নিজের নিজের দেশের মালিক্‌দের স্বার্থকে বিশ্বের শ্রমিকদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো করে দেখলেন, নিজের নিজের দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করলেন। সুইট্‌জারল্যান্ডে ৎসিমেরভাল্‌ড্‌ আর কিয়েন্থাল নামে দু'টো জায়গায় যুদ্ধবিরোধী সাম্যবাদীদের সভা হয়েছিল। সেখানে লেনিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে প্রত্যেক দেশে অন্তর্যুদ্ধে পরিণত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের গোড়াপত্তন এখানেই হয়েছিল। দ্বিতীয় (বা সোশালিস্ট) ইন্টারন্যাশন্যাল যুদ্ধের সময় প্রায় বিকল হয়ে গিয়েছিল। এর অধীনে নানা দেশে যেসব দল ছিল, তারা নিজের নিজের দেশের যুদ্ধজয় চেষ্টায় লেগেছিল, বিপ্লব বা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্যের কথা ভাবার সময় পায়নি।

মুষ্টিমেয় সহকর্মী নিয়ে লেনিন তাঁর ঘোষণা পত্র প্রচার করলেন—"মার্ক্‌স্‌পন্থী বিপ্লবীরা দলের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সুবিধাবাদী ও যুদ্ধরত সমাজতন্ত্রীদের বাদ দিয়ে আমাদের এক নতুন বিপ্লবী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গড়তে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মতবাদ, সুবিধাবাদীদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত। সুবিধাবাদের পতন হোক, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পতাকা উত্তোলিত হোক।"

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশদেশের উচ্চ-মধ্যশ্রেণী মহাযুদ্ধের পরিচালনা ব্যাপারে বিষম অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। আসন্ন বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখার আশা না থাকায় জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এ বিপ্লবের খবর পেয়ে লেনিন দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু ফেরবার পথে মুশকিল ছিল অনেক। ইংরেজ আর ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে লেনিনকে ফিরতে দিতে রাজি ছিলেন না, রুশদেশের অস্থায়ী সরকারও বলশেভিক নেতাকে আবার দেশে দেখবার জন্য একেবারেই ব্যস্ত ছিল না। শেষকালে জার্মান কর্তৃপক্ষ

রাজি হল যে, একটা বদ্ধ গাড়িতে লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের রুশদেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে, কিন্তু রাস্তায় তাঁরা জার্মানির কোথাও কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারবেন না। এই ভাবে সুইডেন ও ফিনল্যান্ড ঘুরে ১৯১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তিনি পেট্রোগ্রাডে নামলেন।

পরের ছ'মাস ধরে লেনিনের কাজ হল, যারা গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে আসলে জনসাধারণের দাসত্ব কায়েম করবার মতলবে ছিল, তাদের হারিয়ে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থার জন্য দেশকে তৈরি করা। তিনি স্পষ্ট দেখেছিলেন যে শীঘ্রই যুদ্ধক্লান্ত, অভুক্ত জনসাধারণ আর অস্থায়ী গভর্নমেন্টের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে না, আর সোভিয়েটগুলিতে তাদের নেতা হিসাবে বলশেভিকরা অধিকাংশ জায়গা অধিকার করে বিপ্লবী-ব্যবস্থা আনতে পারবে। প্লেখানভ্ লেনিনকে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু লেনিন তাতে পিছপাও হলেন না, "প্রাভ্‌দা" কাগজ মারফৎ ও অন্যান্য নানা উপায়ে প্রচার চালাতে লাগলেন।

জুলাই মাসে লেনিনকে "জার্মান গোয়েন্দা" অপবাদ দেওয়া হল, পেট্রোগ্রাডে জনসাধারণের বিক্ষোভকে একেবারে নিষ্পিষ্ট করা হল। লেনিন আবার লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে কাজ চালাতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু জাগ্রত গণশক্তির অগ্রগতি এখন আর কারো রোধ করার শক্তি রইল না। পেট্রোগ্রাডে আর মস্কো সোভিয়েটে বলশেভিকরা সংখ্যায় সব চেয়ে বড়ো দল হল। লেনিন বিপ্লবী কর্মসূচী দেশের সামনে রাখলেন, বিপ্লবের ভেরী বেজে উঠল— সারা দেশে নতুন এক আওয়াজ উঠল, 'সমস্ত শক্তি সোভিয়েটের হস্তগত হোক', 'যুদ্ধ নিপাত যাক', 'জমি চাষীদের হোক', 'নিরন্নদের অন্ন হোক', 'সোভিয়েট হোক সর্বময় কর্তা'— রুশদেশের সর্বত্র এই কথা শোনা যেতে লাগল।

৭ই নভেম্বর সোভিয়েট রাষ্ট্রশক্তি দখল করল। পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ প্রথম মজুর-কিষাণের দল সমাজ থেকে শ্রেণীভেদ চিরকালের জন্য দূর করে, শোষকদের নির্মমভাবে দখল করে। সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

লেনিনের সহকর্মী বলে যাঁরা পরে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন এ সময় তাঁকে বড়ো কম বাধা দেননি। ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েফ, কামেনেফ্ প্রভৃতি কখনো লেনিনের কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই তাঁরা আসন্ন বিপ্লবের সময়ও তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে একেবারেই মনস্থির করেন নি। লেনিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, বিশেষ করে স্টালিনের একাগ্র কর্মক্ষমতার ভিতর দিয়ে, তখন বিপ্লবের আয়োজনে প্রযুক্ত না থাকলে হয়তো ১৯১৭ সালের প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সুযোগও নষ্ট হয়ে যেত।

রণক্লান্ত রুশদেশকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে আনতে না পারলে বিপ্লব আবার বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল। তাই লেনিন, ট্রটস্কির মতো সহকর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শান্তি স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত জার্মানির সঙ্গে যে সন্ধি হল, তার শর্তগুলি রুশদেশের পক্ষে একেবারেই সুবিধাজনক হয়নি। কিন্তু সন্ধি না হলে সাম্যবাদ প্রবর্তনের কোনো আশাও থাকত না; তাই লেনিন শান্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, ট্রট্স্কির মতো উগ্রপন্থী কম্যুনিস্টের আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন, অনেকের অপবাদও মাথায় পেতে নিতে রাজি ছিলেন। সন্ধি-বিরোধীরা তাঁর কথা আগে মেনে নিলে শর্তগুলি রুশদেশের পক্ষে অনেক বেশি অনুকূল যে হত, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।

সোভিয়েট শাসনের আরো কঠিন পরীক্ষা এবার আরম্ভ হল। অধিকারচ্যুত অভিজাত ধনিকশ্রেণী এবং তাদের অনুবর্তী সমস্ত দল তাদের পুঞ্জীভূত আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্য পশ্চিম ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির কাছ থেকে অর্থ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য অপেক্ষা না করেই ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকা রুশদেশে সোভিয়েট শাসন ভেঙে দেওয়ার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে দিল। এমন সময় গিয়েছে যখন একদিকে পোল্যান্ডের প্রান্ত থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, আর অন্যদিকে কাশ্মীর ও আফগানিস্থানের সীমান্ত থেকে উত্তরমেরু পর্যন্ত একসঙ্গে চৌদ্দটি ধনিক শক্তি সোভিয়েট উৎপাটনে ব্যাপৃত হয়েছিল। অনেকের পক্ষে হয়তো এটা বিশ্বাস করাই শক্ত, কিন্তু ইংরেজ, জাপানি, আমেরিকান, ফরাসি, ইতালিয়ান, চীনা, গ্রীক, পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, তুর্কি, চেকোস্লোভাক, জার্মান, অস্ট্রিয়ান, পোলিশ যোদ্ধা এসে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল। দেনিকিন, কল্‌চাক, য়ুদেনিচ, রাঙ্গেল প্রভৃতি বিদ্রোহী রুশ-সেনানায়করা বিদেশিদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছিল। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রীরা যেমন চীনে তথাকথিত "স্বতন্ত্র" শাসনব্যবস্থা খাড়া করেছে, প্রাক্তন রুশ সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশে সোভিয়েট-শত্রুরাও তাই করেছিল। উত্তরে আর্কএঞ্জেল ও মুরমালক্, দক্ষিণে ককেশস্ ও ডন্ অঞ্চল, পূর্বে সাইবিরিয়ার নানা প্রদেশ, য়ুরাল পর্বতের নিকটস্থ জায়গা, বোখারা সামারকন্দ অঞ্চল— এরূপ বহুস্থলে বিদেশি আশ্রয়ে সোভিয়েট-বিরোধীদের শাসন কায়েম করার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সোভিয়েটে এই নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা চলেছিল। এমনকি তার পরেও জাপান ১৯২২ পর্যন্ত ভলাডিভস্টক বন্দর ছাড়েনি, আর ১৯২৪-এর আগে উত্তর-শাখালিন ছেড়ে যায়নি।

গৃহযুদ্ধ আর বিদেশি শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপকে ব্যর্থ করে দিল জাগ্রত সোভিয়েট গণশক্তি। দুনিয়ার শ্রমিকরাও তাদের পক্ষে আন্দোলন করেছিল, নিজেদের সরকারের উপর চাপ দিয়ে সোভিয়েট দলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিপ্লবের জয় হল প্রধানত সোভিয়েট জনসাধারণের অটুট তেজস্বিতার জন্য, আর সে তেজস্বিতাকে যারা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হচ্ছেন লেনিন।

কিন্তু দীর্ঘ চার বৎসর প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দারুণ শক্তিক্ষয় হয়েছিল। সংকট সময়ে সোভিয়েট সরকার অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে "সামরিক সাম্যবাদ" (War communism) প্রবর্তন করেছিল। তখন প্রধান প্রয়োজন ছিল সংগ্রামরত লালফৌজ আর দেশের অভুক্ত কৃষিজীবীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। তাই ছোটো-বড়ো সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকার পরিচালনা করে; ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের উদ্‌বৃত্ত অংশ সরকার বাঁধা দামে কিনে শ্রমিক ও সৈন্যদের জন্য সরবরাহ ও সঞ্চয় করে রাখে। সকলকেই বলা হয় যে শ্রম না করলে আহার মিলবে না— সংকট সময়ে এ নিয়ম যে নির্মম ভাবেই পালন করা হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যতদিন যুদ্ধ চলেছিল, ততদিন শ্রমিক-কৃষক সব কথা ভুলে সোভিয়েট ভূমি রক্ষার জন্য খেটেছে, স্বার্থের কথা ভাবেনি। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর তাদের পক্ষে নির্বিকার চিত্তে অভাবের দংশন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কৃষকরা উদ্‌বৃত্ত শস্য সরকারের হাতে তুলে দিতে আপত্তি করল, শস্য উৎপাদন কমাতে লাগল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমনকি যে-শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতি ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সচেতন, তাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। অবসাদখিন্ন জনসাধারণ আর স্বার্থকে

সম্পূর্ণ বলি দিয়ে পুনর্গঠনের কাজে লাগতে পারল না। এই নতুন বিপদের সময় বলশেভিক্ দলের কর্তব্য হল দেশে প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লববিরোধের মনোভাব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সে চেষ্টা করা। লেনিন বললেন যে, নতুন পরিস্থিতিতে "সামরিক সাম্যবাদ" অচল, নতুন অর্থ-নৈতিক নীতি প্রচলন করতে হবে।

এই নীতি New Economic Policy (N. E. P.) নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সমস্ত বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যানবাহনের ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, জমি, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ভার সরকারের হাতেই ন্যস্ত রইল। কিন্তু "সামরিক সাম্যবাদের" উদ্‌বৃত্ত শস্য বাঁধা দরে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দিয়ে উৎপন্ন শস্যের উপর একটা কর বসানো হল। কর দিয়ে যা বাকি থাকত, তা কৃষক স্বেচ্ছায় সম্ভোগ করার অনুমতি পেল। ট্রট্স্কি প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীরা বললেন যে, লেনিন এই নীতি অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রকে নির্বাসন দিলেন, ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করলেন। কিন্তু আসলে এতে শুধু কৃষির শোচনীয় দুর্গতি দূর হল, ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় স্বাধীনতা দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক জীবন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। যারা শুধু বাগাড়ম্বরপটু, তাঁরা বললেন যে, লেনিন বিপ্লবকে বিপন্ন করছেন। তাঁরা বোঝেননি যে, লেনিন যে-পথের নির্দেশ দিলেন, তাই ছিল বিপ্লবকে রক্ষা করার একমাত্র পথ। পরে যাতে একসঙ্গে দু'পা এগিয়ে যাওয়া চলে, তাই তিনি এক পা পিছিয়ে এসেছিলেন।

এ দুঃসাহস দেখাবার ক্ষমতা ছিল বলেই মার্ক্স্‌বাদী হিসাবে লেনিনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সাম্যবাদের প্রয়োগ কিরূপ হওয়া উচিত তা জানার শক্তি না থাকলে কেউ যথার্থ সাম্যবাদী হতে পারে না।

এই সুযোগে লেনিনের মতের ব্যাখ্যা নিয়ে ট্রট্স্কির সঙ্গে স্টালিন ও অধিকাংশ রুশ সাম্যবাদীর যে বিসংবাদ চলেছিল, সে বিষয়ে আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মতদ্বৈধের প্রধান কারণ ছিল, ট্রট্স্কির 'Permanent Revolution'-বাদ। তাঁর মতে প্রলেটেরিয়টের যে কেবল ধনিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে তা নয়, চাষীদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের বিরুদ্ধে যাবে। সুতরাং যে-সমস্ত পশ্চাদ্‌পদ দেশে চাষীদের সংখ্যাধিক্য প্রবল, সেখানকার সমাধান তখনই হতে পারবে যখন সমস্ত পৃথিবীতে প্রলেটেরিয়ট বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করেছে। এর এক অর্থ এই যে, বিপ্লবী সোভিয়েট রক্ষণশীল ইয়োরোপ বর্তমান থাকা পর্যন্ত কিছুতেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণী রুশদেশকে সাক্ষাৎ সাহায্য না করলে সেখানে সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। অন্তত ইয়োরোপের প্রধান সব দেশে শ্রমিকদের জয় না হলে রুশদেশে নতুন সমাজসৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

লেনিনের লেখা থেকে বোঝা যাবে যে প্রলেটেরিয়ন ডিক্টেটরশিপের ভিত্তি হচ্ছে নগর ও গ্রামের সকল শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ মিলন; মিলের কুলি আর মাঠের চাষীকে এক নিশানের তলায় দাঁড় করাতে হবে। ট্রট্স্কি এদের আলাদা তাঁবুতে ঠেলে দিয়েছিলেন। বিপ্লবে চাষীদের যে অনেকখানি জায়গা নেবার আছে, তা তিনি উড়িয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরই সাহায্য করেছেন যারা চাষীদের বিপ্লব আন্দোলনে ডাক দিতে নারাজ। আর দ্বিতীয়ত, লেনিনের মতে ধনিকবাদের একটা নিয়মই হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে অসমান, তার রেখা অবক্র, মসৃণ বা ঋজু নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি— এই তার স্বভাব। সুতরাং এ অবস্থায় কয়েকটি বা এমনকি একটিমাত্র দেশেও সাম্যবাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) লেনিন মনে করেছিলেন যে ঐ বিকট

তাণ্ডবের অবিশ্বাস্য ক্রূরতা ও নির্বুদ্ধিতা দেখে সকলের চক্ষুরুন্মীলন হবে, বিপ্লব কেবল সর্বব্যাপী হবে না, সর্বত্র সফলও হবে। "এক দেশে সমাজতন্ত্র" সম্ভব কি না— সে বিচার নিষ্প্রয়োজন হবে। কিন্তু ইতিহাসের সিদ্ধান্ত হল ভিন্ন, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপন ও পরিচালন ব্যপদেশে তাঁর অভিজ্ঞতা পুরানো মতের পরিবর্তন এনে দিল।

মার্ক্স্ একবার তাঁর এক চিঠিতে বলেছিলেন যে, "এক দেশে সমাজতন্ত্র" (Socialism in one country) সম্ভব কি না সন্দেহ। কিন্তু লেনিন আর স্টালিন দেখলেন যে অন্তত রুশদেশ সম্বন্ধে তাঁরও মত ঠিক ঘটছে না। মার্ক্স্ যে-অর্থে "এক দেশ" কথা দুটো ব্যবহার করেছিলেন, সে অর্থে সোভিয়েট ইউনিয়ন একদেশ মাত্র নয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে এক বিরাট মহাদেশ যা প্রায় সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারে। ভৌগলিক বহিরাকৃতি (configuration) যার সহায়, যেখানে ধনোৎপাদনের সুযোগ প্রায় অফুরন্ত, যেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অনেক অগ্রগামী দেশের তুলনায় সহজে পরিবর্তন সাপেক্ষ,— সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক কথা, আর ধনিকজগতের বৈরিতা অগ্রাহ্য করে ইংল্যান্ডের মতো সুসংহত, বাণিজ্যনির্ভর দেশে সমাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা আর এক কথা। এই জন্যই লেনিন একবার বলেছিলেন যে, রুশদেশের তুলনায় পশ্চিম ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন সময়সাপেক্ষ, কিন্তু সেখানে ভিত একবার ভালো করে খুঁড়তে পারলে রুশদেশের চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি পাকা ইমারত উঠে যাবে।

অবশ্য "Socialism in one country"— একথা শুনে সহজ প্রেরণা বেশি আসে না। তবে যাদের প্রেরণা কতকগুলো গরম কথা, তাদের দাম সাম্যবাদীদের কাছে খুবই কম। আর সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে প্রচেষ্টা অদম্য উদ্যমে চলে এসেছে, তার সাফল্যের চেয়ে বড়ো প্রেরণা শ্রমিক-আন্দোলনের আর কিছু নেই। মার্ক্স্‌বাদ জড় বিশ্বাস নয়, জীবন্ত আন্দোলন; তার রীতি, তার বিধি স্থাণু নিশ্চল নয়। তাই ব্রেস্টলিটভস্ক্ সন্ধির সময় ট্রট্স্কি যখন ব্যাকুল হয়ে লেনিনকে তার করেছিলেন যে, ঈভ্‌নিং পোশাক পরে সন্ধিসভায় তিনি প্রলেটেরিয়ন্ হয়ে কেমন করে উপস্থিত হন, তখন উত্তর আসে যে যুদ্ধশান্তির জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো 'পেটিকোট' পরে হাজির হও! তাই তাঁর New Economic Policy মার্ক্স্‌বাদ থেকে সাময়িক বিচ্যুতি হলেও তিনি তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। স্টালিনও সেই পথ অনুসরণ করে ট্রট্স্কির বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে সমূহের স্বার্থই শ্রেয়, তাই দলের অবাধ্যতা করায় ট্রট্স্কির শাস্তি হয়েছিল। লেনিনের সময় যেমন Martov, Dan প্রভৃতি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, তেমনি স্টালিনের সময় ট্রট্স্কিকেও দেশ ছাড়তে হল। আরও যাঁরা কেতাবে পড়া বাঁধাবুলি আউড়ে সোভিয়েটের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে বাধা দিয়ে শুধু বিপ্লবী বাগাড়ম্বর দেখিয়েছিলেন, প্রকারান্তরে সোভিয়েট ধ্বংসের কাজেই সাহায্য করেছিলেন, তাঁদেরও বিপথগামিতার শাস্তি নিতে হয়েছে।

* * *

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি তারিখে মহামানব লেনিনের মৃত্যু হয়। ধনিক একাধিপত্যের চিরশত্রু লেনিনের মতো বিপ্লবী নেতা ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি। তাঁর নামে কত অপবাদ প্রচার করা হয়েছে, দানব বলশেভিকদের রক্তপিপাসু নেতা বলে কতবার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আর কোনো নেতা এত বেশি অর্জন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। লেনিনের অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁরা সকলেই

বলেছেন যে তাঁর হৃদয় সত্যই ছিল কুসুমকোমল, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকে প্রাণ খোলা আনন্দ করতে যারা দেখেছে, তারা তা কখনো ভুলতে পারে না। এই হৃদয়বত্তার দরুনই তিনি চির নির্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকদের মনের সত্য পরিচয় পেয়েছিলেন, আর সেই কারণেই কখনো তাদের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। আকৈশোর তিনি বিশ্বের আর্তদের যথার্থ মুক্তি সংঘটনের কঠোর ব্রত পালন করে গিয়েছিলেন, বিপর্যয়ের মধ্যেও বিপ্লবের জয় সম্বন্ধে ভরসা রেখেছিলেন। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের জীবনকথা মুক্তিকামীদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

মস্কো শহরে সোভিয়েট সৌধে লেনিনের যে প্রতিমূর্তির পরিকল্পনা হয়েছে, সেটা হবে মানুষের তৈরি সকল মূর্তির চেয়ে বড়ো। সোভিয়েট জনসাধারণ এই ভাবে তাদের অতি প্রিয় নেতার স্মৃতিকে সম্মান করছে। কিন্তু লেনিন শুধু সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন দুনিয়ার সর্বহারাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, দুনিয়ার সাম্যবাদীদের তিনি ছিলেন গুরু।

সোভিয়েট রাষ্ট্র

সোভিয়েট শাসনবিধির প্রথম ধারাতেই পরিষ্কার বলা হয়েছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন হচ্ছে মজদুর আর কিষাণদের সাম্যবাদী রাষ্ট্র।

এ কথা শুনে অনেকে হয়তো আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্র কি কখনো শ্রেণীবিশেষের হতে পারে! রাষ্ট্র যে সার্বভৌম, সর্বব্যাপী। সোভিয়েট জনসাধারণ কি সে কথা স্বীকার করে না?

এ আপত্তির উত্তর খুবই স্পষ্ট। রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে গভীর বুজরুকি বহুদিন থেকে চলে এসেছে, সাম্যবাদীরা তা স্বীকার করে না।

আমাদের শিক্ষাদীক্ষার যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা শুধু বুঝিয়ে আসছেন যে, রাষ্ট্র শ্রেণীভেদ ও স্বার্থভেদকে অতিক্রম করে সকলকেই ব্যক্তিত্বস্ফুরণের সুযোগ দেয়— ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাধীনতা একমাত্র রাষ্ট্রজীবনেই সম্ভব।

দার্শনিকশিরোমণি হেগেল রাষ্ট্রকে প্রায় এক অলৌকিক স্তরে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অনুসরণ করে ভাববাদীরা (Idealists) বলে থাকেন যে সমাজের আইন মেনে চলা আর নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট করার মধ্যে সামঞ্জস্য কেবল রাষ্ট্রই আনতে পারে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকাই মনুষ্যত্ববিকাশের চরম লক্ষণ।

এই সব গালভরা কথা শুনতে ভালোই লাগে। রাষ্ট্রের বাস্তব ইতিহাস আলোচনা না করে তার কাল্পনিক রূপচিন্তার বিলাস উপভোগ করাও বেশ সহজ। রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরা যখনই ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন কথা বলতে গেছেন, তখনই তাঁদের মুখোস খুলে গেছে। হেগেল বলেছিলেন যে তাঁর সময়ের প্রাশিয়াতেই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে সেখানে হেগেলের মতো বহুমানভাজন মহামহোপাধ্যায়দের যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনার কোনো ব্যাঘাত না ঘটলেও জনসাধারণের স্বাধীনতা বলে কোনো বস্তুই ছিল না। রাষ্ট্রের দাপটে গরীব জার্মানরা মুখ বুজে মালিকদের শাসন মেনে নিতে বাধ্য ছিল।

সত্যই যদি রাষ্ট্র একটা চমৎকার ব্যাপার হয়ে থাকে তো এখনো অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধবিগ্রহ, শোষণলাঞ্ছনের অবধি নাই কেন? এতদিন নানা দেশের রাষ্ট্র কি কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাই করেনি? তাদের ক্ষমতা কায়েম করার জন্যই কি রাষ্ট্রের অলঙ্ঘ্য শুচিতা সম্বন্ধে এত প্রচার চলে আসেনি?

রাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা না করলে এ প্রশ্নের জবাব মিলবে না। মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স্, লেনিন প্রভৃতি সে ইতিহাস আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার বনিয়াদ।

ইতিহাস বলে যে, এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। শ্রেণীবিভাগ যখন সমাজে প্রথম দেখা দিল, শোষক ও শোষিতের কাহিনী যখন শুরু হল, তখনই রাষ্ট্রের আবির্ভাব। রাষ্ট্র সনাতন নয়; সমাজপতিরা যখন জেঁকে বসল, তখন তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার হাতিয়ার হল রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আদিম যুগে একজন মানুষ যা উৎপাদন করতে পারত, তাতে কোনোক্রমে তার নিজের খাওয়া-পরা চল্‌ত, উদ্‌বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকত না। তাই একজনের খাটুনি ভাঙিয়ে আর একজনের লাভ করা সম্ভব ছিল না বলে একজনের উপর আর একজনের প্রভুত্ব স্থাপনেরও প্রয়োজন ছিল না। ক্রীতদাস রাখতে হলে তার খোরাকপোশাকের খরচ মালিককে দিতে হয়; সুতরাং যতদিন উৎপাদনপদ্ধতির কিছু উন্নতি না ঘটল, যতদিন ক্রীতদাসের পরিশ্রমের ফলে তার ভরণ-পোষণের খরচ বাদে কিছু উপরি লাভ মালিকের পকেটে না এল, ততদিন ক্রীতদাস রেখে মালিকের কোনো সুবিধা ছিল না, দাসপ্রথাও সমাজে চলিত হয়নি। সেই আদিম অবস্থায় রাষ্ট্র বলে কোনো কিছু থাকার দরকার ছিল না। সমাজ চলত অনেকটা অভ্যাসের বশে আর সম্মানী ব্যক্তিদের প্রভাবে। রাষ্ট্রে যে প্রধান লক্ষণ— দণ্ড দেবার অধিকার, জুলুম, জবরদস্তির অধিকার— তার তখন প্রয়োজন ছিল না।

তারপর থেকে সমাজে শাসন-নিপুণ এক সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে; সাধারণ লোককে হুকুম তামিল করার অভ্যাস শেখানো আর সমাজপতিদের, ধনপতিদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখাই তাদের কর্তব্য হয়েছে। দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা, জায়গীরদারি, জমিদারি, পুঁজিদারি— সকল ব্যবস্থাতেই অল্প কয়েকজনের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে। প্রচার করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার চেয়ে দুষ্কর্ম আর নেই, চরম দণ্ড তার শাস্তি। সমাজব্যবস্থাকে অটুট রাখার নামে সমাজপতিদের জবরদস্তি আর জনসাধারণের বিড়ম্বনাকে সমর্থন করা হয়েছে। রাষ্ট্রের 'স্বরূপ' সম্বন্ধে কাল্পনিক ভাববিলাস সুশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ শ্রেণীনির্বিশেষে সকল পৌরজনের পরম কর্তব্য বলে প্রচারিত হয়েছে। রাষ্ট্রের নামে প্রভুশ্রেণীর একাধিপত্যে জনসাধারণ যে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, সে কথা ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ধনতন্ত্রের যুগ; এ যুগের শ্রেষ্ঠ বল হচ্ছে অর্থবল। যে যুদ্ধ রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বরূপকে প্রকট করে দেয়, সে যুদ্ধের জনক হচ্ছে ধনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনিকশ্রেণীর স্বাভাবিক সাম্রাজ্যলিপ্সা। অর্থবানরা আজকের সমাজপতি; তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা সংখ্যাল্প অর্থবানদের কল্যাণকল্পে রয়েছে। লেনিন ঠিকই বলেছিলেন যে 'আসল রাষ্ট্র হচ্ছে ধনিকশ্রেণীর কার্যনির্বাহক সভা'।

একটি শ্রেণী আর-একটি শ্রেণীকে চেপে রাখে যে অস্ত্র দিয়ে, সেই অস্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র। একথা শুধু রাজতন্ত্র নয়— প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র সম্বন্ধেও খাটে। সাধারণের ভোট দেবার অধিকার সম্বন্ধে

এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন যে "তা এইমাত্র বোঝায় যে শ্রমিকশ্রেণীর অপরিণত অবস্থার অবসান হয়েছে।" কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধাপ্পাবাজি হচ্ছে এই যে ভোটের ঘুষ দিয়ে সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখা চলে, বড়োলোকদের সর্দারি বজায় থাকে, টাকার অভাবে গরীবের পক্ষে প্রচার চলে না, নির্বাচনে জিত শক্ত হয়ে পড়ে, আর রাষ্ট্রশক্তি হাতে না এলে গরীবের গরীবানা ঘোচানো সম্ভব হয় না। ভোট থাকলেই যদি গরীবের সব মুশকিল আসান হয়ে যেত, তাহলে যাত্রার দলে যে রাজা সাজে তারও দুঃখ ঘুচত।

কয়েকজন "সাম্যবাদী" পণ্ডিত বলতেন, আর বিলাতের লেবার পার্টির সুবিধাবাদী নেতারা আজও প্রাণপণে আশা করেন যে ধীরে-সুস্থে ঘষে-মেজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সাম্যবাদে পরিণত করা চলবে, আর পার্লামেন্টের পাকা রাস্তা দিয়ে অক্লেশে সাম্যবাদের রাজ্যে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু বিপ্লবকে দূরে পরিহার করে রাষ্ট্রের পুরানো ঠাট্ বজায় রেখেছিল বলে জার্মানির পার্লামেন্টমুগ্ধ সোশালিস্টদের শাস্তি হল হিটলারের করাল কবলে পড়া। পার্লামেন্টের সদিচ্ছা যতই থাকুক, গরীব আর বড়োলোকের শ্রেণীস্বার্থে প্রভেদ রয়ে গেলে সাম্যবাদের কাছাকাছিও পৌঁছানো যাবে না। জমিদারের দাপট যতই হোক, সত্যই বাঘ আর ছাগলকে একঘাটে জল খাওয়ানো সম্ভব নয়।

অধ্যাপক ল্যাস্‌কি এ বিষয়ের আলোচনা করে দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রক্ষমতা শোষকদের হাত থেকে শোষিতদের হাতে যাওয়া যে উচিত তা তিনি বেশ বোঝেন। আইনকানুন বাঁচিয়ে, বিনা বিপ্লবে উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবে, সে ভরসা তিনি ইতিহাস থেকে পান না। কিন্তু বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর মারাত্মক ভীতি রয়ে গেল। দোটানা থেকে উদ্ধার পেতে হলে মার্ক্‌স্‌বাদের শরণ নিতে হয়। মুশকিলই বটে!

মার্ক্‌স একবার বলেছিলেন, "ধনতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় যাওয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একটা কালব্যবধান আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের একটা বিশিষ্ট পর্যায় আছে। এ সময় রাষ্ট্র প্রলেটেরিয়েটের বৈপ্লবিক একাধিপত্য ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না।"

গণতন্ত্রের মুখোস পরা থাকলেও বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্ব নষ্ট করা সাম্যবাদীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। ভালোমানুষের মতো যখন তারা নির্বিবাদে শ্রমিক-শাসন মেনে নেবে না, তখন তাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য এই বিপ্লবী একাধিপত্য প্রয়োজন। শ্রমিকশ্রেণী অ্যানার্কিস্টদের মতো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উড়িয়ে দিয়েই খুশি হতে পারে না। রাষ্ট্র চিরকালই শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করার অস্ত্র; তাই সর্বহারাদের স্বার্থরক্ষা আর বিরোধীদের শক্তি-ধ্বংসের জন্যই রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে। শ্রেণীহীন সমাজ তো আর একদিনে তৈরি হয় না। সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ যখন আসবে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ পাবে; চরকা আর কুঠারের মতো রাষ্ট্রকে জাদুঘরে পাঠানো চলবে। কিন্তু যতদিন শ্রেণীহীন সমাজ না আসছে ততদিন রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করতে হবে মজদুর-কিষাণের হাতিয়ার হিসাবে, ততদিন চলবে শ্রমিক-একাধিপত্য।

সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই একাধিপত্যেরই সাক্ষাৎ মিলবে। সারা দুনিয়া যাদের দুশমন, তাদের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্যই এর দরকার ছিল। যাদের শত্রু ঘরে বাইরে সর্বত্র, তাদের পক্ষে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু জনসাধারণের একাধিপত্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, সমাজের শতকরা ৯৯ জন যা চায়, তাই বাহাল হবে, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কর্তৃত্ব আর বরদাস্ত হবে না। তাই বলা যায় যে এ

ব্যবস্থা হচ্ছে যথার্থ গণতন্ত্রের চূড়ান্ত। বড়োলোকের প্রভুত্ব চলুক, গরীবের উপর জুলুম যেমন চিরকাল চলছে তেমনই চলুক, ভোট দেওয়ার অধিকার না হয় সকলকেই দেওয়া হোক্— এই ধাপ্পাবাজিই বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত আছে। এর তুলনায় মজুর-কিষাণের সর্দারি সমাজের পক্ষে হাজার গুণ কল্যাণকর। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেই কল্যাণ বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে।

* * *

১৯০৫ সালে আইভানোভা-ভস্‌নেজেন্স্ক্ বলে একটা ছোটো শহরে কাপড়ের কলওয়ালাদের সঙ্গে মজুরদের পক্ষ থেকে কথাবার্তা চালাবার জন্য প্রথম "সোভিয়েট" (বা পঞ্চায়েত) স্থাপিত হয়। যেসব শহরে কারখানা ছিল, ক্রমে সে সব জায়গায় ঐ রকম সোভিয়েট খাড়া করা হয়। আর ঐ বৎসর বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটগুলি মিউনিসিপ্যালিটি দখল করে শহর শাসন চালায়। কিন্তু বিপ্লব সেবার সফল হল না বলে সোভিয়েট আন্দোলনও নষ্ট হল।

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জারের শাসন যখন ভেঙে আসছিল, তখন আবার ঐ সোভিয়েটকে দেখা গেল। রুশরাজধানী পেট্রোগ্রাডে সমস্ত কারখানার শ্রমিকরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সোভিয়েট গঠন করল, শহরে ও গ্রামেও তাই হতে লাগল, সৈনিক-নাবিকরাও নিজেদের সোভিয়েট খাড়া করল।

বলশেভিক বিপ্লব জয়যুক্ত হল নভেম্বর মাসে। তখন একদিকে ছিল জনসাধারণের হাতে-গড়া সোভিয়েট, অন্যদিকে চলছিল বিপ্লববিরোধীদের গূঢ় ষড়যন্ত্র। বলশেভিক নেতা লেনিন বুঝলেন যে, সোভিয়েটই হবে নতুন সমাজ গড়বার বিপ্লবী হাতিয়ার। ৭ই নভেম্বর সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল; সোভিয়েট-কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হল যে, তার নির্বাচিত কার্যনির্বাহক সমিতি আর তার মনোনীত কমিসাররা দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে ঐ প্রথম মজুর-কিষাণের দল সমাজ ভেঙে গড়ার শক্তি পেল।

১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে তৃতীয় সোভিয়েট-কংগ্রেস অত্যাচারিত জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে একটি ঘোষণা প্রচার করল। সকলকে জানানো হল, "সমাজ থেকে শ্রেণীভেদ চিরকালের জন্য দূর করে, শোষকদের নির্মমভাবে দমন করে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।"

১০ই জুলাই, ১৯১৮, তারিখে প্রথম সোভিয়েট শাসনবিধি মজদুর-কিষাণদের প্রতিনিধিরা সোভিয়েট-কংগ্রেসে গ্রহণ করল। তখন সোভিয়েটের দারুণ দুঃসময়; চারদিকে গৃহযুদ্ধ চলছিল, বিদেশিরা এসে নবজাত সোভিয়েটকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার কাজে লেগেছিল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নানা মুনির নানা মত প্রচার হচ্ছিল, "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" দোহাই দিয়ে সোভিয়েটগুলিকে উৎপাটিত করার অপচেষ্টা চলছিল। কিন্তু বিপ্লবের জোয়ার যখন আসে, জনসাধারণ তখন এগিয়ে চলে বিপুল উল্লাস নিয়ে, বাধাবিপত্তি তখন তৃণের মতো ভেসে যায়। বলশেভিক নেতারাও সিংহবিক্রমে জনসাধারণকে পথের নির্দেশ দিয়েছিল। চার বৎসরের মধ্যে শত্রুর নিপাত হল। ১৯২৪-এ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিধি সম্মিলিত সোভিয়েট-কংগ্রেসে গৃহীত হল।

* * *

১৯৩৭ থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কানুনে কতগুলো জরুরি অদলবদল হয়েছে। কিন্তু প্রথমে ১৯৩৭-এর আগে কী ব্যবস্থা ছিল, তার খোঁজ নেওয়া যাক।

সাতটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র একজোট হয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গড়েছিল— রাশিয়া, হোয়াইট রাশিয়া, য়ুক্রেন, তুর্কমেনিস্থান, উজ্‌বেকিস্থান, তাজিকিস্থান আর আর্মিনিয়া, জর্জিয়া ও আজেরবাইজানের সম্মিলিত রাষ্ট্র। এদের মধ্যে আবার তাতার ও ভল্‌গা জার্মানদের গণতন্ত্রের মতো কয়েকটি স্বাধীন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, বিদেশি বাণিজ্য, রাজস্ব, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভাগ পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা,স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাবার পূর্ণ অধিকার আছে। প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেবার যে ব্যবস্থা এখন আছে, তার তুলনায় জারের শাসন যে কত নিকৃষ্ট ছিল বোঝা যায়। বিপ্লবের আগে লেখাপড়া শিখতে পেত সামান্য কয়েকজন, তাদের শিখতে হত রুশ ভাষা, অন্য সব ভাষা অগ্রাহ্য অবস্থায় পড়েছিল। রুশ সাম্রাজ্য ছিল একটা বিরাট কয়েদখানা, কত জাতি সেখানে বন্দী হয়ে থাকত! এই কয়েদখানাতে সোভিয়েট-শাসন মুক্তির হাওয়া এনে দিল।

বিপ্লববিরোধীরা যাতে রাষ্ট্রকে বিকল না করতে পারে, সে জন্য প্রথম শাসনবিধিতে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। যারা পরশ্রমজীবী তাদের ভোট দেওয়া হয়নি; তেমনি যারা পাদরী বা মঠের লোক, যারা পুরানো সরকারের কর্মচারী ছিল কিংবা যাদের মস্তিষ্ক বিকৃত, তারা ভোট পায়নি। এতে লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় আড়াই জন মাত্র ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। ভোট দেওয়ার ব্যাপারে সোভিয়েট জনসাধারণের উৎসাহ যথেষ্ট। ১৯৩৪ সালের নির্বাচনে ৯ কোটি ১০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ লোক ভোট দিয়েছিল। এই ভোটের ব্যাপার ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন বা কো-অপারেটিভ বা যৌথ কৃষিসমবায়ের দৈনন্দিন কাজে লেগে থেকে সোভিয়েট জনসাধারণ স্বায়ত্তশাসনের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অন্য কোনো দেশে তার তুলনা নেই।

সোভিয়েটভূমিতে প্রত্যেকে আঠারো বৎসর বয়সে ভোট দিতে পারে, ঐ বয়সে নিজেরা নির্বাচিত হতে পারে। এত কম বয়সে ভোটের অধিকার আর মাত্র তিনটি দেশে আছে — তুর্কী, আর্জেন্টাইন, মেক্সিকো। কিন্তু এ তিন দেশের কোথাও আঠারো বৎসরের মেয়েরা ভোট দিতে পারে না, আর মেক্সিকোর নিয়ম হচ্ছে এই যে, আঠারো বৎসরের ছেলে বিবাহিত না হলে ভোট পাবে না! অত অল্প বয়সে শুধু ভোট দেওয়া নয়, নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও দেয় একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন।

বিদেশ থেকে যারা এসে সোভিয়েট কলকারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, তাদেরও ভোট দেওয়া সম্বন্ধে সমান অধিকার। স্ত্রীপুরুষের অধিকারভেদ সোভিয়েট দূর করেছে — শুধু ভোট দিয়ে নয়, মেয়েদের পুরুষের সমান বেতন দিয়ে, শিশুজন্মের পূর্বে ও পরে কিছুকাল তাদের পুরো বেতনে ছুটি আর দরকারের সময় প্রসূতিপরিচর্যার ব্যবস্থা করে, ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে কেবল মায়ের আঁচল ধরে না থাকে সেজন্য সরকারি খরচে তাদের খেলাধুলা আর খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করে, রান্নাঘরের ভিতর মেয়েরা যাতে কয়েদী না থাকে সেজন্য বহুলোকের একত্র ভোজনালয় সর্বত্র স্থাপন করে। শুধু একটা ভোট পেলেই যে কেল্লা ফতে হয় না, তা তো আমরা খুবই বুঝি। যাদের পকেটে টাকার অভাব নেই, পয়সা বিলিয়ে সভা-শোভাযাত্রা করা যাদের পক্ষে সহজ, খবরের কাগজ যাদের হাতে, তারা যখন গরীবের বন্ধু নয়, তখন শুধু একটা ভোট নিয়ে গরীব করে কী? সোভিয়েট দেশে কেউ তাই

শুধু একটা ভোট নিয়ে খুশি হয় না, তারা চায় নিজেরা দেশের শাসন চালাতে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে। এর কারণ এই যে সোভিয়েট দেশের মালিক সেখানকার জনসাধারণ, আর অন্য সব দেশের মালিক হচ্ছে বড়োলোকের দল।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে ইমারত, তার বনিয়াদ হচ্ছে গ্রামে, শহরে, কারখানায়, কেল্লায়, জাহাজে সর্বত্র মজদুর-কিষাণদের জমায়েত। প্রথমে আছে গ্রাম আর ছোটো শহরগুলির সোভিয়েট, তারা নির্বাচন করে 'Volst' বা তালুক সোভিয়েট, সেখান থেকে প্রতিনিধি যায় Uyezd বা জেলায় আর Gubernia বা প্রাদেশিক সোভিয়েটে। প্রাদেশিক সোভিয়েট আর মস্কো-লেনিনগ্রাডের মতো বড়ো বড়ো শহরের সোভিয়েট মিলে সোভিয়েট-কংগ্রেস নির্বাচন করে; ইউনিয়নের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে এই কংগ্রেসই সর্বশক্তিমান। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়নের কাউন্সিল নির্বাচন করে, আর নিজেদের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন অঞ্চলগুলির সঙ্গে মিলে জাতিসংসদ (Council of Nationalities) গঠন করে। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি এই বিরাট সোভিয়েট-কংগ্রেসে মনোনীত হয়। সমিতির সভাপতিমণ্ডলীতে থাকে একুশ জন সভ্য, আর প্রধান বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বলা হয় কমিসার। সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রপতি বলে কেউ নেই, তবে কেন্দ্রীয় সমিতির কয়েকজন আর কমিসার-সংসদের একজন সভাপতি আছেন। কালিনিন এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে সাধারণত তাঁকেই সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি বলা হয়।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নির্বাচন যে-রীতিতে হয়, এখানে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিদ্‌রা মনে করেন যে একটা জায়গা থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠালেই ভোট দেওয়া সার্থক হয় না। বাসস্থলের চেয়ে কর্মস্থলের অভাব অভিযোগ লোকে বেশি জানে। আপিস বা কারখানায় সবাই মেলামেশা, গল্পগুজব করে, মতামত স্থির করে। সোভিয়েট দেশে যারই ভোট আছে, সে হয় হাতের নয় মাথার কাজ করে; সুতরাং তার পক্ষে আপিস বা কারখানাই হচ্ছে ভোট দেবার সব চেয়ে ভালো জায়গা। তা ছাড়া যারা লড়ছে বা জাহাজ কিংবা এরোপ্লেনে ঘুরছে, তাদের পক্ষে ইংরেজদের মতো ডাকে ভোট পাঠানোর চেয়ে নিজেদের সোভিয়েট নির্বাচন করা অনেক ভালো। অবশ্য যারা (বিশেষত যেসব মেয়েরা) বাড়িতে থেকে কাজ করে, তারা সেই অঞ্চল থেকেই স্থানীয় সোভিয়েট নির্বাচন করে।

শ্রমিকশ্রেণীর সর্বসময় কর্তৃত্ব বজায় দরকার বলে ১৯৩৭-এর পূর্বে এই নির্বাচনপরম্পরায় প্রথম স্তরের পর পরোক্ষ নির্বাচনেরই ব্যবস্থা ছিল। আবার এই কর্তৃত্ব পাকা করার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল যে, শহরে যারা ভোট দেয়, তাদের ভোটের দাম হবে গ্রাম্য ভোটারের চেয়ে প্রায় তিন গুণ। এর কারণ এই যে, শহরের শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্য গ্রামের চাষীদের চেয়ে বেশি। বিপ্লববিরোধীতারা তখনো অনেক সময় কিষাণদের ভুল বুঝিয়ে দলে টানার চেষ্টা করত। পয়সাওয়ালা চাষীদের প্রভাব গ্রামে তখনো একেবারে নষ্ট করা যায়নি। আর সোভিয়েট শাসন তাদের মনোমত নয় বলে গরীবদের ধোকা দেওয়া তাদের মতলব ছিল। তাই শহরের ও গ্রামের শ্রমজীবীদের মধ্যে এই অধিকারভেদ ১৯৩৭ পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল।

* * *

১৯৩৫ সালে সারা ইউনিয়নের সম্মিলিত সোভিয়েট কংগ্রেসে মলোটভ্ প্রস্তাব করলেন যে, শাসনবিধিতে কী অদলবদল দরকার তা ঠিক করার জন্য একটা কমিটি নিযুক্ত করা হোক।

একত্রিশ জন সভ্য নিয়ে কমিটি খাড়া করা হল; স্টালিন হলেন তাদের সভাপতি। কমিটির প্রস্তাবগুলি প্রকাশ হলে সারা ইউনিয়নে তুমুল তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল। প্রস্তাবগুলির দেড় কোটি কপি ইউনিয়নের নানা ভাষায় ছাপিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হল। সভাসমিতিতে, খবরের কাগজে, বেতারে, শহর ও গ্রামের সমস্ত জমায়েতে তার আলোচনা চলল। দু'মাসের মধ্যে মস্কোতে হাজারে হাজারে সমালোচনা আর নতুন প্রস্তাব আসতে লাগল। ১৯৩৩-এর ২৫শে নভেম্বর সোভিয়েট কংগ্রেসের অধিবেশন বসল; ইউনিয়নের সমস্ত অঞ্চল থেকে ২,০১৬ জন ডেলিগেট শাসনবিধি সংশোধনের কাজ আরম্ভ করল। দশদিন আলোচনার পর ৫ই ডিসেম্বর তারিখে নতুন শাসনবিধি পাকাপাকি ভাবে গৃহীত হল।

দেশ-শাসন কী ভাবে হওয়া উচিত, তা দেশের লোকই স্থির করবে— শুধু নামে নয়, কাজে করবে— এ ব্যাপার সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোথাও সম্ভব নয়। শুধু ভোট দেবার একটা ভূয়ো অধিকার পেয়ে যারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে মালিকদের জবরদস্তিকে খোসমেজাজে বরদাস্ত করে, তারা কখনো আইনকানুনের অদলবদল নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস করে না। গণতন্ত্র বলে যেসব দেশের সুপারিশ যখন তখন শোনা যায়, তাদের সঙ্গে সোভিয়েট দেশের তফাৎ এইখানে।

* * *

সোভিয়েট বিপ্লব যতই দুনিয়ার পুঁজিদারদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলল, যতই সোভিয়েটভূমিতে সাম্যবাদের প্রথম পর্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল, যতই শ্রেণীশত্রুর বিষদন্ত চূর্ণ হয়ে এল, ততই দেশবাসী প্রত্যেককেই সমান রাষ্ট্রিক অধিকার দেওয়া সম্ভব হল। তাই সোভিয়েট গণতন্ত্রের পূর্ণতর বিকাশ আমরা ১৯৩৭ থেকে দেখতে পাই। অন্য বহু দেশে যখন ফ্যাশিজম্ বর্বর মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, গণতন্ত্র যখন সর্বত্র সংকুচিত করা হচ্ছে, সেই সময় সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় যথার্থ গণতন্ত্র পূর্ণ সম্প্রসারণ ঘটল।

ইউনিয়নে আগে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল সাতটি; এবার হল এগারো। আর্মিনিয়া, জর্জিয়া, আজেরবাইজান পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হল। কাজাক আর কিরঘিজ্‌রা এতদিন রুশ ফেডারেল সোভিয়েটের-অন্তর্ভুক্ত থেকে নিজেদের শাসন, শিক্ষাদীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের অঞ্চলগুলি এবার নতুন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিকার পেল। বিপ্লবের পূর্বে এদের অবস্থা ছিল জঘন্য; জারের শাসনে তাদের বেশ মতলব করেই পশ্চাৎপদ অবস্থায় আটকে রাখা হত। তারা যে কখনো 'রাজার জাত' রাশিয়ানদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে, তা কেউ তখন কল্পনাও করতে পারত না আর আজ সোভিয়েট শাসনে জাতি বর্ণ বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য অচল। তাই সোভিয়েট রুশিয়ার চিরলাঞ্ছিত কত জাতি আজ সগর্বে ও সানন্দে সাম্যবাদ সমাজ গঠনে লেগে গিয়েছে।

শাসনবিধিতে আর একটি প্রধান পরিবর্তন হল এই যে, বিকৃত-মস্তিষ্করা বাদে সকলেই ভোটের অধিকার পেয়েছে। খ্রীস্টান পাদরি, মুসলমান মোল্লা, বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রভৃতি আর সে অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়। এমনকি প্রাচীন রাজবংশের জ্ঞাতিত্বও আর ভোট কেড়ে নেবার কারণ মনে করা হয় না। তা ছাড়া পূর্বে যে-ব্যবস্থায় গ্রামের ভোটারদের চেয়ে শহরের ভোটারদের ভোটের দাম বেশি ধরা হত, সে ব্যবস্থাও উঠে গেছে।

আগেকার নির্বাচনপরম্পরায় স্তরের পর স্তর যে পরোক্ষ নির্বাচনের বন্দোবস্ত ছিল, এখন তা বদলে গেছে। শুধু গ্রাম বা ছোটো শহরের সোভিয়েট নয়, সর্বত্রই সোজাসুজি নির্বাচন ব্যবস্থা বাহাল হয়েছে, গোপন 'ব্যালট্' ভোটের বন্দোবস্ত হয়েছে। সোভিয়েট শাসনের প্রথম

কয়েক বৎসর জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা খুবই বেশি ছিল; জারের শাসনের ঐ ছিল উত্তরাধিকার। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গোপন 'ব্যালট' ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো অসুবিধার কথা রইল না। তা ছাড়া সাম্যবাদবিরোধীর সংখ্যা এখন সোভিয়েট দেশে এতই নগণ্য যে গোপন 'ব্যালট' ভোটের ব্যবস্থা কায়েম করতে কর্তৃপক্ষ সংকোচ করেনি।

কোনো কোনো সমালোচক (বিশেষত যারা ইংরেজ) এই বলে আনন্দ পেয়েছেন যে, বলশেভিকরা এই নতুন শাসনবিধি তৈরি করে সাম্যবাদ থেকে পার্লামেন্ট মার্কা 'লিবারল' মতবাদে ফিরে এসেছে! কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে, ১৯০৩ সালে বলশেভিকরা ঘোষণা করেছিল যে, প্রত্যেককে ভোট দিয়ে গোপন 'ব্যালটের' ব্যবস্থা করে প্রত্যক্ষ নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা তাদের উদ্দেশ্য। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের সময় এই ঘোষণাবাণীই তাদের পথ নির্দেশ করেছিল। কিন্তু বলশেভিকরা ভাববিলাস পরিহার করতে অভ্যস্ত বলে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তখনই সুদূরপরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রে অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে 'ব্যালট' বাক্সের মহিমা প্রচার করা প্রয়োজন ছিল না, যুক্তিযুক্তও ছিল না। কিন্তু আঠারো বৎসর পরে বদলাবার পর সেই ১৯০৩ সালের ঘোষণা অনুসারেই কাজ হল। জনসাধারণকে বলশেভিকরা যতটা বিশ্বাস করেছে, কোনো দেশের কোনো দল মুখের কথাতেও ততটা বিশ্বাস দেখাতে পারেনি।

নতুন কানুনে সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভা হচ্ছে রাষ্ট্রের সুপ্রীম কাউন্সিল। এ কাউন্সিলের দুটো ভাগ আছে। দশ কোটি ভোটার সোজাসুজি নির্বাচন করে ইউনিয়নের কাউন্সিল। আর ইউনিয়নে যেসব রাষ্ট্র ও স্বাধীন অঞ্চল আছে, তাদের প্রতিনিধি নিয়ে জাতিসংসদ গঠন করা হয়। উভয়েরই সমান ক্ষমতা; মতভেদ হলে উভয়ের সম্মিলিত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে। এতেও যদি মতভেদের অবসান না ঘটে, তাহলে নতুন করে নির্বাচন করতে হয়। বৎসরে অনন্ত দু-বার সুপ্রীম কাউন্সিল বসে, এর মেয়াদ হচ্ছে চার বৎসর। সুপ্রীম কাউন্সিলের দুটো শাখা আছে বলে যেন মনে না করা হয় যে, এ হচ্ছে ইংরেজদের হাউস্ অব লর্ডস আর কমন্সের আর এক সংস্করণ। সোভিয়েট ব্যবস্থায় ঐ রকম প্রভেদ বলে জিনিস নেই। তা ছাড়া সর্বত্র যাকে বলা হয় 'আপার হাউস', তার আসল কাজ হচ্ছে সমাজের প্রগতিকে রোধ করে রাখা। ফ্রান্স ও আমেরিকায় তারা যে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়, তা কেবল ধনিকদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। সোভিয়েটে এ রকম কাণ্ডকারখানার কোনো জায়গা নেই।

সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশন যখন চলছে না, তখন দৈনন্দিন রাষ্ট্রশাসনের কাজে কমিসারদের সাহায্য করার জন্য একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। কার্যনির্বাহকদের কোনো কাজে গলদ থাকলে বিচার করে সুপ্রীম কাউন্সিল। আমেরিকায় এ বিচার করে সুপ্রীম আদালত। কিন্তু স্পষ্ট দেখা গেছে যে, সে আদালত হচ্ছে পুরোপুরি ধনিকদের হাতে। নতুন শাসনবিধিতে বিচার বিভাগ পূর্বের তুলনায় যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তাও রাষ্ট্রবিদ্‌দের প্রণিধানযোগ্য।

শাসনবিধির একটা পরিচ্ছেদ খুবই মূল্যবান— সেটা হচ্ছে নাগরিকের মূলগত অধিকার ও কর্তব্যের তালিকা। আমেরিকা যখন ইংল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীন হয়েছিল কিংবা ফ্রান্সে যখন বিপ্লব হয়েছিল, তখনও মানুষের অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু দুটোতেই বলা হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত সুখের জন্য অবাধে সম্পত্তি উপভোগের অধিকার সনাতন ও অপরিবর্তনীয়। রাজস্ব আদায় করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে ব্যক্তিস্ব সম্পত্তিতে হাত দিলে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলা হত। সাধারণের কল্যাণ সম্বন্ধে বড়ো বড়ো কথা শোনা গেলেও তার চেয়ে মাত্র কয়েকজনের স্বার্থ কায়েম করা যে সমাজের প্রধান কর্তব্য,

তা বেশ বোঝা যেত। সোভিয়েট শাসন চায় সর্বজনের কল্যাণ, তাই সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা বরদাস্ত করা হয় না। সেখানকার শাসনবিধি বলে যে, কাজ দাবী করা ও পাওয়া, যে-কোনো বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষালাভের পূর্ণ সুযোগ পাওয়া, রোগে শোকে বার্ধক্যে সমাজের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো ভাতা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ নিয়ে প্রায় দুশো জাতি উপজাতি সোভিয়েট রাষ্ট্রে বাস করে। জাতিধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলের জন্য এই ব্যবস্থা সব সময় মজুদ রাখা হয়েছে। আমাদের মতো যারা ঘনান্ধকারে পড়ে আছি, জমিদার, পুঁজিদারের লাভের অঙ্ক মোটা করতে সাহায্য করাই যাদের একমাত্র কাজ, দুঃখকষ্ট যাদের চিরসাথী, অত্যাচার লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করাই যাদের ধর্ম, বড়োলোক-গরীবের তফাৎ স্বয়ং ভগবান করে দিয়েছেন বিশ্বাস করে স্বস্তি পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করি, গরীবের যে সমাজের কাছে দাবি থাকতে পারে এ যারা স্বপ্নেও ভাবতে সাহস করি না— তাদের কাছে সোভিয়েট দেশটা তাজ্জব লাগবে বই কি!

সোভিয়েট শাসনে বক্তৃতা আর প্রচারের স্বাধীনতা, সভাসমিতি শোভাযাত্রা করার স্বাধীনতা সকলে পেয়েছে। অবশ্য নামমাত্র স্বাধীনতা অন্য কতগুলো "গণতান্ত্রিক" দেশেও আছে। কিন্তু সে স্বাধীনতার সত্যিই কোনো অর্থ নেই। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। এখানে কেউ কাউকে বড়ো হোটেলে খানা খেতে বা প্রকাণ্ড মোটর চড়ে হাওয়া খেতে বারণ করছে না। স্ফূর্তিতে থাকার "অধিকার" তো আমাদের আছে, কিন্তু ট্যাঁক যখন খালি আর তা ভারী হবার কোনো আশাও নেই, তখন ঐ "অধিকার" বা "স্বাধীনতা" একটা নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া কিছুই নয়। তাই স্টালিন একবার বলেছিলেন যে, "যতদিন শোষণপ্রথা লুপ্ত না হচ্ছে, যতদিন মানুষের উপর অত্যাচার চলতে পারছে, যতদিন দারিদ্র্য রয়েছে, বেকার সমস্যা রয়েছে, যতদিন সবাই ভয়ে কম্পমান হয়ে ভাবে যে তার কাজ গেলে খাবার জুটবে না, ঘরবাড়ি থেকে গলাধাক্কাই খেতে হবে, ততদিন 'স্বাধীনতা' কথাটার কোনো অর্থ হয় না।" যথার্থ স্বাধীনতা কেবল সাম্যবাদী সমাজেই সম্ভব। সোভিয়েটভূমিতে সেই সমাজ তৈরি হচ্ছে।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে শোনা যায়, খ্রীস্টজন্মের সাড়ে-চারশো বৎসর আগে গ্রীস দেশের অ্যাথেন্সে তার পরাকাষ্ঠা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অ্যাথেন্সের সমাজ দাসপ্রথা না থাকলে চলত না। কাজ করত ক্রীতদাসেরা; আর তাদের প্রভুরা "গণতন্ত্র" চালাত! এই ব্যবস্থাই বুর্জোয়া "গণতান্ত্রিকদের" আদর্শ!

জায়গীরদারি-জমিদারি ব্যবস্থায় সাধারণ লোকের কী অবস্থা ঘটে, তা আর আমাদের দেশের লোককে কষ্ট করে বোঝাতে হবে না। ব্যাপারটা যে আসলে কী , তা তারা হাড়ে হাড়ে বোঝে।

ধনতন্ত্র যখন ক্রমে সারা দুনিয়া অধিকার করে বসল, তখনো "স্বাধীনতা" সম্বন্ধে অনেক গালভরা বুলি আওড়ানো হচ্ছিল, কিন্তু বড়োলোকদের দাবা খেলায় গরীবদের শুধু বোড়ে-হিসাবে ব্যবহার করে চলল। আজো তাই চলছে--"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়"। মতলব হাসিল করতে হলে গরীবকে খাটিয়ে নিতে হবে, আর বুঝিয়ে দিতে হবে যে বড়োলোক-মহাপ্রভুদের জন্য খেটে যাওয়াই হচ্ছে ভগবানের ব্যবস্থা। ধনিকদের অনুচর হয়ে গরীবদের ভড়কে রাখার কাজে অনেক "নেতা" অবশ্য জুটে গেলেন এবং আছেন।

গরীব যেই বুঝতে শিখল, একজোট হয়ে লড়াই করতে তৈরি হল, অমনই বড়োলোকেরা মুখোস খুলে নিজ মূর্তিতে দেখা দিলেন। একশো বৎসর আগে বিলাতের একজন মহানুভব বড়োলোক--রবার্ট ওয়েন--গরীবদের হয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর বড়োলোক-বন্ধুরা কিছুদিন তাঁর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তারপর তাঁকে "একঘরে" করে দিল। এখনো যারা গরীবদের হয়ে কাজ করে, বলা হয় তাদের মাথা কিংবা মতলব খারাপ। মজুর আর কিষাণ আর আন্দোলনকে যে এত ঝড়ঝাপটা সইতে হয়, তার কারণ এই যে, গরীবদের "অধিকার" সম্বন্ধে বড়োলোকদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তাই কাজের ক্ষেত্রে সে "অধিকার" প্রয়োগ করতে গেলেই তাদের দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা তৈরি আছে।

ধনতন্ত্রের নিপাত ঘটাতে না পারলে সর্বমানবের মঙ্গল আসবে না। মজদুর-কিষাণরা একজোট হয়ে না লড়লে ধনতন্ত্র আপনা আপনি সরে যাবে না। কিন্তু এ কথা বলাই আমাদের সমাজে "মহাপাপ"।

সামনে পোলাও-কালিয়া-সন্দেশ-মোণ্ডা সাজিয়ে যদি কাউকে বলা হয় যে জিনিসগুলি খাওয়া ছাড়া অন্য সব অধিকারই আছে, তা হলেই ধনতন্ত্রের আমলে আমাদের "অধিকারের" তুলনা মিলবে। যাদের খাটুনির জন্যই দুনিয়ার দৌলত মানুষের হাতে আসছে, সে দৌলতে তাদের কোনো অধিকার নেই, বড়ো জোর তারা একটা ভোট পেতে পারে; কিন্তু তার বেশি কিছু চাইতে গেলেই মুশকিল। ধনতন্ত্রের বিধান হচ্ছে এই।

ফ্যাশিস্ট দেশগুলোর তো কথাই নেই, "গণতান্ত্রিক" দেশেও জনসাধারণের অধিকার বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে না। অবশ্য সেখানে তারা সামান্য কিছু সুবিধা পেতে পারে, কিন্তু তারা যে মুহূর্তে আসল "অধিকার" দাবি করে, তখনই মুশকিল বাধে। ধনিক দেশে যখন কাগজে কলমে গণতন্ত্র স্থাপিত হয়, তখন ধনতন্ত্রের মধ্যে একটা লড়াই সর্বক্ষণই চলতে থাকে। ধনতন্ত্রের জয় হলে আসে ফ্যাশিজ্‌ম; গণতন্ত্রের জয় হলে আসে সাম্যবাদ। সোভিয়েট দেশে যথার্থ গণতন্ত্রের জয় হয়েছে।

সোভিয়েটের প্রশংসা শুনলে যেন অনেকেরই গায়ে জ্বর আসে। সোভিয়েটের কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও তাদের সন্দেহ যায় না; ভাবটা প্রায় পুরানো নিন্দুকের মতো "অমুক ডেপুটি হয়েছে? ওঃ! --মাইনে পাবে না।" এরা ১৯১৭ সালে বিজ্ঞের মতো বলেছিলেন যে বলশেভিকরা গোটাকতক গুণ্ডা, দেশ শাসন ওদের কর্ম নয়। যখন দুনিয়ার বড়লোকেরা মিলে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করছিল, তখন তারা বলতেন যে শীঘ্রই সোভিয়েট একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা যখন প্রচার হয়, তখন তাঁরা তো প্রায় হেসে লুটিয়ে পড়েছিলেন, অর্থনীতি আবার অসভ্য বলশেভিকরা কী জানবে! নতুন শাসনবিধি যখন বাহাল হল তখন তাঁরা আবার বললেন, "ও সমস্ত হচ্ছে খবরের কাগজ গরম করার 'প্রোপাগাণ্ডা', আসলে কিছুই হয়নি, হবেও না।" আজ আবার তাঁরা বলছেন যে চাষাভুষোরা আবার জার্মানির সঙ্গে লড়বে কি, তারা হেরে ভূত হয়ে গেছে।

নির্লজ্জ নিন্দুকরা যাই বলুক না কেন, দুনিয়ার মজদুর কিষান জানে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের বন্ধু, তাদের আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সহায়। তারা জানে সোভিয়েট রাষ্ট্রেই মানুষ তার জন্মগত অধিকার ভোগ করতে পারে; তারা জানে যে মানুষের কল্যাণ আনতে পারে, নতুন দুনিয়া গড়তে পারে একমাত্র সাম্যবাদ আর সাম্যবাদী গণশক্তি।

হিন্দু ও মুসলিম

হিন্দু ও মুসলিম

ইংরেজ-আমলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মাত্র একটা সময়ই ছিল যখন আপামর সাধারণ বিশ্বাস করেছিল যে, বিদেশি শাসনের কেল্লা ফতে করে আমরা নিশ্চয়ই স্বাধীন হয়ে যাব। এটা ঘটেছিল ১৯২১ সালে, যখন গান্ধীজী যেন তাঁর সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে ঘুমন্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, যখন তিনি মুসলমানকে কোল দিয়ে টেনে এনেছিলেন স্বরাজসংগ্রামে, যখন মুষ্টিমেয় অবিশ্বাসীকে বাদ দিয়ে দেশের সবাই মেতে উঠেছিল ৩১শে ডিসেম্বরের রাত পোহাবার পরই নতুন প্রভাতের আশা ও উদ্দীপনায়। এমনটি বোধ হয় আমাদের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

১৯৪৬ সালে ইংরেজ শাসকরা নিজেদের মতলবের ওপর একটা বোরখা চাপিয়ে বারবার বলছে যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে দেবার আগ্রহ তাদের অফুরন্ত, দুঃখ শুধু এই যে, ভারতবাসীদের ঘরোয়া ঝগড়া এখনো মেটেনি। গান্ধীজীর মতো সর্বজনবরেণ্য নেতাও বলেছেন যে, স্বরাজ এসে আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, আমরা শুধু আগলটা খুলতে দেরি করে ফেলছি। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোক ইংরেজ শাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে জেনেও ঠিক তার দিনক্ষণ সম্বন্ধে ১৯২১ সালের মতো জোর করে কিছু বলতে বা ভাবতে চায় নি, মহাত্মা গান্ধীর কথা তাদের 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে' প্রবেশ করে নি। ১৯৪২-৪৩ সালে অবশ্য অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, স্বাধীনতা প্রায় করতলগত, কিন্তু বিদেশির ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাকৃত সাহায্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করে সে-ধারণা সবাই করেছিল। ১৯২১ সালে অবস্থা ছিল আলাদা; দেশের লোক তখন শুধু নিজের পায়ে ভর করে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বাধীন হবার উৎসাহে মেতেছিল।

পচিঁশ বছর পূর্বেকার সেই উদ্দীপনার একটা প্রধান কারণ নিশ্চয়ই ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অদ্ভুত মৈত্রী। হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মুসলমানরা তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য যে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখিয়েছিল, আজ তার ভগ্নাংশেরও সন্ধান মিলছে না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ আজ এমন চেহারা নিয়েছে যাকে বিকট বললে ভুল হবে না। হিন্দুর ন্যায়বোধ সম্বন্ধে মুসলমানের সন্দেহ আর মুসলমানের দেশপ্রেম সম্বন্ধে হিন্দুর সন্দেহ কদাকার রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

এ প্রবন্ধ লেখার সময় ভারতবর্ষে নতুন একটা শাসনতন্ত্র খাড়া করার কথা চলছে, খুব ধুমধামের সঙ্গেই চলছে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে তিনজন মহারথী প্রায় মাস তিনেক দিল্লী সিমলায় অধিষ্ঠান করে আছেন। রেলে এরোপ্লেনে দেশের বড়ো বড়ো নেতারা ছোটাছুটি করছেন। কেমন করে নতুন শাসনতন্ত্র গড়তে হবে সে বিষয়ে কংগ্রেস আর লীগ মনস্থির করতে পারে নি বলেই ইংরেজ পক্ষ থেকেই একটা রায় দেওয়া হচ্ছে, খানিকটা কথা কাটাকাটির পর লীগ কংগ্রেস দু'পক্ষই সে-রায় মেনে নিয়েছে, শুধু ইতিমধ্যে বড়োলাটের শাসন-পরিষদে ঢোকা নিয়ে কংগ্রেস আর লীগের মতভেদ পেকে উঠেছে, লীগ শাসন-পরিষদে ঢুকতে রাজি থাকলেও অনেক গড়িমসির পর কংগ্রেস গররাজি হওয়ায় বড়োলাট

আমলাদের দিয়েই কাজ চালাবেন বলে দিয়েছেন। এতে কংগ্রেস-সমর্থক দলে বেশ উল্লাস পড়ে গেছে, লীগের কপালে চাকরি না জোটায় সবাই যেন উৎফুল্ল। আফসোসের কথা এই যে, শাসনতন্ত্র গড়ার খেলাঘরের নিমন্ত্রণ দু'পক্ষই গ্রহণ করে বসেছে, আর লীগের গালে বড়োলাটের চড় পড়ায় কংগ্রেস পক্ষের উল্লাসের কোনোই হেতু নেই। ইংরেজ শুধু হাসছে এই ভেবে যে, সে দরকার মতো কংগ্রেস লীগ দু'পক্ষকেই অম্লান মুখে ঠকাতে পারে।

হয়তো কেউ কেউ অনুযোগ করবেন যে, এ-সব ব্যাপার হল রোজ-কে-রোজ রাজনীতির মারপ্যাঁচ, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার তেমন প্রয়োজন নেই। আসল কথা হল এই যে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তান নাম দিয়ে এমন একটা মারাত্মক দাবি খাড়া করা হয়েছে যে সে-দাবি প্রকৃত দেশভক্তদের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ-বিষয়ে লেখালেখি দু'পক্ষে নেহাৎ কম হয় নি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, পাকিস্তানের সমর্থনে লেখা বইগুলোর যুক্তি এবং মেজাজ দুইয়েতেই প্রায় অতিরিক্ত গলদ থাকে আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লেখা বইগুলোর ক্ষেত্রে যুক্তির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু সে যুক্তি কিছুতেই মুসলমানের মন স্পর্শ করে না বলে শেষ পর্যন্ত তা হাওয়ায় কথা বলার সামিল হয়ে পড়ে।

কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যে কয়েকজনের পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সম্প্রতি তিনি একটা বড়ো বই* লিখেছেন পাকিস্তান বস্তুটাকে অ-দরকারি আর অযৌক্তিক প্রমাণ করার জন্য। প্রথমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নানা বিষয়ে মিল আছে অনেক, আর সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিলে একটা বড়ো জাতির সৃষ্টি হয়েছে বলা খুব ঠিক। তারপর তিনি পাকিস্তান-প্রস্তাবের গলদগুলো জাহির করার চেষ্টা করেছেন; শেষে পাকিস্তানের বদলে পাকিস্তান-ঘেঁষা যে কয়েকটা প্রস্তাব এসেছে, সেগুলোকেও অগ্রাহ্য করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। সবাই একজোট হয়ে আমরা বিরাট সর্বভারতীয় রাষ্ট্র স্থাপন করব, এই হল তাঁর সিদ্ধান্ত।

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বাকবিতণ্ডার কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ঐক্য অটুট থাক, এ কামনা রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যাদের মতভেদ তারাও অনেক করে থাকে। কিন্তু সেই ঐক্যকে অটুট করার উপায় আর উপকরণ নিয়েই যত গণ্ডগোল। তাই পাকিস্তান যুক্তিহীন বা পাকিস্তানি আমলে নানা সমস্যার উদ্ভব হবে আর একত্র থাকলেই আমাদের মঙ্গল, এ ধরনের কয়েকটা ভালো কথা প্রমাণ করে দিলেই মুশকিল আসান যে হচ্ছে না, তা আমাদের বুঝতে হবে। আর বুঝে তার কারণেরও খোঁজ করে একটা হদিস বার করতেই হবে।

কথাটার পুনরাবৃত্তি বোধহয় দোষের হবে না। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ রয়েছে, তা সবাই স্বীকার করবেন। ভেদাভেদটা মেটানো যে আমাদের নেহাৎ জরুরি একটা কাজ, তাও সবাই স্বীকার করবেন। স্বাধীনতার লড়াইয়ে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে টেনে আনতে না পারলে যে ইংরেজেরই পোয়াবারো, তা নিশ্চয়ই আমরা জানি। কিন্তু এক হওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে চমৎকার যুক্তি দেখানো সত্ত্বেও যখন হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে যাওয়ার লক্ষণ তেমন দেখাচ্ছে না, তখন শুধু সে যুক্তিরই ব্যাখ্যা দিয়ে খুব বেশি উপকার হচ্ছে কি?

অবশ্য মুসলমানদের অধিকাংশ যদি আজ পাকিস্তানি আলেয়ার পিছনে ছুটে চলে, তা হলেই যে পাকিস্তান স্বীকার করে নিতে হবে, এমন কোনো কথা হতে পারে না। যদি ধর্মান্ধতা

*" India Divided" — by Rajendra Prasad (Hind Kitabs, Rs. IO/8)

বা অনুরূপ কোনো কারণে অন্যায় এবং ভ্রান্ত একটা রাস্তা মুসলমানরা বেছে নিতে যায় তো নিশ্চয়ই সে-কাণ্ডের বাহবা দেওয়া চলে না। আমরা বাস্তবিকই যদি মনে করি যে পাকিস্তানের নামে মুসলমানদের মধ্যে চতুর, স্বার্থসর্বস্ব কয়েকজন সকলের চোখে ধুলো দিচ্ছে, যদি আমরা আমাদের দেশের অবস্থা আলোচনা করে বাস্তবিকই বুঝি যে, পাকিস্তান নিয়ে লম্ফঝম্ফ হল রাজনীতিবিশারদদের দাবা খেলার একটা চাল মাত্র, যদি আমরা বাস্তবিকই মনে করি যে, পাকিস্তান ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেও মুসলমানদের বুঝিয়ে আমরা তাদের নিয়ে একত্র এদেশে সুখী স্বাধীন জীবনযাত্রা চালাতে পারি তো নিশ্চয়ই আমরা সরাসরি পাকিস্তান দাবিকে বরবাদ করব, পাকিস্তানি ধাপ্পাবাজিও অচিরে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু পাকিস্তান যে একটা ধাপ্পাবাজি একথা বলার আগে আমরা যারা মুসলমান নই, তাদের নিশ্চয়ই একটা প্রধান কর্তব্য হল, কেন মুসলমান জনসাধারণের মনে পাকিস্তান এত বড়ো একটা জায়গা দখল করেছে তা বোঝার চেষ্টা করা। সে-চেষ্টা যদি আমরা বাস্তবিকই করতাম তো নিশ্চয়ই পাকিস্তানের অসারত্ব আর পাকিস্তানিদের দেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিজ্ঞ ভাবে কতগুলো মন্তব্য করেই সন্তুষ্ট থাকতাম না। রাজেন্দ্রবাবু পাকিস্তান-সমস্যা নিয়ে অনেকের চেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছেন। খুব হালকা আলোচনা তিনি করেন নি, এ দেশের হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে মিলনসূত্র যে অনেকই আছে তা তিনি ভালো ভাবেই বর্ণনা করেছেন, পাকিস্তান দাবি যে অচল তা নিতান্ত মুসলমানবিরোধী মনোভাব না দেখিয়েই সিদ্ধান্ত করেছেন। আম্বেদকারও পাকিস্তান সম্বন্ধে একটা বড়ো এবং জরুরি বই লিখেছেন। কিন্তু সেখানে অনেক জানবার কথা লিখেও তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কেবল হিন্দু-মুসলমান ঝগড়াটাই হল এ দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে লক্ষ করার জিনিস। সে তুলনায় রাজেন্দ্রবাবুর বইয়ে ভাববার কথা বেশি আছে। তা হলেও বলতে হবে যে, পাকিস্তান মুসলমানের মনকে যে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে, তা বোঝার প্রকৃত আগ্রহ রাজেন্দ্রবাবুর কেতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আবার পুনরাবৃত্তি করে বলি যে, পাকিস্তানের নামে এ দেশের মুসলমান মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। সহানুভূতি নিয়ে, বাস্তবিক দরদ নিয়ে, এ ব্যাপারের কারণ খুঁজলে আমরা আর শুধু কয়েকটি মামুলি যুক্তি দেখিয়ে পাকিস্তানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করতে যাব না। মুসলমান তখন বুঝবে যে, হিন্দুরা তার মরমের কথায় কান দিতে নারাজ নয়, আর পরস্পর বন্ধুত্বের আবহাওয়ায় তখন দুই পক্ষে একটা শলাবন্দোবস্ত সম্ভব হতে পারবে।

বিষয়টা নিয়ে একটু গভীর ভাবে আলোচনায় নামার আগে রাজেন্দ্রবাবুর বইয়ের কয়েকটা গলদের উল্লেখ করা দরকার। মনে হয় এই গলদগুলো ঢুকেছে রাজেন্দ্রবাবুর অজ্ঞাতসারে, আর ঠিক সেই কারণেই সেগুলোকে সাংঘাতিক বলা চলে। শিক্ষিত হিন্দুর অবচেতন মন বুঝি কয়েকটা সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেয়!

বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে বিহারের ঋষিকল্প নেতা সদাকত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মজহরুল হকের স্মৃতির উদ্দেশে। মজহরুল হক্ সাহেবের অনাবিল স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে রাজেন্দ্রবাবুর মনে নিশ্চয়ই সন্দেহের ছায়াপাত মাত্র নেই। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু ভুলে গেছেন যে, যে মুসলীম লীগ্ পুরাপুরি ইংরেজের আনুকূল্যে ও আগ্রহে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সফল করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল বলা হয়, সেই মুসলিম লীগেরই প্রথম অধিবেশন যখন ১৯০৬ সালে ঢাকাতে হয়েছিল, তখন সে-অধিবেশনে মজহরুল হক্ উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি লীগের সভাপতি।

সার সৈয়দ আহ্‌মেদ একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন এই কথা প্রমাণ করতে যে, ওয়াহাবি আন্দোলনটা চলেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, শিখদের বিরুদ্ধে। এই পুস্তিকাটির কথা রাজেন্দ্রবাবু বারবার বলেছেন, জাতীয় সংগ্রামে ওয়াহাবি আন্দোলনের গুরুত্বকে খর্ব করারই জন্য। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবুর জানা উচিত ছিল যে, সার সৈয়দ আহ্‌মেদ একটা অভিপ্রায় নিয়ে ঐ কেতাবটি লিখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল তার সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বন্ধুত্ব স্থাপন করা। হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা ইংরেজ-শাসনের দুশমন বেশি, এই ধারণা তখন পর্যন্ত চলতি ছিল বলে তিনি তাঁর শিক্ষিত সহধর্মীদের পরামর্শ দেন কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে, আর ইংরেজকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, মুসলমানরা তাদের সঙ্গে অতিরিক্ত শত্রুতা করেনি। রাজেন্দ্রবাবু একটু মেহনত করলেই জানতে পারতেন যে, ওয়াহাবি অন্দোলনের ফলে ইংরেজের মনে নিদারুণ ভয় ঢুকেছিল, ঢোকার যথেষ্ট কারণও ছিল।

অনেকগুলো পাতা ধরে রাজেন্দ্রবাবু বলতে চেয়েছেন যে, সার সৈয়দ আহ্‌মদ প্রভৃতি তদানীন্তন মুসলমান নেতা আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ কোন্‌ এক বেক্‌-সাহেবের কথাতেই উঠতেন বসতেন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অত সহজ ছিল না। ইংরেজ নিজের স্বার্থে চক্রান্ত করেছে, আজও করে চলেছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মন-ভাঙাভাঙির জন্য। কিন্তু সৈয়দ আহ্‌মদের ইংরেজ-প্রীতির কতগুলো ঐতিহাসিক কারণ ছিল। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তেরাও একসময় ইংরেজের সঙ্গে মিতালি করাটাই কর্তব্য স্থির করেছিল; মুসলমানদের অপরাধ হল এই যে তাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হল বিলম্বে, তাই হিন্দুরা যখন একটু-আধটু গরম কথা বলতে শুরু করেছে তখন তারা ঠিক সেই রা-য়ে যোগ দিতে পারে নি।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি রাজেন্দ্রবাবু যে বিদ্বেষ পোষণ করেন, তার প্রমাণ হল এই যে, তিনি একটা পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন—"পাকিস্তান ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সমর্থন"—অথচ যা লিখেছেন তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, পাকিস্তান দাবি বেমালুম মেনে নিতে গররাজি বলে তারা লীগেরই চক্ষুশূল হয়েছে।

'প্যান্‌-ইসলাম' জুজুর ভয় জিন্না-সাহেবের আশ্বাস সত্ত্বেও হিন্দুদের আছে। দেশবিদেশের মুসলমান সুবিধা পেলে একজোট হয়ে অমুসলমানদের মুণ্ডপাত করার চেষ্টায় লাগাতে পারে, এটাই হল আশঙ্কা। দুঃখের বিষয় রাজেন্দ্রবাবুরও মনে এ আশঙ্কা আছে (পৃ: ৩০৮)। অর্থাৎ রাজেন্দ্রবাবু ভাবেন যে, মুসলমানদের চরিত্রে এমন একটা বস্তু আছে যা তাকে সহজেই 'প্যান-ইসলামের' রাস্তায় ঠেলে দিতে পারে। যদি সে-ধরনের একটা বৈশিষ্ট্যের বীজ মাত্র থাকে, তা হলে তার কারণ সন্ধান করে একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু সে-কথা চিন্তা করেন নি।

একথা চিন্তা করার দায়িত্ব হল ভারতবর্ষের সকল মুক্তিকামীর। বিষয়টির আলোচনা সন্তোষজনক হতে হলে সুদীর্ঘও হতে হবে। এখানে শুধু সংক্ষেপে কয়েকটি জরুরি কথার অবতারণা করা যাচ্ছে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ সরকার একটা বড়ো ধাক্কা খেয়েছিল ওয়াহাবিদের হাতে। তখনো একটা মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্বিভাব হয় নি, তাই যাকে নিছক জাতীয় সংগ্রাম বলা হয়, ওয়াহাবিদের উদ্যোগ তা নয়। কিন্তু পরদেশি, পরধর্মীকে দেশ থেকে হটিয়ে দেবার জন্য ওয়াহাবিরা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। দেশের সর্বত্র এদের ঘাঁটি ছিল;

বিশেষত দক্ষিণ বাঙলা থেকে একেবারে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত তাদের বেশ যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল। রায়-বেরেলির সৈয়দ আহ্‌মদ এবং দিল্লীয় শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এই দুজনই ছিলেন এ দেশের ওয়াহাবিদের গুরু। ওয়াহাবিরা চাইত মুসলমান ধর্মের কতকগুলো গলদ দূর করতে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে ক্রম্‌ওয়েলের আমলের 'ডিগার'দের মতো তারা চাইত সম্পত্তি-ব্যবস্থার তারতম্য দূর করতে। ১৮৩০ সালে এরা পেশাওয়ার দখল করে, আর ১৮৩১-৩২ সালে চব্বিশ পরগনার নারিকেলবেড়িয়াকে কেন্দ্র করে তিতু মিঞা ইংরেজের বিরুদ্ধে এমন লড়াই চালান যে, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া আর ফরিদপুর জেলার মুসলমান আর হিন্দু চাষী একত্র মিলে ইংরেজশাসন প্রায় নিশ্চিহ্ন করে আনে।

সরকারের বিরুদ্ধে তিতু মিঞার লড়াইয়ের কথা সহজে ভোলবার নয়। নারিকেলবেড়িয়ার কেল্লা থেকে বেরিয়ে লড়াই করার সময় তিতু মারা যান। একজন সেনাপতির ফাঁসি হয়, বহুলোককে ইংরেজ পাকড়াও করে, ১৪০ জনকে লম্বা মেয়াদে কয়েদখানায় পাঠায়।

শিখদের কাছ থেকে ইংরেজ যখন পাঞ্জাব দখল করে, তখন তাদের ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়। সৈয়দ আহ্‌মদের মৃত্যুর পর ওয়াহাবিদের নেতা ছিলেন বিলায়েৎ আলি ও ইনায়েৎ আলি। পাটনায় এদের প্রধান ঘাঁটি ছিল, আর বাঙলা দেশ থেকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে দলের বহুলোক এই লম্বা রাস্তায় সর্বদা পাড়ি দিত।

আমাদের প্রায় সকলের কাছে এ একটা বিস্মৃত কাহিনী, কিন্তু বাঙালি মুসলমান মহলে ওয়াহাবি আন্দোলনের জের বহুদিন চলেছিল। জৌনপুরের কেরামৎ আলি আর ফরিদপুরের হাজি শরিয়তুল্লাহ্ ছিলেন যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের 'আল-ই-হদিস্' ও বাঙলার 'ফরাজি' সম্প্রদায়ের গুরু।* অনেকের মতে তিতু মিঞার চেয়ে শরিয়তুল্লাহ্ ছিলেন বাঙালি ওয়াহাবিদের বড়ো নেতা। শরিয়তুল্লার ছেলে দুধু মিঞা (পরবর্তী যুগে কংগ্রেস ও খেলাফৎ নেতা পীর বাদশাহ মিঞা এই বংশের সন্তান) জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। হাণ্টার "The Indian Musalmans" গ্রন্থে ১৮৪৩ এবং ১৮৪৭ সালে বাঙলার পুলিশ বিভাগের বড়ো কর্তার লেখা চিঠি তুলে দেখিয়েছেন যে, এক একজন 'ফরাজি' প্রচারকেরই ৮০,০০০ অনুচর ছিল।

১৯২০-২১ সালে খেলাফৎ আন্দোলনের মতো এই ওয়াহাবিদেরও প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল মুসলমান ধর্মপ্রাণতা, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দুবিরোধী মনোভাব ঠিক ছিল না। অবশ্য স্থানে স্থানে হিন্দুরা যে ওয়াহাবি অভ্যুত্থানের ফলে বিপন্ন হয় নি তা নয়, কিন্তু আমরা দেখি যে, ১৮২৭-৩০ সালে তারা শুধু শিখদের সঙ্গে লড়ে নি, পেশাওয়ারের মুসলমান শাসককেও তারা উত্যক্ত করে তাড়িয়েছিল, আর ১৮৩১-৩২ সালে দক্ষিণ বাঙলায় তারা নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বাড়ি চড়াও হয়েছিল। ১৮৪৬ সালের এক সরকারি বিবরণে দেখা যায় যে, ৮০,০০০ লোক নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একজোট হয়ে ছিল, আর তারা সবাই হল "নিম্নশ্রেণীর" লোক। পৃথিবীর যে কোনো দেশে এমন ব্যাপার ঘটলেই জমিদার

* কেরামৎ আলি পরে ইংরেজ শাসনে বাস করা মুসলমানদের পক্ষে অধর্ম নয় বলে এক ফতোয়া দেন। কলকাতায় নবাব আবদুল লতিফ তাঁকে এনে এই কাণ্ডটি করান।

শ্রেণী ক্রুদ্ধও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ওয়াহাবি অভ্যুত্থানটা হল শ্রেণীসংঘর্ষের একটা দৃষ্টান্ত; সমাজ তখনো শিল্পপ্রধান হয় নি, তাই ধর্মের আহ্বান ছিল ঐ অভ্যুত্থানের অনুপ্রেরণা। কিন্তু এটা বিশেষ লক্ষ করার ব্যাপার যে বাঙালি মুসলিম ওয়াহাবি নিম্নশ্রেণীর বাঙালি হিন্দুকে তার শ্রেণীশত্রু মনে করে নি, হিন্দু হোক, জমিদার এবং জমিদারের মুরুব্বি ইংরেজ সরকার তার দুশ্‌মন, এ কথাই সে ভেবেছিল।

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে মুসলমানরাই ছিল সরকারের প্রধান শত্রু। শিক্ষিত হিন্দুরা ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরেজের গুণাবলী আয়ত্ত করে, দেশের কুসংস্কারজাল ছিন্ন করে 'ভারতবর্ষের উন্নতি চাইছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা তখনো রাজ্যচ্যুতির লজ্জা ও অভিমানে ইংরেজসংসর্গকেই দূরে পরিহার করছিলেন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বলা যায় যে, ইংরেজ সরকার হিন্দুকেই বন্ধু আর মুসলমানকে শত্রু বলে মনে করছিল। এর স্বপক্ষে সহজেই অনেক সরকারি উক্তি উদ্ধৃত করে দেওয়া চলে।

১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ আমাদের ইতিহাসে একটা বিরাট, অবিস্মরণীয় ঘটনা। এতেও মোটের ওপর মুসলমানদের অংশ হিন্দুদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ মুসলমানদের শায়েস্তা করার জন্য আরো কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিল।

মুসলমান উলেমারা ১৮৫৭ সালে ধুমধাম করে এক 'ফতোয়া' জারি করেন, ইংরেজ হুকুমতকে 'হারাম' বলে ঘোষণা করেন। মুসলিম বিক্ষোভের কারণও ছিল অনেক। মেকলের ভারতীয় দণ্ডবিধি বাহাল হওয়ার পর হতে মুসলিম ফৌজদারী আইন বাতিল হয়ে যায়। আদালতে আর সরকারি দফ্‌তরে ফারসি ভাষা বরবাদ হয়ে পড়ে, 'শরিয়তের' বিধান অনুযায়ী বিচার করার জন্য যে-কাজীরা ছিলেন তাঁরা বরখাস্ত হন। ইংরেজি শিক্ষা তখনো মুসলমানরা গ্রহণ করে নি, সুতরাং পুরানো কেতায় যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদের দুর্দশার সীমা রইল না। সমাজে তাঁদের খাতিরও নষ্ট হতে চলল। এ-অবস্থায় যে মুসলিম অসন্তোষ বেড়ে উঠবে, তা অনিবার্য।

ইতিমধ্যে ওয়াহাবিরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু পাটনায় তাদের নেতারা গ্রেফতার হওয়ায় বিপদ ঘটে। পাটনার ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা যদি গয়া আর শাহাবাদ জেলায় কোঙর সিঙের নেতৃত্বে যে হিন্দুরা বিদ্রোহ চালাচ্ছিল তাদের সঙ্গে হাত মিলাতে পারত, তো তখনকার ইতিহাসই বদলে যেত।

এটাই হল আমাদের ইতিহাসের একটা প্রধান শিক্ষা আর বারবার তা মনে রাখার দরকার রয়েছে--হিন্দু আর মুসলমান একত্র হলেই ইংরেজের দিন ফুরিয়ে যেতে বাধ্য।

১৮৬৩ সালে ইংরেজ আবার ওয়াহাবিদের নিয়ে বিপদে পড়ে। সরকার তখন আন্দোলনের এগারো জন প্রধান নেতাকে গ্রেফতার করে। ১৮৬৪ সালে আম্বালাতে তাঁদের বিচার হয়। এদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন আম্বালার বাসিন্দা, পাঁচজন পাটনার একজন পাবনা জিলায় (এখন নদীয়া) কুমারখালি গ্রামের লোক। ষড়যন্ত্রের নায়ক আহম্‌দউল্লার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই বিচার সম্পর্কে আম্বালার কমিশনার সার হার্বার্ট এড্‌ওয়ার্ডসের কথায় দেখা যায় যে " বহু দিন ধরে সৈয়দ আহ্‌মদের ওয়াহাবি অনুচরেরা বাঙলা দেশের সর্বত্র তাদের জাল ছড়িয়ে রেখেছিল। তাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইস্‌লামের পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা, আর এরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ইংরেজ বিধর্মীশাসন ধ্বংস করা।"

আবার ১৮৬৮ সালে পাটনা, মালদহ আর রাজমহলে ওয়াহাবি নেতাদের বিচার বসে। রাজদ্রোহ সম্পর্কে আমীর খাঁর মামলার কথা সকল আইনের ছাত্র শুনেছে। আমীর খাঁ ছিলেন ওয়াহাবি। বাঙলা পুলিশের 'ডিটেক্‌টিভ' বিভাগের বড়োকর্তা রাইলি-সাহেবকে অনুসন্ধানের জন্য বাঙলা থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়ে ছিল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ওয়াহাবি নেতাদের শাস্তি দেওয়া হয়। মওলানা আকরম খানের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন; মওলানা সাহেবের কাছে শুনেছি যে তাঁর ছেলেবেলায় তিনি পরিবারভুক্ত ওয়াহাবি নেতাদের পায়ে কারাবাসকালীন বেড়ির কালো দাগ দেখেছেন। রাজনৈতিক কারণে তখনই প্রথম ইংরেজ আমলে ১৮১৮ সালের তিন আইন (রেগুলেশন নং ৩) প্রয়োগ করা হয় বাইশ জন ওয়াহাবির বিরুদ্ধে। এ-সব কথা আমরা জানি না বলেই মাঝে মাঝে শুনি যে মুসলমানেরা ইংরেজদের 'সুয়োরানী' হয়ে বরাবরই পেয়ার পেয়ে এসেছে, ইংরেজ তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করার কাজে তাদের তেমন দেখা যায় নি।

১৮৭০ সালের পর ওয়াহাবি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। কেবল ১৮৭১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্মান্‌ এবং ১৮৭২ সালে বড়োলাট লর্ড মেয়োকে যারা খুন করে, তাদের ওয়াহাবি বলে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু এই সময় থেকে ইংরেজ সরকার স্থির করে যে এবার মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের ইংরেজবিদ্বেষ খানিকটা প্রশমিত করতে হবে। সার সৈয়দ আহ্‌মদের মতো মুসলমান নেতাও তখন মনে করলেন যে ইংরেজি কেতায় শিক্ষাদীক্ষা না পেলে মুসলমানরা হিন্দুদের পিছনে পড়ে থাকবে, মাঝে মাঝে ওয়াহাবি ধরনের অভ্যুত্থানে কোনো ফায়দা হবে না। ইংরেজও যে এই সময় পাকা মতলব করে মুসলমানকে স্তোক দিতে আরম্ভ করল, তা হান্টারের বই এবং অন্যান্য সমসাময়িক কাগজপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

কিন্তু বাঙলা দেশে ওয়াহাবি বিদ্রোহের রেশ তখনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি। ১৮৭১-৭৫ সালে পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় কৃষকদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দেয়। পাবনায় তারা নিজেদের নাম দেয় "বিদ্রোহী", "সমিতি"ও তখন তারা গঠন করে। ১৮৭১-৭২ সালে বাঙলা দেশের শাসনবিবরণ ("Administration Report ") থেকে জানা যায় যে বিক্ষুব্ধ কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল মুসলমান আর তারা পুরানো 'ফরাজি'দের মতো জমি সম্পর্কে এমন দাবি পেশ করছে যা রীতিমত চিন্তার বিষয় ("not without some elements of political anxiety")। ১৮৮৫ সালে বাংলা দেশের প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন হয় তা সরকারের অনুগ্রহে ঘটে নি, চাষীদের লড়াইয়ের ফলেই ঘটেছিল।

মুসলমানের ধর্মনিষ্ঠা যে তখন শাসনকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র উপজীব্য ছিল তা নয়। আমরা দেখেছি যে ধর্মনিষ্ঠার চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করার আগ্রহই আন্দোলনকে ব্যাপক করে তুলেছিল। কিন্তু এ ছাড়াও তখন দেশের নানা স্থানে সাধারণ লোক সরকারকে বরবাদ করার জন্য ব্যগ্র হয়েছিল। ১৮৩১ সালে ছোটোনাগপুরে কোলদের বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬১ সালে বাংলার অনেকখানি জুড়ে নীলকুঠিওয়ালাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ১৮৫২ সালে দাক্ষিণাত্যে গণ্ডগোল আর ১৮৭৪-৭৫ সালে সেখানকার কৃষক-বিদ্রোহ—এগুলোকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো চলে। আমরা অনেকেই

জানি যে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস স্থাপনা ব্যাপারে ইংরেজের যথেষ্ট কারসাজি ছিল; সে-কারসাজি অবশ্য ধোপে টিকল না, কংগ্রেস মারফত জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিকে ঠেকাতে পারল না, কিন্তু তখন দেশের সর্বত্র নিদারুণ অসন্তোষ এমন ভাবে ছিল যে হিউম্-সাহেব তার দলিল-দস্তাবেজ দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন আর বড়োলাট ডাফ্‌রিনের সঙ্গে পরামর্শ করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। দেশের যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁরা যদি জনসাধারণের অভাব অভিযোগ নিয়ে মাঝে মাঝে ঘটা করে বক্তৃতার জাল বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে আত্মসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন তো দেশের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে আন্দোলনের নির্দেশ দেবার মতো বড়ো কেউ থাকবে না—এই ছিল সরকারের হিসাব। আর সে হিসাব যে সম্পূর্ণ নাকচ হয়েছিল, তাও নয়।

যাই হোক্, ওয়াহাবি আন্দোলন এবং তার আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলির সঙ্গে পরিচয় হলে আমরা বুঝব যে এদেশের মুসলমান তখন প্রধানত মুসলমান হিসাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে সরকারের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছে, আর ধর্মবহির্ভূত অর্থনৈতিক কারণে তাদের সন্তোষ পুষ্ট হয়েছিল বলে কিছু কিছু অমুসলমানও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বর্তমান কালের জাতীয় আন্দোলনের মাপকাঠিতে বিচার করলে তাদের কার্যক্রমে গলদ ছিল অনেক, কিন্তু তখনকার দিনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনও ঐ প্রকার আদিম রূপ পরিগ্রহ না করে পারত না। প্রথমত মুসলমান হিসাবেই মুসলমান রুষ্ট হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছে, লড়তে গিয়ে সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে হাত মিলানোও তার পক্ষে অনিবার্য হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমরা এখনো এদেশে এতটা অগ্রসর হতে পারিনি যাতে বলতে পারি যে ও-ধরনের ঘটনা হল নিছক মধ্যযুগীয় ব্যাপার, এখন আমরা মুসলমান বা হিন্দু হিসাবে চিন্তাই করি না; পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে এখনো আমরা অনেকটা ঐ ভাবেই চিন্তা করি।

হয়তো অভিযোগ করা হবে যে এ-কথা বলা হল আমাদের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসকেই অগ্রাহ্য করা। কিন্তু সে অভিযোগ ভিত্তিহীন। কংগ্রেসের প্রথম যুগে মুসলমানরা যে হিন্দুদের মতো উৎসাহ নিয়ে যোগ দেয় নি, তা অস্বীকার করা চলে না। ১৮৮৭ সালে তৃতীয় কংগ্রেসের (মাদ্রাজ) সভাপতি বদরুদ্দিন তৈয়বজী মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন; ১৮৯৬ সালের সভাপতি রহিমতুল্লা সায়ানি তাঁর অভিভাষণের মধ্যে অনেকটা জায়গা ধরে মুসলমানদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে কংগ্রেস থেকে দূরে থাকা তাদের পক্ষে ঠিক নয়। লক্ষ করার বিষয় যে এই দুই দেশনেতাই মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য ও জাত্যভিমান ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেন। এরপর কংগ্রেসের তৃতীয় মুসলমান সভাপতি হন নবাব সৈয়দ মহম্মদ ১৯১৩ সালে। কিন্তু ততদিনে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান মিলে একত্র আন্দোলন করার ক্ষেত্র তখন প্রস্তুত হয়েছিল। আবার তখন মুসলমান হিসাবেই মুসলমানের মন মাতোয়ারা হয়েছিল বলে একত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচেষ্টায় নামা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মুসলমান মুসলমানত্বের গণ্ডি কাটাতে পারে না বা চায় না বলে হিন্দু যদি আত্মশ্লাঘা করতে যায় তো সেটাও হবে ইতিহাস অস্বীকার করার সামিল। স্বদেশি যুগে বাঙালি আর মারাঠা দেশভক্তের দল্ ইংরেজ শাসনকে শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল, জাতি বোধ তখন জাগ্রত। "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি—তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে

জননী!"—বলে রবীন্দ্রনাথ সেদিনের তেজোদীপ্ত আবির্ভাবের আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু স্বদেশি যুগের মর্মস্পর্শী আবেগে ও কর্মকাণ্ডে হিন্দুত্বের ছাপ যে সুস্পষ্ট ছিল তা মানতেই হবে। ভবানীপূজা, বীরাষ্টমী, গণপতি উৎসব, গঙ্গাস্নানের পর রাখীবন্ধন ইত্যাদি ছিল তখনকার আনন্দ ও অনুপ্রেরণা। এমন কি মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে যে স্বাদেশিকতা জেগে উঠেছিল, গো-রক্ষা ও প্লেগের টিকা গ্রহণে ধর্মগত আপত্তি নিয়ে যার পত্তন, সেই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তন হল। "এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি"—শিবাজীর এ-কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ "রাজতপস্বী বীরকে" প্রণতি জানালেন। মুসলমান বাঙালি হলেও তার মন কবির প্রশাস্তিকে গ্রহণ করতে পারল না। জাতীয় আন্দোলনকে হিন্দু ভাবধারার প্রাধান্য তখন সত্যই ওতপ্রোত করে রেখেছিল। সন্ত্রাসবাদীরা তখন কালীপ্রতীমার পদস্পর্শ করে দেশসেবার শপথ নিত, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এর কারণ হল মানুষের পক্ষে অতীত গৌরব ও আদর্শের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন। ঐতিহ্যসমৃদ্ধ না হলে ব্যাপক আন্দোলনের আবেদন সফল হতে পারে না।

স্বদেশি আন্দোলনে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মুসলমান অবশ্য ছিলেন, কিন্তু মোটের উপর বাংলার মুসলমান তাতে যোগ দেয় নি। অবশ্য এটাই ছিল ইংরেজের মতলব, হিন্দু আর মুসলমানের পরস্পরসম্বন্ধকে বিষাক্ত করতে পারলে তাদেরই কেল্লা ফতে। কিন্তু মুসলমান দূর থেকে ঐ আন্দোলনের তারিফ করেছিল, কেবল হিন্দুদের মতো তাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী তখনো আন্দোলনে নামতে তৈয়ার ছিল না বলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি। বড়োলাট মিন্টো অনেক কল টিপে ১লা অক্টোবর, ১৯০৬, তারিখে এক মুসলিম প্রতিনিধিদলকে সিমলায় লাটসদনে হাজির করেছিলেন, মুসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজন বলে দরখাস্ত লাটের কাছে পেশ হয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিনিধিদলের নেতা আগা খাঁ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে যারা অল্পবয়স্ক তাদের মধ্যে এমন মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে যে কোনো কোনো অবস্থায় তাদের রাশ টেনে রাখা আর চলবে না ("beyond the control of temperate counsel and sober guidance")।

১৯০৬ সালের শেষ দিকে ঢাকাতে মুস্‌লিম লীগের পত্তন হয়। এতে অবশ্যই ইংরেজ সরকারের হাত ছিল। কিন্তু তাই বলে মুস্‌লিম রাজনীতির প্রতি কটাক্ষ করা দেশভক্তের কাজ হবে না। ১৮৫৫ সালে কংগ্রেস স্থাপনায়ও ডাফ্‌রিন, হিউম প্রভৃতির কারসাজি কম ছিল না। কংগ্রেসের প্রথম যুগে যেমন নরম সুরে আবেদন আর 'নিবেদনের থালা' বয়ে প্রস্তাব পাস করা হত মুসলিম লীগেরও বেলায় হল তাই। কংগ্রেসেরও বিবর্তন যেমন পরে হতে লাগল, লীগেরও অনেকটা তেমনই হল।

১৯০৬ সালে কলকাতা-কংগ্রেস যখন বসে, তখন স্বদেশি আন্দোলনের তেজ খুবই বেশি। তখন নরমপন্থী গরমপন্থীদের মধ্যে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হয় যে কংগ্রেসের লক্ষ হল 'ইংরেজের স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশসমূহে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা" ("the system of government obtaining in the self-governing British colonies")। এর সাত বছর পরে লীগও সাহস করে বলল যে তার লক্ষ হল "ভারতবর্ষের অবস্থানুযায়ী স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা" (the attainment of the system of self-government suitable

to India")। প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের পথে তখন হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষই খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল।

কিন্তু এ-সময় মুসলমানদের অগ্রগতির কারণ শুধু হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যাল্প একটি মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিছক মুসলমান জনসাধারণও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল বলেই ঐ মধ্যবিত্তদের পক্ষে জাতীয় আন্দোলনে নামা সম্ভব হল। বঙ্গভঙ্গ বাহাল করে ইংরেজ যে মুসলমানের দোস্ত সেজেছিল, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর সে-ভোল্ আর টিক্‌ল না। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান দেশগুলোর সম্পর্কে কূটনীতিও মুসলমানকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। ১৯০৭ সালে ইংরেজ আর রুশ সাম্রাজ্যবাদীরা পারস্যদেশের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের যে-চক্রান্ত করল তা ভারতীয় মুসলমানকে বিক্ষুব্ধ করল। পাঁচ বছর বাদে ইতালি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপলি দখল করায় এবং বলকান্-যুদ্ধে তুর্কী রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপল পর্যন্ত ধাওয়া করায় সব দেশের মুসলমান ইয়োরোপের সাম্রাজ্যলোভী শক্তিগুলোর উপর খাপ্পা হয়ে উঠল। এমনই তো ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে সাম্রাজ্যবাদী শাসন সম্পর্কে অন্য সবায়ের মতো হাজার অসন্তোষ জমে ছিল। আর এখন মুসলমান হিসাবে বিচলিত হয়ে উঠে তারা একটা কিছু করার জন্য তৈয়ার হতে পারল।

বলকান্-যুদ্ধের সময় মুসলমান এ-দেশে চাঁদা তুলে ডক্টর আন্সারীর নেতৃত্বে একটি চিকিৎসা-'মিশন' তুরস্কে পাঠায়। ডক্টর আন্সারী পরে কংগ্রেস ও খেলাফৎ আন্দোলনের একজন মস্ত নেতা হয়েছিলেন, ১৯২৭ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন ১৯১২ সালে লাহোরে "জমিদার" পত্রিকার সম্পাদক জাফর আলি খান (ইনি পরে কংগ্রেস ও খেলাফৎ নেতা হন, এখন লীগে আছেন) কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য করেন। ১৯১৩ সালে রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ ছাপার অপরাধে "জমিদার" পত্রিকার আমানত বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে তুর্কির রাজদূত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ লাহোরের বাদ্‌শাহী মস্‌জিদে একটি জাজিম উপহার আনেন; কিছুদিন পরে 'রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটির' দুজন তুর্কী ডাক্তার এ-দেশে আসেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ যখন বাধে, তখন ইংরেজ তুর্কীর বিরুদ্ধে বলে ভারতীয় মুসলমান রুষ্ট হয়েছিল।

মুসলমানের এ-মনোভাব 'প্যান্-ইসলাম' দোষদুষ্ট এবং জাতীয়তার পরিপন্থী মনে করা সহজ, কিন্তু ভুল। 'প্যান্-ইসলামী' গন্ধ যে এ-আন্দোলনে ছিল না, তা নয়। কিন্তু বাস্তবিকই এ-আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা এবং বিশেষত ইংরেজ যে ইসলামকে ছেড়ে কথা বলছে না, এটা বুঝে ভারতীয় মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধ প্রখর হয়ে উঠল। শিব্‌লি, এক্‌বাল প্রভৃতি মুসলিম মনীষী অসন্তোষকে তখন ভাষারূপ দিয়েছিলেন। নির্জলা রাজনীতির ভাষায় লিখলেন মহাপণ্ডিত বলে খ্যাত যুবক আবুল কালাম আজাদ তাঁর "অল্ হিলাল্" পত্রিকায়, জাফর আলী খান "জমিদার" পত্রিকায়, আর বহুপ্রসিদ্ধ মুহম্মদ আলী ইংরেজি "কমরেড" ও উর্দু "হমর্দদ" পত্রিকায়।

১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে ভারতব্যাপী অসন্তোষ এবং বিশেষত বাংলা ও পাঞ্জাবে ইংরেজ বিদূরণের প্রাণপণ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এ-যুগেই বালেশ্বরের কাছে খণ্ডযুদ্ধে "বাঘা" যতীন প্রাণ দেন. আমেরিকা-ফেরৎ "গদর" পার্টির শিখ দেশভক্তেরা সরকারকে চিন্তাকুল করে তোলেন। এ-যুগেই জার্মান ও তুর্কিদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ইংরেজ শাসনকে চূর্ণ করার জন্য মহেন্দ্র প্রতাপ, হরদয়াল, বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা সিন্ধী প্রভৃতি উদ্যোগ

করতে থাকেন, স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটা অস্থায়ী সরকার পর্যন্ত তখন জার্মানদের আনুকূল্যে খাড়া করা হয়। কিন্তু এযুগে দেশ স্বাধীন করার একটা স্বতন্ত্র মুসলমান প্রচেষ্টাও হয়েছিল। যে-ওয়াহাবিদের কথা প্রায় সকলে ভুলে এসেছিল, তারা ১৯১৫ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটা খণ্ডযুদ্ধ চালায়। ১৯১৭ সালের প্রথমে রংপুর ও ঢাকা থেকে কয়েকজন বাঙালি মুসলমান টাকা নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে "রেশমীচিঠি' ষড়যন্ত্র বলে এক ব্যাপার সরকারের কানে ওঠে। ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তে আক্রমণ আর সঙ্গে সঙ্গে দেশময় মুসলিম-বিদ্রোহ। দেওবন্দে মুসলমানদের যে-বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম-শিক্ষাকেন্দ্র আছে, তার অধ্যক্ষ, আবুল কালাম আজাদের গুরুস্বরূপ, শেখ-উল্-হিন্দ্ মওলানা মহ্মুদ হাসান দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে হেজাজ্ থেকে এই ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছিলেন। তিনি ১৯১৬ সালে ওবেদুল্লার কাছে "গালিবনামা" বলে এক ঘোষণাপত্র পাঠান, তাতে হেজাজের তুর্কী শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ আহ্বান করেন। এ-ব্যাপার বেশি এগোবার পূর্বেই 'শেখ্-উল্-হিন্দ্' ইংরেজদের হাতে আটক পড়েন। দেশের মধ্যে মুসলমানদের যাঁরা সব চেয়ে তেজস্বী নেতা, ইংরেজ তাঁদের সবাইকে, অর্থাৎ মুহম্মদ আলী, শওকৎ আলী, আবুল কালাম আজাদ, হসরৎ মোহানী, হুসেন আহ্মদ, জাফর আলী খান প্রভৃতিকে অন্তরীণ করে রাখে।

তুর্কীর ব্যাপার নিয়ে মাথাব্যথা নিতান্তই একটা চিত্তবিকার, এই সিদ্ধান্তে যদি কেউ সন্তুষ্ট হতে পারেন তো উপায় নেই। খাস কংগ্রেসের সভাপতি-আসন থেকে ১৯১৩ সালে নবাব সৈয়দ মুহম্মদ বললেন যে "বলকান-যুদ্ধে তুর্কীর হারে সারা দুনিয়ার মুস্লিম নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর ফলে মুস্লিমরা পরস্পরের এত কাছাকাছি এসেছে যা অন্য উপায়ে সম্ভব হত না।" ইংরেজ সম্পর্কে হিন্দু মুসলমান কারোই তখন মতভেদ তেমন ছিল্ না। তাই কংগ্রেস আর লীগ ক্রমে হাত মিলাতে পারল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে হিন্দু-মুস্লিম চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেল, আর মিলন শুধু কংগ্রেসে-লীগে হল না, ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের পর গরমপন্থী নরমপন্থীর যে-বিভেদ কংগ্রেসে প্রকট হয়েছিল, সে-বিভেদও নতুন আবহাওয়ার গুণে সেরে গেল।

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে ডায়ার-ওডায়ারের দল পাঞ্জাবে যে অকথ্য অত্যাচারের নমুনা দেখাল আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ও বে-সরকারি শ্বেতাঙ্গেরা যেমন করে তাদের কুকীর্তির দোষক্ষালন করতে লাগল, তাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অসহ্য জঘন্যতা সম্বন্ধে দেশবাসীর আর সন্দেহ থাকতে পারল না। অপর দিকে ভের্সাই ও সেভর সন্ধিতে তুর্কীয় খালিফার দুরবস্থা ঘটতে দেখে মুসলমানরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বার আর একটা বড়ো কারণ খুঁজে পেল। ১৯১৯ সালে মুহম্মদ আলী ও শওকৎ আলী আটক থেকে ছাড়া পেলেন; দু'বছর আগে একবার সরকার তাঁদের খালাস দিতে চায় শুধু যদি তাঁরা ইংরেজ রাজার শত্রুপক্ষে সাহায্য করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু আলীভ্রাতৃদ্বয় বলেন যে 'ইসলামের প্রতি আমাদের আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে" ("Without prejudice to our allegiance to Islam") এই কটি কথা তাঁরা যোগ করে দেবেন। বলা বাহুল্য, সরকার তাতে রাজি হয় নি। মুহম্মদ আলী এবার খেলাফৎ কমিটির নেতা হলেন, বড়ো বড়ো ওলেমা-মওলানারা এতে ছিলেন; ১৯২০ সালের গোড়ায় খেলাফৎ কমিটির বিখ্যাত ইশ্তেহার প্রকাশ হল, গান্ধীজী তার সমর্থন করলেন। আবুল কালাম আজাদ এবার বেরিয়ে এসে গান্ধীজীর

সঙ্গে অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব খাড়া করলেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব গান্ধীজীর উদ্যোগে গৃহীত হয়, কিন্তু তার পূর্বেই মে-মাসে গান্ধীজী স্বয়ং খেলাফৎ সম্মেলনে হাজির হয়ে ঐ প্রস্তাব সারা দেশের সামনে রাখার কথা বলেন, সম্মেলন প্রস্তাবটি সোৎসাহে গ্রহণ করে। অক্টোবর মাসে মুহম্মদ আলী কয়েকজন মুসলমান নেতা এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে নিয়ে বিলাত যান, খেলাফৎ সমস্যার সমাধান যাতে মুসলমানের মনোমত হয় সেই চেষ্টায়। বিলাতযাত্রা নিষ্ফল হল, আর ফিরে এসে হিন্দু-মুসলমান গান্ধীজীর ডাকে প্রতিজ্ঞা নিল যে খলিফার প্রতি অবিচার রোধ করার জন্য, পাঞ্জাবের অনাচারের বিহিত ব্যবস্থার জন্য এবং স্বরাজ লাভের জন্য অহিংস অসহযোগের পথে সংগ্রাম করতে হবে। ১৯২০ সালে বিদেশী, বিধর্মী শাসনের যন্ত্রণা এড়াবার জন্য ১৮,০০০ মুসলমান 'মুহজরিন' হয়ে দেশত্যাগ করল, কিন্তু মিলিটারির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হল, আফগান সরকার তাদের পথরোধ করল, কেউ কেউ পালিয়ে গেল সোভিয়েট মুলুকে, আর অধিকাংশ অবসন্ন মনে ফিরে এল ভারতবর্ষে। এ-দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই এ-দেশের মাটির ওপরই করতে হবে তা তারা বুঝল।

'খেলাফৎ, পাঞ্জাব, স্বরাজ'—এই তিন ডাকে দেশের হিন্দু-মুসলমান তখন মাতোয়ারা, তাই ১৯২০-২১ সাল আমাদের ইতিহাসে এত স্মরণীয়। নাগপুর কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতারা গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন, "শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজলাভ" কংগ্রেসের লক্ষ বলে ঘোষিত হল, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাইরে যাওয়া পূর্বে যে-কল্পনার অতীত ছিল, সে-অবস্থার অবসান ঘটল। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অদ্ভুত সম্প্রীতি দেখা দিয়েছিল তার তুলনা কখনো দেখা যায় নি। খেলাফৎ নিয়ে মুসলমানের দুশ্চিন্তার ভার হিন্দুর মাথায় তুলে নিয়েছিল গান্ধীজীর আহ্বানে। হিন্দু-মুসলমানদের বন্ধুত্বকে অটল করতে হলে এমন সুযোগ আর একশো বছরের মধ্যে আসবে না, তিনি বলেছিলেন। দেশও তাঁর নির্দেশে বুক ফুলিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যদর্পীদের মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিল। মুসলমানের হৃদয় স্পর্শ করতে পারা গেছল বলে সে-দিন আমাদের জাতীয় আন্দোলন অমন অপূর্ব ভাস্বর রূপে দেখা দিয়েছিল।

আন্দোলনকে আবার রাশ টেনে বাঁধলেন গান্ধীজী, ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরীচৌরা হাঙ্গামার পর। তখন থেকে আবার দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। সকলেরই মনে নৈরাশ্য, আর সেই নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার একটা রাস্তা খুঁজতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহ্রু প্রভৃতি 'স্বরাজ্যদল' গঠন করে কাউন্সিলে ঢুকলেন।

১৯২১ সালের অদ্ভুত উন্মাদনা নিভে যাওয়ার পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার যেন পুরানো সন্দেহের যুগ ফিরে এল। অবশ্য সাম্প্রদায়িক মৈত্রী যখন প্রায় অটুট বলে মনে হচ্ছিল, তখনই মাঝে মাঝে দু'য়েকটা খারাপ সংকেত দেখা দিত। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২০, তারিখের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় গান্ধীজী লেখেন যে সভাসমিতিতে হিন্দু আর মুসলমান যেন রেষারেষি করে "বন্দেমাতরম্" কিংবা "আল্লা-হো-আকবর" রব তোলে, অথচ রব তুলতে হলে সকলেরই সমান অনুরাগ ও আবেগ নিয়ে তা করা উচিত। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে মালাবারে মুসলমান মোপালারা যখন বিদ্রোহ করে তখন সেখানকার হিন্দুদেরও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ঘটেছিল। কিন্তু হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের কাহিনী অতিরঞ্জিত বলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অভিমত দেওয়ার পরও অনেকে মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব

ভাবতে আরম্ভ করল। যে-স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লীর মুসলমানরা ১৯১৯ সালে জুম্মা মসজেদের তখত থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল, সেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমানদের প্রকৃতি সম্বন্ধেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। স্বামীজীকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটতে লাগল, আর ১৯২৬ সালে একজন ধর্মান্ধ মুসলমানের হাতে শ্রদ্ধানন্দ প্রাণ দিলেন। একদিন যিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন, পরে তিনিই হলেন মুসলমানদের চক্ষুশূল। মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁরই মত হল অত্যন্ত কঠোর—এটা যেন আমাদের ইতিহাসেরই পরিহাস।

তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে ক্রমে খালিফাকেই সরিয়ে দেওয়া হল, সুতরাং এদেশে খেলাফৎ আন্দোলনের আর বিশেষ কোনো তাৎপর্য রইল না। মুসলমানদের মনে যে-উদ্দীপনা জেগেছিল সেটা নির্বাপিত হয়ে এল। আর পরাধীন দেশের রাজনীতি যখন কেবল নিয়মানুবর্তী রাস্তায় চলে, তখন চাকরি-বাকরি নিয়ে কামড়াকামড়ি হল হিন্দু আর মুসলমান শিক্ষিতদের প্রধান কাজ। তাই ১৯২৩ সাল থেকে দেশের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে লাগল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' নিয়ে ব্যস্ত হলেন, ডক্টর কিচলু প্রভৃতিও প্রত্যুত্তরে 'তাঞ্জিম' ও 'তবলিঘ' নিয়ে ব্যস্ত হলেন। সাম্প্রদায়িক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বারবার ঐক্য সম্মেলন বসল, কিন্তু কোনো ফল হল না।

বাংলায় হিন্দু-মুসলমানকে একজোট করার চেষ্টাকে প্রায় সফল করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের চাপে বাংলা-কংগ্রেস তাঁর হাতে বানানো 'চুক্তি' পাস করলেও ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ-কংগ্রেসে ভোটাধিক্যে চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থা এবং সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের অনুপাতের বাঁধা হারে চিত্তরঞ্জন রাজি হয়েছিলেন। মুসলমানদের চিত্ত জয় করেছিলেন বলে তাঁর ঐক্যবদ্ধ স্বরাজ্য পার্টি বাংলাদেশে আইন পরিষদকেই বাতিল করে দিতে পেরেছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস তাঁর কাজকে সমর্থন করল না। আর লালা লাজপৎ রায় ও ডাক্তার আন্সারীকে সর্বভারতীয় হিন্দু-মুসলিম চুক্তি খাড়া করার ভার দেওয়া হলেও তাঁরা কিছুকাল পরে জানালেন যে কোনো রকম চুক্তি স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মন-ভাঙাভাঙি তখন থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে; ১৯২৭-২৮ সালে হিন্দু প্রধান স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলে প্রজাস্বত্ব আইনং সংশোধনকালে জমিদারের পক্ষে ও প্রজাদের বিপক্ষে কথা বলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান পার্থক্যকে আরও কটু করে তুলল।

১৯২৭-২৮ সালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যখন সাদা-চামড়া সাইমন কমিশনকে দিয়ে এদেশের ভাগ্যনির্ণয় করতে গেল, তখন ঘরোয়া মনোমালিন্য ভুলে হিন্দু-মুসলমান আবার এক হওয়ার চেষ্টা করল, কংগ্রেসের মতো মুস্‌লিম লীগও (পাঞ্জাবের কয়েকজন খয়ের খাঁ বাদে) কমিশনকে বয়কট করল, কংগ্রেস থেকে সর্বদলীয় কমিটি (মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে) নিয়োগ করা হল নতুন শাসন ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করার জন্য। ১৯২৮ সালের শেষে কলকাতা-কংগ্রেসের সময় নেহরু রিপোর্ট আলোচিত হল সর্বদলীয় বৈঠকে। এখানে মুস্‌লিম পক্ষ থেকে জিন্না সাহেব জানান যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি যুক্ত ('Joint') নির্বাচন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান চায় স্বতন্ত্র নির্বাচন-কেন্দ্র; তাই নেহরু রিপোর্টের সংশোধন হিসাবে তিনি প্রস্তাব করেন যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের অনুপাত হোক্ শতকরা ৩৩ $\frac{১}{৩}$ (রিপোর্টে অনুপাত ছিল ২৫), বাংলা ও পাঞ্জাবে লোকসংখ্যার

অনুপাতে মুসলমানদের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট হোক্ (অর্থাৎ অধিকাংশ আসন মুসলমানরা পাক), সিন্ধু-প্রদেশকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হোক এবং রাষ্ট্রবিধিতে অনুলিখিত অধিকার-সমূহ ("Residuary powers") কেন্দ্রের পরিবর্তে প্রদেশগুলিকে দেওয়া হোক।

নেহ্‌রু রিপোর্টের পক্ষে যে মুসলমান কেউই ছিলেন না, এ কথা বলা চলে না, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ঐ রিপোর্টের সামান্য সংশোধনই চেয়েছিলেন। সাইমন কমিশন বয়কটে জিন্না সাহেব ছিলেন অগ্রণী। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে জিন্না সাহেব ইংরেজের হাতে কলের পুতুল মাত্র। কিন্তু ভুললে চলবে না যে ১৯০৬ সালে বড়োলাটের কাছে মুস্‌লিম ডেপুটেশনে ১৯২১ সালের কংগ্রেস-সভাপতি হাকিম আজমল খান যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু জিন্না সাহেব যোগ দিতে গররাজি হয়েছিলেন; ১৯১৩ সাল পর্যন্ত জিন্না সাহেব মুস্‌লিম লীগেই যোগ দেননি; ১৯১৯ সালে তিনি পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে জাতীয়তাবাদী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, মুসলমানদের কোনো কোনো সাম্প্রদায়িক দাবির তিনি বিরোধিতা করেন; ১৯২০ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন, শুধু অসহযোগ নিয়ে মতান্তরের দরুন তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের অগ্রদূত বলে বর্ণনা করেন, এখনো বোম্বাইয়ে 'জিন্না হল্' এই খ্যাতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। কংগ্রেসকে মাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান তিনি বলেন নি এই মর্মে ১৯২৫ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি 'টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া'তে পত্র লেখেন; ১৯২৫ ও ১৯২৮-এ যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু-মুস্‌লিম চুক্তির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন; ১৯২৮-এ তিনি সাইমন বয়কটে কংগ্রেসের সঙ্গে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন। জিন্না সাহেবের পক্ষে ওকালতির এখানে প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিন্না সাহেবের অতি বড়ো শত্রুও কখনো বলেনি যে তিনি মোটা চাকরিতে গদিয়ান্ হওয়ার মোহে মুগ্ধ বলে লীগ রাজনীতিকে একদিকে চালাচ্ছেন। আজ এককালকার 'হিন্দু-মুস্‌লিম ঐক্যের অগ্রদূত' হলেন হিন্দু-মুস্‌লিম স্বাতন্ত্র্যের সব চেয়ে মারাত্মক প্রচারক, এর কারণ না খুঁজে জিন্না সাহেবকে গালাগাল দেওয়া শুধু যে শ্লীলতাবিরুদ্ধ তা নয়, দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কে তা হলে জেনে শুনেই চোখ বুজে থাকা হয়।

১৯২৩ সালের পর থেকে ক্রমাগত ঐক্যসম্মেলন হয়েছে, যাঁদের দেশপ্রেম নিঃসন্দিগ্ধ এমন হিন্দু ও মুসলিম নেতা একত্র হয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ফল হয় নি। আর ১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে বারবার মুস্‌লিমদের যে-দাবি কিছুতেই গ্রাহ্য নয় মনে হয়েছে আজ মুস্‌লিমদের দাবির বহর দেখে মনে হয় যে সে-দাবি তো ছিল অতি তুচ্ছ। ১৯২৮-এ কলকাতায় কংগ্রেসের পাশাপাশি হয়েছিল খেলাফৎ কনফারেন্স, সভাপতি ছিলেন কংগ্রেসের একসময়কার বিরাট নেতা মওলানা মুহম্মদ আলী। বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে বলেন : "শাসনতন্ত্র ব্যাপারে আপনারা প্রতিদিন মিথ্যা, নীতিবিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত ধারণার সঙ্গে আপোস করেন। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন-কেন্দ্র আর স্থিরীকৃত আসন 'সাম্প্রদায়িক দাবি' বলে আপনারা সে বিষয়ে কোনো মিটমাট করবেন না। দেশের লোকসংখ্যায় আমরা হলাম শতকরা ২৫, কিন্তু আপনারা কিছুতেই আমাদের শতকরা ৩৩ হারে আইনসভায় আসন দেবেন না। আপনারা ইহুদী, আপনারা বেনে।" মুসলমানদের মধ্যে বামপন্থী যাঁরা, তাঁরা অনেকে বলতে লাগলেন যে হিন্দুরা কংগ্রেসে আধিপত্য করে বটে, কিন্তু পূর্ণ স্বরাজ তারা চান না। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয় যে ১৯২১ সালে আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসে স্বাধীনতা সম্পর্কে মওলানা হসরৎ মোহানীর প্রস্তাব গান্ধীজীর বিরোধিতার দরুন অগ্রাহ্য হয়ে যায়। ১৯৪২ সালে বেলগাঁও

কংগ্রেসে সভাপতি গান্ধীজী ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করার বিপক্ষে মত দেন। ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করার সময় 'ডোমিনিয়ন স্টেটসের' ''আধ্যাত্মিক গুরুত্ব'' ও স্বাধীনতার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন, ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ প্রচার করা সত্ত্বেও ১৯২৮-এ নেহরু রিপোর্টে 'ডোমিনিয়ন স্টেটসের' ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের খসড়া করা হয়। আর ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজী ওকালতি করে কংগ্রেসকে আরো এক বছর ইংরেজকে সময় দিতে রাজি করান। অপর পক্ষে বলা হল যে ১৯২৮-এ যুক্তপ্রদেশে মুসলমানদের এক সর্বদলীয় সম্মেলনেও ''প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র'' এবং ''পূর্ণ স্বাধীনতার'' লক্ষ প্রচার করা হয় এবং এক খান বাহাদুর যখন আপত্তি করেন তখন পর্দা 'গ্যালারি' থেকে মুসলিম মেয়েরা চিঠি লিখে পাঠান যে, পুরুষেরা পিছপাও হলে মেয়েরা তাদের জায়গা নিতে প্রস্তুত।

অবশ্য হিন্দুরা চায় 'ডোমিনিয়ন স্টেটস্' আর মুসলমানেরা চায় 'পূর্ণস্বাধীনতা,' শুধু এ-কথা বলা ছেলেমানুষি। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটা প্রভেদ আছে, এ-ধারণাটি পুষ্ট হচ্ছিল। রাজনীতি ব্যাপারে নিষ্কর্মা হয়ে থাবার লক্ষণ যতদিন ছিল ততদিন সে-ধারণা বেশ বেড়ে উঠল। ১৯২৯ সালে জিন্না সাহেব তাঁর চৌদ্দ দফা দাবি ('Fourteen Points') পেশ করলেন; আজ সেগুলো পড়লে মনে হয় অতি সামান্য। কেন যে তা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল ভেবে ওঠা শক্ত। গান্ধীজী বলেছিলেন তিনি জিন্না সাহেবকে 'শাদা চেক্' দিতে রাজি, কিন্তু তা সত্ত্বেও চৌদ্দ দফা নিয়ে যখন দরকষাকষি হল, তখন জিন্না সাহেব বললেন 'চেক্' গান্ধীজীর কাছেই থাক, বার বার সাদা 'চেকের' কথা বলে চৌদ্দ দফা দাবিকে চাপা দেওয়া হচ্ছে মাত্র।' দু'পক্ষের ঝগড়া আরো পেকে উঠল।

১৯৩০-৩২ সালে দেশব্যাপী আন্দোলন চলল বলে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়ার কথা জনসাধারণ প্রায় ভুলতে পারল। কিন্তু মুস্‌লিমরা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দিলেও ১৯২০-২১ সালের পুনরাবৃত্তি ঠিক ঘটল না। এটা বোঝা গেল বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে। গান্ধীজী হাজির থেকেও হিন্দু আর মুস্‌লিম মিলল না, তুচ্ছ কারণে গোলযোগ টিকে রইল, আবুল কালাম আজাদের ভাষায় বলা যায় : ''মুস্‌লিমদের পক্ষে বিশেষ অধিকার চাওয়া হল মূর্খামি, আর তেমনই মূর্খামি হল হিন্দুদের পক্ষে সে-দাবি অস্বীকার করা।'' ইংরেজ সরকার আমাদের ওপর চাপাল 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড'; হিন্দুদের মধ্যে প্রায় সকলেই চাইলেন এই সরকারি সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করতে, কিন্তু ডাক্তার আন্সারী, চৌধুরী খলীকুজ্জামান প্রভৃতি কংগ্রেসী-মুসলমান জানিয়ে দিলেন যে নিজেদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক মিটমাট না করে ঐ সিদ্ধান্তকে বরবাদ করা হলে তাঁদের পক্ষে কংগ্রেসে থাকা সম্ভব হবে না। 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের' কল্যাণে হিন্দু-মুস্‌লিম সম্পর্ক আরো বিষাক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু আর মুস্‌লিম নেতারা একযোগে দরখাস্ত করেই সরকারকে ঐ নিদারুণ সিদ্ধান্ত চালু করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এতে ইংরেজের কারসাজি আছে যথেষ্ট, কিন্তু তাদের কারসাজির ফাঁদে পা দেবার জন্য আমরা এগিয়ে ছিলাম কেন?

১৯৩৭ সালে নতুন কানুন অনুসারে নির্বাচন হল। মুসলিম লীগ তখনো সংগঠন হিসাবে তেমন জোরদার নয়। কিন্তু অধিকাংশ মুস্‌লিম আসনে কংগ্রেসমনোনীত মুসলমান নির্বাচনপ্রার্থী হলেন না, ৪৮২-টি মুসলমান আসনের মধ্যে কংগ্রেসে অধিকার করতে চাইল মাত্র ২৬ (তার মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই ১৫-টি)। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) বলা

হয়েছিল যে মুস্‌লিম জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কিন্তু তার ফল তেমন হয়নি। 'Unity Conference'-এর মতো 'Muslim mass contact'-এর মন্ত্রও বেকার হয়ে গেল।

কেন এমন হয়—এ-প্রশ্ন বার বার আমাদের করতে হবে। দুই পক্ষে যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি ও দেশভক্তিসম্পন্ন মানুষ একত্র সভা-সমিতি করেও কিছুতেই হাতে হাত মিলাতে পারছেন না কেন? আজও হিন্দু আর মুস্‌লিমে প্রকৃত সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হল না কেন?

১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুস্‌লিম লীগ সংগঠন হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ প্রচার করল, কংগ্রেস ১৯৩১-এ করাচীতে যেমন করে, তেমনই লীগ এক 'জনসাধারণের অধিকার' নামে ইশ্‌তেহার গ্রহণ করল। তখন থেকে চলেছে মুসলমান-মহলে লীগের জয়যাত্রা, লীগ-নেতৃত্বের শত শৈথিল্য সত্ত্বেও সে-জয়যাত্রা এখনো ব্যাহত হয় নি। ১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে লীগ ঘোষণা করল যে তার লক্ষ হল পাকিস্তান, যে-সব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য নিয়ে একত্র বাস করে, সেগুলোকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার অধিকার দাবি করা হল। মনে করে রাখার কথা যে 'জাতীয়তাবাদী' বলে পরিচিত ফজলুল হক্-সাহেব লাহোরে এই প্রস্তাব স্বয়ং উত্থাপন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন অনেকগুলো প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করল, তখন লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের একজোট হয়ে কাজ করার কথা উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস একাই মন্ত্রিসভা গঠন করে। মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব বেড়ে ওঠার সুযোগ এতে মিলল; লীগের উদ্যোগে এক রিপোর্ট ছাপা হল যাতে কংগ্রেসের 'কুকীর্তির' একটা ফিরিস্তি প্রকাশ হল, 'কুকীর্তি'গুলো 'কু' কি না সে-বিষয়ে সাধারণ মুসলমান মনোযোগই দিল না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেহ্‌রু, সুভাষ বসু প্রভৃতি কংগ্রেস-সভাপতির সঙ্গে বার বার জিন্না-সাহেবের মোলাকাৎ হল, দু'পক্ষে মিটমাট হল না। ১৯৪০ সালে গান্ধীজী 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' নিয়ে ব্যস্ত হলেন, দেশ তখন আসল আন্দোলনে মাতলে মুসলমানদের মন অতটা বিগড়ে যেত কি না কে জানে? পাকিস্তান প্রস্তাব পাস হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস-লীগে মিতালী হল না, মোটের উপর হিন্দু-মুসলমান বিভেদও যে বেড়ে এসেছে তা অস্বীকার করা চলবে না।

পাকিস্তান ব্যাপারটাই ছেলেমানুষি—ঐ পুরানো খেলাফতের মতো, এ-কথাটা বললে মুসলমান মনস্তত্ত্বেরই অপমান করা হবে। ১৯২৩ সালের 'স্পেশাল' কংগ্রেসে সভাপতি আবুল কালাম আজাদ মুসলমানের খেলাফৎ নিয়ে মাতামাতির স্বপক্ষে অনেক কথা বলেছিলেন। নিশ্চয়ই এমন কোনো ঐতিহাসিক কারণ আছে যার ফলে পাকিস্তানের নামে মুসলমানরা এভাবে মেতেছে? ঐ-রকম কোনো কারণের কথা ভেবেই ১৯২৪ সালে লাজপৎ রায় চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখেছিলেন : 'হাকিম আজমল খানের মতো বহুমানভাজন মুসলমান শরিয়তের আইন মানেন, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁদের প্রকৃত আনুগত্য কি সম্ভব'? হিন্দু মহাসভার নায়ক বীর সাভারকর বহুপ্রশংসিত বক্তৃতা করতে থাকলেন : 'হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ, বাসভূমি... মুসলমানরা কেবল এখানে বাস করে বলেই ভারতীয় (territorially Indians), নাগরিকদের পূর্ণ অধিকার তাদের প্রাপ্য নয়...।' মুসলমানরাও বলতে আরম্ভ করলেন জিন্না সাহেবের ভাষায় : 'এ-দেশে অধিকাংশ মুসলমান হাজার বছর ধরে আলাদা দুনিয়ায় বাস করে এসেছে, তাদের সমাজ আলাদা, জীবনদর্শন আলাদা, ধর্ম আলাদা। হিন্দু মুসলমানধর্মে দীক্ষা

নিয়েছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ঘটেছে বহুকাল আগে, আর তখন থেকে মুসলমান হিন্দুর কাছে ম্লেচ্ছ, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ব্যাপারে হিন্দুর সংসর্গ ত্যাগ করতে সে বাধ্য হয়েছে।'

গত কয়েক বছর ধরে যে-সব ঘটনা ঘটছে, তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ এখন যেন মারাত্মক অবস্থায় রয়েছে। যে-বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান এক ভাষাভাষী, যেখানকার সংস্কৃতি সৃষ্টিতে মুসলমানের অবদান সামান্য নয়, সেখানকার শিক্ষিত মুসলমান মহলও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য জাহির করাতে চাইছেন, যে-যুক্তি দিচ্ছেন তাও সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না। আবুল মন্‌সুর আহ্‌মদ সাহেব ১৬ই ও ২৩শে জুলাই, ১৯৪৩, তারিখের 'অরণি'-তে এ-বিষয়ে রীতিমত ভাববার মতো একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন! "আমাদের মানস, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের রীতিনীতি, আমাদের সমাজব্যবস্থা কি এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়েছে? খানার টেবিলে বা পর্ব উৎসবাদিতে আমরা এক হতে পেরেছি? খোরাকে পোশাকে আমরা কি সাদৃশ্য লাভ করতে পেরেছি? সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা কি গলাগলি করতে পেরেছি? এক ভাষায় কথা বলতেই কি আমরা পেরেছি? এক পাড়ায় এক মহল্লায় বাস করতেই কি আমরা শিখেছি? আমার খাদ্য পেঁয়াজ রসুন আজো আপনার নাসিকা কুঞ্চিত করছে; আমার মুরগি আজো আপনাকে জ্বালাতন করছে। আমার ভোজ্য গরু আজো আপনার পূজ্য দেবতা হয়েই রয়েছে। আমার পোশাক লুঙ্গি তহবন্দ আজো আপনার কাছে বর্বরতা। আপনার দেবতা আজো আমার কাছে মাটির ঢেলা হয়েই আছে; আপনার ধর্মের ঢোল আজো আমার ধর্মের বিঘ্ন হয়েই রয়েছে। এক কথায় ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজব্যবস্থা আপনার ও আমার মানসিক গঠনকেই ভিন্ন করে তুলছে।...আপনার সাহিত্যে আমি উপেক্ষিত" [আবুল মন্‌সুর সাহেব অভিযোগ করেছেন যে পার্ল বাক্ চীনা জীবন নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু হাজার বছর একত্র বাস করার পরও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বাঙালি মুসলিম জীবনের ছবি আঁকতে পারলেন না]; "আমার ভাষা আপনার পুস্তকে স্থান পাচ্ছে না। আমার মাতৃভাষা পানি, আল্লা নামাজ, রোজা, এবাদত, বন্দেগী আজো আপনার কাছে বিদেশী ভাষা।..." মনসুর সাহেব বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে অনেক মিলও আছে তা অস্বীকার করেন নি, কিন্তু আপাতত স্বাতন্ত্র্যেরই গুরুত্ব বেশি মনে করে লিখছেন : "সোনার বাংলার উর্বর মাঠকে আমরা কেন বিভিন্ন সংস্কৃতির গুলবাগিচায় পরিণত করব না? কেন বাংলার সভ্যতার উদ্যানে মুস্‌লিম কালচারের বোসরাই গোলাপের পাশে হিন্দু কালচারের পদ্মফুল ফোটাতে পারব না? স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার আবহাওয়ায় প্রস্ফুটিত সে-গোলাপ ও পদ্মের সমবায়ে ভবিষ্যতে বিশ্বসংস্কৃতির ফুলের তোড়া রচনা করবার স্বপ্ন কেন আমরা দেখব না?"

এ-প্রবন্ধ থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়া হল এতে ভাববার কথা অনেক আছে বলে। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবোধবুদ্ধ করে তুলতে হলে মুসলমানের মনের কথা শুনতেই হবে। হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি ব্যাপারে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা বাংলার ইতিহাসে বহু বার বহু ভাবে হয়েছে; কিন্তু বাউল, সাহেবধনী, সত্যধর্মী, নাগরচি, কীর্তনীয়া, চিত্রকর, নৈতা, মালকানা, মোতিয়া, মোম্‌না, শেখ, মোলেসোলাম্, সঙ্গহর, সংযোগী, কবিরপন্থী, দাদুপন্থী, পাঁচপীরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় দুই সমাজেরই বাইরে একঘরে হয়ে আছে, ঐক্যস্থাপনের একটা মহৎ প্রয়াস করে যে তারা ব্যর্থ হয়েছে তা মনে রাখতে হবে (এ বিষয়ে ১৩৫২ শারদীয় সংখ্যা

'পরিচয়'-এ শ্রীরাধারমণ মিত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ কথা বলার উদ্দেশ্য বাংলাভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি প্রমাণ করা নয়; কিন্তু মুসলমানের (এবং বহুক্ষেত্রে হিন্দুরও) প্রকট স্বাতন্ত্র্যবোধের অস্তিত্ব স্বীকার করলে পাকিস্তানের মতো দাবি ইতিহাসগত কারণেই যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা বোঝা যাবে।

কিন্তু মুসলমানদের মুসলমানবোধ আছে এবং হিন্দুদেরও 'হিন্দুত্ব' প্রীতি আছে, সুতরাং মুসলমান ও হিন্দু হল ভারতবর্ষের দুই জাতি, বলা পাকিস্তানপন্থীদের একটা মস্ত ভুল। আমাদের ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ; আজ পর্যন্ত কখনো এই বহু জাতির সম্মতি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠিত হয় নি। কঠোর শাসনদণ্ডের নিয়ন্ত্রণে এদেশে মৌর্যযুগ থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত মাত্র সাময়িক ভাবে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। এই বহু জাতির সম্মতি ও আগ্রহ নিয়ে নতুন স্বাধীন ভারত গড়তে হবে, ঐ ভাবে গড়লেই সে-ভারত হবে অখণ্ড শক্তির অধিকারী।

জাতিবোধ গঠনে অবশ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষত যেখানে এদেশের মতো মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি প্রকট। কিন্তু শুধু ধর্মের ভিত্তিতে এক একটা জাতি গঠন হয় না। তা যদি হত তো দুনিয়ার মুসলমান মিলে হত মাত্র একটি জাতি। ভারতবর্ষের মধ্যে একই রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে বাস করেও সমস্ত মুসলমান নিজেদের এক জাতি বলে মনে করতে পারে না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঠানরা নিজস্ব পাঠানদেশকেই স্বাধীন, সুষ্ঠু রূপে গড়তে চায়; কাশ্মীরের জনসংখ্যার শতকরা ৮২ জন মুস্‌লিম, কিন্তু শেখ আবদুল্লার নায়কত্বে যে আন্দোলন সেখানে প্রবল, তা সকল কাশ্মীরীকেই একজোট করতে চায়; এমন কি বাংলা দেশের মুস্‌লিম লীগও বাংলাকে অখণ্ড রাখতে চেয়েছে, অবাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত করতে চায় নি; বেলুচিস্তানের মুস্‌লিম লীগ কিছুকাল আগে জিন্না সাহেবকে জানিয়েছিল যে বেলুচিস্তানকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে রাখতে হবে। অপর দিকে আমরা দেখি বাঙালি-বিহারী, বিহারী-ওড়িয়া, বাঙালি-আসামী, তামিল-তেলুগু, মারাঠি-কর্ণাটকি, মারাঠি-গুজরাটি, সিন্ধী-পাঞ্জাবী ইত্যাদিদের মধ্যে পরস্পর স্বার্থে সংঘাতের আশঙ্কা স্বাধীনতার অদূর সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এ-প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে, এবার উপসংহারে উপস্থিত না হলেই নয়। সকলকেই স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় মুসলমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে নানা ভাবে অংশ গ্রহণ করে এসেছে। হিন্দুর পূর্বেই তারা ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে প্রবল অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজ মুসলমানের পক্ষ নিয়ে প্রধানত হিন্দু-পরিচালিত মুক্তি-সংগ্রামের পথ রোধ করতে পেরেছে, এ-কথা ইতিহাস স্বীকার করে না। ইতিহাস বলে যে ইংরেজ একবার হিন্দু আর একবার মুসলমানের পক্ষ নেবার ভান করে দু'পক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে এসেছে, আজো সে-কৌশল তারা প্রয়োগ করছে। ইতিহাস বলে যে ভারতীয় মুসলমান যথেষ্ট সাহস ও নৈপুণ্য ও উদ্দীপনা নিয়ে দেশকে পরদেশীর কবলমুক্ত করার চেষ্টায় লেগেছে। ইতিহাস বলে যে বহু বার মুসলমান হিসাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রয়াসে নেমেছে, কিন্তু প্রতিবারই ইতিহাসের শিক্ষা হল এই যে মুসলমান ও হিন্দু একত্র না মিললে ইংরেজের কারসাজি ব্যর্থ করা সম্ভব হয় না। ইতিহাস বলে যে মুসলমানদের বহু ব্যাপারে একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, তাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক। ইতিহাস আরো বলে যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ভারতের সমস্ত মুসলমান মিলে একটি মাত্র জাতি গঠিত হয়েছে বলা ভুল। ইতিহাস বলে যে ভারতে

আছে বহু জাতি, তার মধ্যে কোনো কোনো জাতি হিন্দু-প্রধান বা মুসলমান-প্রধান, কিংবা বাঙালিদের মতো এমন জাতিও আছে যাদের মধ্যে আপতত হিন্দু প্রাধান্য আছে মনে হলেও স্বাধীন সোনার বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাস্তবিকই 'ভাই ভাই' হয়ে 'এক ঠাঁই' থাকতে পারবে এবং চাইবে। ইতিহাসের এই শিক্ষা যদি আমরা আত্মস্থ করতে পারি তো মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-প্রচারকদের নিছক্ কু-মতলবী বা বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করব না, বরং বুঝতে পারব যে স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির মধ্যেই প্রকৃত ঐক্য ও সৌহার্দ্যের বীজ লুকানো রয়েছে।

মুস্‌লিম লীগের তথাকথিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম"কে অছিলা করে ১৬ই আগস্ট তারিখে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে উন্মত্ত সংঘর্ষ ও কাপুরুষোচিত নৃশংসতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, তার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া শক্ত। তার পর থেকে প্রদেশে প্রদেশে পরস্পর বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, কি বিজাতীয় আক্রোশ দুই সম্প্রদায়কে যেন সহসা অন্ধ অমানুষিকতার আবর্তে ফেলতে পারে, তার বিভীষণ মূর্তি আমরা দেখেছি।

কাকতালীয় ন্যায়ের সূত্র প্রয়োগ করলে ঐ প্রবন্ধ-প্রকাশকেই দুর্দৈবের জন্য দায়ী মনে করা যেতে পারে! অবশ্য কাকতালীয়ের কথা দূরে রেখেই অনেকে হয়তো ভাববেন যে আজ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভবুদ্ধি প্রণোদনের চেষ্টা থেকে বিরত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু শুভবুদ্ধি বিনা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপ শুভকর্মই কি অনারব্ধ থেকে যাবে না, বহুদিন ধরে যে-আশা আমাদের সঞ্জীবিত করে রেখেছে তা কি নৈরাশ্যে পরিণত হবে না?

সুখের বিষয় এই যে নিছক কূটনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যথার্থ একটা মিটমাট এখনো না হলেও, দাঙ্গা এবং দাঙ্গার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে কলকাতা বা বোম্বাইয়ে, নোয়াখালী বা বিহারে বা গড়মুক্তেশ্বরে কিছুকাল যে বিকট সাম্প্রদায়িক জিঘাংসার অকথ্য কাহিনী নিয়ে উভয় পক্ষে উল্লাসের মনোভাব দেখা গেছল, আজ আর তা নেই। সুপ্ত মানবতা যে ক্রমে জাগ্রত হচ্ছে, নানা বাস্তব কারণেই যে তাকে আবার জাগ্রত হয়ে সমাজজীবনে সৌষ্ঠব ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় লাগতে হচ্ছে, তার প্রমাণ আমরা এইভাবে পাচ্ছি। মুসলমানের কাছে হিন্দু এবং হিন্দুর কাছে মুসলমান যদি চক্ষুশূল হয়েই থাকে তো সেটা নিতান্ত সাময়িক একটা চিত্তবিকারের চেয়ে বড়ো কিছু হওয়াটা হল অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইতিহাসগত কারণে এবং সামজিক রীতিনীতি ও নিত্যকর্মপদ্ধতি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান যে আছে তা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু ব্যবধানের অস্তিত্ব আছে বলে পরস্পরের মধ্যে অন্ধ বিদ্বেষ ও জঘন্য জিঘাংসাকে অনিবার্য মনে করাও অসম্ভব।

যে-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের দুর্ভাগা দেশকে যেতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, যে-বিপর্যয়কে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নিদারুণ সাফল্য রূপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে-বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্র দুনিয়ার দরবারে আজ মহোল্লাসে আত্মসমর্থন করে ভারতবাসীদের নিন্দাবাদ করতে পারছে, সেটাকে কেবল একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল মনে করা ভুল। 'কলকাতার বিরাট হত্যাকাণ্ড' বলে ঐ হাঙ্গামার নামকরণ করেছিল এদেশের সেরা ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্র। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের বিশেষণ হিসাবে শুধু 'সাম্প্রদায়িক' কথাটি জুড়ে দিলেই যথেষ্ট হবে না। হিন্দু ও মুসলমানে অবশ্য লড়াই হয়েছিল; হিন্দুকে দেখলে বা তার কথা হলে মুসলমান হয়ে যেত দিগ্বিদিকশূন্য, আর মুসলমানকে দেখলে বা তার কথা হলে

হিন্দু হত দিশাহারা—ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এই ছিল দাঙ্গার সময়কার নিয়ম। কংগ্রেসের সমর্থক বা বন্ধু হয়েও বহু মুসলমান কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হিন্দু জনতার হাত থেকে পার পায় নি, মুসলমানও প্রচণ্ড আক্রোশের সময় ভেবেছে যে প্রতিটা হিন্দু হল তার দুশ্‌মন। বিকটত্ব এমন অভূতপূর্ব হওয়ার কারণ প্রধানত ছিল এই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেয়ে তাকে রাজনৈতিক অন্তর্যুদ্ধ বলা উচিত আর ইতিহাস তো সর্বদাই সাক্ষ্য দেয় যে রাজনীতি নিয়ে ঘরোয়া লড়াই দুটো আলাদা দেশের মধ্যে লড়াইয়ের চেয়ে বেশি নির্মম প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ভুল হোক বা ঠিক হোক, অধিকাংশ মুসলমানের মনে একটা ধারণা ঢুকেছে যে কংগ্রেস স্বাধীনতা-আন্দোলনের নামে মুসলমানের স্বার্থ, মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য, মুসলমানের সত্তাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে যেতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আবার তেমনই অধিকাংশ হিন্দু লীগের তুলনায় কংগ্রেসের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, কংগ্রেস যখন আজ স্বাধীনতার ডাক দেয় তখন সাড়া দিতে অধিকাংশ মুসলমানের ঔদাসীন্য লক্ষ করে, আর স্থির করে যে লীগের নির্দেশ যারা মানে তারা দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কেই নিস্পৃহ, তারা স্বাধীনতারই শত্রু। মুসলমান ধরে নেয় যে প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক হিন্দু হল কংগ্রেসের সমর্থক। আর হিন্দু ধরে নেয় যে প্রত্যেক মুসলমান হল লীগের অনুচর। তখন সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও রাজনৈতিক বিভেদ মিলে প্রচণ্ড এক অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

কেন এমন হয়, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সাধারণত এক পক্ষ অপর পক্ষের নিন্দাবাদ করে, অপর পক্ষই যে কেবল দোষী তা বলতে থাকে। যাদের রাজনীতিবোধ হল প্রখরতর, তারা বলে যে সাম্রাজ্যবাদই চক্রান্ত চালিয়ে, একবার একদিক আর একবার অন্যদিকে পক্ষপাত দেখিয়ে, উভয় পক্ষকে স্বতন্ত্র ভাবে আশার ছলনায় মুগ্ধ করে এ-অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে—সাম্রাজ্যবাদ যদি ফাঁদ পাতে তো সে-ফাঁদে আমরাই বা পা দিয়ে বসি কেন? সাম্রাজ্যবাদ যদি কল টিপতে থাকে তো আমরা লজ্জা বিসর্জন দিয়ে পুতুলনাচ নাচি কেন? সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের কথা তো আমরা আবহমান কাল থেকে শুনে আসছি কিন্তু সে-চক্রান্তকে আমরাই একজোট হয়ে বিকল করে দিই না কেন?

জবাব হল এই যে আমরাই আমাদের মনে বিষ পুষে রেখেছি, নিজেদের পাপে নিজেরাই আমরা বারবার বিড়ম্বিত হচ্ছি, কিন্তু মন থেকে সে-পাপকে নির্মম ভাবে উৎখাত করতে পারছি না। ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস, আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হলেও আমরা হলাম বহু জাতি, কিন্তু কোনো কোনো জাতিতে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য, কোনো কোনো জাতিতে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য, এবং বাঙালিদের মতো জাতিতে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাসাম্য থাকলেও কোথাও মাত্র মুসলমান বা হিন্দু হিসাবে কোনো জাতিই গঠিত হয় নি, বাংলার মুসলমান যেমন বাঙালি তেমনই সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দু হল সিন্ধী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হলে পাঠান বলেই নিজের পরিচয় দেবে। এ-সত্ত্বেও আমরা ধর্ম-বৈষম্যের ভিত্তিতে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবছি, তাই অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানের আওয়াজ তুলেছে বা সে-আওয়াজে ভুলেছে, আর অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু অপেক্ষাকৃত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বলে মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অখণ্ড হিন্দুস্থান ও সাভারকারী "হিন্দুত্বে"ই বিশ্বাস করছে। এ-সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়, তা হলে সাম্রাজ্যবাদের দুষ্ট সংকেতে পরস্পরদ্বন্দ্বের

কলুষপঙ্কে এত সহজে আমরা ডুব দিই কেমন করে? "If the light that is in thee is darkness, how great is that darkness!"

মুসলমানকে আজ বুঝতেই হবে যে ভারতবর্ষের সব মুসলমান মিলে এক জাতি, এ-কথা পাখিপড়ার মতো আউড়ে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই, তাতে মুসলমানেরই স্বাধীনতা কোনোদিন আসবে না। মুসলমানকে বুঝতেই হবে যে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রে তার স্থান, তার অধিকার সম্বন্ধে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সন্দেহ এবং অভিযোগ অযৌক্তিক না হলেও সে জোর করে এদেশের ছ'টা প্রদেশ দখল করতে পারবে না, করা উচিতও হবে না। যে কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কেরই ভোট দেওয়ার এক্তিয়ার থাকলে মুসলমান হিসাবেও তার দুশ্চিন্তার তেমন কারণ নেই; পুঁজিদারি সমাজে বড়োলোকের শাসন কায়েম রাখার জন্য হরেক কায়দা যখন চলে আর বাংলাদেশে যদি অধিকাংশ ধনী হয় হিন্দু, তা হলে তো মুসলমানদের কর্তব্যই হয় পুঁজিদারী ব্যবস্থা দূর করে দিয়ে যথার্থ গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা—সুতরাং দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হওয়ার কারণ কোথায়? মুসলমানকে বুঝতেই হবে যে কংগ্রেসকে (এবং মোটের উপর সকল হিন্দুকে) শত্রু মনে করলে পরদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের তো হটানো যাবে না, বরং তারা আরো জেঁকে বসবে; কংগ্রেসকে মতলবী হিন্দু প্রতিষ্ঠান মনে করলে আর কংগ্রেসের নেতাদের হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী বলে দুর্নাম করলে মুসলমান তো ইংরেজকে খেদিয়ে নিজেদের আজাদীই অর্জন করতে পারবে না। মুসলমান তো দেখে যে লড়াই যখন হয়—সে লড়াই রুজী-রোজগারের জন্য হোক বা সোজাসুজি আজাদীর জন্য হোক— তখন হিন্দু আর মুসলিমে তফাৎ থাকে না, থাকলে লড়াই ভেস্তে যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের জন্য দেশকে যখন তৈরি হতেই হবে, তখন মুসলমান তো শুধু পাকিস্তানের নামে একটা ধোঁয়াটে নেশায় মশ্‌গুল হয়ে থাকতে পারে না।

আবার হিন্দুকে তেমনই বুঝতে হবে, স্বীকার করতেই হবে যে মুসলমানকে স্বাধীনতার আসল লড়াইয়ের সময় পেছপাও মনে করাটা হল একটা মস্ত ভুল, স্বীকার করতেই হবে যে স্বাধীনতার ঐতিহ্যে মুসলমানের অবদান হল মহামূল্য। স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু প্রাধান্যের কথা ভাবলে মুসলমানের মনে বিভীষিকা সঞ্চার হল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বীকার করতেই হবে যে সর্বব্যাপারে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দুদের মতিগতি সম্বন্ধে মুসলমানের মনে সন্দেহ ও অভিযোগ না থাকাই আশ্চর্য। হিন্দুকে মানতেই হবে যে কেতাবী বুলি আউড়ে যখন মুসলমান-প্রধান সিন্ধুদেশকে আলাদা প্রদেশ হিসাবে খাড়া করতেই হিন্দু আপত্তি করেছে কিংবা কেন্দ্রীয় আইনসভার আসন-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বদলে এক-তৃতীয়াংশ দিতে গররাজি হয়েছে কিংবা মামুলী গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন-ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এসেছে, তখন একটার পর একটা ভুল করে হিন্দুই মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধকে কটু ভাবে প্রকট করেছে, হিন্দুর কাছে সুবিচারের আশা যে মুসলমান করতেই পারে না এ-ধারণা সৃষ্টি করেছে। হিন্দুকে বুঝতেই হবে যে স্বাধীনতার যুদ্ধে মুসলমানকে বাদ দিয়েও সাফল্য লাভের আশা হল দুরাশা। বুঝতে হবে যে স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদই আমাদের ভেদাভেদের সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। হিন্দুকে বুঝতেই হবে যে মুসলমানকে 'তলোয়ারের বিপক্ষে তলোয়ার' বলে হুমকি দেওয়া আর কৌশলী সাম্রাজ্যবাদীদেরই গুণপনার বাহবা দেওয়া দেশভক্তের কাজ নয়, বুঝতেই হবে যে পাকিস্তানকে কেবল হেসে উড়িয়ে

দেওয়া এবং প্রতিবেশী, ভ্রাতৃস্থানীয় মুসলমানকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেরই সাথী বলে টেনে নেওয়ার চেষ্টা না করা হল দেশদ্রোহিতা।

কেমন করে ভারতের বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে পূর্ণ-আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করলে, এমন কি ঐ সব অঞ্চলের সর্বভারতীয় রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করলে, এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের ন্যায্য দাবি সুপ্রতিষ্ঠ করা যায়, সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি বিনা মুসলমানকে ভাই বলে কোল দেওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হতে পারে, তা আজ না মেনে উপায় নেই। ধর্ম, সংস্কৃতি, শীলতার দিক থেকে মুসলমানকে ভাই বলে যদি হিন্দু অগ্রসর হয়ে যায় তার সঙ্গে মিলবার জন্য আর মুসলমানও যদি হিন্দুর প্রতি অনুরূপ মনোভাব নিয়ে আসে, তো নিশ্চয়ই তা হবে পরম কাম্য, আমাদের মানবতা তখন সাম্প্রতিক অবমাননার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে ভেদবোধ এতে প্রকট হয়ে উঠেছে, বহুদিনের পরস্পরসংশয় এমন অপঘাতের পথে উভয়কে ঠেলে নিয়ে চলেছে যে, আজ আর শুধু "হিন্দু-মুস্‌লিম এক হও" আওয়াজে তেমন প্রাণের সাড়া মেলে না, স্বার্থনিরপেক্ষ সহানুভূতি ও পরস্পর মৈত্রীর ভিত্তিতে হিন্দু আর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য নোয়াখালীতে গান্ধীজী যে-প্রচেষ্টায় নেমেছেন, তা যে সম্পূর্ণ সফল হবে আশা করার ভরসা হয় না। ভারতবর্ষের বহু জাতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত থাকলেও তাদের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের যে সম্ভাবনা বর্তমান এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে-মনোমালিন্য আজ সর্বনাশা রূপে দেখা দিয়েছে, তার প্রকৃত প্রতিকার করতে পারে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অকুণ্ঠ নির্ভীক স্বীকৃতি।

কিন্তু তখনো একটা বড়ো প্রশ্ন থেকে যায়— আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিলেই কি সব মুশকিলের আসান হবে? যে-মুসলমান আজ পাকিস্তানকে মনে করে অকাট্য, মনে করে পাকিস্তান হল তার সর্বনিম্ন দাবি, সে কি আত্মনিয়ন্ত্রণের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হবে? ভাষা, সংস্কৃতি, বসতি, বৃত্তি ও মানসগত ঐক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় জেনে ভারতবর্ষের বর্তমান ভুক্তিব্যবস্থাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে নিলেই কি মুসলমানের সকল সন্দেহের নিরাকরণ ঘটবে?

এ-প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা পুঁথিগত নীতি নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ হল একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। কাগজে কলমে, আইনের অভ্যস্ত মারপ্যাঁচ সমেত, এদেশের প্রত্যেকটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া হল বলেই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি হয় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থই হল এই যে জনতা তার ভাগ্য, তার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে, পূর্ণ গণতান্ত্রিক বনিয়াদের উপর নতুন সমাজের ইমারত বানানো হবে, আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবল কয়েকটি সভাসমিতি আর সম্মেলনে বচনবাগীশদের বাকচাতুরির ফলে অর্জিত হবে না, অর্জিত হবে জাগ্রত, সংহত জনতার সচেতন সংগ্রামের ফলে। অর্থাৎ আজকের দিনে ভারতবর্ষের দিকে দিকে সাধারণ মানুষের যে-সংগ্রাম চলছে, যে-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুমুসলমান ভেদাভেদ হল অপ্রাসঙ্গিক, সে-সংগ্রামের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণনীতির যোগ হল অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক। কতকগুলো আইনসভায় কিংবা রাষ্ট্রগঠনপরিষদে চমকপ্রদ বক্তৃতার মারফৎ আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না, হবে গণসংগ্রামের মধ্যস্থতায়, যে-সংগ্রাম আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ বিভেদের অক্লান্ত পরিপোষক ও প্ররোচক সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস

করে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর প্রকৃত স্বাধীনতার পথ সুগম করবে। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি যারা বাস্তবিকই গ্রহণ করেছে, তারা সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত জনগণের আন্দোলনকে সাহায্য করবে, মাত্র মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে সে-নীতিরই অসম্মান করবে না।

ঠিক এই কারণে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে আমাদের দেশের কোনো কোনো নামজাদা নেতা বলে থাকেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি তাঁরা সমর্থন করেন, অথচ দেখা যায় যে আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির আনুষঙ্গিক যে অধিকার হল মৌলিক, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রয়োজন বোধে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অধিকারকে তাঁরা বরদাস্ত করেন না। আর যে গণসংগ্রামের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতিকে অঙ্গাঙ্গি বন্ধনে বেঁধে না দিলে জনসাধারণের কাছে আত্মনিয়ন্ত্রণ একটা কেতাবী বুলি হিসাবেই থেকে যায়, সে-গণসংগ্রামকে তাঁরা তো আজ বিষবৎ পরিত্যজ্য মনে করছেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতিরই আছে, অকাট্য ভাবে আছে,—এমন কি, কোনো জাতি যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থির করে যে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রিক ঐক্যের চেয়ে তার নিজের স্বতন্ত্র স্বকীয়, স্বাধীন জাতিসত্তার গুরুত্ব ও উপযোগিতা বেশি বলে তার স্বাতন্ত্র্য সে বজায় রাখবেই, তখন তার বিরুদ্ধেও নীতির দিক থেকে কোনো আপত্তি চলে না। এ-কথা আজ স্বীকার না করলে সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান মিলবে না; কেবল মানবতার নামে হিন্দু ও মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা শ্রদ্ধেয় হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা হবে অরণ্যে রোদনেরই নামান্তর। সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতিকে অবাস্তব মানসরাজ্য থেকে নামিয়ে এনে জনতার দৈনন্দিন সংগ্রাম এবং তৎসম্ভূত সংহতি ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এ-কাজ যাঁরা পারেন না, তাঁরা বহুমানভাজন নেতা হয়েও আজ দিশাহারা দেশকে পথের সন্ধান দিতে পারেন না।

সারা ভারতবর্ষে আজ নির্জিত জনগণ বিপ্লবের আবাহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, অধীর আগ্রহে তারা সংগ্রামের আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র আজ এ-আলোড়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে যার ঐতিহাসিক সূচনা, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহের সময় যার বিরাট গম্ভীর মূর্তি আমরা দেখেছিলাম, সারা ভারতের রেল, তার, ডাক শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যে যার ভাস্বর প্রকাশ হয়েছিল, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুরের চিরলাঞ্ছিত জনগণের দুর্জয় পরাক্রমে যার আসন্ন বিজয়ের সংকেত দেখা দিয়েছে, দেশের সর্বত্র কৃষক ও শ্রমিকের বিপুল সঙ্ঘবদ্ধ বিক্ষোভ এবং অমলনীর, ত্রিচিনপল্লী, ওয়র্লি, কানপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি শত স্মরণীয় তীর্থে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী সরকারের হুকুমে চালানো গুলিকে অগ্রাহ্য করে জনগণের অনমনীয় সংহতিতে যার শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই আলোড়নকে আজ অস্বীকার করবে কে? লীগের নেতারা যতই এ-ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য ও বৈরিভাব দেখান না কেন? কংগ্রেসের নেতারা যতই সর্দার প্যাটেলের মতো হুমকি দিন না কেন, কিংবা পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্‌রুর মতো বিপ্লবগন্ধী কথার কুহকী জাল বুনে চলুন না কেন, এ-আলোড়নকে স্তব্ধ হয়ে যেতে দেশবাসী দেবে না। দেশবাসীর চোখের সামনে ভাসছে নোয়াখালীর সন্দ্বীপে হিংসায় উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করতে গিয়ে বিপ্লবী লালমোহনের আত্মত্যাগ, তারা সাম্প্রতিক অন্তর্যুদ্ধের কথা মনে করে বলবে সাম্প্রতিক কবিতার ভাষায়—

প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগ,
নিকটে সুদূরে, কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে, রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে,
অনেক হাসানাবাদে প্রাণের আবাদে...

ভারতের সর্বাগ্রগণ্য নেতারা আজ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকারীদেরই ছলনায় মুগ্ধ হয়ে যেন আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন। রাষ্ট্রগঠন-পরিষদে বক্তৃতা প্রকরণে স্বাধীনতা আসবে বলে জনসাধারণকে আশ্বাস দিচ্ছেন। পরিতাপের কথা, কারণ যাঁরা সেদিন বলেছিলেন যে, স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হয়ে গেছে, তাঁরাও তো বুঝছেন, "হনোজ্ দিল্লী দূরস্ত"। আজ জনসাধারণের আশা, স্বাধীনতার আশা, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য নির্মূল করার আশা হল জনসাধারণেরই সংগ্রাম—আত্মনিয়ন্ত্রণের অকুণ্ঠ ভিত্তিতে নতুন স্বাধীন ভারত গড়ার জন্য আকুমারী হিমাচল যে জন-আন্দোলন চলেছে, তাকে পুষ্ট করে, সুদৃঢ় করে, সুসংহত করে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম। এ-সংগ্রামে দ্বিধাহীন সাহচর্য যাঁর কাম্য নয়, হিন্দু ও মুসলিমের পরস্পর সম্পর্কগত সমস্যা সমাধানে তাঁর কাছে কোনো সহায়তাই মিলবে না।

মার্ক্‌স্‌বাদের অ, আ, ক, খ

"সব লাল হো জায়েগা"

গল্প আছে যে শিখবীর রঞ্জিৎ সিং ভারতবর্ষের মানচিত্রে অনেকগুলো এলাকার রঙ লাল কেন জানতে চেয়ে যখন শোনেন যে সেগুলো হল ইংরেজের দখলে, তখন নাকি তিনি বলেছিলেন, "সব লাল হো জায়েগা"। আবার কিছুকাল আগে নয়াচীন সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে বাঙালি সাংবাদিকদের মধ্যে এখন যিনি বয়সে সবচেয়ে ['বসুমতী'-সহ বহু পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ] বড়ো, তিনি বলেছিলেন অন্য অর্থে, "সব লাল হো জায়েগা"। ইংরেজ এদেশ দখল করেছিল ছলে, বলে, কৌশলে; কিন্তু লাল ঝাণ্ডা আজ দুনিয়া জয় করতে চলেছে সাধারণ মানুষের অন্তরের উদ্দীপনার জোরে।

এ-বিষয়ে আজ কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না যে কমিউনিজম্ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার অগাধ রটনা সত্ত্বেও শোষণহীন, মুক্ত সমাজ স্থাপনের জন্য জনতার আগ্রহের অন্ত নেই। এ-বিষয়ে আজ কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না যে এটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, জীবাণু যুদ্ধ প্রভৃতি পাশবিকতার ভয় দেখিয়েও সাধারণ মানুষের অগ্রগতিকে রোধ করা সম্ভব নয়। জগতের এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে সোবিয়েত দেশ, সেখানে সোশালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কমিউনিজম্ স্থাপনার দিকে সে-দেশ জোর কদমে এগিয়ে চলছে। নূতন চীনের ষাট কোটি মানুষ বহু যুগের শৃঙ্খল ভেঙে পরম উৎসাহে সোশালিস্ট ব্যবস্থা নির্মাণ করছে; পূর্ব ইয়োরোপের দেশে দেশে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার ইমারত গড়ে উঠছে। আর দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশে সাম্যবাদের অপরাজেয় মন্ত্র নিয়ে শোষণের শিকলকে বিকল করে দেওয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলছে। খুব দেরি নেই আজ সেদিনের, যেদিন "সব লাল হো জায়েগা"।

ইতিহাস যতদিনের খোঁজ রাখে, প্রায় ততদিন ধরেই মানুষের সমাজে শোষণ চলে আসছে—মুষ্টিমেয় কিছু লোক সমাজপতি হয়ে থেকেছে আর বাকি সবাই তাদের তাঁবেদারি করতে বাধ্য হয়েছে, হাজার রকমে বঞ্চিত হয়েছে। শোষণের অবসান হোক, এই স্বপ্নও মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে, কিন্তু তা ছিল নিছক কল্পনা, শুধু এতকাল পরে সেই স্বপ্ন সোবিয়েত দেশ বা নূতন চীনে বাস্তব রূপ নিতে পেরেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র শোষণহীন, শ্রেণীহীন, এবং সকলের সমান সুযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃত স্বাধীন সমাজ স্থাপনের দ্রুত সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়েছে। ঠিক এই জন্যই আজ শোষক শ্রেণীর আতঙ্কের অন্ত নেই; তারা বেশ জানে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে, তারা বেশ বোঝে যে শুধু বিত্ত দিয়ে মানুষের চিত্ত জয় করা যায় না, অস্ত্রের জোরে মানুষের অন্তর অধিকার করা চলে না।

বর্তমান কালের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হল এই যে সাম্যবাদ আর কল্পনার বস্তু নয়, কমিউনিস্ট সমাজের কাল্পনিক ছবি এঁকে, নিষ্ঠুর বাস্তবের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টায় মনের রাশ খুলে দিয়ে তাঁকে আকাশে বিচরণ করানোর প্রয়োজন নেই— সাম্যবাদকে আজ স্বপ্নরাজ্য থেকে আমাদেরই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শুধু বর্তমান কালে কেন, এত বড়ো ঘটনা মানুষের ইতিহাসে এ-পর্যন্ত ঘটে নি। আমরা আজ বাস করছি যে বিরাট যুগসন্ধিক্ষণে তার তুলনা নেই।

তাই বিপুল আগ্রহে আজ দেশে দেশে মেহনতী মানুষ বিপ্লবের জয়ধ্বনি করছে, নবজাতকের গাথা যেন আজ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে—

"সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন কিরণ করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
"আসিবে সে-দিন আসিবে।"

স্বপ্ন থেকে বাস্তব

শুধু মাত্র অন্তরের উদ্দীপনায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, শোষণের শিকল ভাঙতে গেলে শুধু মনের একান্ত কামনাই যথেষ্ট নয়। যদি তাই হত তো বহুকাল পূর্বেই মানুষ শ্রেণীশাসনের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারত। অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বহুজনের কণ্ঠে দারিদ্র্যের দুঃখ, গ্লানি ও লজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা গেছে। কিন্তু অত্যাচার, অনাচারকে হাজার নীতিকথা বন্ধ করতে পারে নি; অসাম্যের বিড়ম্বনা সমাজজীবনে যে দুঃখ এনেছে, গৌতম বুদ্ধের মতো মহাপুরুষের অপরিসীম মমতা সে দুঃখ মোচনে সমর্থ হয় নি। সাম্যবাদ তাই কবিকল্পনাই থেকে গিয়েছিল— কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সম্ভাবনা শুধু এসেছে অতি আধুনিক যুগে, যখন যন্ত্রের প্রচলন হওয়ায়, বড়ো বড়ো কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদের মেহনতে দুনিয়া চলে তারা একজোট হতে শিখেছে, নিজেদের মধ্যে সন্ধান পেয়েছে সেই শক্তির যে শক্তি নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে পারে।

অনেকে বলে যে কমিউনিজম্ হল বিদেশ থেকে ধার করা জিনিস, এদেশের মাটির সঙ্গে তার নাকি কোনো সংযোগ নেই। একথা যদি সত্যি হত তো কমিউনিজম্ যাদের চক্ষুশূল, তারা নিশ্চয়ই খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে দিন কাটাত। বাস্তবিকই যদি কমিউনিজম্ এমন এক বস্তু যার শিকড় এদেশের মাটিতে গজাতে পারে না, তা হলে কমিউনিজম্ অসার বাগাড়ম্বর মাত্র, তাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সবাই জানে কমিউনিজমের ভয়ে সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও শোষকের দল থরহরি কম্পমান। কমিউনিজম্‌কে যে বাক্স-প্যাঁটরায় পুরে দেশ থেকে দেশান্তরে আমদানি-রপ্তানি করা যায় না, একথা লেনিন-স্তালিনের মুখে আমরা বারবার শুনেছি। প্রত্যেক দেশেই তার নিজস্ব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কমিউনিজমের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ঘটছে। কোথাও আগে আর কোথাও পরে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান অনিবার্য হয়ে উঠছে। কংস যেমন শুনেছিল, 'তোমাকে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'—তেমনই আজ দুনিয়ার ধনিকেরা ক্রমশ জানছে যে মেহনতী জনতার বিজয় অভিযানকে রোধ করা আর বেশিদিন সম্ভব নয়, এবং জানে বলেই মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে নিজেদের পরমায়ু বাড়াবার জন্য। এদেশে তাদের একটা অস্ত্র হল এই কুৎসা রটনা করা যে কমিউনিজম্ হল বাইরে থেকে আমদানি করা ব্যাপার, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবন ও আদর্শের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

ভারতবর্ষ কিছু একটা সৃষ্টিছাড়া, আজব দেশ নয়— সাধারণ মানুষের মনের কামনা ভারতবর্ষে বদলে যাবে এমন কথা ভাবা বাতুলতা বই কিছু হতে পারে না। দুঃখের বন্ধনকে আমরা যুগ যুগ ধরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছি, এ কি কখনো সম্ভব? আমাদের দেশের মহাপুরুষরা এ জীবন সম্বন্ধে ভাবেন নি, শুধু পরমার্থের কথা ভেবেছেন, এ-কথা প্রায় শোনা যায় বটে, কিন্তু তা সত্য নয় একেবারে।

যারা বলে যে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মায়া," ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তার সার কথা হল এই, তারা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা বিরাট অংশকে অস্বীকার করতে চায়। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে এদেশের সবচেয়ে পুরানো সভ্যতার যে বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে তদানীন্তন জীবনের বস্তুনিষ্ঠা অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ, হোম ইত্যাদির উদ্দেশ্য পারলৌকিক সদগতির চেয়ে ইহজীবনে সাফল্যই ছিল ঢের বেশি। দর্শনের বিকাশ যখন ঘটল, তখন প্রচণ্ড প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাস্তববাদী লোকায়ত দর্শন কিছুতেই নিষ্পিষ্ট হল না, চার্বাকপন্থীদের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করার হাজার চেষ্টা ব্যর্থ হল। সাংখ্যকার বলতে কুণ্ঠিত হলেন না যে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর হলেন অসিদ্ধ, আর গৌতম বুদ্ধ কোনো এক কল্পনা-সৃষ্ট জগৎকর্তার নাম উচ্চারণ না করেই তাঁর নব ধর্ম প্রচার করলেন। যে দেশের নগরসভ্যতা চৌষট্টি কলার ছটায় সমৃদ্ধ ছিল সে দেশ কখনো জীবনকে, বাস্তবকে তুচ্ছ করে নি। শুধু যখন আমাদের ইতিহাসে নিদারুণ দুর্দিন ঘনিয়ে এসে বাসা বেঁধেছে, তখনই আমাদের চিন্তায় তার ছায়া পড়েছে— বাস্তব যখন নির্মম, তখন তার দিকে চোখ বুজে অবাস্তবের ধ্যানে সান্ত্বনার অন্বেষণ আরম্ভ হয়েছে। এ শুধু আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য নয়। সব দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে এ ঘটনা ঘটেছে।

আদিম স্তর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সমাজ-জীবনে শ্রেণী শাসনের গ্লানি দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে গ্লানিকে কখনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যারা তারা মেনে নিতে পারে নি। বৈদিক ঋষি কল্পনা করেছিলেন প্রশান্ত, মধুময় পরিবেশ—'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' —মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ঋষি শম্বর বলছেন—

পতিপুত্রবধাদেতৎ পরমং দুঃখমব্রবীৎ।
দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্যায়মরণং হি তৎ॥

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি বা পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে দারিদ্র্য আরো অসহনীয় দুঃখ, কারণ দারিদ্র্য পর্যায়মরণ নিয়ে আসে, তিলে তিলে পুড়িয়ে মারে। চিরজীবী বলে বর্ণিত বক ঋষিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে তাঁর অতি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হল গর্বিত ধনীর হাতে দরিদ্রের লাঞ্ছনা। ধ্রুব-উপাখ্যানে কথিত আছে যে বালক ধ্রুব যখন কঠোর তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন তখন দেবরাজের মর্যাদা হারাবার আশংকায় ইন্দ্র গিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কাছে ধরনা দেন। ধ্রুবকে তপস্যা থেকে নিরস্ত করতে বলেন। ব্রহ্মা যখন ধ্রুবের কাছে গিয়ে বর দিতে চান, তখন ধ্রুব যে উত্তর দিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়। 'স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য, বরং না যাচে'—'বিশ্বের স্বস্তি হোক, আমি বর যাচ্ঞা করি না,' —এ-কথাই বলেছিলেন ধ্রুব।

গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগ করেছিলেন জীবের দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। রাজপ্রাসাদের নিখুঁত তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও জীবনের যন্ত্রণাকে তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত রাখা সম্ভব হয় নি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণনা আছে যে শিবিরাজা সামান্য পাপক্ষালনের জন্য কিছুক্ষণের জন্য যখন নরকে

যান, তখন তাঁর দেহনির্গত সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে পাপীরা সবাই তাঁর সান্নিধ্য চাইতে থাকে, আর নরক ত্যাগের সময় উপস্থিত হলে তিনি অস্বীকৃত হয়ে বলেন—

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং, ন স্বর্গ ন পুনর্ভবং।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্।

আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, পুনর্জন্ম চাই না— আমি চাই শুধু এই যে, দুঃখতপ্ত প্রাণীদের যন্ত্রণার অবসান হোক। আরো কত আখ্যানের উল্লেখ করা যায়, যার মধ্য দিয়ে মানুষের দুঃখ মোচনের কামনাই ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে প্রকট হয়ে রয়েছে।

কিন্তু বসুধৈব কুটুম্বকং— নীতিশাস্ত্রের এই শিক্ষা আজো আমাদের জীবনে বাস্তব হয়ে ওঠে নি। ১৯৫১ সালে নূতন চীন দেখে এসে উত্তর প্রদেশের স্বনামধন্য জননেতা পণ্ডিত সুন্দরলাল বলেছিলেন যে সেদেশে সত্যই নূতন সমাজ সকলের প্রকৃত কুটুম্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের প্রখর গণতান্ত্রিকতা ও 'জাকৎ' প্রথা মারফত পরস্পরের সাহায্যের নির্দেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নেই; মুসলিম জগতে বলা যায় যে, সোবিয়েত উজ্‌বেকিস্তান, তাজিকিস্তান, আজেরবাইজান, দাঘেস্তান, প্রভৃতিতেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলেছে প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসতে, কিন্তু যেখানে সাম্যবাদী আন্দোলনের জোরে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেখানে ধর্মের নির্দেশ অবলীলাক্রমে অবহেলিত হয়েছে। ধর্মপ্রচার ও নীতিশিক্ষা যুগ যুগ ধরে চলে আসা সত্ত্বেও সমাজের যে পরিবর্তন সাধারণ মানবিকতা দাবি করে, সে-পরিবর্তন ঘটতে পারে নি। সাম্যবাদী আন্দোলনই গত একশো বৎসরের মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন প্রবর্তন করতে পেরেছে— আজ পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি সোশালিস্ট সমাজ গড়েছে কিংবা গড়ে তুলেছে।

মার্ক্‌স্‌বাদ ধর্মকে হেসে উড়িয়ে দেয় না, শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে সে-বিষয়ে মার্ক্‌স্‌বাদ আলোচনা করে। কিন্তু ইতিহাস থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল এই যে, ধর্ম যে-সমাজকে ধারণ করে রেখেছে, সে-সমাজ হল শ্রেণীসমাজ, সে-সমাজে অধিকার ও সুযোগের বৈষম্য স্বীকৃত, সে-সমাজে "কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ"— যেন একটা প্রাকৃতিক নিয়মেরই মতো অমোঘ ও অকাট্য বলে মেনে আসা হয়েছে। এইজন্য দেখি, বলা হয়েছে যে ধর্মের তত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত রয়েছে, তাকে ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে আনা যায় না, আর তাই "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"— মহাজনেরা যে পথে গেছেন, সেটাই হল সকলের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাস্তা। ধর্মের প্রভাব এইভাবে মানুষকে গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত করিয়েছে, যা কিছু চলে এসেছে তাকেই মান্য করার প্রয়োজনকে বড়ো করে তুলে ধরেছে, নিজের চেষ্টায় পুরুষকারগুণে ব্যক্তির ও সমষ্টির ভাগ্য পরিবর্তনের কল্পনা যে বৃথা তা বুঝিয়েছে, বিধিনির্ধারিত রীতিতে সমাজ চলতে থাকবে, যে ঋষিরা সামাজিক জীবনে নিত্যকর্মপদ্ধতি স্থির করে দিয়েছেন তাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, ঈশ্বর-অনুপ্রেরিত বলে তাঁদের নির্দেশ অমান্য করা মহাপাপ, এ-ধরনের মনোভাব সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রবাদবাক্যের মধ্যে বহুজনের মনোভাব প্রকাশ পায়, যেমন ইংরেজি প্রবাদ বলে : 'The poor shall be with us always', "গরীব এবং গরীবানী সমাজে চিরকাল থাকবে"— অর্থাৎ এ ব্যবস্থাকে বদলানোর কথা ভাবা বা সেই কাজে এগিয়ে যাওয়া হল বাতুলতা।

তাই সব দেশে ধর্মব্যবস্থার মধ্যে যাঁরা কর্তৃপক্ষীয় হয়ে বসেন, তাঁদের কায়েমী স্বার্থও সমাজে প্রখর হয়ে ওঠে। খ্রীস্টান ধর্মের আদি ভক্তেরা কমিউনিজ্‌মের কথা ভেবেছিলেন, সবাইয়ের সমান সুযোগ থাকবে এই ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত করার চেষ্টায় নেমেছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সমাজ ও রাষ্ট্র সে চেষ্টাকে নিষ্পেষিত করে দেয়। আর তার ''Render unto Caesar the things that are Caesar's'' (''রাজার প্রাপ্য রাজাকে দাও'') প্রভৃতি যীশুখ্রীস্টের যেসব কথা ছিল সেগুলোকে সামনে টেনে এনে তখনকার যারা সমাজপতি তাদের সঙ্গে ধর্মযাজকদের মিতালি ঘটে, খ্রীস্টান পাদরীরা মঠে ও গির্জায় ক্রমশ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বসে। ইয়োরোপের মধ্যযুগে টাকা লেনদেন ব্যাপারে পর্যন্ত এই ধর্মযাজকের দল একটা বড়ো অংশ গ্রহণ করে এবং বহু উত্থানপতনের মধ্যেও রাষ্ট্রশক্তির প্রতি আনুগত্য রেখে চলে, আর সাধারণ, বঞ্চিত মানুষের অত্যাচার নিরসন করার যে-সমস্ত উদ্যম হয় তাকে নষ্ট করে দেয়। ইয়োরোপের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে— যখনই ধর্মবিশ্বাসী মানুষ নীতিকথাকে জীবনের বাস্তবে রূপায়িত করতে গেছে, উইন্‌স্ট্যান্‌লির মতো যখন তারা বলেছে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই চান যে, মাটি যারা চাষ করে তারাই হবে মাটির মালিক, তখন হোমরা-চোমরা পাদরিরা শুধু যে ধমক দিয়ে উঠেছে তা নয়, একেবারে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদের পিষে মেরেছে। এ-ব্যাপারে ক্যাথলিক-প্রটেস্টান্ট ভেদাভেদ থাকে নি। রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যে খ্যাতনামা মার্টিন লুথর জার্মানিতে ধ্বজা তুলে লড়েছিলেন তিনিই আবার দেশের চাষীরা জায়গীরদারি অত্যাচার হজম না করে বিদ্রোহ করেছিল বলে তাদের পিষে মারার জন্য অকথ্য ভাষায় প্রচার চালিয়েছিলেন। ধর্মধ্বজীদের সঙ্গে সমাজে যারা কর্তৃপক্ষীয় তাদের ঘনিষ্ঠতা সব দেশে সব সময় দেখা গেছে। ওয়াহাবি (কিংবা ফরাজি) নেতৃত্বে সাধারণ মুসলমান কৃষক যখন মোল্লা আর ওয়াকিফদের বিরুদ্ধে লড়েছে, কিংবা হিন্দু জনতা যখন তারকেশ্বরের মতো বিপুল সম্পত্তির অধিকারী মোহন্তের বিরুদ্ধে লড়েছে, তখন সেই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়।

সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব বিচার করতে গিয়ে আরো দেখা যায় যে সাধারণ মানুষের জীবনে যে অজস্র বিড়ম্বনা, তাকে দূর করার চেষ্টার বদলে স্বীকার করে নিয়ে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্যে কিংবা পরজন্মে সেই দুঃখ, লজ্জা, অপমানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে শান্তি ও সুখের আশ্বাস দিয়ে ধর্ম মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। যীশুখ্রীস্টের ধর্মসমাচারের যে বিবরণ তাঁর প্রধান শিষ্যেরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে তখনকার অর্থব্যবস্থায় যারা ধনী, তাদের সম্পর্কে বারবার কশাঘাত করে কথা বললেও তিনি সকলকে সমাজ ও রাষ্ট্রের নির্দেশ মেনে চলতে বলেছেন আর গরীবকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন যে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হল তারা, ভগবানের আশীর্বাদ তাদেরই উপর পড়ছে। ইসলামের ঐক্য ও সাম্যমন্ত্র জনজীবনের দারিদ্র্য ও গ্লানি মোচন করতে পারে নি বলে বেহেস্ত-এর প্রলোভন দেখিয়ে গরীবকে আমীর-ওমরাহদের হুকুম-বরদারী করানোর ব্যবস্থা সমাজ করে রেখেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে হিন্দু জনতা বাস করে এসেছে, সেই অভাব ও বঞ্চনার জ্বালা উপশমের কাজে জন্মান্তরবাদকে লাগানো হয়েছে— হয় পুণ্যবলে পুনর্জন্মের শিকল থেকে মুক্তি মিলবে, কিংবা ইহজন্মে কর্মফলের অনুপাতে আবার জন্মাতে হবে জীবরূপে, এবং হয়তো শতকোটি জন্মের পর মুক্তি আসবে, মোটামুটিভাবে এই হল

কথা। এর পরিষ্কার অর্থ হল : ইহজীবনে যা কিছু ঘটে তা সহ্য করে যাও; যে নিত্যকর্মপদ্ধতি শাস্ত্রকারেরা স্থির করে দিয়েছেন তা অনুসরণ করে চল; বিধিনির্দিষ্ট ভবিতব্য যা, তা অনিবার্য; সুতরাং যা ঘটছে তার বিরুদ্ধাচরণ ক'রো না; মনে আশ্বাস রেখো যে মায়াময় জীবনে সুখ আর দুঃখ চক্রের মতো বদলে চলেছে; ভুলো না যে সংসারে যা কিছু দেখছ তা হল আসলে অলীক, এই মায়ার জাল কাটিয়ে মোক্ষলাভের চেষ্টাই হল একমাত্র কর্তব্য; তাই দেবদ্বিজে ভক্তি রেখো, রাজাকে মান্য ক'রো; জাতিধর্ম পালন ক'রো এবং শেষ অবধি জেনো, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য, আর "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। সমাজের ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে সকল ধর্মই এইভাবে সাধারণ মানুষের অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষকে প্রশমিত করে রেখেছে, বলে এসেছে পরমকারুণিক পরমেশ্বরের কথা, আর যখন সেই পরমেশ্বরের বিধান অন্যায় ও অনাচারের সমর্থকরূপে লোকচক্ষুর সামনে ফুটে উঠেছে তখন এই বলে সবাইকে বুঝিয়েছে যে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার লীলা হল রহস্যময়, তার গূঢ়ার্থ তো আমরা সবাই বুঝবার আশা করতে পারি না! তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখি যে কোম্পানির আমলে দুঃখী বাঙালির মনের কথা বলেছিলেন রামপ্রসাদ সেন তাঁর উপাস্য কালীকে উদ্দেশ্য করে :—

করুণাময়ি, কে বলে তোরে দয়াময়ী?
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা,
আমার এমনই দশা,
শাকে অন্ন মেলে কই?

কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এবং অপরকে দিয়েছিলেন কালীভক্তির রসে ডুবে আর সব কিছু দুঃখকষ্টের কথা ভুলে। কার্ল্ মার্ক্স্ বলেছিলেন যে ধর্মের মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে দলিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, তিনি বলেছিলেন যে, ধর্মের আফিম গিলিয়ে মানুষকে ঝিমিয়ে রাখা হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে; তাঁর একথা সমাজের ইতিহাসের দিক থেকে একেবারে অকাট্য।

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কবিতা "এবার ফিরাও মোরে" অনেকেরই স্মরণে আসবে। তাতে তিনি বলেছিলেন তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে—

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি এনে যে দৈন্যের কালিমা ঘোচানো সম্ভব, এই যে ধারণা "এবার ফিরাও মোরে"-র রচনাকাল ১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথের মনে নিশ্চয়ই ছিল, তা যেন ১৩৩৮ সালে লেখা তাঁর "প্রশ্ন" কবিতার নির্মূল হতে চলেছিল—

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,

তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

শ্রেণীসমাজের ইতিহাসে ক্রমাগত এই ব্যাপারই লক্ষ করা যায় যে, মুষ্টিমেয় যারা তারা সমাজপতি সেজে শুধু নিজেদের স্বার্থে দুনিয়ার খোলা হাওয়াকে বিষিয়ে দিচ্ছে, আলোকে পর্যন্ত নিভিয়ে দিচ্ছে, আর তাদের বিরুদ্ধে যাতে অভ্যুত্থান না ঘটে তাই সাধারণ মানুষকে ধর্মের বুলি শুনিয়ে, নীতিকথা আউড়ে, আর হাজার ফন্দিফিকির খাটিয়ে মোহমুগ্ধ করে রাখছে। যুগে যুগে মানুষ এ অনাচার মানতে অস্বীকৃত হয়েছে, যুগে যুগে শোনা গেছে বিভিন্ন সুরে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথেরই কথা :

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে : "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"—ওঠো, জাগো। উপনিষদে বলা হয়েছে, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, গতিবেগকে স্তিমিত ক'রো না, পথচারি, এগিয়ে চলো। দুঃখের শৃংখল ভাঙতে বেরিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ, আর বহু তপশ্চর্যার পর বললেন, পথ আছে মাত্র এক, মুক্তি যদি পেতে হয়, নির্বাণের মধ্যে সকল গ্লানির অবসান যদি ঘটাতে হয় তো অষ্টমার্গ অনুসরণ করতে হবে, পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে সত্যসন্ধ হতে হবে, অন্যায়কে বর্জন করতে হবে, লোভ-জটিল সংসারবন্ধনকে পরিহার করতে হবে। কত মহাজন এলেন গেলেন, জগতের সর্বত্র তাঁদের কণ্ঠ উত্তোলিত হল— তাঁদের বিবরণ দেওয়া এ রচনার উদ্দেশ্য নয়, সে বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু যে দারিদ্র্যকে "পর্যায়মরণ" বলে মহাভারতকার ধিক্কৃত করেছিলেন, সেই দারিদ্র্য দূর হল না, সমাজ রয়ে গেল মুষ্টিমেয়ের কর্তৃত্বে, দেশের দৌলতে মেহনতী মানুষ ভাগ পেল না, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"— এই মহিমামণ্ডিত ঘোষণা কবিকল্পনাই থেকে গেল। দাসপ্রথা গিয়ে এল জায়গীরদারি ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র নানারূপে ইয়োরোপে ও এশিয়ায় দেখা দিল, তারপর যন্ত্রযুগের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল— কিন্তু ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে মানুষ এগিয়ে চলতে থাকলেও শ্রেণীশাসনের অবসান ঘটল না, বহুজনকে শোষণ করে সংখ্যাল্প প্রভুশ্রেণীর কর্তৃত্ব শেষ হল না। যন্ত্রযুগ প্রবর্তিত হওয়ার পর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, দুঃখ দৈন্য, অভাব অনটন বিধি-নির্দিষ্ট ভবিতব্য নয়, মানুষ উৎপাদন কৌশলে বাস্তব জীবনের ক্লেশ ও গ্লানি নিরসন করতে পারে। তাই উনিশ শতকের প্রথমে ইয়োরোপে সমাজবাদ ("সোশালিজ্‌ম্") প্রচারে কয়েকজন মহামতি অগ্রণী হলেন। ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন, ফ্রান্সে ফুরিয়ে, স্যাঁ-সিমঁ প্রভৃতি বলতে থাকলেন যে ধনিক ব্যবস্থার গলদ এত বেশি ও এত অসহ্য যে সোশালিজ্‌মের উৎকর্ষ প্রচার করলেই সবাই বুঝবে যে সোশালিজ্‌ম্ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আদর্শ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে, কিংবা ফুরিয়ে ও স্যাঁ-সিমঁ-র বহু শিষ্যের মতো আমেরিকায় অনেকটা জমি নিয়ে নিজেদের আস্তানা গড়ে বাকি সবাইকে সোশালিজ্‌মের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে যুক্তির দিক থেকে সোশালিজ্‌ম্‌কে খণ্ডন করা যখন সম্ভব নয় এবং দারিদ্র্যসমস্যা সমাধানে ধনতন্ত্রের

অক্ষমতা যারা সুবুদ্ধি ও বিবেচক তাদের কাছে যখন স্পষ্ট, তখন শুধু যুক্তির জোরে আর কয়েকটা সোশালিস্ট কায়দায় পরিচালিত আস্তানার উদাহরণ দেখিয়েই সোশালিজম্ প্রতিষ্ঠা করা চলবে। শ্রেণীসমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন বলে সেই সমাজের রূপান্তর কেমন করে ঘটানো যায় তা তাঁরা জানতেন না। মানুষের বুদ্ধিবিবেচনার উপরই তাঁরা নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁদের শেখায় নি যে শ্রেণীশাসনকে দূর করতে হলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত মেহনতী মানুষকে সংহত করা ভিন্ন পথ নেই। তত্ত্বের ছটা যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, কর্মের সঙ্গে তার সমন্বয় বিনা যুগান্তর আসতে পারে না। তত্ত্ব হিসাবে সোশালিজম্ যতই অকাট্য হোক, চিন্তার দিক থেকে সোশালিজমের উৎকর্ষ যতই অনস্বীকার্য হোক, মানবতার সঙ্গে সোশালিজমের সামঞ্জস্য যতই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক হোক, সমাজে যারা কর্তৃত্ব করছে তারা যে কখনো প্রচণ্ড প্রতিরোধ না করে একতিল জায়গা ছাড়বে না, তাদের গদি থেকে টেনে নামাতে হলে যে শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় সমগ্র বঞ্চিত জনতাকে সুদীর্ঘ সংগ্রাম করতে হবে, শুধু অর্থনীতি ও রাষ্ট্র ব্যাপারে নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনই অনলস সংগ্রাম করে যেতে হবে— একথা আকাশচারী (utopian), স্বপ্নবিলাসী সোশালিস্টরা বোঝেন নি। একথা বুঝেছিলেন এবং অমিত তেজে প্রচার করেছিলেন মহামতি কার্ল মার্ক্স্ (১৮১৮-৮৩) এবং তাঁর আজীবন সহচর ও সহকর্মী ফ্রেডরিক্ এঙ্গেল্স্ (১৮২০-৯৪)।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শিক্ষা দিলেন যে বিপ্লব সংঘটনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর যে পার্টি একান্ত প্রয়োজন, তার কাজ নূতন সমাজের পরিকল্পনা খাড়া করা কিংবা ধনিক ও তাদের অনুচরদের কাছে শ্রমিকের দুঃখ দূর করার জন্য অনুনয় বিনয় করা আর নীতিকথা শোনানো নয়, গোপন ষড়যন্ত্র করে যাওয়াও তার কাজ নয়; আসল কাজ হল শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামকে সংগঠিত ও পরিচালিত করা, এবং আসল উদ্দেশ্য হল শ্রমিকশ্রেণীর জোরে রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে সোশালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মার্ক্সের এই শিক্ষা মানুষের ইতিহাসে যুগান্তর এনে দিয়েছে। সমাজের বিকাশ কি ভাবে ঘটে তার সন্ধান হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পায় নি। মার্ক্স্ প্রথম সেই বিকাশের বিধান আবিষ্কার করলেন। তিনি শেখালেন যে প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সমাজবিকাশের বিধানের তফাৎ হল এই যে প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের ইচ্ছা বা কর্মের উপর নির্ভর করে না কিন্তু সমাজের বিকাশ ঘটে বিশাল জনতার কাজের মধ্য দিয়ে— যুগ থেকে যুগান্তর আসে যখন সমাজের ভিতরকার অসঙ্গতিকে আর কিছুতেই চাপা দিয়ে রাখা যায় না। তাই মার্ক্স্ দেখালেন যে ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় অনিবার্য এবং এর ফলে সমাজের মধ্যে পরস্পরসম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবীরূপে সঞ্জাত হচ্ছে, তার পরিণতি হল সোশালিস্ট বিপ্লবে। তিনি আরো দেখালেন যে ধনতন্ত্রের অবসান সমাজ বিবর্তনের বিধান অনুযায়ী একেবারে অবধারিত হলেও অন্ধ নিয়তির মতো তা ঘটবে না— সেজন্য চাই কঠোর প্রস্তুতি ও সংগ্রাম, চাই অতীতের গ্লানি দূর করে প্রদীপ্ত ভবিষ্যৎকে আবাহনের আয়োজন।

সেই আয়োজন আজ দেশে-দেশে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, শ্রেণী শাসনের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে শ্রেণীহীন সমাজের আলো দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আজ "কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের" বজ্রবাণী চারদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : "কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে

শাসকশ্রেণী কাঁপতে থাকুক। যারা শ্রেণী হিসাবে নিঃস্ব, সর্বহারা, তাদের শৃংখল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করবার জন্য রয়েছে সারা জগৎ। সব দেশের মেহনতী মানুষ, এক হও!"

"নাই অন্য পথ"

আমরা হবুচন্দ্র রাজা আর তার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর অনেক উদ্ভট কাণ্ডকারখানার গল্প শুনেছি, কিন্তু সে-তুলনায় আজকের দিনে ধনতন্ত্রের আওতায় যে সব ব্যাপার ঘটে তা বড়ো কম আজগুবি নয়। এক সময় ছিল যখন শিল্পে যন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করতে পারার ফলে ধনতন্ত্রের কৃতিত্ব ছিল অভূতপূর্ব। মার্কস্ (এবং এঙ্গেল্স্) জগদ্বিখ্যাত "কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে" (১৮৪৮) লিখেছিলেন : "বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের এক শতাব্দীও ঠিক পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে তারা উৎপাদন শক্তির এমন বিরাট ও প্রচুর প্রসার এনেছে, যার তুলনা আগেকার সকল যুগকে একত্র করলেও মেলে না। প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের দাস করে তোলা, যন্ত্রের ব্যবহার, শিল্প ও কৃষিকার্য, রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্পশক্তির সাহায্যে জলযাত্রা, রেলপথ, ইলেকট্রিক, টেলিগ্রাফ, চাষবাসের জন্য গোটা মহাদেশ সাফ করে ফেলা, খাল কেটে নদীকে কাজে লাগানো, ভেল্‌কিবাজির মতন যেন মাটি ফুঁড়ে বহু জনের আবির্ভাব—(সংঘবদ্ধ) সমাজের পরিশ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদনশক্তি ঘুমিয়ে ছিল, আগেকার কোনো এক শতকে কি এর আভাস মাত্র পাওয়া গেছে?' তার পরে একশো বছরে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব অনেক বেড়েছে, আণবিক শক্তিকে উৎপাদনে লাগাবার যে সম্ভাবনা আজ স্পষ্ট তাতে অসাধ্যসাধনই সহজে সম্ভব। কিন্তু সমাজবিকাশের যে অমোঘ নিয়ম মার্কস্ আবিষ্কার করেছিলেন, সেই নিয়মেই বুর্জোয়া শ্রেণী অপরিসীম শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেই শক্তিরই ফাঁদে আটক হয়ে পড়েছে, আর বুর্জোয়া সমাজদেহ থেকে উদ্ভূত শ্রমিকশ্রেণীর সর্বব্যাপ্ত আক্রমণে শঙ্কিত হয়ে এবং নিজের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির ঐকান্তিক চেষ্টায় সেই শক্তিকেই নষ্ট করছে। আজ তাই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার "গোড়ায় গলদ" ধরা পড়ে গেছে, সে-ব্যবস্থা যে কত দেউলিয়া তা প্রতিনিয়ত প্রমাণ হচ্ছে, সে-ব্যবস্থার যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই তাই সবার চোখে ধরা পড়ছে, ধনতন্ত্রের বিপুল প্রবঞ্চনাকে তাই সাধারণ মানুষ আর বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

সভ্যতা আজ এমন একটা স্তরে উপস্থিত হয়েছে যে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ অতি সহজে উপভোগ করতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) যখন শেষ হয়, তখন মস্ত বড়ো শিল্পপতি লর্ড লীভরহিউম্ ("সান্‌লাইট" ও অন্যান্য সাবান কারখানার মালিক) হিসাব করে বলেছিলেন যে তখনকার দুনিয়ার উৎপাদনশক্তিকে ঠিকভাবে সংগঠিত করলে মানুষ সপ্তাহে মাত্র এক ঘণ্টা কাজ করলেই তার খাওয়া-পরা এবং বেঁচে থাকার অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে পারে। ১৯৩২ সালের ২০শে জুন তারিখে বিলাতের "রয়াল সোসাইটি অফ্ আর্ট্‌স্"-এর সভায় এক ইঞ্জিনিয়ার তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন যে ১৯১৮ সালে লর্ড লীভরহিউমের হিসাব নির্ভুল ছিল, তবে তারপর চোদ্দ বছরে উৎপাদনশক্তির সম্ভাবনা আরো দ্বিগুণ

বেড়েছে, অর্থাৎ মানুষের হাতে যে শক্তি রয়েছে, তার পুরো ব্যবহার করলে সপ্তাহে আধ ঘণ্টা খাটুনি দিয়েই মোটামুটি সব দরকার মিটানো যায়। ১৯৩১ সালে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ফিশর তাঁর বিষয়ে আর একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত স্যর্ জর্জ নিব্‌স্-এর (Knibbs) মত উদ্ধৃত করে বলেন যে তখন সব দেশ মিলে পৃথিবীর যে সম্পদ ছিল এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে যে কৌশল আয়ত্ত ছিল, তারই জোরে সহজে তখনকার পৃথিবীর লোকসংখ্যার চারগুণ লোককে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের ব্যবস্থা জুগিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল। ১৯৩৫ সালে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দেশের শিল্প ও কৃষির উৎপাদনক্ষমতা পরিমাপের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করে তার রিপোর্টে দেখা যায় যে, আমেরিকায় উৎপাদনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে তার উৎপন্ন ফল প্রত্যেক পরিবারের (একটি পরিবারে চারজন পোষ্য) মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিলে তারা পাবে বছরে ৯১৫ পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় ১৩ হাজার টাকা। এই হিসাব যখন হয়েছিল তখন আমেরিকায় আর্থিক সংকট চলছিল, প্রায় ত্রিশ লক্ষ শিশু স্কুলে যেতে পারছিল না অথচ আড়াই লক্ষ শিক্ষক ছিল বেকার, আর চাষের জমিকে পতিত করে রাখা হচ্ছিল ; গম, তামাক, কফি প্রভৃতির চাষ বন্ধ করা হচ্ছিল, বাজারে মাংসের সরবরাহ বেশি হয়ে যাচ্ছিল বলে জানোয়ারদের মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল! ১৯২৯-৩৪ সালে ক্রমাগত দেখা গেল যে দুনিয়ার দেশে দেশে (এবং খাস আমেরিকাতে পর্যন্ত) মানুষ যখন খাওয়া-পরা নিয়ে নিতান্ত দুর্দশায় রয়েছে তখনই তুলো, কফি, গম, মাছ, মাংস, কমলালেবু প্রভৃতি নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, আর এই পাগলামির কারণ হল যে মোট সরবরাহের পরিমাণ কমালে দর বাড়বে, সুতরাং গরীব খেতে পরতে নাই পাক্ মুনাফাখোরদের পেট আরো মোটা হবে। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু বাস্তবিকই ১৯৩১-৩৩ সালে ব্রেজলির কফি ব্যবসার পুঁজিপতিরা ২ কোটি ২০ লক্ষ বস্তা কফি সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। ১৯৩৩ সালে গ্রীষ্মকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ হুকুম দেয় যে তুলোর চাষ বন্ধ রাখলে প্রত্যেক 'একর' (অর্থাৎ আড়াই বিঘা) জমি পিছু সাত থেকে বিশ ডলার (ত্রিশ থেকে নব্বই টাকা) বখ্‌শিস্ দেওয়া হবে। ১৯৩৪ সালে বিলাতের লিভারপুল বন্দরের কাছে দশ লক্ষ কমলালেবু সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। অথচ বিলাতের গরীবদের মধ্যে অনেকেই কমলালেবুর স্বাদ কেমন তাই জানে না, কিনে খাওয়ার পয়সা নেই বলে। এ-ধরনের আরো অজস্র খবর দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। আমরা তো প্রায়ই শুনি যে উৎপাদন বড়ো বেশি হয়ে ("over-production") গেছে—সাধারণ মানুষের পেটে অন্ন নেই, পরনের বস্ত্র নেই, কিন্তু খাদ্য আর বস্ত্রের উৎপাদন নাকি অতিরিক্ত হয়েছে! উৎপাদনের উদ্দেশ্য যখন মালিকের মুনাফার পাহাড়কে যথাসম্ভব উঁচু করে তোলা, তখন এ-রকম ব্যাপার ঘটবে-ই। উৎপাদন যখন চলবে মানুষের চাহিদা মিটাবার জন্য আর সমাজজীবনে কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, তখন এই বিকট অসঙ্গতির অবসান ঘটবে। ১৯৪০ সালে এক বক্তৃতায় বৈজ্ঞানিক জুলিয়ন্ হক্সলি (যিনি আজ সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের হয়ে ওকালতি করতে কুণ্ঠিত নন্) বলেছিলেন যে অল্প খরচাতেই আজ মানুষের ওজন বাড়ানো যায়, স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটানো যায় আর প্রত্যেককে আরো দু' ইঞ্চি লম্বা করে তোলা যায়। সে-খরচা করা দূরে থাক, পেট পুরে খাওয়ার সংস্থান আজো আমাদের মতো দেশের অধিকাংশ লোকের নেই। ১৯৩৩ সালের সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে এ দেশের চিকিৎসা বিভাগের বড়ো কর্তা স্যর্ জন্ মেগো-র হিসাবে শতকরা মাত্র ৩৩ জন মোটামুটি ভালো খেতে পায়, কিন্তু

বাংলাদেশের অবস্থা আরো শোচনীয় বলে এখানে ভালো খাবার সংস্থান রাখে শতকরা শুধু ২২ জন। তখনকার তুলনায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি তেমন হয় নি; আয় অবশ্য কিছু বেড়েছে, কিন্তু ব্যয় বেড়েছে আরো বেশি। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালোর শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড্ নেশন্সের) খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের (F.A.O.) এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের যে আঞ্চলিক সভা হয় সেখানে জানা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে জনসাধারণের খাদ্যের পরিমাণ রীতিমত কমে গিয়েছিল; তারপরে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা কিছুটা হওয়ার ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে বটে, কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও যুদ্ধের পূর্বে মাথা পিছু গড়ে যে খাদ্য উৎপন্ন হত তা হবে না, যদিও যুদ্ধের আগে পুষ্টিকর খাবার যে সকলের মিলত তা একেবারেই নয়। এদেশের লোক যে খেতে পাচ্ছে না, এই সুস্পষ্ট সত্যকে সরকারি রিপোর্টও অস্বীকার করতে পারে না।

যে ভারতবর্ষে প্রাচীন ঋষিরা মানুষকে "অমৃতের পুত্র" বলে আহ্বান করেছিলেন, সেই ভারতবর্ষে মানুষের দুঃখ দুর্দশা যন্ত্রণার অবধি নেই। পেটের দায়ে তাকে মাথায় করে মোট বইতে হয়, জানোয়ারের মতনই মাল বোঝাই গাড়ি ঠেলতে হয় কি সওয়ারি-সমেত রিক্শ' টানতে হয়, আস্তাকুঁড়ে উচ্ছিষ্ট খুঁটে খেতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন গুজরানের মতো রোজগার তার হয় না। যন্ত্রের যুগে, বিজ্ঞান যখন প্রকৃতিকে পরাভূত করছে, তখন এদেশের লোকের অবস্থা ভালো না হয়ে যেন মন্দের দিকেই চলেছে। ইংরেজ আমলের আগে এদেশের অবস্থা খারাপ ছিল প্রমাণ করবার জন্য কোমর বেঁধে লাগার পর সিভিলিয়ান মোর্‌লন্ড্ সাহেব তাঁর "India at the death of Akbar" এবং "From Akbar to Aurangzeb", এই দুই কেতাবে স্বীকার বাধ্য হয়েছিলেন যে আকবরের যুগের তুলনায় বর্তমান কালের ভারতবাসীদের আয় মোটের উপর বাড়েও নি, কমেও নি। ইংরেজ শাসন আরম্ভ হওয়ার আগে তখনকার পৃথিবীর মানদণ্ড অনুসারে যে ভারতবর্ষে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হয়েছিল, একথা সবাই স্বীকার করে থাকে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ এমন যে এদেশে আধুনিক কায়দায় শিল্পোন্নতির পূর্ণ সম্ভাবনা যে ছিল এবং আছে, তা-ও অকাট্য। কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রের চরম রূপ, তারই শাসনে থেকে আমাদের দুর্দশার অন্ত রইল না— এখনো সেই সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার জের টেনে "স্বাধীন" ভারত চলছে বলে প্রকৃত উন্নতি ঘট্‌ছে না, ধনিক ব্যবস্থার অভিশাপ একেবারে অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার সম্ভাবনা নেই।

অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ তো দূরের কথা— এই হল আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা। কিছুকাল আগে এক সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে বোম্বাইয়ের মজদুরদের মধ্যে ৯৭ জন এক-ঘর বাসায় থাকে, প্রায়ই এক ঘরে দুই পরিবার বাস করে, কখনো কখনো সাত আটটি পরিবারও একত্র একটি মাত্র ঘরে মাথা গুঁজে থাকতে বাধ্য হয়। আহ্‌মদাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ, ঝরিয়া, হাওড়া, কলকাতার শহরতলী ও বস্তি সর্বত্রই ঐ একই অবস্থা। একটু আধটু উন্নতি যেখানে হয়েছে, সেখানে বলতে ইচ্ছা করে যে শালগ্রাম শিলার শোওয়া আর বসা হল একই ব্যাপার? "দরিদ্র নারায়ণের" সেবা এদেশে এই ভাবেই চলেছে।

কয়েক বছর আগে বোম্বাইয়ের সরকারি "লেবর গেজেট' পত্রিকায় এক লেডি-ডাক্তারের লেখা প্রকাশ হয়েছিল। তা থেকে এইটুকু তুলে দিলেই হবে :" একটি 'চলের'

তিন তলায় দৈর্ঘ্যে ১৫ আর প্রস্থে ১২ ফুট এক ঘরে দেখলাম যে ছ'টি পরিবার একত্র বাস করছে। আমার খবর যে ভুল নয় তার প্রমাণ এই যে ঘরে ছ'টি আলাদা উনান ছিল। প্রশ্ন করে জানলাম, ঐ ঘরে বাস করে সর্বসমেত ৩০টি প্রাণী। যে ছ'জন স্ত্রীলোক সেখানে বাস করত, তাদের মধ্যে তিন জনের তখন সন্তান সম্ভাবনা লক্ষ করলাম। শুনলাম যে ঐখানেই নাকি প্রসবের ব্যবস্থাদি করতে হবে। চট্ ঝুলিয়ে প্রত্যেক পরিবার নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করে।" দারিদ্র্যের দিক থেকে এখনো সত্যই বলা যায় এদেশ সম্বন্ধে— 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'! তাই শিশুমৃত্যুর হার এখানে বিলাতের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি। কিছুকাল আগেকার হিসাব অনুসারে কলকাতা শহরে এক বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই হাজার করা ২৩৯টি শিশুর মৃত্যু ঘটে, বোম্বাইয়ে ২৪৮, মাদ্রাজে ২২৭। গরীবদের প্রতি যমরাজের যে বিশেষ পক্ষপাত, তার প্রমাণ এই বোম্বাই শহরে যারা একটি মাত্র ঘরে বাস করে তাদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হাজার করা ৫৭৭ ; যারা দুটো ঘর নিয়ে আছে, তাদের মধ্যে ২৬৪ ; আর হাসপাতালে ব্যবস্থা অনেক ভালো বলে হার হচ্ছে ১০৭।

সারা ভারতে প্রতি বৎসর যত লোক মারা যায় তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দেওয়া হয়— "জ্বর"। এই "জ্বর" কিম্বা বসন্ত, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদির আসল কারণই হল দারিদ্র্য। ক্ষয়রোগ যে আজ দেশে একটা বিকট পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তার প্রকৃত কারণ যে দারিদ্র্য, পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার অভাব, তা সকলেই স্বীকার করে। এ-সব কথা ঠাণ্ডা-মাথা পণ্ডিতেরাই বলে থাকেন, যাদের হুজুগকারী বলে কর্তৃপক্ষ উড়িয়ে দেয় শুধু তারা নয়।

১৯২৭-২৮ সালে বাংলার স্বাস্থ্যবিভাগের সরকারি বড়কর্তা ডাক্তার বেন্ট্‌লী বলেছিলেন যে এখানকার চাষীদের যা খোরাক তাতে একটা ইঁদুর পাঁচ হপ্তা বাঁচে কিনা সন্দেহ, আর এই জন্য ম্যালেরিয়া আর হাজার ব্যারাম প্রতিরোধ করতে তারা পারে না। ১৯৩৩ সালে সারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে সরকারি স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে এই কথাই বলা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে "পঞ্চাশের মন্বন্তরে" বাংলাদেশের ৩৫ লক্ষ মানুষ যে না খেয়ে মারা যায় তার প্রকৃত কারণ হল এই অবস্থা। আজো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে সরকারি প্রচারকরা বগল বাজাতে থাকলেও সর্বসময়েই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে দারুণ অন্নাভাব লেগেই থাকে, আর সর্বত্র এদেশের মেহনতী মানুষকে সর্ববিধ অভাবের তাড়নায় উত্যক্ত হয়ে থাকতে হয়।

অতি সম্প্রতি, ১৯৫৪ সালে, বোম্বাইয়ের কাপড়কলের মজুরদের বেতন কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে একটা অনুসন্ধান হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী, আর দুই নাবালক শিশু নিয়ে যে মজুর পরিবার, আজ তার পক্ষে বেঁচে থাকার উপযোগী ("Living wage") রোজগার হল মাসে অন্তত ১৭৫ টাকা। এটা পোলাও-কালিয়া-মণ্ডা খেয়ে থাকার মতো রোজগার নয়; নিতান্ত যে দরকারগুলো না মেটাতে পারলেই নয়, সেই দরকারের হিসাব থেকে ঐ সংখ্যা স্থির করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের কাপড়কলে যে মজুর কাজ করে, দেশের অধিকাংশ মেহনতী মানুষের তুলনায় তার রোজগার বেশি; সরকারি হিসাবে মাগ্‌গী ভাতা সমেত গড়ে তার মাসিক রোজগার (যখন অবশ্য পুরো কাজ থাকে) হল ১০৫্ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালের সরকারি হিসাবে ভারতবাসী প্রত্যেকের গড়ে মাথা পিছু রোজগার হল বছরে ২৬৫্ টাকা; অর্থাৎ চারজনের এক পরিবারের মাসিক আয় ৮৮ টাকা মাত্র। বোম্বাইয়ের কাপড়কল মালিকরা বলছে যে দু'লক্ষ শ্রমিককে বেঁচে থাকার মতো পারিশ্রমিক ("Living

wage'') দিতে হলে তাদের লালবাতি জ্বালিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হবে। শ্রমিক কর্মচারী ও অন্যান্য শ্রমজীবীরা সবাই জানে যে মালিকের কাছে কিংবা সরকারের দরবারে বেঁচে থাকার উপযোগী পারিশ্রমিক দাবি করলে জবাব মেলে যে তা সম্ভব নয়। ইউনিয়ন কিংবা কৃষক সভা মারফৎ দাবি উঠলে এই অভিজ্ঞতা সর্বদাই হয়ে থাকে। আকাশের চাঁদ চাওয়া নয়, শুধু মাত্র বেঁচে থাকার মতো রোজগারের আশা করা এই পুঁজিদারী আমলে অচল। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ যখন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার ক্ষমতা পেয়েছে, তখন সচেতন শ্রমিক কেন এই যন্ত্রণা সইতে থাকবে?

ভারতবর্ষের মতো দেশের দারিদ্র্য ও দুঃখের বর্ণনা দিতে গেলে মহাভারত লিখতে হয়। অথচ কোনো কারণ নেই আজকের দুনিয়ায় এ-ধরনের দুঃখ, দৈন্য, গ্লানিকে কায়েম রাখার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ একেবারে দেউলিয়া, সোশালিস্ট সমাজে সাধারণ মানুষের বিস্ময়কর অগ্রগতি আজ অবিসম্বাদী সত্য, দেশে দেশে মেহনতী জনতার মধ্যে চেতনার বিস্তৃতি ও শক্তি আজ অকাট্য। এমন অবস্থায় পুঁজিবাদী দুনিয়ার যারা কর্তা তারা যে মরিয়া হয়ে ক্ষমতা বজায় রাখতে চাইবে আর সেজন্য মুহূর্তের সংকোচ না করে যুদ্ধের আবর্তে পৃথিবীকে ঠেলে দিতে তৈরি থাকবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিছুকাল আগে একজন হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে সর্বসমেত খরচ হয়েছিল ৮০০০ কোটি পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় ১,১২,০০০ কোটি টাকা। ঐ টাকাটা ভস্মে ঘি ঢালার মতো অপব্যয় না করে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খরচ করা যদি কর্তাদের মর্জি হত (যা ধনিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়), তা হলে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম আর রাশিয়ার প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ বিঘা জমির উপর সাত হাজার টাকার এক বাড়ি আর আড়াই হাজার টাকার আসবাবপত্র দেওয়া চলত। তা ছাড়া যা উদ্‌বৃত্ত থাকত, তা থেকে যে যে শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষের বেশি, সেই সেই শহরে দেড় কোটি টাকা দিয়ে লাইব্রেরি আর তিন কোটি টাকা খরচ করে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা যেত। ১৯৩৫ সালে জাতিসংঘের হিসাবে দেখা যায় যে যুদ্ধসজ্জার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ খরচ করেছিল মোট ৮৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড। পাঠক যদি রোজ দুই পাউন্ড (অর্থাৎ ২৭৷২৮ টাকা) খরচ করে যান, তা হলে ঐ টাকা নিঃশেষ হতে দশ লক্ষ বৎসর লেগে যাবে! ঐ টাকাকে মোহর বানিয়ে যদি কেউ গুনতে বসে, তা হলে ২৬ বৎসর ধরে তাকে গুণে যেতে হবে। এই দারুন অপব্যয় হয়ে থাকে যুদ্ধ আর যুদ্ধের আশংকা এবং সেই অনুপাতে আয়োজনের দরুণ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা দুনিয়ার দৌলত তৈরি করছে তাদের মেহনতে গড়া ঐশ্বর্যের ব্যবহার এভাবে হয়ে থাকে।

১৯৩৭ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার পূর্বেই, সারা দুনিয়াতে যুদ্ধের উদ্যোগ বাবদ খরচ হয় ২০০ কোটি পাউন্ড। ১৯৩৯-৪৫ সালে যুদ্ধ যখন চলছিল, তখন কত টাকা যে খরচ হয়েছিল তার কোনো ইয়ত্তা নেই। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষে যারা মরছিল তাদের মুখে অন্ন দেবার সঙ্গতি যে সরকারের ছিল না, সে-সরকার যুদ্ধের খরচ এক পাই কমাতে চায় নি। কিন্তু যুদ্ধের সময়কার খরচের দিকে ছাড়া অন্য এক দিকে নজর দেওয়া খুব দরকার—তা হল পুঁজিদারদের মুনাফার দিকে। এদিকে তাকালে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়—অর্থের লোভ যে মানুষকে পিশাচে পরিণত করতে পারে, তা বোঝা যায়।

আজ যারা দুনিয়া জুড়ে লড়াই বাধাতে চাইছে, সোভিয়েট আর চীন প্রভৃতি দেশকে ধ্বংস

করার জন্য লালায়িত, তারা জানে যুদ্ধের নৃশংসতা আজ কত ব্যাপক, কত মর্মান্তিক। কিন্তু সব ছাপিয়ে তাদের মনে রয়েছে মুনাফার আশা, সারা পৃথিবীকে নিজেদের মুনাফার দিক থেকে একেবারে নিরাপদ বানাবার মতলবে তারা আধুনিক যুদ্ধের অকথ্য নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়।

এখনো যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়লে শেয়ার বাজারে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, শান্তির শক্তি বৃদ্ধি ঘটলে শেয়ারের দর পড়ে যায়, বাজার হয় মন্দা, লাভে পড়ে ঘাটতি, আর শান্তির জন্য যারা লড়ছে, মানুষের জীবনে শান্তি আনার জন্য যারা ব্যস্ত, তাদের মুণ্ডপাত করে শেয়ার বাজার এবং টাকার খেলার অন্যান্য ক্ষেত্রের বড়োকর্তারা। আবার যাঁরা অর্থনীতিবিদ বলে খ্যাত, মোটা মোটা কেতাব যাঁরা লেখেন আর কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেন, তাঁরাও প্রায় সকলে এই যক্ষমনোবৃত্তিকে সমর্থন করে থাকেন, তাই সুজন এবং সুধী বলে জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড্ কেন্স্ ১৯৩৩ সালে তাঁর "The Means of Prosperity" গ্রন্থে লেখেন : "যাঁরা আবেগে গা ভাসান না তাঁদের সিদ্ধান্ত হল এই যে ব্যবসাক্ষেত্রে বড়ো দরের যে পড়তির ঝোঁক চলছে তার অবসান ঘটাতে পারে একটা যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।" মোটামুটি একই সময়ে নিউ ইয়র্কের আর্থিক পত্রিকা "অ্যানালিস্ট্"-এ বলা হয়েছিল যে শিল্পের উদ্ধার ঘটাবে যে যুদ্ধ তারই প্রত্যাশা আমেরিকান বণিকেরা করছে।

নিছক নিজেদের স্বার্থের দিক থেকে তাদের প্রত্যাশা যে একেবারে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ ভূরি ভূরি মিলেছে। সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাঁচ বৎসরে আমেরিকার একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা মুনাফা করে ১০৭০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৫০০০০ কোটি টাকা। এই অর্থের পরিমাণ হল ১৯৪০ সালে সে দেশের সমগ্র শিল্পের মূলধনের চেয়ে বেশি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই মুনাফার পাহাড় ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন চলে, আর যাকে বলা হয় "ঠাণ্ডা লড়াই" সেই কাণ্ড চালিয়ে যুদ্ধের আবহাওয়াকে জিইয়ে রাখা হয়। এর ফলে আবার আমেরিকান পুঁজিদারের দল লাভের 'হরির লুঠ' জোগাড় করল, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ এই পাঁচ বৎসরে ১৫৮০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ ৭৬০০০ কোটি টাকারও বেশি মুনাফা করে। এই যে চমৎকার লাভের রাস্তা (splendid business trend) তারা বার করেছিল, তাকেই আরো পাকা করার জন্য কোরিয়াতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণ চালায়, আর বিদেশে পাঁচশো সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে, সারা দুনিয়াকে কব্জা করার কাজে নামে।

প্রাচীন যুগে রোমের আইনবিশারদরা বলতেন যে যদি অপরাধীকে পাকড়াও করতে হয় তো অপরাধের ফলে লাভ কারা করছে, তাদের খোঁজ নেওয়া দরকার ('facit cui prodest')। যুদ্ধ আর যুদ্ধের উদ্যোগ থেকে ধনিকের দলই যে প্রচুর লাভ করে, তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। ভারতবর্ষে যিনি সম্প্রতি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেই মিস্টার চেস্টার বোল্‌স্ কিছুকাল আগে লিখেছিলেন যে আমেরিকার বড়ো কারবারীরা ১৯৩৯ সালে লাভ করেছিল ৬৫০ কোটি ডলার, ১৯৪৪ সালে ২৪৩০ কোটি ডলার আর ১৯৫১ সালে ৫০০০ কোটি ডলারেরও বেশি। এর মানে হল যে যুদ্ধের সময় লাভের যে হার ছিল তার চেয়ে ১৯৫০ সালে শতকরা দু'শোরও বেশি বেড়েছে। ১৯৫২-৫৩ সালে এই ধারাই চলতে থাকে—১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে আগের বৎসরের তুলনায় লাভের হার বাড় শতকরা পঁচিশ। যুদ্ধের চিন্তাই যখন মানুষের মনকে দখল করে বসে আছে, তখনই যে ব্যবসা ফেঁপে

ওঠে সব চেয়ে বেশি, এ-কথা "Nations Business" নামে আমেরিকান বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ("চেম্বার অব কমর্স") মুখপত্রেই বলা হয়েছিল।

কোরিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, কিনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা প্রস্তুতিতে অগাধ অর্থব্যয় করেছে এবং করছে আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র, আর সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে তাদের খরচ হয়েছে যুদ্ধের খরচের তুলনায় নগণ্য। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়র এক বক্তৃতায় জানান যে আমেরিকায় প্রত্যেক তিন ডলারের মধ্যে দু'ডলার খরচ হচ্ছে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। তাই আশ্চর্য হলে চলবে না যে ১৯৫০-এ ১৮০০ কোটি ডলারের তুলনায় ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেটে যুদ্ধ এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৬৩০০ কোটি ডলার। আশ্চর্য হলে চলবে না যে সোভিয়েটে এবং অন্যান্য যে সব দেশে সোশালিস্ট সমাজ গড়ে উঠছে, সেখানে জনকল্যাণকর হাজার পরিকল্পনা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আশ্চর্য হলে চলবে না যে ১৯৫২ সালে সোভিয়েট বাজেটে যুদ্ধের খরচের জন্য বরাদ্দ ছিল শতকরা ২৩.৬, আর ১৯৫৩ সালে সেই হার নেমে দাঁড়ায় ২০.৮। যুদ্ধের আশংকা না থাকলে, এই অর্থও সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা চলত। কিন্তু যতদিন ধনতন্ত্র আর তার চরম সংস্করণ সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটছে, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা একেবারে নিঃশেষ হতে পারে না বলেই সোভিয়েটকে কিংবা চীনকে যুদ্ধের খাতে অর্থ বরাদ্দ করতে হচ্ছে।

১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লব ঘটার পরই শান্তি সম্বন্ধে লেনিনের নেতৃত্বে যে ঘোষণা প্রচারিত হয়, তাতে বলা হয়েছিল যে যুদ্ধ হল "মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ"। ১৯৫১ সালে যখন সাম্রাজ্যবাদীরা অ্যাটম্ বোমার হুমকি দিয়ে জগৎ জয়ের স্বপ্ন দেখছিল, তখনই সোভিয়েটে আইন পাশ করে বলা হয় যে যুদ্ধের পক্ষে যদি কেউ সোভিয়েট দেশে প্রচার চালায় তো তার বিচার এবং কঠোর শাস্তি হবে। যুদ্ধ বিনা সাম্রাজ্যবাদ বাঁচে না, পররাজ্য গ্রাস করে আর বিদেশে অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে শোষণ চালিয়ে না যেতে পারলে সাম্রাজ্যবাদের চলে না। ধনতন্ত্রের প্রকৃতিই হল এমন যে সস্তায় কাঁচা মাল আর বাজার দখল না করলে তার লোভের শান্তি নেই, গরীব দেশের সাধারণ মানুষের মেহনতকে সস্তা দরে কিনে নিজে মুনাফার পাহাড় না গড়ে ধনতন্ত্র ক্ষান্ত থাকতে পারে না। তাই যুদ্ধের সঙ্গে ধনতন্ত্রের একেবারে অকাট্য সম্পর্ক। তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইও আজ দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধের বিপক্ষে এবং শান্তির সপক্ষে রব তুলছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাতিল না করে যে আজ মানুষ এগিয়ে যেতে পারবে না, তা ক্রমশ সরকারের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যে সব অজুহাত দেখানো হয় পুঁজিদারি ব্যবস্থার পক্ষে, সেগুলো যে ডাহা মিথ্যা, তা সোশালিস্ট সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট। আমাদের দেশে নাকি জনসংখ্যা অতিরিক্ত বাড়ছে, সুতরাং গরীবানা ঘুচবে কেমন করে, একথা প্রায়ই কংগ্রেস-সরকারি মহল থেকে শোনা যায়। যারা একথা বলে, তারা আসলে প্রতিধ্বনি করে সেই সব নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকদের বুলি, যারা Vogt-এর মতো বলার ধৃষ্টতা রাখে যে এশিয়ার ঘরে ঘরে ঠিক যেন খরগোসের মতো ক্রমাগত বাচ্চা জন্মে চলেছে কিংবা বৈজ্ঞানিক খ্যাতিসম্পন্ন স্যর আর্থর হিলের মত বলে যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়ছে দেখে মনে হয় যে চিকিৎসাবিদ্যায় উন্নতি এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে হয়তো হিতে বিপরীত হয়েছে, কারণ এত বেশি লোক রোগভোগ এবং মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার

পাচ্ছে যে তাদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত সমাজ করতে পারে না। আমরা কিন্তু আগেই দেখেছি যে আজকের দিনে, বিজ্ঞান যখন মানুষের হাতিয়ার, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বিপদ মনে করতে পারে শুধু তারা, যারা সকল মানুষের কল্যাণে সমাজের সম্পদ ব্যবহারের ব্যবস্থা না করে দেশে দেশে অধিকাংশ মানুষের দুর্দশার উপর অল্প কয়েক জনের সুখ আর ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখতে চায়। তাই সোভিয়েটের কথা দূরে থাক, চীনদেশ গর্ব করে বলে তার লোকসংখ্যা ৬২ কোটি, আর আমরা লোকসংখ্যা বাড়ছে ভেবে মুষ্‌ড়ে পড়ি!

ধনতন্ত্রের বিধানকে মাথায় পেতে নিয়েছে বলেই ভারতের পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার এত সংকোচ, এত ব্যর্থতা। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার আজ হল্যান্ডের চেয়ে বেশি নয়; ১৮৯৪ সালে জার্মানির জন্মহার ছিল ৩৬, আর এদেশে এখন হল ৩৪। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ১৭৫০ থেকে ১৯৪১ এই সময়ে তিনগুণ বেড়েছে। অথচ ঐ একই সময়ে ব্রিটেনের লোকসংখ্যা (বিদেশে বহুলোক গিয়ে বসতি স্থাপন করা সত্ত্বেও) বেড়েছিল পাঁচগুণ। অথচ বেকারী এদেশে বাড়ছে আর লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো বাড়বে, এই দুশ্চিন্তায় আমাদের অর্থনীতিবিদরা ম্রিয়মান। অনেক ঢাক বাজানোর পর পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানানো হয়েছে যে ১৯৭৬ সালে আমাদের দেশের বর্তমান যে আয় তা দ্বিগুণ হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে শতকরা সাড়ে বারো হারে বাড়লে আয় বৃদ্ধির শতকরা হার দাঁড়াবে ষাটের কিছু কম। ১৯৩৯ সালে আমরা যে অবস্থায় ছিলাম, প্রায় সেখানেই ফিরে দাঁড়াতে পারব কয়েকটা পঞ্চবর্ষ যোজনা সম্পূর্ণ হলে! দুনিয়া যখন ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলছে, প্রতিবেশী চীন যখন চোখের সামনে দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে প্রাচুর্যের দেশে পরিণত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের জীবনে যখন নূতন স্ফুরণ সর্বত্র আসছে, তখন আমরাই কি শুধু ধরে নেব যে এই মান্ধাতাগন্ধী দেশে দারিদ্র্যের বিড়ম্বনা আমাদের জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসেছে?

এ প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব দ্বিধাহীন ভাষায়। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। মেহনতী জনতার জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়েছে মার্ক্‌স্‌বাদে— তার বাস্তব পরীক্ষা যেখানে যেখানে হয়েছে, তা সোভিয়েটে হোক বা চীনেই হোক, সেখানেই আমরা দেখেছি তার বিজয় বৈজয়ন্তী, সেখানেই আমরা শুনেছি তার অপরাজিত বাণী—অসত্যকে যা খণ্ডন করেছে, শঙ্কাকে যা অপহৃত করেছে, সংশয় যার কাছে অপগত হয়েছে। শোষণের ও যন্ত্রণার তিমির-দুয়ার ভেঙে যে জ্যোতির্ময় শক্তির অভ্যুদয় আজ হয়েছে, তারই আবাহন আজ দেশে দেশে, তারই আহ্বান আজ আমাদের অন্তরে।

ইতিহাসের গতি

প্রকৃত গুরু কে, বোঝাবার জন্য সংস্কৃতে কথা রয়েছে যে জ্ঞানাঞ্জনের শলাকা দিয়ে যিনি চক্ষু উন্মীলন করেছেন তিনিই গুরু। আমাদের পৃথিবীকে জানতে হলে, ইতিহাসের ধারা বুঝতে হলে, সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ হতে হলে কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার অঞ্জন

চোখে না মাখলে বাস্তবিকই চোখ খোলে না, ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কোনো সঙ্গতি কোনো বিধি লক্ষ করা যায় না। এদিক থেকে কার্ল্ মার্ক্স্ হলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ গুরু।

কিন্তু এখনই বলে রাখা উচিত যে আমাদের দেশে গুরুবাদ বলে যে ধারার উদ্ভব হয়েছে, যার বহু লজ্জাকর দৃষ্টান্ত আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি, তা থেকে মার্ক্স্‌বাদের প্রভেদ হল চূড়ান্ত। উত্যক্ত হয়ে কার্ল্ মার্ক্স্ একবার বলেছিলেন : "কী বাঁচোয়া যে আমি মার্ক্স্‌বাদী নই!" মার্ক্স্-এর উক্তি নিয়ে তার আক্ষরিক আর নকল ব্যাখ্যা করছিলেন পণ্ডিতম্মন্যেরা এমনভাবে যে মার্ক্স্ "মার্ক্স্‌বাদী" শব্দটিরই উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। মার্ক্স্-এর শিক্ষা চিন্তাকে মুক্ত করেছে। আপ্তবাক্যের চাপে তার শ্বাসরোধ ঘটায় নি, শ্রেণীসভ্যতার সহস্র সংস্কারের জাল থেকে নিস্তার এনে দিয়েছে, মার্ক্স্‌কে 'গুরু' বলার অর্থ স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে পাখিপড়া বুলি আউড়ে যাওয়া নয়।

অধিকাংশ ছাত্রের কাছে ইতিহাস হল ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা, রাজারাজড়ার কীর্তিকলাপ আর যুদ্ধবিগ্রহের ফিরিস্তি, আর তাকেই কোনোক্রমে কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উদ্‌গার করতে পারলেই ইতিহাসের প্রতি কর্তব্য হল সমাপ্ত। শুধু ছাত্রদের কথাই বা কেন, গিবন্-এর মতো ঐতিহাসিক শিরোমণি একবার খেদ করেছিলেন যে ইতিহাস হল যেন "মানুষের অপরাধ আর নির্বুদ্ধিতা আর দুর্ভাগ্যের তালিকা।" কবি শেলী বর্তমানের ক্লেদ দূর করে ভবিষ্যসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু তিনিও বলেছিলেন : 'অতীতকে নিয়ে দুনিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; সে-অতীত হয় মরুক নয় একেবারে বিশ্রাম নিক।' আধুনিককালে মার্কিন দেশের বিখ্যাত শিল্পপতি হেন্‌রি ফোর্ড বলেছিলেন যে ইতিহাস হল একটা "বুজ্‌রুকি" ("bunk")। এসব কথা যে হয়েছে তার কারণ এই যে ইতিহাসকে অনেকে মনে করে এসেছেন শুধু কতকগুলো তথ্যের সমষ্টি, যে-তথ্যের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না আর যা হল শুধুমাত্র ঘটনা। আবার অনেকে ভেবেছেন যে সব কিছু ঘটেছে ঈশ্বর নির্দিষ্ট এমন একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী যা একেবারে মানুষের নাগালের বাইরে। কেউ কেউ বলেছেন যে মাঝে মাঝে কয়েকজন মহৎ লোক হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন। আবার ব্যাপারটাকে আরো ধোঁয়াটে করে অনেকে গম্ভীরভাবে বলেছেন যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 'যুগধর্ম' ইতিহাসকে পরিচালনা করেছে, কিন্তু এক যুগের 'ধর্ম' আর এক যুগের 'ধর্ম' থেকে কেন বদলে গেল তা বোঝাতে পারেন নি। এমন অবস্থায় ইতিহাসকে "বুজ্‌রুকি" অপবাদ যে শুনতে হয়েছে তা অস্বাভাবিক নয়।

ইতিহাসকে এই পণ্ডিতী বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার করেছিলেন কার্ল্ মার্ক্স্। প্রকৃতিজগতে ডার্‌উইন (Darwin) যেমন বিবর্তনের বিধান আবিষ্কার করেন, তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব হল মার্ক্স্-এর। তিনি এই অত্যন্ত সহজ অথচ একেবারে সার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে বাঁচতে হলে মানুষকে সব চেয়ে আগে গ্রাসাচ্ছাদন আর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে হয়, তা নাহলে সে রাজনীতি শিল্পসাহিত্য ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না। তাই মানুষ কিভাবে উৎপাদন করছে আর উৎপাদন করতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, এই হল এক-একটা যুগের ইতিহাসের মূল কথা। তারই বনিয়াদের উপর বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিধি, এমন কি ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তা ও কর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। যুগে যুগে মানুষ কিভাবে কাজ করে এসেছে, বেঁচে থাকার জন্য কিভাবে উৎপাদন চালিয়ে এসেছে, তাদের পরস্পর সম্পর্ক কিরকম ছিল, জানলে তবেই

আমরা তাদের তদানীন্তন চিন্তাধারা কি ছিল এবং কেন ছিল বুঝতে পারব। একেবারে বাস্তব দৃষ্টিতে মানুষের জীবনযাপনের ধারা লক্ষ করলে তবেই আমরা বুঝব যে কেন বারবার যুগ বদলে যুগান্তর এসেছে, আর সমাজের বিকাশের মধ্যে যে বিধান রয়েছে তার সন্ধান পাব বলে পরিবর্তন কেন আসে এবং কেমন করে সমাজের মানুষই পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা জানতে পারব।

আজকের পৃথিবীতে কি ঘটছে এবং কি ঘটতে পারে তা ভালো করে বোঝার জন্যই আমরা ইতিহাস আলোচনা করি। দুনিয়ায় কিছুই অটল অচল অবস্থায় থাকে না, সর্বদাই অদলবদল চলছে। কয়েকশো কোটি বছর আগে পৃথিবী ছিল একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলার মতো, সেখানে জীবন কিংবা জীবনের সম্ভাবনা পর্যন্ত দেখা দেয় নি। বহু কোটি বছর পূর্বে প্রথম পৃথিবীতে জীবনের আর্বিভাব ঘটল। কয়েক কোটি বছর আগে এখানে প্রচুর গাছপালা আর জলেস্থলে নানারকমের প্রাণী দেখা গেল। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে সেদিনের পৃথিবীর তফাত খুবই বেশি, কিন্তু আমাদের জানা দরকার যে বহু যুগ ধরে অবিরাম পরিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর বর্তমান চেহারা প্রকাশ পেয়েছে।

এই যে যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন ঘটে আসছে, তা হঠাৎ দৈবক্রমে হয় নি, একটা নিয়মিত বিধান অনুসারেই হয়েছে। আমরা যদি শুধু আজকের জীবন নিয়ে আলোচনা করি তো সেই বিধানের খোঁজ পাব না। তাই দেখা যায় যে যতদিন পৃথিবীর আদিযুগের খবর কেউ রাখত না যতদিন কোটি কোটি বছর আগে যে সব প্রাণী ও গাছগাছড়া পৃথিবীতে ছিল তাদের দেহাবশেষ ভূগর্ভ থেকে বার করা হয় নি, ততদিন পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করতেন যে দুনিয়া একদিন হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছিল, আর গোড়া থেকেই তার চেহারা মোটামুটি আজকের মতোই ছিল।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক রূপকথা চলিত ছিল। একজন মস্ত পাদরী বলতেন—আর প্রায় সবাই সেকথা বিশ্বাস করতেন—যে খ্রীস্টপূর্ব ৪০০৪ সনে একদিন হঠাৎ সকাল ৯টা নাগাদ ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে বসেন! আজ যিনি সামান্য শিক্ষাও পেয়েছেন, তিনি একে গাঁজাখুরি বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু পণ্ডিত আর অপণ্ডিত, সবাই যে বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী হচ্ছে অপরিবর্তনীয় এবং হঠাৎ এক মুহূর্তে তার সৃষ্টি হয়েছিল, এর কারণ শুধু জ্ঞানের অভাব নয়। যাঁরা প্রভাবপ্রতিপত্তি ভোগ করতেন, তাঁদের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত খুবই মনঃপুত ছিল। জগৎ যদি নিত্য, সনাতন, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে, তা হলে মানুষের সমাজও নিশ্চয়ই তাই। আজ যে ব্যবস্থা চলছে, ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদের মতো যে সব প্রথা চলছে, তা আগেও ছিল, পরেও চলতে থাকবে, বনিয়াদী কোনো অদলবদল ঘটেনি, ঘটবে না—একথা বিশ্বাস করা এবং অপরকে বিশ্বাস করানো সমাজে কর্তৃপক্ষ যারা তাঁদের পক্ষে লাভজনক বই কি।

ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি প্রসারের ফলে একদিন আকস্মিকভাবে অপরিবর্তনীয় পৃথিবী সৃষ্টির রূপকথা ভেঙে গেছে। আর যে রূপকথায় বলে যে সমাজ আজ যেমন আছে, আগেও মোটের উপর তেমনই ছিল, পরেও তাই থাকবে, সেই রূপকথার বিনাশ ঘটাচ্ছে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব। মানুষ আর মানুষের সমাজ বদলে আসছে যুগ যুগ ধরে, ভবিষ্যতেও বদলে চলবে—এই হল অমোঘ নিয়ম। এই ভাঙাগড়ার ইতিহাস হল সমাজের বিকাশের ইতিহাস। ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি দেবে, ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি

অর্জনে সহায়তা করবে। অতীত সমাজে প্রকৃত জ্ঞান তাই আজকের দিনকে বোঝার এবং ভবিষ্যতকে আয়ত্ত করবার সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার। ইতিহাস বিনা তাই রাষ্ট্রনীতি পঙ্গু। প্রকৃত ইতিহাসের বোধ না থাকলে অচেতন অবস্থায় বহু সামাজিক সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, আর সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে অন্ধকারে শুধু হাতড়ে বেড়াতে হবে।

কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলে থাকেন যে ইতিহাসের কালপরম্পরায় আমরা লক্ষ করি যে বিভিন্ন চিন্তা, ধারা, নীতি ইত্যাদি এক একটি যুগে প্রকাশ পাচ্ছে, অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে এক একটি নীতি এক একটি শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করছে। এ-সম্বন্ধে মার্ক্স্ লেখেন : "দৃষ্টান্ত ধরা যাক যে (ইয়োরোপে) একাদশ শতাব্দীতে কর্তৃত্বের নীতি বলবৎ ছিল। ঠিক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিকে দেখা গিয়েছিল। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের রীতি অনুসারে বলতে হবে যে শতাব্দীকে নীতিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, শতাব্দী নীতিকে নির্দিষ্ট করে নি। অর্থাৎ নীতিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাস নীতিকে সৃষ্টি করে না। তখন যদি আমরা নীতি এবং ইতিহাস উভয়কেই বাঁচাবার জন্য প্রশ্ন করি যে একাদশ শতাব্দীতে এক নীতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্য এক নীতি আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন। আর উভয় নীতিই বা একই শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেনি কেন, তা হলে বাধ্য হয়ে তখনকার খুঁটিনাটি খবর আমাদের খুঁজতে হবে, জানতে হবে যে একাদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ কেমন ছিল, তাদের সামাজিক জীবনের চাহিদা কি কি ছিল, তাদের উৎপাদনশক্তি কেমন ছিল, উৎপাদনের পদ্ধতিই বা তাদের কি ধরনের ছিল, কোন্ কোন্ কাঁচা মাল নিয়ে তারা উৎপাদন চালাত, আর অবশেষে জানতে হবে যে তখন মানুষের সম্পর্ক কি ছিল, বেঁচে থাকার যে ধরন তাই থেকে মানুষের যে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার প্রকৃতি কি।... কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা এভাবে মানুষকে তার নিজস্ব ইতিহাসের স্রষ্টা এবং সেই ইতিহাসে অভিনেতা রূপে দেখি, তখনই আমরা যেন এক চক্র ঘুরে ঠিক আসল রওনা হওয়ার জায়গায় ফেরৎ পৌঁছে যাই, কারণ তখন আমরা যে শাশ্বত নীতি নিয়ে আমাদের খোঁজ আরম্ভ করেছিলাম তাকে পথে ফেলে দিয়ে এসেছি।" অবশ্য এখনো অনেকে বলে থাকেন যে এক একটা নীতি বা ভাবধারা বা চিন্তার প্রকাশ এক একটা যুগকে শুধু চিহ্নিত করা নয় তাকে সৃষ্টি করেছে—যেমন একটা যুগ হল ধর্মবিশ্বাসের যুগ কিংবা যুক্তিবাদের যুগ। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন্ একবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইয়োরোপের তিনশো বছরের ইতিহাস সম্বন্ধে বলেছিলেন যে ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য হল স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই আর দৃষ্টান্তস্বরূপ গর্ব করে জানিয়েছিলেন যে ঐ যুগে তাঁর স্বদেশ ইংল্যান্ড চারবার ইয়োরোপকে বাঁচিয়েছে— স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই এবং নেপোলিয়ন, আর জার্মানির কাইজার উইলিয়মের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ইতিহাস আলোচনায় এই রকম গুরু গম্ভীর অথচ সত্যই হাস্যকর কথা পণ্ডিতেরা প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু মার্ক্স্ যা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলেই অভ্রান্ত। যুগে যুগে মানুষ যে ভাবে বাঁচে তারই ছাপ পড়ে তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, তার ধ্যানধারণার উপর। চিন্তা কর্মকে নির্ণীত করে না, কর্মই চিন্তাকে নির্ণীত করে। চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

ইতিহাস সম্বন্ধে বহু মনীষীও প্রচণ্ড ভুল করে থাকেন। প্রকৃত সমাজবোধের অভাবে তাঁদের পাণ্ডিত্য পঙ্গু হয়ে যায়। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্ সম্বন্ধে মার্ক্সের

প্রভূত শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতাকে তিনি মার্জনা করতে পারেন নি। একবার এঙ্গেল্‌স্ ঠাট্টা করে লেখেন যে এইসব বিরাট পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন মনে হয় যে যদি ইংল্যান্ডে একাদশ শতাব্দীতে "সিংহহৃদয়" রাজা রিচর্ড্ একটু অর্থনীতির খোঁজ রাখতেন তা হলে ৬০০ বছরের বিড়ম্বনা এড়ানো যেত কারণ রিচর্ড্ তা হলে আর খ্রীস্টানদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ("Crusades") লড়াইয়ে সময় নষ্ট না করে দেশে দেশে স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন আর ইয়োরোপ স্বস্তিতে থাকত!

শোষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নীতিশাস্ত্র অনেক কথা নানা ভাবে বলে থাকলেও শোষণব্যবস্থা শুধু আধুনিক ধনিকযুগের বিশেষত্ব নয়। পুঁজিদারি জেঁকে বসার আগে ছিল জায়গীরদারি জমিদারির প্রাধান্য, তারও আগে ছিল গোলামী ব্যবস্থা। প্রশ্ন উঠবে—ধনিক যুগ আসার পূর্বে দুর্গত কৃষকরা কি বিপ্লব করত না, অত্যাচারীকে যথাযোগ্য শিক্ষা দেবার চেষ্টা করত না? ইতিহাস বলে যে তারা বিদ্রোহ করত বটে, কিন্তু প্রত্যেকবারই "বড়োলোক"দের কাছে হার মানতে বাধ্য হত, কৃষক বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করা হত। বারবার পরাজয়ের কারণ নীতির দিক থেকে দুর্বলতা আর অত্যাচারীদের শ্রেষ্ঠতা একেবারেই নয়, কারণ হল যে উৎপাদনের তদানীন্তন পদ্ধতি এমন ছিল যে কৃষকরা একজোট হয়ে এক মতলব নিয়ে বেশিদিন জোর লড়াই চালাতে পারত না। সচরাচর চাষীরা সামান্য একখণ্ড কিংবা এদিক ওদিক কয়েকখণ্ড জমি চাষ করে, কদাচ কখনো পরস্পরকে কাজে সাহায্য করার দরকার পড়ে, শস্য বিক্রয়ের সময় তারা হয় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে বলে অন্য কথা, কিন্তু সাধারণত আগেকার দিনে চাষীদের পক্ষে বোঝাই শক্ত ছিল যে তাদের সকলের স্বার্থ এক, আর সহজে তাদের একজোট হওয়ার প্রবৃত্তিও আসত না। অন্যদিকে কলকারখানায় মজুর বহুলোক একত্র কাজ করে, পাশাপাশি থেকে পরস্পরকে সাহায্য করে, একজন মজুর একলা কোনো কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে না, অন্য সহকর্মীর উপর নির্ভর করতেই হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির দুর্ভোগ ভুগে নিরুপায় বোধে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয় কৃষক, আর যন্ত্রযুগের শ্রমিক বিজ্ঞানের জোরে কল চালিয়ে প্রকৃতিকে পরাভূত করে এক নূতন আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। তাই তাদের পক্ষে একজোট হওয়া স্বাভাবিক, চাষীদের চেয়ে সহজে তারা ইউনিয়ন গড়ে, পরস্পরের স্বার্থ যে এক তা বুঝতে পারে আর নিজেদের সংঘশক্তির উপর ভরসা রাখে। ইতিহাসে তাই কৃষক বিদ্রোহের সংখ্যা অনেক হলেও সাফল্যের দৃষ্টান্ত বিরল। চাষীরা যখন শ্রমিকদের সঙ্গে হাতে হাত বেঁধে এগোতে পারে, তখনই বিপ্লবের জয় সম্ভব হয়। সোভিয়েট বিপ্লবে এবং তার পরবর্তী যে ঘটনার মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষের জয়যাত্রা চলছে, তা থেকে আমরা একথা আরো ভালো করে বুঝতে পারি।

ইতিহাসে মৌলিক পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন যাদের স্বার্থ এক, এমন বহু লোক মিলে আন্দোলন আর সংগ্রাম করে। ইতিহাসে পরিবর্তন ঘটানোর অর্থ হল সমাজের রূপান্তর। যে শ্রেণীর উদ্যোগে ও উদ্যমে পরিবর্তন ঘটে, সমাজের নূতন রূপের উপর সে-শ্রেণীর ছাপ থেকে যায়। তাই যখন জনসাধারণ বলতে বোঝাত কৃষক জনতা, তখন ইতিহাস ছিল একরকম। আর বর্তমান কালে যখন শ্রমিকরা গণআন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত লড়াই চালাবার ক্ষমতা দেখাচ্ছে, তখন ইতিহাসের চেহারা হবে আর একরকম।

আগে উৎপাদন মোটের উপর কৃষক শ্রেণী করত কেন, তা সহজে বোঝা যায়। তখন প্রত্যেকে খানিকটা জমি চাষ করে শস্য উৎপাদন করত, আর তাঁতী, মুচি, কামার, কুমোর

প্রভৃতি সবাই বাড়ি বসে নিজেদের কাজ চালাত। আজ অবশ্য দেখি বিরাট কারখানা আর ব্যবসা বাণিজ্যের সরঞ্জাম। এই তফাতের কারণ হচ্ছে যে আগে মানুষকে সব জিনিসই নিজের হাতে তৈরি করতে হত। যন্ত্রপাতি যা ছিল তা আজকের তুলনায় ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কলকব্জার রেওয়াজ হয়নি বলে নিছক মেহনত আর হাতের কৌশলের উপর নির্ভর করতে হত। প্রায় দুশো বছর আগে থেকে যন্ত্রের প্রচলন আরম্ভ হয়েছে আর তার ফলে সত্যই ঘটেছে একটা বিরাট সমাজবিপ্লব।

প্রত্যেক লোক নিজের বাড়িতে কলকব্জা বসাতে পারে না বলে একা (বা কয়েকজনের সাহায্যে) কাজ করে মাল বেচে জীবন ধারণ করা শক্ত হয়ে উঠল। (আমাদের দেশে এখনো দেখছি কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে যারা কুটিরশিল্প নিয়ে আছে তাদের বিড়ম্বনার অবধি নেই)। তাই যেখানে কল বসল, কারখানা ফাঁদা হল, সেখানে যাদের খেটে খেতে হয় তারা এসে জড়ো হতে লাগল। কলের যারা মালিক তারা বেকার গরিবদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হয়ে দাঁড়াল। গরিবকে কলে কাজ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হল, কিন্তু পারিশ্রমিক যা দেওয়া হল তাতে কোনোক্রমে বেঁচে থাকা যেত। উৎপাদনের ফলে যে মোটা মুনাফা হল তা পুঁজিদার আত্মসাৎ করতে থাকল। এই ব্যবস্থাতে নূতন একটা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল, যারা নিজের ঘরে কাজ না করে মালিকের কারখানায় খাটত, যারা আর নিজের হাত না চালিয়ে অপরের কলকব্জা চালাত। এভাবে নির্বিত্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা, "প্রলেটেরিয়ট" শ্রেণীর সৃষ্টি হল। সারা দুনিয়াতে এরাই বর্তমান যুগে সমাজবিপ্লব আনবার জন্য ব্যগ্রতা দেখায় এবং অবিরাম সাংগঠনিক আয়োজন করে।

আমরা তা হলে মোটামুটি দেখলাম যে উৎপাদন যে-ভাবে চলে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজে নূতন শ্রেণীর জন্ম হয়। যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের পূর্বে, বিজ্ঞান শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হওয়ার পূর্বে, উৎপাদন হত কম, তার পদ্ধতি ছিল ভিন্ন, যারা উৎপাদনে রত তাদের পরস্পর সম্পর্কও ছিল তদনুরূপ, তাই সমাজের চেহারা ছিল একরকম। পরে বহু জন একত্র হয়ে অল্প কয়েকজন মালিকের কারখানায় কাজ করতে লাগল, আর সমাজের চেহারা বদলে গেল। সমাজে বিবর্তনের হেতু হল উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন।

মানুষ উৎপাদনে লাগে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরি হয় না, কারণ মানুষকে বাঁচতে হলে যা দরকার তা পয়দা করতেই হবে। মানুষ কাজ করে ক্ষুধা তৃষ্ণার হাত থেকে বাঁচবার জন্য, পরনের কাপড় আর মাথা গুঁজে থাকার মতো জায়গা জোগাড় করার জন্য। এই প্রয়োজনগুলো মেটাবার আগে কোনো মানুষ মনের আনন্দে পাখির গানের মতো তার কাজকে উপভোগ করতে পারে না; কবি হোক, শিল্পী হোক, খাওয়া পরা সম্বন্ধে সত্যই কেউ উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না। তাই সহজ অথচ আসল কথা হল এই যে মানুষ যা কিছু করেছে তার মূলে আছে বেঁচে থাকার প্রয়োজন। বাঁচবার জন্য কাজকর্ম হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি, আর সেই পদ্ধতির পরিবর্তনই হল বিপ্লব, তাতে মানুষের পরস্পর সম্পর্ক বদলে যায়, তখনই ইতিহাসের অধ্যায় পালটে যায়। এ-কথা, বুঝলেই আমরা ইতিহাসের যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মার্ক্স দিয়েছিলেন, তা বুঝতে পারার দিকে এগোতে পারব।

সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার যারা মালিক এবং নানা উপায়ে সংস্কারের কারাগারে যারা সবায়ের মনকে বন্দী করে রাখার ক্ষমতা রাখে, তাদের কাছে এই ব্যাখ্যা মনঃপূত নয়, তারা

একে উড়িয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ উলটো কথা প্রচার করে। তাই শুনি যে মানুষের মনে কাজে নয়—কোন্ এক অজানা রহস্যময় কারণে পরিবর্তন আসার ফলেই সমাজে পরিবর্তন আসতে পারে। তাই বলা হয় যে আগে মানুষ নিরীহ, ধর্মভীরু ছিল বলে যার যে অবস্থায় জন্ম সেটা মেনে নিত, মুখ বুজে যারা "বড়ো লোক' বলে পরিচিত তাদের বশ্যতা স্বীকার করত আর সেজন্য তখন বিপ্লব হত না। পরে কয়েকজন সমাজব্যবস্থার নিন্দা করতে লাগল আর তাদের প্ররোচনায় কিছু লোক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটাল, বিপ্লবের যুগ শুরু হল। ইংরেজ সরকার যেমন বলত যে এদেশের লোক তাদের শাসনে খুশি, তবে কতকগুলো লোক হল যত নষ্টের গোড়া, গলাবাজি করে তারা আন্দোলন চালায় ("agitator") বলে নিরীহ ভারতীয় প্রজারা ক্রমে বিচলিত হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনই পুঁজিবাদের যারা পাণ্ডা তারা জোর গলায় বলতে চেষ্টা করে যে, বিপ্লব ব্যাপারটা কয়েকজন প্ররোচকের কর্ম, সাধারণ লোকের সেদিকে ঝোঁক না থাকলেও তারা প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে হাঙ্গামা হুজ্জুতের পথে যায়।

এ-ধারণা যে ভুল তা বোঝা খুবই সহজ। যদি পুঁজিদাররা গরিব মজুরদের যথাসম্ভব কম মজুরি দিয়ে বেশি খাটিয়ে নিজেদের পকেট ভারী না করত, তা হলে কি মজুরেরা মালিকের বিরুদ্ধে কথা শুনতে রাজি হত? নিজেদের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে তারা যার তার কথায় মালিকের বিরুদ্ধে জেগে উঠত কেন? আর শুধু আন্দোলনে কি কখনো বিপ্লব হয়? শুধু বক্তৃতা দিয়ে আর প্রবন্ধ লিখে যদি বিপ্লব করা যেত, তা হলে তো মার্ক্সের পূর্ববর্তী আকাশচারী, ("Utopian"), স্বপ্নপ্রবণ সোশালিস্ট যাঁরা ছিলেন রবার্ট ওয়েন, স্যাঁ-সিমঁ, ফুরিয়ে প্রভৃতির মতো, তাঁরাই তো ধনিক শ্রেণীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা কিছু করতে পারতেন? যারা লেখাপড়া শিখেছে বেশি, তারা প্রায়ই গরিব নয়—অথচ তাদের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে শুধু তাদের নিয়ে বিপ্লব করা যায় না কেন? এর কারণ হল এই যে বিপ্লব আন্দোলন ধনিকদের (এবং নানা ভাবে তাদের যারা সহায়ক) স্বার্থে বেজায় আঘাত দিয়ে থাকে বলে কিছুতেই তা তাদের মনঃপূত হতে পারে না। ইতিহাস ক্রমাগত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে অপরের উপর প্রভুত্ব উপভোগ করে ভালো খাওয়া আর সুন্দর পরিবেশে থাকার অধিকার বজায় রাখার জন্য তারা বিপ্লবীদের কাছে হার না মেনে ফাঁসিকাঠে চড়িয়ে বা গুলি করে মারতে চাইবে। বিপ্লবকে পরাজিত করার জন্য তারা দেশভক্তি ভুলে যাবে, বিদেশিদের সাহায্য ভিক্ষা করে আনবে, গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেবে, নিজের দেশে দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দেবে, এমন কোনো পাপ নেই যা করবে না—এই হল ফরাসি বিপ্লবের ক্রমান্বিত অভিজ্ঞতা, এই হল সোভিয়েট বিপ্লবের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। শ্রমিকরা যখন সামান্য মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে দেখে মালিক ভাঙে তো মচ্‌কায় না, তখনই সে বোঝে যে "বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী"ও তার মিলবে না; অতি তুচ্ছ এবং জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজন যে দাবি তা যখন অস্বীকৃত হয় তখন মজুরের অভিজ্ঞতাই তাকে শেখায় যে শুধু মজুরির বাড়াবার চেষ্টা যথেষ্ট নয়, মালিক-মজুর সম্পর্কটাকেই উৎখাত করতে হবে, সমাজবাদী ব্যবস্থা আনতে হবে, সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মজুর-মালিকে বা চাষী-জমিদারে যে ঝগড়া, তার নিষ্পত্তি নেই যতদিন না বিপ্লব এসে এই নোংরা আর অচল সম্পর্কটাকেই অপসারণ করে দেয়।

কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের আরম্ভেই বলা হয়েছে : 'আজ পর্যন্ত মানুষের যত সমাজ দেখা দিয়েছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।'' পাদটীকায় এঙ্গেল্‌স্ জানিয়েছেন যে এখানে ইতিহাস বলতে "লিখিত ইতিহাস" বোঝাচ্ছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের

বিবরণ ১৮৪৭-৪৮ সালে অস্পষ্টই ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল তখনই, যখন শ্রেণীবিভাগ সমাজে প্রথম দেখা দিল, শোষক ও শোষিতের কাহিনী, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের বৃত্তান্ত শুরু হল। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতোই রাষ্ট্র সনাতন নয়; সমাজপতিরা যখন জেঁকে বসল, তখন তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার হাতিয়ার হল রাষ্ট্রব্যবস্থা। তখনই মানুষের যে ইতিহাস আমরা সাধারণত জানি, সেই ইতিহাস আরম্ভ হল, তখন থেকে শ্রেণীসংগ্রামেরও বিরতি নেই।

অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার পর মানুষকে বহু লক্ষ বৎসর ধরে জানোয়ারদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, প্রকৃতিজগৎকে বাগে আনার চেষ্টা করতে হয়েছে। কোনো অধ্যাত্মগুণের অধিকারী বলে মানুষ তা করেনি; নিছক বাঁচার তাগিদেই তাকে ক্রমাগত এই লড়াই করে যেতে হয়েছে। এই লড়াইয়ের ফলেই মানুষ উৎপাদন করতে শিখেছে—যে মানুষ একদা শুধু গাছের ফল আর জানোয়ারের কাঁচা মাংস খেয়ে বাঁচত, সেই মানুষ ক্রমে ভূগর্ভ থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে, আগুনের ব্যবহার জেনেছে, শীত বর্ষা গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে নিস্তার খুঁজতে গিয়ে বহু পরীক্ষার পর ঘর বানাতে শিখেছে, পরনের বস্ত্র তৈরি করেছে, সেই মানুষই শিকারের উদ্দেশ্যে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে করতে কয়েক লক্ষ বৎসরের চেষ্টার পর অন্য ধাতুর সন্ধান পেয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সে সংগ্রামের বিবরণ মনোমুগ্ধকর; তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। শুধু এখানে বলা দরকার যে বাঁচার লড়াই চালাতে গিয়েই সভ্যতার জন্ম হয়েছে, আদিম শিল্পে যেমন গুহাগাত্রে ছবি কিংবা বহু জন মিলে নৃত্যে—ঠিক সেই বাস্তব জীবনেরই অনিবার্য ছাপ থেকেছে। "অমৃতের পুত্র" হয়ে জন্মে মানুষ যে অকস্মাৎ ভগবৎ কৃপায় সভ্যতার ইমারত বানাতে লেগেছিল, তা একেবারেই নয়। মানুষ প্রাণিজগতেরই এক অংশ হিসাবে বিবর্তনের ফলে একটা বিশিষ্ট বিকাশ লাভ করে অন্যান্য প্রাণিদেরই মতো জীবনসংগ্রাম চালিয়েছিল। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে যে প্রথমে আবির্ভূত হল বাক্য ('In the beginning was the word')—অনেকটা হিন্দু চিন্তায় 'ওঁ' শব্দের মতো; কিন্তু আসলে কাজ, নিছক বেঁচে থাকার জন্য দরকারি কাজেই মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছে।

কিন্তু আদিম যুগে একজন মানুষ যা উৎপাদন করত, তাতে কোনোক্রমে তার নিজের খাওয়া পরা চলতে পারে, উদ্‌বৃত্ত বিশেষ কিছু রইত না। তাই তখনকার উৎপাদন পদ্ধতি ঐরকম থাকাতে একজনের খাটুনি ভাঙিয়ে আর একজনের লাভ করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং একজনের উপর অন্যজনের প্রভুত্ব স্থাপনেরও প্রয়োজন ছিল না। তখন তাই শোষণ ছিল না, মানুষের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে যে গ্লানি সভ্যতার যুগে প্রকট, তা সেই বর্বরতার দিনে দেখা দেয় নি। এজন্যই অনেকে সেই বর্বরযুগকে হারানো স্বর্ণযুগ আখ্যা দিয়েছেন। এখনো পর্যন্ত আমরা দেখি যে আদিম জাতি যেখানে অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পেরেছে (বর্তমান পৃথিবীতে সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল), সেখানে শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণের বালাই নেই।

জীবন স্থা ু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তাই উৎপাদন পদ্ধতিতে ক্রমশ পরিবর্তন এল। বহুদিনের অভ্যাসগুণে মানুষ উৎপাদন ব্যাপারে উন্নত হতে লাগল, কিন্তু সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য দিতে হল প্রচণ্ড। উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি হওয়ায় একজনের পরিশ্রমের ফলে তার নিজের ভরণপোষণের খরচ বাদ দিয়েও কিছু অতিরিক্ত উৎপন্ন হল—অর্থাৎ একজনের পরিশ্রমফল অপরের পক্ষে বিনা পরিশ্রমে ভোগ করার বাস্তব সম্ভাবনা এল।

এতে ঘটল সমাজবিপ্লব। আদিম সমাজে রাষ্ট্র ছিল না, দণ্ড ছিল না, জুলুম-জবরদস্তির অধিকার কয়েকজনের হাতে ন্যস্ত ছিল না, অভ্যাসের বশে এবং সম্মানী ব্যক্তিদের প্রভাবে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। এখন উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত যে উৎপাদন তাকে গ্রাস করার জন্য কিছু লোক এগিয়ে এল আর তারাই হল সমাজপতি, তারা হল পরশ্রমভোগী, আর নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করার জন্য নানা কৌশল তারা অবলম্বন করতে লাগল। এই সময় থেকে আমরা দাসপ্রথা গোলামী ব্যবস্থার চেহারা দেখতে পাই। আর তখন থেকেই ক্রমাগত চলে এসেছে শ্রেণীশাসন আর শ্রেণীসংগ্রাম। দাসপ্রথা, ভূমিদাস প্রথা জায়গীরদারি, জমিদারি, পুঁজিদারি— সকল ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য হল যে সমগ্র জনতার তুলনায় নিতান্ত অল্পসংখ্যকের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে; আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের মুখোস পরলেও শ্রেণীশাসনের কালিমা ঢাকা সম্ভব হয় নি।

প্রায় সব দেশে এই দাসপ্রথার অস্তিত্ব ইতিহাস লক্ষ করেছে আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করেছে যে নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নির্যাতিত দাসগণ শুধু যে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেছে তা নয়, বার বার পরাজয় অনিবার্য জেনেও লড়াই করেছে, শৃংখল মোচনের জন্য প্রাণপাত করেছে। সে যুগে গ্রীসের মহামনীষী প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌লের মতো যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সমাজপতিদের পক্ষ নিয়ে বললেন যে দাসপ্রথা একান্ত স্বাভাবিক, প্রতিদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মতোই অবশ্যম্ভাবী। তখনকার সভ্যতার পিল্‌সুজ হয়ে ছিল এই দাসের দল, উপরে জ্বলত সভ্যতার প্রদীপের আলো আর তারই ঠিক নিচে, অন্ধকারে মেহনতের জোরে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখত দাসেরা। ধর্মধ্বজীরা সমাজে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে শৃংখলিত করে রাখতে মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করে নি, বরং দাসপ্রথা যে ন্যায়সঙ্গত তাই প্রচার করেছে। মাঝে মাঝে কবিকণ্ঠে ক্ষীণ প্রচার তখন হয়েছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, কিন্তু সংগঠনের পথে অপার বাধা সত্ত্বেও দাসেরা বারবার অভ্যুত্থান করেছিল বলেই সে-প্রথা মোটের উপর অবলুপ্ত হয়েছিল। মহানুভবদের করুণায় এ-ঘটনা ঘটে নি। ঘটেছে কঠোর শ্রেণীসংগ্রামের ফলে। অধিকারীশ্রেণী যখন বুঝল যে আগেকার কায়দায় দাসদের পদানত করে রাখা আর চলে না, তখনই সে-প্রথা রদ হতে থাকল। আজো এমন দেশ আছে যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম ঐ পর্যায়ে উঠতে পারে নি বলে দাসপ্রথাও সেখানে বহাল আছে।

দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসপ্রথার বিবর্তন একটা বিপ্লব বটে। কিন্তু সে-বিপ্লবের ফলে শোষণের ধরন বদলে গেল, শোষণ ব্যবস্থারই অবসান ঘটতে তখনো অনেক বিলম্ব। তাই ভূমিদাসপ্রথায় প্রজা জমিদারের কেনা গোলাম নয়, তার দেহের উপর অধিকারীর পূর্ণ সম্পত্তি নেই, তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতাও মালিকের নেই, কিন্তু এমন নিয়ম করা হল যে ভূমিদাস জমির সঙ্গে বাঁধা হয়ে রইল, জমি ছেড়ে যাওয়ার অধিকার তার রইল না, জমির মালিক বদল হলে ভূমিদাসেরও নূতন মালিক হত। জায়গীরদার-জমিদারের দল যখন ছিল সমাজে সব চেয়ে শক্তিশালী, যখন রাজাকে পর্যন্ত তাদের বিশ্বস্ততা ও সহায়তার উপর নির্ভর করতে হত, যখন ধর্মযাজকরাও মঠ বা গির্জার সংলগ্ন জমির উপর কর্তৃত্ব ভোগ করল, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্কের মাঝখানে যখন এই ভূমধ্যকারীরা খাড়া হয়ে ছিল, তখনকার সামাজিক গঠনকে সামন্ততান্ত্রিক ("ফিউডল্‌") বলা হয়। দেশে দেশে এর প্রকাশে কিছু ইতর বিশেষ থাকলেও মোটামুটি এর ধরনটা সর্বত্র প্রায় একই ছিল।

সামন্ততন্ত্রের আমলে সমাজে গ্রাম্যজীবনের ছাপ ছিল বেশি। কৃষিকর্মই তখনকার প্রধান

বৃত্তি; ছোটো ছোটো কারখানা কিছু ছিল স্বল্পসংখ্যক শহরের চাহিদা মিটাবার জন্য এবং রাজা আর তার পারিষদদের বিলাস ব্যসনের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য। ক্রমশ দেশে দেশে বাণিজ্যের প্রসারও ঘটল আর বাণিজ্যের নূতন কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সে যুগের জনজীবনের গ্রন্থি বাঁধা ছিল গ্রামের সঙ্গে, শহরগুলো ছিল কিছুটা বেখাপ্পা। এই শহরগুলোতেই নূতন সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হল যারা আগের ব্যবস্থাকে রদ করে পরবর্তী "বুর্জোয়া" সমাজ প্রবর্তনে অগ্রণী অংশ গ্রহণ করেছিল।

"ফিউডল্" যুগের পূর্বেও দেশে দেশে বাণিজ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরে ফিনিশিয় বণিকরা বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রভূত প্রসাদ লাভ করেছিল; আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়া ও রোমের বাণিজ্য সম্পর্ক ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কিন্তু 'ফিউডল্' যুগের শেষদিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বাণিজ্যের প্রসার আগের চেয়ে বেশি ঘটতে লাগল। শহরের বণিকেরা জায়গীরদারি ব্যবস্থায় দেশ খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকায় বাণিজ্যের ক্ষতি লক্ষ করে অনেক সময় জায়গীরদারদের শক্তিতে ঈর্ষান্বিত রাজাকে সাহায্য করল, আর চেষ্টা করল যাতে গোটা দেশে এক ধরনের শাসন স্থাপিত হয়, ব্যবসার মাল লেন্‌দেন্ করতে গিয়ে প্রত্যেক জমিদারের এলাকাতেই নানা রকম শুল্ক না দিতে হয় আর দরকার মতো গ্রামাঞ্চল থেকে কারিগর যোগাড় করা যায় যারা হরেক রকম খাজনা, ভেট্, বেগারী, মাঝে মাঝে জমিদারের ডাকে লড়াইয়ে যাওয়া ইত্যাদি দায় থেকে নিস্তার পাবে। শহর আর বাণিজ্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যে আর বেশিদিন টিকবে না তা বোঝা গেল।

খ্রীস্টানদের তীর্থস্থানগুলোকে মুসলমান দখল থেকে উদ্ধার করার জন্য যে লড়াই ('ক্রুসেড্‌স্') বহু বৎসর ধরে চলেছিল, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ল, এশিয়ার সমৃদ্ধি দেখে ইয়োরোপ বিস্মিত হল, যে ভারতবর্ষের অগাধ দৌলতের কথা জগদ্বিখ্যাত ছিল সেই ভারতবর্ষে পৌঁছাবার জলপথ খুঁজতে গিয়ে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করলেন আর অন্য বহু নৌ-অভিযান প্রায় দু-শো বছর ধরে চলল। নূতন আবিষ্কৃত দেশগুলোকে ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপ, তাঁর অনুগত দুই দেশ—স্পেন আর পর্তুগালের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ায় ইংল্যান্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি খাপ্পা হয়ে ওঠে আর পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করে 'প্রটেস্টান্ট' হওয়ার ঝোঁক তাদের বাড়ে। যাই হোক, ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতির বনিয়াদ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ইতিহাস বদলাতে লাগল। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংল্যান্ডের কথা বলা যায়। টিউডর শাসনের যুগে (১৪৮৫-১৬০৩) পশম আর পশমী দ্রব্যের ব্যবসা খুব লাভজনক হওয়ায় চাষের জমি থেকে চাষীকে উৎখাত করে সেখানে মেষপালনের বন্দোবস্ত হয়, মস্ত বড়ো এলাকায় একটা মেষপাল রাখলেই কাজ চলত বলে চাষীদের জমি থেকে খেদিয়ে দেওয়া হল, তারা শহরে গেল সর্বস্বান্ত হয়ে, বেকারের ভিড় বাড়ল, তাদের 'ভবঘুরে' দুর্নাম দিয়ে বেত্‌মারা এবং আরো অনেক কঠোর শাস্তি দেওয়া হল— মানবপ্রেমিক টমাস্ মূর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে বললেন মানুষকে যেন ভেড়ার দল গিলে ফেলছে! এই ব্যবসা জাঁকিয়ে চালাবার জন্য ক্যাথলিক গির্জা আর মঠগুলোর সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল, রাজাকে যারা সাহায্য করেছিল তাদের মধ্যে সেই সম্পত্তি বন্টন করা হল, নূতন একটা অভিজাত সম্প্রদায় তখন সৃষ্টি হল। টিউডরের পর স্টুয়ার্ট যুগে (১৭০৩-৮৮) নূতন অর্থনীতিব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে যারা অর্থবান হতে লাগল, বাণিজ্য এবং আনুষঙ্গিক পেশা থেকেই যাদের উপার্জন, তারা রাজা আর তার

অভিজাত বন্ধুদের হাত থেকে দেশ-শাসন এবং বিশেষ করে বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কর্তৃত্ব কাড়তে চেয়ে যে লড়াই চালায়, তাতেই রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণ যায়, পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ে।' মধ্যযুগে, যখন সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য ছিল, তখন যে শ্রেণীর রাষ্ট্রশাসনব্যাপারে কোনো ক্ষমতা ছিল না, তারাই এসে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বিপ্লব ঘটায়।

এর চেয়ে বড়ো বিপ্লব হল ১৭৮৯-৯৫ সালের ফরাসি বিপ্লব। তার আগে আরো দুটো যুগান্তকারী ঘটনা হয়েছিল, যার ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়ল, যাকে বলা হয় বুর্জোয়া যুগ, সেই যুগের প্রবর্তন ঘটল। ১৭৬০ নাগাদ সময়ে হল শিল্প বিপ্লব, অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতিতে বাষ্পযান ইত্যাদি নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ ঘটল, উৎপাদনের পরিমাণে যন্ত্রের সাহায্যে পূর্বের তুলনায় অভাবনীয় বৃদ্ধি সংসাধিত হল। ইতিমধ্যে ইয়োরোপের বহু জাতির বণিক ও নাবিক মিলে এশিয়ায় (ভারত ও অন্যত্র) এবং আমেরিকায় হাজির হয়ে সেখানকার দৌলত লুট করে আনতে পেরেছিল বলে যন্ত্রের জোরে বড়ো বড়ো কারখানা ফাঁদার জন্য প্রয়োজন টাকাও ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠীদের হাতে মজুদ ছিল। তাই যে বাষ্পযান সম্বন্ধে দু'হাজার বৎসর পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের ধারণা সত্ত্বেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে নি, সেই বাষ্পযানের কদর হল কাজের মধ্যে। তাই দেখা যায় যে লোভী বড়োলোকরা চাষীর জমি কেড়ে তাকে উৎখাত করার ফলে একদিকে বহু লোক পেটের দায়ে মজুরি খুঁজছিল, আর অন্যদিকে নানা দেশে বাণিজ্য করে এবং বাণিজ্যের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম ধাপ পার হয়ে সেখানকার টাকা আর কাঁচামাল শ্রেষ্ঠীরা ইউরোপে চালান দিচ্ছিল বলে শিল্পবিপ্লব হল, ধনিকের আবির্ভাব ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান সূচিত হল। ধনিকের আবির্ভাব সম্বন্ধে "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের অবিস্মরণীয় অধ্যায়ে কার্ল্ মার্ক্স বলেছিলেন যে কথা আছে বটে যে টাকা দুনিয়ায় প্রথম আসে গালে জন্মসময়ের রক্তের ছাপ নিয়ে, কিন্তু পুঁজি যখন এসে হাজির হয় তখন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সেই পুঁজির চেহারা যে কত বীভৎস ও অমানুষিক হতে পারে তা যারা আজ অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার হুমকি দিয়ে দুনিয়াটাকে কব্জা করে রেখে নিজেদের মুনাফার পাহাড়কে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে চায়, তাদের দিকে নজর দিলেই জানা যাবে।

যাই হোক, ফিউডাল্ সমাজব্যবস্থার মধ্যেই যেমন তার ধ্বংস সাধন করে নূতন বুর্জোয়া সমাজ উদ্ভবের সম্ভাবনা ক্রমশ প্রকাশ পেল, তেমনই বুর্জোয়া সমাজের যে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি তা শ্রমিকশ্রেণীর অনিবার্য আবির্ভাবের মধ্যে দেখা গেল। এ বিষয়ে "কমিউনিস্ট ইশতেহারে" আছে : "আজ পর্যন্ত মানুষের যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস একথা (এঙ্গেল্‌স্ পাদটীকায় লেখেন যে আদিম ইতিহাসকে বাদ দিয়েই একথা বলা হয়েছে)। স্বাধীন মানুষ ও দাসগণ, অভিজাত এবং সাধারণ লোক, মধ্যযুগের 'গিল্‌ড্' (কারিগরসংস্থা) প্রতিষ্ঠানের কর্তারা এবং তাদের মেহনতকারী কর্মচারীরা, এক কথায় (প্রতি যুগের) অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদা পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনো আড়ালে আবার কখনো মুখোমুখি হয়ে।...ফিউডাল্ সমাজের ধ্বংসাবশেষ হতে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে, তার ভিতর শ্রেণীর বিরোধ শেষ হয়ে যায় নি। নূতন সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নূতন শ্রেণী, অত্যাচারের নূতন ব্যবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নূতন ধরন। আমাদের যুগ, অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য

হল এই যে শ্রেণীর বিরোধ এখন সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজটা ক্রমেই দুটো বিশাল শিবিরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে— বুর্জোয়া ও প্রলেটেরিয়ট (নিঃস্ব), এই দুই বিরাট শ্রেণী সোজাসুজি পরস্পরের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে।"

এই শ্রেণীবিরোধ সামাজিক বিবর্তনে সবচেয়ে মৌলিক এবং সক্রিয় শক্তি। ইতিহাস রচনায় চিন্তাধারা বা ব্যক্তিবিশেষের অবদানকে মার্ক্স্‌বাদ অস্বীকার করে না, কিন্তু মার্ক্সবাদ অনুসারে বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবই হল মূলগত ব্যাপার এবং তারই ছাপ পড়ে সমসাময়িক চিন্তাধারার উপর এবং প্রতিভান্বিত ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের উপর। যে "সমাজবাদী" মনে করেন যে ইতিহাস গঠন করে কতকগুলো ভাবাদর্শ, তিনি অবশ্যই শ্রেণীসংগ্রাম কথাটাকে পর্যন্ত বর্জন করে মানুষের অন্তর বদলাবার চেষ্টায় প্রচার ও যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করবেন। কিন্তু মার্ক্স্‌বাদ সুগভীর ঐতিহাসিক অনুশীলনের ফলে জেনেছে যে নিছক চিন্তা বা ভাবাদর্শ বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে পারে না, মার্ক্স্‌বাদ জানে যে নিজস্ব উৎপাদন পদ্ধতিকে বিকশিত করার স্বার্থেই বুর্জোয়া শ্রেণী বাধ্য হচ্ছে সৃষ্টি করতে সেই সংগঠিত নিঃস্বশ্রেণীকে, যারা বুর্জোয়া সমাজের কবর রচনা করবেই। তাই মার্ক্স্‌বাদীর কাছে বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বগরিষ্ঠ কর্ম হল শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে ধনিকশ্রেণীকে অধিকারচ্যুত করে শ্রমিকশাসন প্রতিষ্ঠিত করা। এই শ্রেণীসংগ্রাম কখনো স্পষ্ট আর কখনো অর্ধস্পষ্ট হলেও বুর্জোয়া সমাজে প্রতিনিয়ত চলছে। শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে মার্ক্স্‌বাদ লক্ষ করেছে যে এক একটা যুগে উৎপাদনের যে পদ্ধতি রয়েছে তার সঙ্গে উৎপাদনের ফলে মানুষের যে পরস্পর-সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার একটা বিষম অসঙ্গতি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া যুগে উৎপাদনের পদ্ধতি বিজ্ঞানের কল্যাণে এমন যে উৎপাদন-ফল সকল মানুষের জীবনে স্বস্তি আনতে নিশ্চই সক্ষম। কিন্তু বুর্জোয়া যুগের উৎপাদন-সম্পর্ক এমন, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেটেরিয়ট, মালিক ও মজুরের সম্পর্ক এমন যে যথাসম্ভব বেশি মুনাফার লোভে মালিক মজুরকে যথাসম্ভব বেশি শোষণের চেষ্টা করে আর মজুর একজোট হয়ে তার শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার লড়াইয়ে নেমে ক্রমশ বুঝতে পারে যে বুর্জোয়া শ্রেণীরই উচ্ছেদ বিনা তার স্বস্তি বা সুখের কোনো আশা নেই। এই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থে যে অবিরাম সংঘর্ষ চলে, তারই চরম চেহারা দেখা যায় বিপ্লবের সময়ে, যখন প্রাচীন সমাজ নবীন সমাজের শক্তির কাছে পরাজিত হয়, যেমন হয়েছিল ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবে। সমাজের আভ্যন্তরীণ এই সংঘর্ষ একসময় এমনই পরিণতির পরিস্থিতিতে হাজির হয় যে ভিতরকার গ্রন্থিগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তৎকালীন কর্তৃপক্ষীয় শোষকদের অন্ত্যেষ্টির দিন এসে উপস্থিত হয়, যারা শ্রমিকদের উৎখাত করেছিল, সবদিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, তারা নিজেরাই উৎখাত হয়ে যায়।

মার্ক্স্‌বাদীর কাছে ইতিহাসের শিক্ষা হল এই যে শ্রেণীসমাজের মধ্যে তারই দেহসম্ভূত অসঙ্গতি ঠিক যেন মাতৃগর্ভের নবশিশুর আবির্ভাব ও জন্মের মতো নূতন সমাজের আবির্ভাব ও জন্মের মধ্য দিয়ে পরিপূরিত হয়। সমাজের ইতিহাসের নূতন অধ্যায় তখন আরম্ভ হয়। মার্ক্স্‌ ১৮৫৬ সালে লেখেন্‌ : "আমাদের যুগে প্রত্যেক বস্তুই যেন তার বিপরীত যা, তার সঙ্গে একাত্মভাবে লেগে রয়েছে। আমরা দেখছি, যে যন্ত্র মানুষের মেহনতের লাঘব ঘটাবার এবং তাকে সুফলপ্রসূ করার আশ্চর্য শক্তি রাখে সেই যন্ত্রই মানুষকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাচ্ছে আর উপবাসী রাখছে। কোন্‌ এক বিস্ময়কর মোহমন্ত্রে যেন সম্পদের নব্য রীতিসিদ্ধ

উৎসগুলি অভাবের উৎসে পরিণত হচ্ছে। মানুষ যখন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারছে, তখনই সে যেন অপর মানুষের কিংবা নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। তবে আমরা জানি যে সমাজে নূতন ঢঙের যে শক্তি আজ এসেছে তাকে যদি সন্তোষজনক কাজে লাগাতে হয়, তা হলে নূতন ঢঙের মানুষকে দিয়েই সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—আর এই নূতন ঢঙের মানুষ হল মেহনতী মানুষ। যন্ত্রের মতোই এই মহনতী মানুষ হল আধুনিক কালের আবিষ্কার।" উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্বতন উৎপাদনসম্পর্ক আর খাপ খায় না যখন, তখন বিপ্লব ঘটবেই—এই হল মার্ক্সের নিঃসংশয় ভবিষ্যদ্‌বাণী। ইতিহাসের নিগূঢ় বাস্তব বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাতে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কেউ বলেন যে মার্ক্সের মতে মানুষ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে আর শুধু উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগান্তর ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এ-ধরনের সমালোচনা সম্পূর্ণ অমূলক। জনসমষ্টির সক্রিয়, সদাচলমান আন্দোলন বিনা যে যুগান্তর সম্ভব নয়, তা মার্ক্স্ বহুবার বুঝিয়েছেন, ব্যক্তির অবদানকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। তবে মার্ক্স্‌বাদ বলে যে ইতিহাসের বিধি জানলেই মানুষের স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে। সেই বিধির পরিধি না জানা থাকলে মানুষের পক্ষে সফল কর্মে নিরত হওয়া সম্ভব নয়। শুধু মাত্র স্বাধীন চিন্তার জোরে কি কেউ প্রকৃতির বিধি অগ্রাহ্য করে শরীরের দৈর্ঘ্যে একহাত বৃদ্ধি ঘটাতে পারে? পদার্থবিজ্ঞানের বিধি অনুযায়ী মানুষের পক্ষে স্বয়ং পাখির মতো আকাশে উড়ে যাওয়া অসম্ভব জেনে তবেই মানুষ আকাশযানে বিচরণ করতে শিখেছে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রকৃতই মানুষের চিন্তা ও কর্মে বিপুল মুক্তির সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

নিকৃষ্ট স্তরের সমালোচকরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কুৎসারটনায় বলেছেন যে এই মত অনুসারে মানুষ নিছক স্বার্থপর, অর্থনীতিগত কারণেই কাজ করে থাকে, উদার মানবতার ইতিবৃত্ত এই মত দ্বারা অস্বীকৃত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কখনো ঐ-ধরনের নিরেস কথা বলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফরাসি বিপ্লবের সময় "জিরন্দ্" দল সম্পর্কে মার্ক্স্‌বাদী ঐতিহাসিক যখন লেখেন যে তারা নিজেদের শ্রেণীর কর্তৃত্ব অভিজাতসম্প্রদায় এবং সাধারণ মেহনতী মানুষের উপর চাপাবার জন্যই ব্যস্ত ছিল, তখন হয়তো 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র বাণীতে মুগ্ধ হয়ে কেউ বলতে পারে যে "জিরন্দ্" দলে ছিলেন কন্দর্সে-র মতো দার্শনিক যিনি কখনো শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হতেন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু মার্ক্স্‌বাদী ঐতিহাসিকের কাছে নিছক ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অনুসন্ধান করাটা গৌণ ব্যাপার; মুখ্য কর্তব্য হল জানার চেষ্টা করা যে কেন একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ আদর্শ বহুজনের মনে স্থান পেল। মার্ক্স্‌বাদ এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আদর্শ আকাশ থেকে টুপ করে মনের ভিতর ঢুকে পড়ে না কিংবা হঠাৎ আপনা-আপনি মাটি থেকে গজিয়ে ওঠে না—আদর্শ জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যদি বলত যে মানুষ সর্বদা তার স্বার্থসাধনের জন্যই কাজে নামে তো নিশ্চয়ই তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত।

এই প্রসঙ্গে "অষ্টাদশ ব্রুমের" গ্রন্থে মার্ক্সের কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য : "সম্পত্তির নানা ব্যবস্থা এবং জীবনের সামাজিক পরিস্থিতিকে বনিয়াদ করে তার উপর অনেক এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অনুভূতি, কল্পনা, চিন্তার ধরন ও জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা গোটা ইমারত নির্মাণ করা হয়। এই সব অনুভূতি ও চিন্তাধারাকে জীবনের বাস্তব বনিয়াদ এবং

তারই অনুরূপ সামাজিক পরিস্থিতি থেকে সমগ্র শ্রেণীই উৎপাদন করে এবং তার রূপনির্ণয় করে দেয়। ঐতিহ্য এবং শিক্ষার মাধ্যমে এই সব অনুভূতি ও চিন্তাধারা কোনো ব্যক্তির মনে প্রবাহিত হয়ে গেলে সে ভাবতে পারে যে তার ব্যবহারের প্রকৃত কারণ ও পশ্চাৎপট হল ঐ সব অনুভূতি ও চিন্তাধারা (বাস্তব জীবন নয়)।" এ-বিষয়ে এঙ্গেল্‌স্ "false consciousness" ("কাল্পনিক চেতনা") সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, আধুনিক মনস্তত্ত্বে সেই জটিলতার পরিচয় মেলে। এমন বহুবার ঘটে যে মানুষ এক উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত থাকে। আদর্শবাদী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবসা করতে বেরিয়ে যখন বেশ মোটা মুনাফা আসতে থাকে তখন প্রকৃতপক্ষে আদর্শের কথা ভুলে ব্যবসার তদানীন্তন সমাজে স্বীকৃত যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি, তাতেই অনেকে ডুবে যায়, অথচ মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি নিজেদেরই কাছে অজানা থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার যোগ্য; কিন্তু আদর্শের বুলি আউড়ে সমাজের যারা বিপুলাংশ, সেই সাধারণ মানুষের অবিরাম বঞ্চনা ও দুর্দশার কথা বহু আদর্শবাদীরই সচেতন চিন্তার মধ্যে স্থান পায় না। তাই মার্ক্‌সবাদ শুধু আদর্শের ভাবগত বিশ্লেষণ করে না, স্থানকালপাত্র অনুযায়ী সেই আদর্শের প্রকৃতি বিচার করে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে।

অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে না যে ইতিহাসে অন্যান্য শক্তির মূল্য নেই, বলে না যে একই সোজা, বাঁধা রাস্তা দিয়ে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে। বরঞ্চ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে যে, ইতিহাস হল পরস্পরসম্বন্ধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জটিল সমাবেশ। ১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক চিঠিতে এঙ্গেল্‌স্ লেখেন : 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে ইতিহাস নিয়ন্ত্রণে চরম শক্তি হল বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। মার্ক্‌স্ কিংবা আমি এর বেশি কিছু কখনো দাবি করি নি। সুতরাং যদি কেউ আমাদের কথা বিকৃত করে বলে অর্থনীতি হল ইতিহাস নিয়ন্ত্রণের একমাত্র শক্তি, তা হলে সেটা হবে অর্থহীন, অবান্তর এবং উদ্ভট। অবশ্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হল বনিয়াদ, কিন্তু সেই বনিয়াদের উপর যে সব বিভিন্ন কামরা নির্মাণ হয়—যেমন শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক চেহারা এবং তার ফলাফল, জয়ের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, আইনকানুনের রকমফের, এমন কি তারপর সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করছে তাদের মস্তিষ্কে বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাষ্ট্রনীতি, শাসনবিধি, দর্শন-বিষয়ক মতবাদসমূহ, ধর্মচিন্তা এবং অকাট্য সিদ্ধান্তের মধ্যে সেই চিন্তার বিকাশ— এ সমস্ত ব্যাপারই ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে সেই সংগ্রামের রূপকে পর্যন্ত নির্ণীত করে দেয়। এই সব ধারার মধ্যে একটা পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে।...তা না হলে ইতিহাসের যে কোনো যুগে (মার্ক্‌সের) ঐ নীতি প্রয়োগ করা বীজগণিতের একটা সরল সমীকরণের চেয়েও সহজ হত।" আর একটি চিঠিতে এঙ্গেল্‌স্ খেদ করে বলেছিলেন যে বস্তুবাদের নামে অনেকে এতদূর চলে যায় যে বিভিন্ন চিন্তাধারা ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে একথাও তারা মানতে চায় না। বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তার কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই, চিন্তা কর্মের সঙ্গে, জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বদাই সংলগ্ন থাকতে বাধ্য, কিন্তু চিন্তাধারা যে ইতিহাসে কোনো প্রভাব ফেলে না, একথা ভুল। আবার এক চিঠিতে তিনি অনুযোগ করেন : "এরা সব 'ডায়ালেক্‌টিক্' সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রাখে না। এরা শুধু দেখে একদিকে কারণ আর অন্যদিকে কার্য। এরা বোঝে না যে এভাবে বিচার করলে সিদ্ধান্ত হবে

একেবারে অবাস্তব; এরা বোঝে না যে বস্তুজগতে এমন প্রখর, প্রকট, চিন্তাপ্রসূত বৈপরীত্য দেখা যায় কেবল তখনই যখন পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সংকট উপস্থিত হয়; এরা বোঝে না যে সাধারণত (সমাজ বিকাশের) সমগ্র বিরাট পদ্ধতি বিকশিত হতে থাকে বিভিন্ন ও অসমান শক্তি ও ধারার ঘাত প্রতিঘাতে, আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে প্রাথমিক এবং যুগান্তকারী হল অর্থনৈতিক অগ্রগতি।" মার্ক্‌স্‌ এঙ্গেল্‌সের এই শিক্ষা আত্মস্থ করে লেনিন একবার বলেন যে বিপ্লব কখনো সোজা, বাঁধানো রাস্তা দিয়ে চলে না, সর্বদাই যে বিপ্লবের কাজ একই ঢঙে চলবে তা নয়, অনেক আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে, মাঝে মাঝে পিছু হটে পর্যন্ত, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে মূলগত ভাবে সামাজিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এক একটা যুগের চিন্তায় নয়, তার বাস্তব উৎপাদন ব্যবস্থায়। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে অন্য বহু ধারা অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে সর্বদা পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করে তবে বিপ্লবী কর্তব্যের প্রকৃত সন্ধান মিলবে। বিপ্লব নিশ্চয়ই অনিবার্য, কিন্তু সর্বসময়ে সেই অনিবার্যতার কথা স্মরণ করে বিপ্লবের আওয়াজ তুলে বেড়ানো এমন এক রকমের বিপজ্জনক বিলাসিতা যা মার্ক্‌স্‌বাদ বরদাস্ত করে না। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আয়ত্ত করলে তবেই বিপ্লবী সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা চলবে।

একটা গোটা বই লিখলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পুরো পরিচয় দেওয়া শক্ত। এখানে তাই শুধু মূলগত কয়েকটি কথা বলা হল। আর সর্বদা যেন আমরা স্মরণ রাখি যে বর্তমান যুগে ধনিকবাদের পতন ও সমাজবাদের জয় বাস্তব বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ তথ্য থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌, আর সে-প্রমাণের ফল আমরা দেখছি সোভিয়েট আর চীনের মতো দেশে। আমরা যেন না ভুলি যে বহুজনের সমবেত পরিশ্রমে সৃষ্ট হচ্ছে মানুষের সম্পদ, অথচ মেহনতী মানুষকে শোষণের জাঁতাকলে পিষে এখনো মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মিলে সেই সম্পদ থেকে জনতাকে বঞ্চিত করে রাখছে বলে যে-অসঙ্গতি আজ সমাজে রয়েছে, তার নিরসন অব্যর্থভাবে ঘটাবে মেহনতী জনতার শক্তি। আমরা যেন না ভুলি যে বুর্জোয়া ব্যবস্থা তার অভ্যুদয়ের যুগে উৎপাদনশক্তির বহুগুণ বৃদ্ধি ঘটিয়েছে বটে কিন্তু আজ তার সেই ভূমিকার চিহ্নমাত্র নেই বলে আজ আণবিক শক্তিকে সোভিয়েট ব্যবহার করতে চায় এবং পারে উৎপাদনের জন্য, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তার প্রাচুর্য সংঘটনের জন্য। অথচ বুর্জোয়া ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীরা সেই আণবিক শক্তিকে নিছক নৃশংস ধ্বংসকার্যে ব্যবহার ছাড়া অন্য পথের সন্ধান রাখে না। আমরা যেন না ভুলি যে বুর্জোয়া ব্যবস্থারই আত্মজ হয়ে যে অমিততেজ শ্রমিকশ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে তার চেতনা আজ এত প্রখর এবং যুগান্তর সংঘটনের অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমশ এত প্রস্তুত হচ্ছে, যে দেশে দেশে জনতার জয়ের আর অতিরিক্ত বিলম্ব নেই। বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকট আজ আর সমাধানের সম্ভাবনা রাখে না। যুদ্ধ বাধিয়ে জনতার দুর্গ সোভিয়েট ও চীনকে ধ্বংস করে, সভ্যতার শ্মশানস্তূপের উপর প্রভুত্ব করার ধিক্কৃত কল্পনা আজ তাদের একমাত্র উপজীব্য।

শোষণ ও শাসন

গ্রীক পুরাণে গল্প আছে যে দেবরাজ জিউস্ এই পাপের জন্য প্রমিথিয়ুসকে শাস্তি দিয়েছিলেন যে তিনি স্বর্গ থেকে চুরি করে মর্ত্যের মানুষকে আগুনের ব্যবহার আর অন্যান্য হাতের কাজ শিখিয়েছিলেন। প্রমিথিয়ুসকে সাজা দেওয়া হল যে এক মরুপ্রান্তরে পাহাড়ের গায়ে তাঁকে বেঁধে দেওয়া হবে আর ঈগল পাখি এসে তাঁর পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি কুরে নেবে। এই দণ্ডবিধানের ভার দেওয়া হয় কর্মকারদের দেবতা (হিন্দু শাস্ত্রের বিশ্বকর্মার দোসর) হেফাইস্টস্-এর উপর। কার্ল মার্কস্ একবার বলেছিলেন যে ধনিক ব্যবস্থায় মাহিনার বদলে মেহনতের যে বন্দোবস্ত তা দাস প্রথারই প্রায় সামিল। কারণ ধনতন্ত্রের যখন পোয়াবারো তখন ছোটোখাটো উৎপাদকরা তাদের অভ্যস্ত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় আর বেকারের সংখ্যা বাড়ায় বলে এত বেশি বেকার কাজের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে যে হেফাইস্টস্-এর হাতুড়ী প্রমিথিয়ুসকে যেভাবে পাথরে বেঁধে রেখেছিল তারচেয়ে কড়া বাঁধনে শ্রমিককে ধনিকের দাসত্ব বন্ধনে বাঁধা থাকতে হয়। তাই তিনি বলেন যে, "পূর্বগামী সমাজব্যবস্থাগুলির মতোই বুর্জোয়া ব্যবস্থা জনগণের বিপুলাংশের উপর মুষ্টিমেয় এবং ক্রমশ আরো সংখ্যাল্প কয়েকজনের শোষণ চালিয়ে যাওয়ার এক জাঁকজমকওয়ালা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। মার্ক্সের মহাগ্রন্থ "ক্যাপিটাল"-এ শুধু যে তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা আছে তা নয়, তার ছত্রে ছত্রে ফুটে আছে শোষণব্যবস্থা সম্বন্ধে সেই পরদুঃখে-বিগলিতহৃদয় মনীষীর অগ্নিগর্ভ ঘৃণা। তাই দেখি তিনি বলেছেন যে, 'পুঁজি যেন মরা মেহনত, শুধু পিশাচের মতো জীবন্ত মানুষের মেহনত চুষে বেঁচে রয়েছে' আর মেহনতী মানুষের শরীরপাত ঘটিয়ে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা হল 'মানুষ-নেক্ড়ে বাঘের (were-wolf) ক্ষুধার' মতো। তেজোদৃপ্ত ভাষায় ধনিকের এই দুর্বার তাড়নার কথা বলেছেন : "শ্রমিকের দেহের বিকাশ এবং স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন যে সময় তাকেও ধনিক কেড়ে নেয়। খোলা হাওয়া আর রৌদ্র গায়ে মেখে নেওয়ার সময়টুকুও সে চুরি করে। কাজের মাঝখানে খাওয়ার সময় কতটুকু হবে বা না হবে তাই নিয়ে সে দরদস্তুর করতে থাকে আর যেখানে পারে সেখানে চেষ্টা করে যাতে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ চলে, ঠিক যেমন ইঞ্জিনের বয়লারে কয়লা ঢালা হয় কিংবা কলকব্জায় তেল দেওয়া হয় তেমনই উৎপাদনের একটা যন্ত্র হিসাবে শ্রমিককেও যেন যৎসামান্য গলাধঃকরণ করতে দেওয়া হয়। ক্লান্ত শরীরের শক্তি ফিরিয়ে এনে, দেহকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যতক্ষণ নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাওয়া দরকার, ধনিক তা কমিয়ে দেয় আর চায় যে একেবারে পরিশ্রান্ত শরীরকে আবার মেহনতের জন্য প্রস্তুত করতে হলে যে কয়েক ঘণ্টা ঝিমিয়ে থাকা একান্ত প্রয়োজন তার বেশি যেন শ্রমিক না ঘুমোতে পারে। শ্রমিকের আয়ু সম্পর্কে ধনিকের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সারা দিনে কত বেশি শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে, শুধুমাত্র এই সোজা ব্যাপারটাই সে বোঝে। লোভী কৃষক যেমন জমির উর্বরতা চুরি করে বেশি পয়দা বার করে নিতে চায়, তেমনই ধনিক শ্রমিকের আয়ু কমিয়ে একই মতলব হাসিল করে।"

যে সব দেশে সোশালিজম্ স্থাপিত হয়েছে বা হতে চলেছে, তাদের বাদ দিলে আজ

দুনিয়ার সর্বত্র ধনিক ব্যবস্থাই বর্তমান। অবশ্য ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে কোথাও টিকে নেই, তা নয়। মার্ক্‌স্‌ একবার বলেন যে এই বুর্জোয়া যুগেও পূর্বতন ব্যবস্থার রেশ কিছুটা চলেছে আর আমরা ভুগছি শুধু বর্তমানের চাপে নয়, যা অতীত, যা প্রকৃতই মৃত তারও চাপ জীবনের উপর রয়েছে। আমাদের দেশে বুর্জোয়া যুগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা এখনো বড়ো কম লক্ষ করা যায় না। শিল্পের বিকাশের দিক থেকে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে অষ্টম স্থান নিয়ে আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশটা এত বড়ো যে তার পক্ষে অষ্টম স্থান পাওয়ার অর্থ হল যে সত্যই শিল্প ব্যাপারে আমরা অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ। যাই হোক, মোটের উপর একথা খুবই সত্য যে বুর্জোয়া ধারাই এখনো প্রধান, তারই নিয়ন্ত্রণে সমাজজীবন চলে। উৎপাদন এখন প্রধানত ধনতন্ত্রেরই রীতিতে পরিচালিত হয়, গ্রামে বাস করে ছোটোখাটো কারিগরি যারা করত তারা পেটের তাড়নায় প্রকাণ্ড কলকারখানায় গিয়ে কাজ নিতে বাধ্য হয়, জমি থেকে ক্রমশ তারা উৎখাত হতে থাকে, আর নিজেদের মেহনত করার যে ক্ষমতা আছে তাকেই মালিকের কাছে মজুরির বদলে বিক্রয় করে বেঁচে থাকতে পারে।

ধনতন্ত্রের আমলে শোষণের প্রধান ধরন জানতে হলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে তখন উৎপাদন হয় উৎপন্ন পণ্য ('commodity') বাজারে বিক্রয়ের জন্য, আর সে বাজার হাজার হাজার মাইল দূরে হতে পারে। আরো বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে শুধু মানুষের মেহনতে প্রস্তুত জিনিসই যে বিক্রয় হয় তা নয়, মানুষের মেহনত করার শক্তিটাই একটা বাজারে বিক্রয় করার পণ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এই দুটো কথারই গুরুত্ব খুব বেশি।

মানুষ আদিম অবস্থায় নিজের প্রয়োজন যা কিছু তা নিজেই উৎপন্ন করেছে। তারপর দেখা গেল যে ক্রমশ কেউ কেউ একটা কাজ করছে আর অপরে অন্য কাজ করছে— যে কাজে যার দক্ষতা সে কাজ সে-ই করছে, শ্রমবিভাগের প্রথম প্রবর্তন হচ্ছে। একজনের জিনিস অপরের জিনিসের সঙ্গে বদলে নিয়ে পরস্পরের প্রয়োজন মিটাবার বন্দোবস্ত এভাবে হতে লাগল। ক্রমে যাকে বলা হয় বিনিময়-ব্যবস্থা (''barter'') তা দেখা দিল। মুদ্রার প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত এই পরস্পর বিনিময় দ্বারা মানুষ তার পক্ষে দরকারি পণ্য সংগ্রহ করত।

শ্রেণীভেদ দেখা দিয়েছে সেই প্রাচীন যুগে, যখন একজন মানুষ তার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে যা দরকার তার বেশি কিছু উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাই দাসপ্রথা যখন ছিল, তখন গোলামের পরিশ্রমে যে অতিরিক্ত উৎপাদন (গোলামের পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার চেয়ে বেশি উৎপাদন) হত, তা মালিক এবং মালিকের সাঙ্গোপাঙ্গের ভোগে যেত। তেমনই যখন দাসপ্রথা গিয়ে ভূমিদাসপ্রথা এল, তখন আবার জায়গীরদার জমিদার আর তার পোষ্যেরা খেতখামারে যারা কাজ করত তাদের মেহনতে উৎপন্ন ফলের অতিরিক্ত অংশটুকু (অর্থাৎ চাষীর পক্ষে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার বেশি অংশটুকু) ভোগ করত। ঠিক আবার বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাতে আমরা দেখি এই পরশ্রমভোগীর দলকে, যারা সাধারণ মানুষের মেহনতে যে দৌলত পয়দা হয় তার অধিকারী হয়ে বসে, সমাজপতির আসন নিয়ে থাকে, শোষণ আর শাসন একযোগে চালায়।

বিনিময়ের বদলে মুদ্রা মারফত উৎপন্নদ্রব্য লেন-দেন বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে। মুদ্রার প্রচলনে বাণিজ্যের সুবিধা হয়েছে, বণিকদের বাজারও সুবিস্তৃত হয়েছে। প্রাচীন যুগেই সওদাগররা ঝড়ঝঞ্ঝা ঠেলে নৌকা বেয়ে চলেছে—দাঁড়টানা এবং অন্যান্য সব মেহনতের কাজ অবশ্য গোলামের দর কিংবা প্রায়-গোলাম গরীবেরাই করেছে। বেশি উদাহরণ দেওয়ার

সময় নেই, কিন্তু সবাই জানে প্রাচীনকালে ফিনিশিয়েরা, গ্রীকরা, রোমানরা এবং আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করতে গিয়েছে, বাণিজ্য করতে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তেমনই আবার মধ্যযুগে ইয়োরোপের দেশগুলি প্রথমে বাণিজ্যব্যাপারে পশ্চাৎপদ থাকলেও পরে বাণিজ্যে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আধুনিককালে বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পবিপ্লবের সংমিশ্রণে ধনিক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটার পর থেকে বাজারের বিস্তার হয়েছে অভূতপূর্ব এবং অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদের বর্তমান রূপ দেখা দিয়েছে। তার আগে সমাজের গোটা অর্থনৈতিক জীবনে দূরদেশে বাণিজ্যের স্থান ছিল সামান্যই।

উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হতে পারে। প্রাচীন বাংলায় তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি বন্দর থেকে বাণিজ্য তখনকার পক্ষে বেশ চলত। মধ্যযুগেও চাঁদ সদাগর প্রভৃতির গল্প থেকে, আর পর্যটকদের বিবরণ থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে খবর আমরা পাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রধানত অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং উৎপন্নদ্রব্য বিতরণ হত দেশের মধ্যে, ছোটো ছোটো এলাকার ভিতরই। কলকারখানার পত্তন তখন হয় নি, গ্রামের জীবন তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, গ্রামের বাসিন্দারা সারা জীবন সেখানেই কাটাত, মনের পরিধিও তার মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে থাকত। চাষী মোটামুটি জানত তার শস্য কোথায় কার ঘরে বিক্রয় হয়, কারিগর জানত কে তার খরিদ্দার। কার ব্যবহারের জন্য ("use") উৎপাদন চলছিল, তা মোটামুটি জানা ছিল; গ্রামের যা উৎপাদন তা গ্রামবাসীরাই প্রধানত ভোগ করতে অল্পাধিক পরিমাণে (কারণ সেখানেও শ্রেণীভেদ হয়েছে), আর কিছু উদ্‌বৃত্ত যেত রাজারাজড়া আর তাদের পারিষদ্‌দের ভোগে, বিশেষত যদি তা বিলাসব্যসনের বস্তু হত। এই ছিল আগেকার দিনের মোটামুটি ব্যাপার। কিন্তু এখন যন্ত্রের প্রবর্তন আর বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রাধান্য হয়েছে বলে একটা মস্ত বড়ো অদলবদল ঘটেছে। এখনো অনেক অঞ্চল আছে যেখানে উৎপাদন চলে মান্ধাতার আমলের মতো, অনেক গ্রাম আছে যার চেহারার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু আজ সমাজে উৎপাদনব্যবস্থায় প্রাধান্য নিয়েছে ধনিকশ্রেণী। আর নিছক লাভের সন্ধানে সেই ধনিকশ্রেণী দুনিয়ার বাজার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। গ্রামের তাঁতি জানত যে তার হাতে তৈরি ধুতি-শাড়ি কোথায় যায়; কিন্তু কেশোরাম কাপড় কলের মজুর সে-খোঁজ রাখতে পারে না। গ্রামের মুচি জানত তার তৈরি জুতো কে কেনে, কিন্তু বাটা বা ফ্লেক্স্ কারখানার মজুর তা জানে না। গ্রামের চাষী জানত (আর এখনো অনেক সময় জানে) যে তার ধান মহাজন নিয়ে গিয়ে কোন্ হাটে বেচে, কিন্তু পাটচাষী কিংবা গঙ্গার দু'ধারের চটকলের মজুর জানে না তাদের তৈরি পাট আর থলে কোথায় যায়। সব দেশের মালিকেরা এক দুনিয়া জোড়া বাজারে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য ব্যস্ত। এই বাজারের উপর একচেটিয়া দখল কায়েম করার জন্যই ধনতন্ত্র সাম্রাজ্য বিনা টিকে থাকতে পারে না। উৎপাদনের অপূর্ব উন্নতির ফলে নিজের দেশের সব মানুষের জীবনের মানকে বাড়িয়ে সবায়ের নাগালের মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এনে দেওয়া আজ সম্ভব, কিন্তু যারা ধনিক তারা লাভের জন্য ব্যস্ত, সমাজকল্যাণের জন্য নয়, সুখস্বাচ্ছন্দ্য যদি সকলের হয় তো মুষ্টিমেয়ের হাতে শোষণফলে ঐশ্বর্য জমায়েত হবে কেমন করে? তাই নিজের দেশের উপরই প্রভুত্বকে স্থায়ী করার মতলবে তারা পরের দেশ গ্রাস করে—এশিয়া, আফ্রিকার পশ্চাৎপদ দেশগুলোকে কবলে আনতে পারলে তাদের মুনাফার অঙ্ক ফেঁপে ওঠে, সেই সব দেশ থেকে সস্তায় কাঁচামাল তারা জোগাড় করতে পারে, সেখানে নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রয় করার সুবিধা আদায় করতে পারে, আর যে মূলধন শুধু জমে

যাচ্ছে তাকে খাটাতে পারে ঐ পশ্চাদপদ দেশগুলিতে, যেখানে মানুষ গরিব আর অত্যন্ত সস্তাদরে তাদের মেহনত বিক্রয় করতে বাধ্য বলে মালিকের লাভও হবে চূড়ান্ত। এই ধরনের হিসাব করে নিজস্ব মতলব নিয়ে ধনিকশ্রেণী বেড়িয়েছিল দুনিয়া জয় করতে, এরাই দেশে দেশে কারখানা বানিয়েছে খনি খুঁড়েছে, শহর খাড়া করেছে (যেমন সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতার জলাভূমির উপর আজ বিরাট শহর দাঁড়িয়েছে), এরাই জোর করে মজুরিকে সবচেয়ে কম হারে বেঁধে রাখার জন্য প্রাণান্ত করেছে, এরাই বেকারের দলকে মজুর রেখে দিয়েছে যাতে নিতান্ত পেটের দায়ে যথাসম্ভব কম মজুরিতে মানুষ মেহনত করতে বাধ্য হয়, এরাই সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতবর্ষ কিংবা চীনের মতো দেশের বিশ্ববিশ্রুত ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে দেশবাসীকে নিঃস্ব করে দিয়েছে, এরাই আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সারা দুনিয়ার উপর তাদের বাদ্‌শাগিরিকে জনতার আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করতে পর্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়েছে। বীভৎস অমানুষিক অস্ত্র ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। এই ধনিকের দল যখন দেশপ্রেমের কথা বলে, তখন তা একটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। এদেরই সম্বন্ধে তাই বলা হয়েছে : "যেখানে প্রচুর কাঁচা মাল আর মজুরকে শোষণ করার সুযোগ আমরা পাব, সেখানেই আমাদের দেশ"। তাই লেনিন বলেছিলেন যে ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর, তার চরম চেহারা হল সাম্রাজ্যবাদ। তাই মার্ক্‌সের আর এক মহান শিষ্য স্টালিন বলেছিলেন যে বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রধান লক্ষণ হল যথাসম্ভব বেশি মুনাফার জন্য অবিরাম লড়াই করে যাওয়া। এজন্য প্রয়োজন দুনিয়ার বাজারকে কব্জা করা, যে প্রয়োজনের তাগিদে আজ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের জিগির কেবলই তুলছে। বর্তমান কালের এই ঘটনাসংঘাত থেকে আমরা বুঝব মার্ক্‌সের বিশ্লেষণ, যখন তিনি বলেছিলেন যে বুর্জোয়া আমলে উৎপাদকদের পরিশ্রমে উৎপণ্য পণ্যের বাজার বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, পূর্বের মতো একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকে না।

এই দুনিয়া জোড়া বাজার বসেছে বুর্জোয়া যুগে, আর এর অর্থ হল যে বুর্জোয়া সমাজে উৎপাদনের উপকরণ—ভূমি, যন্ত্র, ইমারত ইত্যাদি—থাকবে মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠীদের অধিকারে আর যারা নিজেদের জমিতে, কাজ করত বা ঘরে বসে কারিগরি চালাত তাদের মধ্যে অধিকাংশই মাহিনা করা মজুরে পরিণত হবে। বহুজনের এই বঞ্চনা আর সামান্য সংখ্যকের লক্ষ্মীলাভের যে কাহিনী, তার অবিস্মরণীয় বর্ণনা দিয়েছেন কার্ল মার্ক্‌স্। সে কাহিনী সত্যই ন্যক্কারজনক; অর্থলোভ যে মানুষকে কত নোংরা, কত বেপরোয়া, কত নির্মম করতে পারে, তার পরিচয় সেখানে মেলে। কিন্তু মানুষের অগ্রগতি এমনিই ক্রূর, বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হয়েছে।

আগে বলা হয়েছে যে বুর্জোয়া ব্যবস্থার আর একটা বৈশিষ্ট্যই হল যে মজুরির নামে মানুষের মেহনত করার শক্তিকেই বাজারে বিক্রয় করার মতো একটা পণ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। খুব সহজভাবে বলা যায় যে আধুনিক কালের শ্রমিক দিনের পর দিন তার জীবনের আট, দশ বা বারো ঘণ্টা বিক্রয় করে ধনিকের কাছে, যে ধনিক হল উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ, এবং কাঁচামালের মালিক। ধনিক তার পরিশ্রম ভাঙিয়ে মনোমতো মুনাফা না পেলে তাকে যখন খুশি বরখাস্ত করে। শ্রমিক হল নিঃস্ব, রোজগার বন্ধ হলে পুঁজি ভেঙে খাওয়ার অবস্থা তার নয়, নিজের মেহনত করার ক্ষমতাটাকেই বিক্রয় করে কিছু দাম পাওয়া ছাড়া কোনো সম্পত্তিরই সে অধিকারী নয়, সুতরাং বুর্জোয়া আইনে যত ঘটা করেই তার স্বাধীন সত্তা আর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মালিকের সঙ্গে চুক্তি করার অধিকার জাহির করা হোক

না কেন, আসলে সে ধনিকের বেড়াজাল কেটে বেরোতে পারে না, নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই তাকে মেহনত বিক্রয় করতে হয়। আধুনিক কালের শ্রমিক অবশ্য কোনো এক বিশেষ মালিকের গোলাম নয়, কিন্তু মালিক শ্রেণীর কাজেই তার সর্বস্ব বাঁধা থাকতে বাধ্য।

কার্ল মার্ক্স্ তাঁর "পুঁজি আর মজুরি" রচনায় বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এভাবে মানুষের যে লাঞ্ছনা ঘটে তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন : "মজুর কাজ করে শুধু বেঁচে থাকার জন্য। যখন সে মেহনত করে, তখন তার মনে হয় না সে বেঁচে রয়েছে, বরঞ্চ মনে হয় যে জীবনের খানিকটা অংশ তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। তার মেহনত যেন একটা জিনিস যা সে অপর একজনকে নীলামে বিক্রয় করে দিয়েছে। তাই তার খাটুনির লক্ষ সেই খাটুনির ফলে যা উৎপন্ন হচ্ছে তা নয়। যে রেশম সে বুনছে, খনিগর্ভে ঢুকে যে সোনার তাল সে তুলে আনছে, যে অট্টালিকা সে নির্মাণ করছে, তা সে নিজের জন্য উৎপাদন করছে না। নিজের জন্য সে উৎপাদন করছে তার মজুরি; আর তার কাছে রেশম, সোনা আর অট্টালিকা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক কতকগুলি জিনিসে, হয়তো একটা সুতীর জামায়, তামার কয়েকটি পয়সায় আর এঁদোপড়া একটা বাসায়। তার জীবন আরম্ভ হয় যখন তার মেহনত শেষ হয়েছে,—খাবার টেবিলে বা শুঁড়িখানায় বা বিছানায়। গুটি পোকা যখন রেশম কাটতে থাকে তখন তার উদ্দেশ্য যদি হত শুধু গুটি পোকা হিসাবেই নিজের আয়ু বাড়িয়ে যাওয়া, তা হলে আমরা মজুরের চমৎকার দৃষ্টান্ত ঐ গুটিপোকাতে দেখতে পেতাম।'

যদি প্রশ্ন করা যায় যে ধনিক শ্রমিকদের কাজে লাগায় কেন, তা হলে নিশ্চয়ই কেউ জবাব দেবে না যে ক্ষুধার্ত গরিবের উপকারের জন্যই মহানুভব মালিকের দল নানা ব্যবসা ফেঁদেছে। এ প্রশ্নের স্রেফ জবাব হল যে মালিক মজুরের মেহনত পিষে মুনাফার রস বার করে নিতে চায়। মালিকের সব হিসাবের মূলকথা হল এই। আর এখানেই ধনতান্ত্রিক সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য খুবই লক্ষ করার মতো। সমাজের পক্ষে যা বাস্তবিকই প্রয়োজন এবং হিতকর, তার উৎপাদনে লাগা ধনিকের মতলব নয়; বরঞ্চ তার বদলে যে জিনিস পয়দা করলে সব চেয়ে বেশি মুনাফা মালিক পাবে, সেই জিনিসের দিকে তার লক্ষ, সেই জিনিসই মজুরদের খাটিয়ে উৎপাদন করা হবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে কোটি কোটি লোক যা চায়, যার অভাবে তাদের কষ্টের অন্ত নেই, সেই সব জিনিস— যেমন রুটি, মাংস, দুধ, পরনের কাপড়, থাকবার বাড়ি ইত্যাদি— বানিয়ে সেই কোটি কোটি লোকের দুর্ভোগ ঘোচাতে গেলে লাভ তেমন নেই, অথচ লাভ আছে যথেষ্ট যদি যাদের সংখ্যা নগণ্য সেই ধনীদের নির্বোধ বিলাসের দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। সুতরাং উৎপাদন চলবে মানুষের ব্যবহারের জন্য নয়, কল্যাণের জন্য নয়, উৎপাদন চলবে লাভের অঙ্কের দিকে নজর রেখে, তাতে মানুষের কল্যাণ না হলে মালিকের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, মুনাফার মন্ত্র নিয়ে সে তার জপমালা গুণে চলেছে।

এই মুনাফা আসছে কোথা থেকে? এর জন্ম কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব হল যে মানুষের মেহনত থেকেই এর উদ্ভব— যুগ যুগ ধরে পরিশ্রম যেন আলস্যকে রাজকর দিয়ে আসছে। মেহনতী মানুষ মেহনত করে শুধু যে তার মজুরি রোজগার করছে তা নয়, উপর তলায় যারা বসে আছে তাদের দৌলতেও ঐ মেহনত পয়দা করে দিচ্ছে। কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছে : "মজুরি খেটে কি মজুরের সম্পত্তি সৃষ্টি হয়? একেবারেই না। শ্রমিকের পরিশ্রম সৃষ্টি করে মূলধন, অর্থাৎ সেই ধরনের সম্পত্তি যা মজুরকেই শোষণ করে থাকে।"

সর্বপ্রকার মূল্য সৃষ্টির উৎস হল পরিশ্রম, মানুষের মেহনত— একথা মার্ক্স বলেছিলেন।

কিন্তু একথা বলতে গিয়ে তিনি একেবারে নিজস্ব এবং নূতন কথা কিছু বলেন নি। যাঁদের 'ক্ল্যাসিকাল' (খানদানী) অর্থনীতি বিশারদ বলা হয়, সেই অ্যাডাম স্মিথ্ ও রিকার্ডো ঐ কথাই বলেছিলেন। মার্ক্সের অবদান হল এই যে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী নূতন সমাজব্যবস্থায় বাস্তব রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটে এমন ভাবে ঐ কথা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন যে পরিশ্রমই সর্বপ্রকার মূল্য সৃষ্টি করছে এবং পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন 'অতিরিক্ত মূল্য' ('Surplus value') ধনতন্ত্রের পরিস্থিতিতে ধনিক আত্মসাৎ করছে এবং শ্রমিককে বঞ্চিত রাখছে। ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে তুলনায় প্রভেদ হল এই যে "যে পণ্য উৎপন্ন হল সেই পণ্য সম্পর্কে ধনিক কোনো আগ্রহ রাখে না, বরঞ্চ উৎপাদনে যে মূলধন প্রযুক্ত হয়েছে তার চেয়ে সেই উৎপাদনফলের মূল্য কত বেশি এ-বিষয়েই তার আগ্রহ।" ("ক্যাপিটাল", তৃতীয় খণ্ড পৃ: ৫৪)। ধনিক ব্যবস্থায় যত পরশ্রমভোগী রয়েছে, যত পরগাছা সমাজকে কণ্টকিত করে রেখেছে, তারা এই অতিরিক্ত মূল্যের দৌলতেই বাস করছে।

আলো হাওয়া না থাকলে জীবন চলে না, আলো হাওয়া জলের চেয়ে দরকারি জিনিস আর কি থাকতে পারে? কিন্তু সূর্য চন্দ্র গ্রহতারা থাকলেই আলো, আর দিগন্ত বিস্তৃত আকাশে হাওয়ার অভাব নেই। আলো হাওয়া প্রাণধারণের পক্ষেই একান্তভাবে প্রয়োজন, কিন্তু সেটা পণ্য নয়, তার কোনো বাজারদর নেই, আলোহাওয়া নিয়ে বেসাতি চলে না। কিংবা নদীর জল যেখানে মিলছে বা ফল যেখানে মানুষের পরিশ্রম বিনা গাছে ফলে রয়েছে, সেখানে সেই জল আর ফলে মানুষের প্রয়োজন মিটানো যায় বটে, কিন্তু তা নিয়ে আদান প্রদান, লেনদেন, ব্যবসাবাণিজ্য চলে না। চাষী শস্য উৎপাদন করে যেটা নিজের দরকারের জন্য ঘরে রেখে দেয় তারও প্রয়োজনগত মূল্য ("Use value") রয়েছে, কিন্তু তাই নিয়ে ক্রয়বিক্রয়ের পালা আরম্ভ হয়ে যায় না, বাজারদরের বালাই সেখানে নেই, কিন্তু উৎপন্ন শস্যের যে অংশ বিক্রয় হয় তার বাজারদর একটা থাকে, তার একটা বিনিময় মূল্য ('Exchange value') স্থির করতে হয়। পণ্যের তাই দুটো গুণ আছে—একটা হল তার প্রয়োজনগত মূল্য, আর একটা বিনিময় মূল্য।

এখন বাজারে উৎপাদনের ফলস্বরূপ যে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কারবার চলে, তার দাম নির্ধারিত হয় কেমন করে? কোনো কোনো জিনিসের দাম বেশি, কোনো কোনো জিনিসের দাম কম, কিন্তু এর কারণ কি? ওজনের দিক থেকে তফাতের কারণ বার করা যায় না—বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহারগত বা প্রয়োজনগত মূল্যে প্রভেদ এক এক সময় এত বেশি যে ওজনের দিক থেকে হিসাব করে কিছু বোঝা যায় না। ইস্পাত মানুষের কাজে লাগে, আবার সন্দেশ-রসগোল্লার মতো খাবার জিনিসও মানুষের প্রয়োজন মিটায় বলে বাজারে বিক্রয় হয়। ব্যবহারের দিক থেকে, প্রয়োজনের দিক থেকে এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে যার সূত্র ধরে তুলনায় এদের দাম বাজারে বেঁধে দেওয়া যায়? এ-সব প্রশ্ন তুললে দেখা যাবে যে প্রয়োজনের দিক থেকে, ব্যবহারের দিক থেকে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। মরুভূমির মাঝখানে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলে ধনী তার হীরাজহরতের বদলে একটু পানীয় চাইতে পারে বটে, কিন্তু টাকার টানে যে বাজার চলে, সেখানে হীরাজহরতের দাম এক, পানীয়ের দাম আর। যে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার নিয়ে দুনিয়ার বাজার চলছে, তা হলে তার মূল্য নির্ণয়ের নীতি কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

মার্ক্স্ এর জবাব দিয়েছিলেন : "পণ্য মানুষের কাজে লাগে একথা বাদ দিয়ে রাখলে

দেখা যায় যে সকল পণ্যেরই আর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে—সব পণ্যই পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন।" সব পণ্যেরই মূল্য স্থির হয় উৎপাদনে মানুষের যে পরিশ্রম লাগে সেই পরিশ্রমের অনুপাতে।

আদিম যুগে অবশ্য অন্য ব্যাপার ঘটত; এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস লেনদেন মাঝে মাঝে হত বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা অনুপাত, একটা পরস্পর-সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া শক্ত। যেমন এক শিকারী হয়তো চাষবাস জানে এমন উপজাতির মানুষের দেখা পেয়ে মাংসের বদলে কিছু শস্য নিল; বিনিময় ঘটল আকস্মিকভাবে দেখা হয়েছিল বলে, তাই বিনিময়ের কোনো নীতির কথাই ওঠে নি। পরে যখন লেনদেন বাড়ল, বিভিন্ন এলাকার মধ্যে আদান প্রদান মোটামুটিভাবে হতে লাগল, তখন ছবি একেবারে বদলে গেল। উৎপাদনপদ্ধতি তখনো সরল ও সহজ, কিন্তু যখন চাষী কিছু শস্যের বদলে একটা কোদাল খরিদ করল, তখন যত শস্য সে দিল তার উৎপাদনে পরিশ্রমের পরিমাণ কোদাল বানাবার মেহনতের পরিমাণের প্রায় সমান। পণ্যের মূল্য নির্ধারণে পরিশ্রমই মাপকাঠি হয়েছে দেখা গেল।

এ সম্পর্কে এঙ্গেলস্ লিখেছেন : "মধ্যযুগের চাষী নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যা পেত তার উৎপাদনে কত সময় লাগে তা প্রায় নিখুঁতভাবে জানত। কামার বা দরজি বা মুচির কাজ কেমন করে হয় তা সে চোখের সামনে দেখত। ...চাষী স্বয়ং এবং যাদের কাছ থেকে সে জিনিষ নিত তারা সবাই ছিল মেহনতী মানুষ; যে জিনিস তারা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করত, তা ছিল তাদেরই পরিশ্রমের ফল। এই সব জিনিস উৎপাদন করতে তাদের ব্যয় হত শুধুই পরিশ্রম। কাজ করার হাতিয়ার, কিংবা কাঁচামাল, কিংবা তাই থেকে একটা সম্পূর্ণ কিছু তৈরি করতে হলে শুধু নিজেদের পরিশ্রমই তাদের ব্যয় করতে হত। তাই কোনো পণ্য উৎপাদনে পরিশ্রমের যে সময় লেগেছে, তার অনুপাতে তারা পরস্পরের উৎপন্ন জিনিস বিনিময় করত, অন্য কোনো হিসাবে নয়। এ কি ভাবা যায় যে চাষী বা কারিগর এতই মূর্খ ছিল যে দশ ঘণ্টা লাগে যে জিনিস উৎপাদনে, তা বিনিময় করবে এমন এক জিনিসের সঙ্গে, যার উৎপাদনে লাগে মাত্র এক ঘণ্টা? যে যুগে কৃষির ভিত্তিতে সরল অর্থব্যবস্থা চলছিল, তখন বিনিময়ের একমাত্র পদ্ধতি ছিল এই যে বিভিন্ন দ্রব্যের বিনিময় হতে থাকবে তাদের উৎপাদনে পরিশ্রমের যে সময় নিহিত রয়েছে সেই অনুপাতে।"

এ-বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে বলা চলে যে, মার্কস্‌বাদ অনুসারে, উৎপাদনে মানুষের পরিশ্রম প্রযুক্ত হয়েছে বলেই তার ফলে উৎপন্ন পণ্য নিয়ে বাজারে আদান-প্রদান চলে। বিভিন্ন পণ্যের বিনিময় কিসের ভিত্তিতে হয়, এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে সমাজের তদানীন্তন পরিস্থিতিতে উৎপাদনে গড়ে পরিশ্রমের যে সময় লাগা উচিত ("Average socially necessary labour-time"), তারই অনুপাতে পণ্যের বিনিময় মূল্য নির্ণীত হয়। বিশেষ করে এই কথা মনে রাখা দরকার, কারণ কোনো কোনো পণ্ডিত এই বলে মার্কস্‌কে উপহাস করতে চেয়েছে যে পরিশ্রমের সময়ই যখন মূল্য নির্ধারণ করে, তখন শস্য উৎপাদনে দশঘণ্টা লাগার পর যে মূল্য উৎপন্ন হয়, তার চেয়ে বেশি হবে যদি একশো ঘণ্টা ধরে কেউ বনে বাদাড়ে খোঁড়াখুঁড়ি করতে থাকে। মার্কসের একজন জীবনীলেখক, অধ্যাপক কার ('Carr') একমুখে বলেছেন যে মার্কসের অবদান ইতিহাসে নবযুগ সৃষ্টি করেছে কিন্তু আর একমুখে ঐ ধরনের উপহাস করে মার্কস্‌বাদের "গলদ" দেখাতে চেয়েছেন। শ্রেণীস্বার্থে

একেবারে মশগুল না হলে এ-ধরনের 'পাণ্ডিত্য' তাঁকে জাহির করতে হত না। কার সাহেব নিশ্চয়ই জানতেন যে 'মূল্য, দর ও মুনাফা' প্রভৃতি নানা রচনায় মার্ক্স্ বারবার এ-ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন বলা হয় যে উৎপাদনে ব্যবহৃত পরিশ্রমের পরিমাণ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে, তখন সমাজের একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে, উৎপাদন ব্যবস্থার মোটামুটি একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উৎপাদনের কাজ জোরে চালিয়ে নেওয়ার সম্বন্ধে তখনকার মোটামুটি কায়দা এবং যারা পরিশ্রম করছে গড়ে তাদের দক্ষতা বা নৈপুণ্য মনে রেখে যে পরিমাণ পরিশ্রম সামাজিক কারণে প্রয়োজন তাই বোঝায়। মার্ক্স্ উদাহরণ দিয়েছেন যে ইংল্যান্ডে যখন হাতে চালানো তাঁতের জায়গায় যন্ত্রচালিত তাঁতের প্রবর্তন হল, তখন যে কাজ কলে করা যায় নয় বা দশ ঘণ্টায়, তা হাতে চালানো তাঁতে করতে তাঁতির ১৭।১৮ ঘণ্টা লাগতে থাকল বলে সমাজের নূতন পরিস্থিতিতে তাঁতি বিশ ঘণ্টা খেটে প্রকৃত প্রস্তাবে দশ ঘণ্টার কাজই করল, বিশ ঘণ্টা খাটুনি সত্ত্বেও 'সামাজিক কারণে প্রয়োজন পরিশ্রমের সময়' হল মাত্র দশ ঘণ্টা। এই 'সামাজিক কারণে প্রয়োজন পরিশ্রমের সময়ের' অনুপাতে পণ্যের মূল্য স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। মেহনত হল মূল্যের প্রকৃত মাপকাঠি।

বাজার দর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা মার্ক্সের এই নীতির উদ্দেশ্য একেবারেই নয়। দিনের পর দিন বিভিন্ন জিনিসের দাম কি হচ্ছে বা না হচ্ছে, সেদিক থেকে এ-নীতিকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার বাজার বলতে যে রহস্যময় বস্তু রয়েছে, তার পর্দার পিছনে পণ্যমূল্য প্রকৃতই কিভাবে নির্ধারিত হয়, সে-কথাই এই নীতি বিশ্লেষণ করে। আজকের সমাজে ব্যবসা যে সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চলে, যে প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগতভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচেতন, সেই প্রচেষ্টায় অর্থোদ্গম হয় মার্ক্সের এই নীতি অনুসারে। তাই দেখি যে নিছক অর্থনীতিবিদেরা যেখানে পণ্য বিনিময়ের মধ্যে শুধু বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন, সেখানে মার্ক্স্ বিভিন্ন মানুষের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্কের সন্ধান পেয়েছেন। মুদ্রার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাজার মারফত এই সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে, যারা উৎপাদনে বড়ো তাদের জীবনকে একসূত্রে বেঁধে দিতে সাহায্য করেছে, আর পুঁজি যখন আসে, ধনিক যখন তার আধিপত্য বিস্তার করে তখন মানুষের মেহনত করার শক্তিই একটা বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের দ্রব্য হয়ে দাঁড়ায়, মানুষে মানুষে সম্পর্ক অন্য একটা আকার পরিগ্রহ করে।

উৎপাদন যখন ধনিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়, তখন পুঁজিদার মজুরের মেহনত করার শক্তি ক্রয় করে; উৎপাদনের যে উপকরণ পূর্বে সাধারণ মানুষের নাগালে অনেকটা ছিল, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করায় মেহনত বিক্রয় করা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। যন্ত্রপাতি আর কাঁচা মালের উপর সেই মেহনত প্রযুক্ত করার পর বাজারে বিক্রয় করার মতো পণ্য উৎপন্ন হয়। পুঁজিকে মার্ক্স্ দুটো ভাগ করেছেন—যে টাকা লাগে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি আর কাঁচা মালের জন্য, তা হল "স্থায়ী" পুঁজি ("Constant Capital"), আর মানুষের মেহনত করার শক্তিকে কিনে নিতে যে টাকা ব্যয় হয় তা হল "সাময়িক" পুঁজি ("Variable Capital")। মানুষের মেহনত পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যে নিহিত রয়েছে বলেই তার মূল্য আছে। পরিশ্রম প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কলকব্জা বা কাঁচা মাল আপনা থেকে কোনো মূল্যই সৃষ্টি করতে পারে না। তাই মূল্য নির্ধারণে "সাময়িক পুঁজি", অর্থাৎ শ্রমশক্তি ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ এবং এর ফলাফল সম্বন্ধে একটু যত্ন নিয়ে চিন্তা করা দরকার।

বাজারে বিক্রয়ের জন্য যখন পণ্য এসে হাজির হয়, তখন তার দামের মধ্যে শুধু যে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল ইত্যাদি এবং মজুরি বাবদে খরচ ধরা হয় তা নয়, মুনাফা হিসাবে পুঁজিদার যেটা রেখে দেয় তাও সেই দামের মধ্যে ধরা হয়। শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে কাজে লাগাবার ফলে যে "অতিরিক্ত" উৎপাদন হয়, অর্থাৎ শ্রমশক্তি যে মূল্যে ক্রয় করা হয়েছিল উৎপাদন ফলে সে মূল্যের অতিরিক্ত যে মূল্য উৎপন্ন হয়, তা-ই হল মুনাফার মূল। যখন পণ্য বিনিময়ের যুগ, অর্থাৎ যখন এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস মানুষ আদান প্রদান করত, এই "অতিরিক্ত" মূল্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। যদি কেউ মনে করে যে ধনিক পণ্য-উৎপাদনের পর দাম কিছু বাড়িয়ে দেয় মুনাফা করার জন্য, তা হলে আমরা ঠিক মুনাফা বস্তুটির বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারব না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা ব্যক্তিগত কোনো লেনদেনের কথা বলছি না, গোটা সমাজের আর্থিক ব্যবস্থাকেই বুঝবার চেষ্টা করছি। পুঁজিদার উৎপন্নদ্রব্যের দর বাড়িয়ে বিক্রয় করলে ক্রেতার সেই অনুপাতে লোকসান হবে, এবং ধনিক যুগে ব্যবসায়ে ক্রেতা-বিক্রেতা দুই পক্ষই প্রধানত যখন পুঁজিদার তখন লাভে আর লোকসানে কাটাকাটি ঘটে যাবে, ধনিক শ্রেণীর 'নীট' মুনাফার সন্ধান আমরা পাব না। এ-বিষয়ে মার্ক্স্‌বাদের শিক্ষা হল এই যে পরিশ্রম হল সর্বপ্রকার মূল্যের স্রষ্টা, এবং মানুষের পরিশ্রম করার শক্তি হল এমন এক বস্তু যা শুধু কাজে লাগে না, নূতন মূল্যও তা সৃষ্টি করে। যার পুঁজি আছে, সে মানুষের মেহনত করার শক্তিকে কিনে নেয়, আর যেহেতু ধনিক যুগে শ্রমশক্তি বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের একটা 'পণ্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেহেতু তার দাম নির্ধারিত হয় অন্যান্য দ্রব্যের মতো, তার উৎপাদনে সামাজিক কারণে যতটা পরিশ্রম প্রয়োজন সেই পরিশ্রমের সময় অনুপাতে, অর্থাৎ শ্রমিক এবং তার পরিবারের জীবনধারণের যে খরচ সেই অনুপাতে। শ্রমিকের শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে ধনিক তাকে কাজে লাগায়; ধরা যাক, দিনে শ্রমিক দশ ঘণ্টা খাটে; দশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা খাটুনির ফলে সে যা উৎপাদন করে তাতে তার (এবং তার পরিবারের) জীবনধারণের খরচ সে তুলে দেয়, আর বাকি পাঁচ ঘণ্টা সে যা উৎপাদন করে তা হল মালিকের 'উপ্‌রি', তাকেই বলে 'অতিরিক্ত মূল্য', আর এই উৎপাদনের বদলে সে কোনো পারিশ্রমিকই পায় না। এইভাবে কাপড় কলের মজুর শুধু যে কাপড় ইত্যাদি পয়দা করছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত উৎপাদন করে সে মালিকের পুঁজি বাড়িয়ে চলেছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সে তার মজুরির একটা বড়ো অংশ মালিকেরই সুপুষ্ট হাতে তুলে দিচ্ছে। তারই খাটুনির ফল আত্মসাৎ করে মালিক তাকেই অবিরাম পরিশ্রমের জাঁতায় পিষতে থাকছে, আর পিষে নূতন পুঁজি জোগাড় করে আবার তা থেকে নূতন মুনাফা বার করবার তালে রয়েছে।

মধ্যযুগের ইয়োরোপে কোনো কোনো চিন্তাশীল ধর্মযাজক প্রশ্ন তুলেছিলেন— টাকা তো নিজে থেকে বাড়তে পারেনা। জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহের জন্য মুদ্রার প্রচলন বেশ কথা, কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তির হাতে অগাধ অর্থ সঞ্চিত হবে কেন, একটা টাকা তো আর নূতন টাকা প্রসব করতে পারে না? আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, 'জলেই জল বাধে', অর্থাৎ যেখানে টাকা, সেখানেই আরো টাকা জমে যায়। কিন্তু এই কাণ্ড তো আর ভৌতিক কারণে কিংবা একেবারে অহেতুক ঘটতে পারে না? যারা সমাজে সম্পন্ন অবস্থার লোক, তারা সেই সম্পদের যোগ্য বলে দেবতার প্রসাদ পেয়েছে এ-কথা বলে মনকে প্রবোধ

হয়তো অনেকে দেয়, কিন্তু এটা তো একটা কারণ বিশ্লেষণ করা হল না। মার্ক্‌স্‌বাদই প্রথম শিখিয়েছে যে পুঁজি হল এমন বস্তু যা কেবল নিজেকে ফাঁপিয়ে না চলে পারে না। যার আজ ঘরে দশটা টাকা রয়েছে, সে পুঁজিদার নয়, তার টাকা পুঁজি নয়, কারণ সে-টাকা খাটিয়ে তাকে বাড়াবার চেষ্টাই সম্ভব নয় (যার সামান্য সঞ্চয় হয়তো ডাকঘরের সেভিংস ব্যাংকে অল্প একটু সুদ পেয়ে বাড়ছে, সে-ও পুঁজিদার নয়), কিন্তু পাঁচ দশ লাখ কিংবা আরো বেশি টাকা নিয়ে যারা ব্যবসা ফাঁদছে, কারবার করছে, তারা ক্রমাগত সেই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়েই ব্যস্ত। তবে তাদের টাকা আপনা থেকেই বাচ্চা প্রসব করে না, টাকা বাড়ে মুনাফার কল্যাণে, আর সে মুনাফা বানায় গরিবের মেহনত। মানুষের মেহনতের ঘাম যেন জমে, নিথর হয়ে পুঁজির পাথুরে আকার নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মার্ক্‌সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সব কথা সংক্ষেপে বলাও এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু মুনাফার হার সম্বন্ধে কিছু না বললে শুধু যে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে তা নয়, বর্তমান জগতে সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব বোঝা যাবে না। পরিশ্রমই যে মূল্য সৃষ্টি করে, তার একটা বড়ো প্রমাণ হল, এই শ্রমশক্তি নিংড়ে নিয়ে মালিক তার মুনাফা পায় বলে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা কম আর কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি বাবদে খরচ বেশি, সেখানে লাভের হার মোটের উপর যে কারখানায় শ্রমিকের আনুপাতিক সংখ্যা বেশি তার তুলনায় কম। যেখানে শ্রমশক্তি অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হচ্ছে, সেখানে 'অতিরিক্ত মূল্য', সুতরাং মুনাফা হয় বেশি। এর অর্থ যেন কেউ না করে যে তা হলে বাংলার কাপড়কলের চেয়ে বোম্বাইয়ের কাপড়কলের, কিংবা বোম্বাইয়ের কাপড়কলের চেয়ে জাপানের কাপড়কলের মুনাফা কম হওয়া উচিত, আর সারা ভারত খাদি সংঘের পক্ষে বোম্বাইয়ের কাপড় কলের চেয়ে বেশি লাভ দেখানো উচিত। ব্যাপারটা আরো তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। মার্ক্‌সের শিক্ষা হল এই যে ধনিকযুগের কোনো একটা অধ্যায়ে, গড়ে মুনাফার যে হার থাকে তা নির্ধারিত হয় উৎপাদনব্যবস্থার সংগঠন দ্বারা, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প ব্যতিক্রম ঘটলেও বলা যায় যে মোটের উপর উৎপাদনে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি বাবদে খরচ শ্রমশক্তি ক্রয় বাবদে খরচের চেয়ে বেশি হতে থাকলে মুনাফার গড় হার কমতে বাধ্য। ঠিক এই জন্যই ধনতন্ত্র উৎপাদনব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া কর্তৃত্বের দিকে চলেছে, যে-কর্তৃত্বের অর্থ হল ধনিকদের মধ্যেই একেবারে মুষ্টিমেয়ের হাতে মোট মুনাফার বহুলাংশ কব্জা করা (তাই মাৎস্যন্যায়ে যেমন বড়ো মাছ ছোটো মাছকে গিলে খায়, তেমনই বড়ো পুঁজিদার ছোটোদের গ্রাস করে)। ঐ অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই সারা জগৎ জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ধনিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রেষারেষি চলেছে (যে রেষারেষির চরম অবসান ঘটবে ধনতন্ত্রেরই অবসান হলে), যে সব দেশ পশ্চাৎপদ, যেখানে শ্রমিককে সস্তাদরে শ্রমশক্তি বিক্রয়ে বাধ্য করা যায়, যেখানে জমে যাওয়া পুঁজি খাটাবার নূতন, অফুরন্ত এলাকা মেলে, সেই সব দেশ দখল করার প্রতিযোগিতা ধনতন্ত্রের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। বিলাতে যখন শতকরা সাত আট টাকার বেশি লাভ করার সম্ভাবনা নেই, তখন এদেশের বিলাতী চটকল মালিক শতকরা একশো টাকা কিংবা তারও বেশি মুনাফা করেছে। আসাম অয়েল কোম্পানি, যার মালিক হল বিদেশি, সম্প্রতি শতকরা দুশো টাকা লাভ করে বলে পার্লামেন্টে সরকার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি এসেছিল। বহুকাল ধরে ইরানের মোট বার্ষিক আয়ের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ

সেখানকার বিদেশি তৈলপতিরা ঘরে নিয়ে গেছে, নূতন বন্দোবস্ত করে সেই লাভ বাঁচাবারই আয়োজন তারা আজ আবার করেছে। যেদেশে শ্রমশক্তির দাম কম, সে দেশগুলো কব্জা করে রাখা (সোজাসুজি কিংবা ছদ্মবেশে কব্জা করে রাখা) তাই আজ ধনিক রাষ্ট্রগুলির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু গড়ে মুনাফার হার কমে থাকলেও, মুনাফার পরিমাণ বেড়ে চলেছে। শ্রমিকের বিড়ম্বনা ধনতন্ত্রের অগ্রগামী দেশগুলিতেও বেড়ে চলেছে। উৎপাদন বাড়াবার জন্য নূতন যন্ত্রপাতি এসেছে, শ্রমিকের কাজ বেড়েছে, তার উৎপন্ন ফলের মূল্য বেড়েছে, মালিক যে অতিরিক্ত মূল্য আত্মসাৎ করে তার পরিমাণও বেড়েছে, শুধু শ্রমিকের দুঃখের লাঘব হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই যে সংকটের সূচনা, আজ ধনতন্ত্রের সেই সংকট একেবারে চরমে উঠেছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা বাবদে খরচ স্থির করেছে ২৪২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। অর্থাৎ ১২১২ কোটি টাকা। এই টাকা তো আর আকাশ থেকে পড়েনি, এ টাকা (আরো অন্য বহু টাকারই মতো) মুনাফা জমে যাওয়ার ফলে মজুদ রয়েছে। একে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহার না করে নিছক ভস্মে ঘি ঢালার মতোই খরচ মার্কিন মালিকেরা করতে চায়, কারণ মানব কল্যাণ করতে গেলে তাদের কর্তৃত্ব খতম হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো মালিক যে পরোপকার করতে চায় না তা নয়; কেউ কেউ কিছু টাকা রকেফেলার (কিংবা এদেশের বিড়লা পরিবার) প্রভৃতির মতো দানধ্যানও করে থাকে, কিন্তু যে কোটি কোটি টাকা খরচ করলে মানব সমাজের চেহারা বদলে দেওয়া যায়, সে টাকা শ্রেণী হিসাবে তারা মানবকল্যাণের জন্য খরচ করতে রাজি তো নয়-ই, বরঞ্চ নিজেদের স্বার্থে মানুষের পৃথিবীকে শ্মশানে পরিণত করতেও তাদের আপত্তি নেই। এত অতিরিক্ত মুনাফা মালিকদের হাতে জমেছে, অথচ তারা মঙ্গলকর উৎপাদনে সে টাকা খাটাতে পারে না, কারণ মুনাফা তাদের একমাত্র ইষ্টবস্তু; তাই উৎপাদন বেশি হলে মুনাফা কমবে বলে দেখি যে যখন মানুষ দারুণ অভাবে অবর্ণনীয় দৈন্যের মধ্যে বাস করছে তখনই অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় যে 'অতিরিক্ত উৎপাদন' ঘটেছে, উৎপাদনকে সংকুচিত করা হোক। এইভাবে ধনতন্ত্রের সংকট উপস্থিত হয়েছে। আর সে সংকটের সমাধানের কোনো হদিস ধনতন্ত্র পায় নি, পেতে পারে না।

১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ডের প্রধান অর্থনীতিবিদ, অধ্যাপক রবিন্স বলেছিলেন : 'বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট চার বৎসর নয়, ১৯ বৎসর আগে (অর্থাৎ ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে) আরম্ভ হয়ে গেছে'। আজো অধ্যাপক রবিন্স ধনতন্ত্রের একজন ধুরন্ধর সমর্থক। পুঁজি জমে যায় পুঁজিদারদের হাতে; লাভ ছাড়া অন্য চিন্তা তার নেই; ফলে আসে তার সংকট। যে মেধাবী ও পরিশ্রমী, সে দরিদ্র হলেও স্বাবলম্বনের জোরে ঐশ্বর্যবান হচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত আজকাল একান্ত বিরল, কারণ টাকার কুমীর কয়েকজন যারা আছে তারা বাকি সবাইকে গিলে ফেলতে পারে—এদেশের সংকীর্ণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আজ দেখা যায় যে ছোটোখাটো ব্যবসাদারকে বড়ো বড়ো কোটিপতির কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে, টাকার খেলায় যারা বাহাদুর তারাই ব্যবসা বাণিজ্য একচেটিয়া রাখছে। প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অতিরিক্ত পুঁজির একটা বড়ো অংশ তারা খাটাতে চায় সাম্রাজ্যে, পশ্চাদপদ এশিয়া আর আফ্রিকার নানা দেশে। কিন্তু আজ জনজাগরণের অনিবার্য আঘাতে সাম্রাজ্যের এলাকা কুঁকড়ে যাচ্ছে, ক্রমশ এশিয়াতে তার অস্তিত্বেরই অবসান ঘটছে। পুঁজিদার আজ ঘরে বাইরে মুশকিলে পড়েছে;

মুশকিল আসানের রাস্তা নেই বলেই আজ সাম্রাজ্যবাদ এত মরিয়া, এত বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধের জিগির তুলছে। ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ধনতন্ত্রের হিসাবে যে দেশ হল সর্বাগ্রগণ্য, সেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই আজ ইতিহাসকে পিছিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে সবচেয়ে আগুয়ান।

ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব আজ একেবারে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একদিন ছিল যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্যোগে বিপ্লব ঘটেছে। পৃথিবীর চেহারাকে সেই শ্রেণী বদলে দিয়েছে, দেশে দেশে দূরত্ব কাটিয়ে নানা জাতির মানুষকে যেন প্রতিবেশী করে দিয়েছে। জীবনের ধারাই পরিবর্তিত হয়েছে। 'গ্রাম্য জীবনের মূঢ়তা' থেকে কোটি কোটি লোক মুক্তি পেয়েছে। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে' (১৮৪৮) মার্ক্‌স্‌ লিখেছিলেন : 'বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের এক শতাব্দীও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এরই মধ্যে তারা উৎপাদনশক্তির এমন বিপুল ও প্রচুর প্রসার এনেছে যার তুলনা আগেকার সব যুগকে একত্র করেও মেলে না...মানুষের সংঘবদ্ধ পরিশ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদনশক্তি ঘুমিয়ে ছিল, পূর্বে কখনো কি তার আভাসমাত্র পাওয়া গেছে?...উৎপাদন, বিনিময় ও সম্পত্তি অধিকারের নিজস্ব সম্বন্ধ নিয়ে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জাদুকরের মতো উৎপাদন ও বিনিময়ের এমন বিশাল ব্যবস্থা খাড়া করেছে, তার অবস্থাটা এখন ঠিক সেই জাদুকরের মতো, যে মন্ত্রবলে পাতাল থেকে ভূত প্রেত টেনে এনে তাদের চালাবার শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলেছে।...সংকটের সময় এক সামাজিক মহামারী হাজির হয়, যে মহামারী অতীতের সকল যুগে একেবারে বেখাপ্পা এবং অসম্ভব মনে হত— সেই মহামারী হল অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন। হঠাৎ সমাজ যেন একটা সাময়িক বর্বরতার স্তরে গিয়ে পড়ে। মনে হয় যেন কোনো দুর্ভিক্ষ কিংবা সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক মহাযুদ্ধ বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিল, যেন সমস্ত শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেল।...যে সম্পদ উৎপন্ন হচ্ছে, বুর্জোয়া ব্যবস্থা তার প্রাচুর্যের টাল সামলাতে পারছে না। কেমন করেই বা বুর্জোয়া শ্রেণী এই সংকট অতিক্রম করে? একদিকে উৎপাদন শক্তির অনেকটা জোর করে নষ্ট করে দিতে হয়; অন্যদিকে নূতন বাজার দখল করতে হয়, পুরানো বাজারের উপর আরো বেশী জুলুম চলে। এর ফলাফল কি? বলা যায় যে ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত এবং আরো সর্বনাশা সংকটের পথই পরিষ্কার হতে থাকে। আর অনুরূপ সংকট এড়ানোর সামর্থ্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

'যে অস্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী 'ফিউড্‌ল্‌' ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করেছিল, সেই অস্ত্র এখন তাদেরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে।

"যে অস্ত্র তাদেরই মৃত্যুকে ডেকে আনে, বুর্জোয়ারা শুধু সেই অস্ত্র নির্মাণ করে নিরস্ত হয় নি। সে অস্ত্র যারা ধারণ করবে তেমন লোকদেরও বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করেছে—তারা হল আধুনিক কালের মজুর, আধুনিক নিঃস্বশ্রেণী (প্রলেটেরিয়ট)।"

"কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার" রচনার সময় মার্ক্সের বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর, এঙ্গেল্‌সের আটাশ। এই দুই যুবকের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে বাতিল করার জন্য অগণিত পণ্ডিত অস্ত্রধারণ করেছেন, খণ্ডনের বন্যায় মার্ক্‌স্‌বাদকে ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবিরত চলে এসেছে, কিন্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে মার্ক্‌স্‌বাদই সত্য প্রমাণ হয়েছে।

১৯১৪ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি মাথা তুলে উঠছিল, ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে অসঙ্গতির নিদারুণ প্রকাশ দেখা গেল। দেশভক্তির নামে শ্রমিক শ্রেণীকে যে মোহমুগ্ধ ও নিগড়বদ্ধ করে রাখা হচ্ছিল, তা সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্পষ্ট হতে আরম্ভ হল। লেনিন মার্ক্‌স্‌বাদের মূলতত্ত্বকে আরো সমৃদ্ধ করলেন শিল্পবিকাশের আন্তর্জাতিক চরিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর স্বার্থজনিত সংঘাতের ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতিকে বিশ্লেষণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধনতন্ত্রকে আবার সুপ্রতিষ্ঠ করার চেষ্টা যে কতদূর ব্যর্থ হল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ইতিহাসের সব চেয়ে কঠোর আর্থিক সংকটে, প্রতিক্রিয়ার সব চেয়ে নোংরা সংস্করণ ফ্যাশিজ্‌মের প্রাদুর্ভাবে; আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত বিপর্যয়ে—ধনতন্ত্রের পক্ষে এই যুদ্ধ যে কত বড়ো বিপর্যয় হয়েছে তা দেখা গেল যখন সোভিয়েটকে ধ্বংস করার সকল চেষ্টা ধূলিসাৎ হল, যুদ্ধোত্তর যুগে মহাচীনে ও পূর্ব ইয়োরোপে জনতার নিজস্ব রাষ্ট্র স্থাপিত হল আর জগতের সর্বত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে সাধারণ মানুষ অভূতপূর্ব ভঙ্গিতে সমবেত হল।

'সোশালিস্ট' নামধারী অনেকে আছেন যাদের সম্বন্ধে স্টালিন বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি তাঁরা জানেন না বা জানতে চান না আর বিপ্লবকে তাঁরা মহামারীর মতো ভয় করেন। এঁরাই অনেক সময় বলে বেড়ান যে মার্ক্‌সের মত হল ভ্রান্ত আর অল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে অধিকাংশ পুঁজি জমে যাওয়া সম্বন্ধে এবং মেহনতী মানুষের ক্রমবর্ধমান দুর্গতি সম্বন্ধে মার্ক্‌সের ভবিষ্যদ্‌বাণী নাকি ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা বলেন যে বুর্জোয়া আমলে শ্রমিকের শৃংখল ছাড়া অনেক কিছুই হারাবার রয়েছে—হয়তো সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে কিছু টাকা, হয়তো বা (আমেরিকার মতো দেশে) ছোটো একটা 'ফোর্ড' গাড়ি, কিংবা কিস্তিতে কেনা একটা ছোট্ট বাড়ি, এই সব 'সম্পত্তি' শ্রমিকের আজ হয়েছে। সুতরাং এঁদের যুক্তিতে বলে যে বিপ্লব হতেই পারে না, বিপ্লবের অনুকূল বাস্তব পরিস্থিতি নাকি নেই।

'রাঘব বোয়াল' পুঁজিদারদের হাতে যে পর্বতপ্রমাণ পুঁজি জমে রয়েছে আর তারাই যে ধনিক অর্থব্যবস্থার কলকাঠি নাড়ার একচেটিয়া দখলীস্বত্ব পেয়েছে, এ-কথা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৩০ সালে জার্মান অর্থনীতিবিদ ডক্টর রাঠেনাউ হিসাব করে দেখান যে তিনশো জন ব্যক্তি গোটা ইয়োরোপের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। ফ্রান্সে তো সবাই বলত যে দুশো পরিবার সে দেশের কর্তৃত্ব কব্জা করে রেখেছে; ইংল্যান্ডের পাঁচটা বড়ো ব্যাঙ্ক আর ইম্পিরিয়ল্‌ কেমিক্যাল কিংবা ইউনিলীভরের মতো প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান সেখানকার অর্থনৈতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। ১৯৩৫ সালে আমেরিকান হিসাবে দেখা যায় সে দেশে বিভিন্ন কোম্পানি মারফত যে টাকা খাটত তার শতকরা ২২ ভাগ ছিল জে, পি, মর্গান কোম্পানির আয়ত্তে, আর রকেফেলার ও মেলন গোষ্ঠী তার খুব বেশি পিছনে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এদের লাভের যেন সীমা পরিসীমা ছিল না, আর যুদ্ধের পর নূতন যুদ্ধের জিগির উঠিয়ে (আর কোরিয়ার মতো অঞ্চলে যুদ্ধ চালিয়ে) এরা তখনকার অবিশ্বাস্য লাভের অঙ্ককেও টপকিয়ে আরো এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মতো দেশেও এই ধনিক ধারার ঢেউ এসে লেগেছে—ছোটোখাটো ব্যবসাদাররা আজ আর কোথাও হালে পানি পাচ্ছে না, টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া-শ্রীরাম-গোয়েঙ্কা-সিংহানিয়া প্রমুখের প্রসাদ না পেলে কারো আশা নেই।

সাধারণ মানুষের দুর্গতি যে ক্রমশ বেড়েই চলছে, একথা যার চোখ আছে সে অস্বীকার করতে পারে কেমন করে? আমেরিকার শ্রমিক নাকি রাজার হালে থাকে, কিন্তু ১৯৫৪ সালের

আগস্ট মাসের হিসাব হল যে সেখানে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি বেকার, প্রায় ষাটলক্ষ অর্ধ বেকার— যার অর্থ হল যে কিস্তিবন্দিতে রেডিও সেট প্রভৃতি কিনে থাকলে কিস্তি দেওয়া বন্ধ হবে আর সখের রেডিওটি হাতছাড়া হবে, অন্য সব মুশকিলের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। অবশ্য একথা সত্য যে আমাদের মতো দেশের তুলনায় আমেরিকা ও ব্রিটেনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু, কিন্তু প্রথমত তা যথেষ্ট একেবারেই নয়, আর দ্বিতীয়ত দুনিয়ার সব পশ্চাৎপদ দেশের দৌলত লুট করে এনে ঐ দেশগুলির মালিকরা তাদের ঐশ্বর্যের কিছুটা উচ্ছিষ্ট গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে, অর্থাৎ আমেরিকা-ব্রিটেনে গরিবের হাল আমাদের চেয়ে কিছু ভালো হয়েছে আমাদের মতো দেশের শোষণ ফল সেখানে গিয়ে পৌঁছায় বলে। একথা মনে রাখলেই আমরা ঐসব আগুয়ান্ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারব।

মার্ক্স্‌বাদের বিরোধীরা সাধারণত বলে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগে ইংল্যান্ডের অবস্থা আর ১৯২৮-২৯ সালে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটার আগে আমেরিকার অবস্থা মার্ক্সের মতকে খণ্ডন করে, কারণ তখন নাকি শ্রমিক-ধনিকের স্বার্থ এক খাতেই বয়ে চলেছিল। আসলে ঘটনা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের ধনিক ও ভূস্বামী শ্রেণীর সম্পদ ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বেড়েছিল। (Inland Revenue Statistics), অথচ শ্রমিকশ্রেণীর উপার্জন বেড়েছিল মাত্র ৩ কোটি পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি টাকা (সে দেশের শ্রমবিভাগ শ্রমিকশ্রেণীর অর্ধেক সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে মোট আন্দাজ করেছিল ১ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় ২১ কোটি টাকা)। আমেরিকাতে ১৯০০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে জাতীয় সম্পদ বেড়েছিল শতকরা ৯০ ভাগ, কিন্তু শ্রমিকের মজুরি সবচেয়ে বেড়েছিল শতকরা ২৫ ভাগ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিভাগের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে শিল্পের উৎপন্ন ফলের মূল্য বেড়ে ১৮০৩ কোটি ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৭২০০ কোটি টাকা থেকে ২৭০৫ কোটি ডলারে, অর্থাৎ প্রায় ১০৮০০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছিল। ১৯২১ সালে মাহিনা ও মজুরিতে ঐ টাকার শতকরা ৫৪.২ ভাগ চলে যেত, অথচ ১৯২৭ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছিল শতকরা ৫১। হিসাবে দেখা গেছে যে যখন আমেরিকার সমৃদ্ধি সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছিল, সেই ১৯২৩-২৯ সালেই ১৯০৭-০৮ সালের তুলনায় বেকারের সংখ্যা ছিল বেশি। অধ্যাপক কোল্ (যিনি মার্ক্স্‌বাদের কিছুটা অনুরাগী হলেও অবিশ্বাসী), তাঁর 'The Common People, 1746-1938' গ্রন্থে বলেছেন যে গোটা দেশের মোট উপার্জনের মধ্যে শ্রমিক ও কর্মচারীর ভাগ ব্রিটেনে ছিল ১৯১১ সালে শতকরা ৩৮.৫, ১৯২৪ সালে শতকরা ৩৯.৫, ১৯২৯ সালে শতকরা ৩৭, আর ১৯৩১ সালে শতকরা ৪০.৫; মুনাফা আর সুদ বাবদ সম্পত্তির মালিকরা পেয়েছে ১৯১১ সালে শতকরা ৫১, ১৯২৪ সালে শতকরা ৪০, ১৯২৯ সালে শতকরা ৪২, আর ১৯৩১ সালে শতকরা ৩৬। কিন্তু কোল্ আরো বলেছেন যে কর্মচারীদের মাহিনার ভাগ বেড়েছে ১৯১১ সালে শতকরা ১০.৫ থেকে ১৯২৪ সালে শতকরা ২০.৫, ১৯২৯ সালে শতকরা ২১, আর ১৯৩১ সালে শতকরা ২৩.৫—এর একটা মোটা অংশ হল কোম্পানির ডিরেক্টর, ম্যানেজর প্রভৃতি উপরওয়ালাদের মাহিনা। অর্থাৎ যারা সম্পত্তির অধিকারী তারা প্রকারান্তরে গোটা দেশের মোট উপার্জনে তাদের অংশকে বেশ বাড়িয়েই তুলছিল। ইংল্যান্ডে ১৮৪৩ সালে দেশের মোট আয়ের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী পেয়েছিল শতকরা ৪৫.৬ ভাগ, ১৮৬০ সালে শতকরা

৪৭.১ ভাগ, ১৮৮৪ সালে শতকরা ৪১.৪ ভাগ, ১৯০৩ সালে শতকরা ৩৮.৩ ভাগ আর ১৯০৮ সালে শতকরা ৩৮.১ ভাগ। এর অর্থ এই যে যখন ধনতন্ত্র সংকটাপন্ন হয় নি, যখন তার উঠতির দিন, তখনই এমন অবস্থা চলেছে। 'The rich is getting richer and the poor poorer' ('যার পয়সা আছে তার পয়সা বাড়ছে, আর গরীবের গরীবানা বাড়ছে')—একথা যে যথার্থ, তা ধনতন্ত্রের ইতিহাসই বলছে।

আমাদের দেশের দুর্দশার কথা বলতে গেলে যন্ত্রণার মহাকাব্য লিখতে হয়। শুধু আধুনিক কালের দুটো তথ্য এখানে উদ্ধৃত করা যাক। অধ্যাপক শাহ্ এবং খাম্বাটা 'Wealth and Taxable Capacity of India' গ্রন্থে লেখেন যে এদেশের শতকরা মাত্র একভাগ লোক পায় দেশের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ (লোকসংখ্যা তিন পঞ্চমাংশ পায় মোট আয়ের তৃতীয়াংশেরও অল্প)। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডন 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় ভারতবর্ষের অর্থনীতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ হয়; তাতে ইংরেজ ব্যবসাদারদের হিসাবে দেখা যায় যে এদেশের (অবিভক্ত ভারতবর্ষে) প্রায় ৬০০০ পরিবার ছিল যাদের বার্ষিক গড়পড়তা আয় লক্ষ টাকা কিংবা তার বেশি ; ২,৭০,০০০ পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ছিল ৫০০০ টাকা; ২,৫০,০০০ পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ছিল ১০০০ টাকা; সাড়ে তিনকোটি পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ছিল ২০০ টাকা; আর বাকী অন্যান্য পরিবারের বার্ষিক গড়পড়তা আয় মাত্র ৫০ টাকা। এই হিসাবে বেশি ভুল থাকা উচিত নয়, কারণ ইংরেজ ব্যবসাদাররা নিজেদের লাভের জন্য কোথায় কত খরিদ্দার আছে তা জানতে চায়, আর যত্ন করেই খোঁজ খবর নেয়। এই সব সংখ্যা সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ লেবর পার্টির তৎকালীন সভাপতি ডক্টর হিউ ডল্‌টন (যিনি অর্থনীতিবিদ্ এবং মার্ক্‌স্‌বাদের ঘোর বিরোধী) এক বক্তৃতায় বলেন যে ব্যবসায় সংকট এবং বেকারী ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে বেশি আয়কর যাদের কাছ থেকে আদায় হয় তাদের সংখ্যা কিছু কমেনি। ঐ একই সময়ে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন্ (চিকিৎসক সংঘ) এবং সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের মধ্যে একটা বিতর্ক চলছিল; বিষয় হল, বেকার শ্রমিকের পক্ষে প্রাণধারণের জন্য প্রতি সপ্তাহে খাওয়া বাবদে নিম্নতম খরচ কত পড়ে। সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগ বলে, অন্তত পাঁচ শিলিং দেড় পেনি (অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন টাকা) মাথাপিছু চাই, আর চিকিৎসক-সংঘের মতে দরকার পড়ে আরো নয় পেনি বা নয় আনা। কিন্তু বেকারী ভাতা যা মিলত,তাতে কেউ মাথাপিছু তিন শিলিং দু'পেনির বেশি খরচ করতে পারত না। যাদের কাজ ছিল তারাও উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য কেনার সঙ্গতি রাখত না। এ-সম্বন্ধেও মন্তব্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

অনেকে বলেন যে পূর্বের তুলনায় মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার ধরনে কিছু উন্নতি যে হয়েছে, তা অস্বীকার আমরা করি না। বাইরে থেকে দেখতে গেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি যে হয়েছে তা স্বীকার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু যাঁরা একথা বলে মার্ক্‌স্‌বাদের ভুল দেখাতে চান, তাঁদের যুক্তি যে অসার, তা মার্ক্‌সের একটা কথা উদ্ধৃত করে দিলে হয়তো বোঝা যাবে। "মজুরি আর পুঁজি" রচনায় মার্ক্‌স্ লেখেন : "সমাজের সাধারণ বিবর্তনের পরিমাপে ধনিকের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে-সম্ভোগ শ্রমিকের নাগালের বাইরে, আর শ্রমিকের স্বস্তি কিছু বেড়ে থাকলেও সে-তুলনায় সমাজের বাসিন্দা হিসাবে তার মনস্তুষ্টি কমেছে। আমাদের অভাব এবং আমাদের মনের আনন্দ সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়; আমরা তাই

সমাজের মাপকাঠি দিয়েই তার পরিমাণ স্থির করি। তাই আমাদের অভাব আর আনন্দের প্রকৃতি সামাজিক বলেই তা আপেক্ষিক।'' ১৮২৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এক কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এক ডাক্তার-পুঙ্গব বলতে ইতস্তত বোধ করেন নি যে কলের মজুরকে একাদিক্রমে একুশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে খাটানোর দরুন তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার কথা নয়; আজ ঠিক মালিকের পক্ষে অত নির্জলা নির্লজ্জ কথা চট্ করে শোনা যাবে না। কিন্তু শ্রমিক সচেতন হয়ে লড়াই করে কিছু অধিকার অর্জন করতে পেরেছে বলে যে তার দুর্গতি মোচন হচ্ছে, তা একেবারেই নয়। আমাদের দেশে আজো রিক্‌শাওয়ালার পায়ে রবারের জুতো দেখলে অনেকে ভ্রূ কুঁচকে 'ছোটোলোকের বাড়' সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর মন্তব্য করে, কিন্তু তা থেকে যদি কেউ গরিবের অবস্থা খুব উন্নত হচ্ছে ধারণা করে বসে তো সত্যই নাচার।

যথাসম্ভব বেশি মুনাফা শিকারে মালিকের যে আগ্রহ আর ব্যস্ততা, তার সীমা পরিসীমা নেই। আঘাত তাই ক্রমাগত বাড়ছে শ্রমিকের উপর, আর সে-আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়েই শ্রমিক বুঝছে তার কর্তব্য। তাই ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে শ্রমিক বোঝে যে শুধু কিছু মজুরি বাড়াতে পারলেই তার কাজ শেষ হল না, এই মজুরি ব্যবস্থাকেই খতম না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। এ-বিষয়ে মার্ক্‌স্ তাঁর ''ক্যাপিটাল'' গ্রন্থে বলেছেন : ''ধনিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকের উপর সামাজিক উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সফল উপায়ই প্রত্যেকটি শ্রমিকের উপর চাপ বাড়িয়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে; উৎপাদনের বিকাশ ঘটাবার সকল পদ্ধতি যারা উৎপাদক তাদের উপর জুলুম আর শোষণের আকার গ্রহণ করে; এই সব পদ্ধতি শ্রমিককে যেন মানুষের ভগ্নাবশেষে পরিণত করে, যন্ত্রের একটা অংশ মাত্রের পর্যায়ে তাকে নামিয়ে দেয়, আর কাজে স্ফূর্তির যে ভাগ থাকে তার শেষ রেশটুকু নষ্ট করে মেহনতের উপরই ঘৃণা ধরিয়ে দেয়; স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞানকে শ্রম-পদ্ধতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করার অনুপাতেই শ্রমপদ্ধতির যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটাবার, তা থেকে শ্রমিককে দূরে সরিয়ে রাখে; যে অবস্থায় শ্রমিক কাজ করে, তাকে বিকৃত করে দেওয়া হয়, শ্রমব্যপদেশে শ্রমিককে এমন এক স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের অধীন হয়ে থাকতে হয় যা নিতান্ত হীন বলেই ঘৃণার উদ্রেক করে।...পুঁজি যত বেশি জড়ো হয়, ততই শ্রমিকের ভাগ্য মন্দ হয়, তার মজুরি বেশি বা কম হোক না কেন।...পুঁজির সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণারও সঞ্চয় হতে থাকে। একপ্রান্তে ঐশ্বর্য যখন পুঞ্জীভূত হয় তখন অপর প্রান্তে যে শ্রেণী নিজের পরিশ্রমের ফলে পুঁজিকেই উৎপাদন করে তার কাছে পুঞ্জীভূত হয় যন্ত্রণা, পরিশ্রমের গ্লানি, দাসত্ব, অশিক্ষা, পাশবিকতা, মানসিক অধঃপতন। (''ক্যাপিটাল'', প্রথম খণ্ড, পৃ: ৫৫৯-৬০)

সমাজে পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন শ্রেণী-সংগ্রামের অনিবার্যতা শুনলে আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই। শ্রেণী-সংগ্রামের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁরা সজ্ঞানে উদাসীন থাকতে চান, তাঁদেরই গুরু ও বন্ধু হিসাবে কিছুকাল আগে রোমের মহামান্য পোপ্ এক ফতোয়াতে বলেছিলেন : ''আজকের দিনে দুঃখকষ্ট যে বেড়ে চলেছে, তার উপশমের দুটো উপায় আছে— প্রার্থনা আর উপবাস। যারা ধনী তারা কিছু ভিক্ষা দান করে এই উপবাসব্রত পালন করুক। আর যারা গরিব, যারা আজ বেকারী ও খাদ্যাভাবের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন, তারা ধনীদেরই মতো প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব নিয়ে স্থির করুক যে পরমেশ্বরের অপরিজ্ঞেয় অথচ চিরকরুণাময় পরিকল্পনা অনুসারে সমাজের যে স্তরে তাদের স্থান নির্দিষ্ট সেই স্তরে থাকার দরুন বর্তমান দুঃসময় যে কষ্ট তাদের উপর চাপিয়েছে, তাকে আরো বেশি ধৈর্যসহকারে সহ্য

করবে।'' বলতে ইচ্ছা করে ফরাসি মনীষী আনাতোল ফ্রাঁসের কথায়— বুর্জোয়া আইন অতি নিরপেক্ষভাবে ধনী দরিদ্র সবাইকে সাবধান করে দেয়। রুটি চুরি করলে সাজা হবে, পুলের তলায় শুয়ে রাত কাটালে শাস্তি পাবে! বুর্জোয়া সমাজে সকলের সমান অধিকার আছে— সবচেয়ে জমকালো হোটেলে খানা খেতে আর সবচেয়ে ঝকঝকে মোটর গাড়ি চড়তে কারো আইনগত বাধা নেই! মহামান্য পোপ্ তাই বললেন, ধনী কিছু ভিক্ষা দিক আর দরিদ্র ভগবানের নাম নিয়ে দুঃখকষ্ট সহ্য করুক! সমাজ কিন্তু এমনভাবে এগিয়েছে যে শোষণের অবসান ঘটাবে যে-শ্রেণী, শোষকের দল সেই শ্রেণীকেই বুর্জোয়া যুগে সৃষ্টি করেছে।

শ্রেণীসংগ্রাম একটা বাস্তব ব্যাপার, একটা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা। শ্রেণীসংগ্রাম মার্ক্‌সের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভুত একটা মতবাদ নয়। বহু বুর্জোয়া ইতিহাসকার এই সংগ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন। মার্ক্‌স বলেছেন : ''নূতন কাজ আমার শুধু এইটুকু যে আমি প্রমাণ করেছি যে (১) উৎপাদনের বিকাশে কয়েকটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব জড়িত রয়েছে; (২) শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য ফলস্বরূপ নিঃস্ব (সর্বহারা) শ্রেণী তার একাধিপত্য স্থাপন করবে; (৩) ঐ একাধিপত্য শুধুমাত্র সমস্ত শ্রেণীর বিলোপ এবং শ্রেণীহীন সমাজে সংক্রমণ ঘটাবার জন্য স্থাপিত হবে'' (''মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্ পত্রালাপ'' ইংরাজি সংস্করণ পৃঃ ৫৭)। এই একাধিপত্য সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন যে জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সবচেয়ে আগুয়ান্ ধনিকশাসিত গণতন্ত্রের তুলনাতেও এ হল 'হাজারগুণ বেশি গণতান্ত্রিক'। মার্ক্‌স্‌বাদকে বর্জন করে কাউট্‌স্কির মতো পণ্ডিত যখন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের ছিদ্র অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলেন, ঘরেবাইরে শত্রুর হাত থেকে বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট সেই শ্রেণীশত্রুর বিষদাঁত ভাঙার ব্যবস্থা করলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার হানি ঘটছে বলে কাউট্‌স্কির মতো অনেকে যখন হাহাকার তুলছিলেন, তখনই লেনিন জবাবে বলেন যে সর্বহারার একাধিপত্য সবচেয়ে অগ্রসর ধনবাদী গণতন্ত্রের চেয়ে 'হাজারগুণ বেশি গণতান্ত্রিক'। পৃথিবীর দুজন শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক সিডনী ও বীট্রিস্ ওয়েব্ সোভিয়েটে দেশে এই একাধিপত্যের সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ড দেখে বলেছিলেন তাঁদের বিরাট 'সোভিয়েট কমিউনিজম্' গ্রন্থে, যে, সেখানেই রয়েছে 'দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যাপক ও সমান অধিকারমূলক গণতন্ত্র', তাঁরা দেখেছিলেন সর্বব্যাপারে সাধারণ মানুষ সর্বদা দেশশাসন ব্যাপারে এমনভাবে অংশগ্রহণ করছে বা ধনতন্ত্রের আমলে একেবারে অচিন্তনীয়। শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে বলেই যে নিঃস্ব শ্রেণীর একাধিপত্য সমর্থনযোগ্য তা নয়; সেই একাধিপত্যের প্রকাশ এমন ভঙ্গিতে ঘটে যে সকলের সামনে সমান সুযোগের পরিপ্রেক্ষিত উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং নাগরিকদের পরস্পরস্বার্থ যে অভিন্ন, সমাজের পরস্পরের জীবনে বিকাশের সম্ভাবনা ও সার্থকতা যে একই সূত্রে গ্রথিত, এই বোধ সকলের মনে জেগে ওঠে।

মার্ক্‌স্‌বাদীরা শ্রেণীসংগ্রাম বাধিয়ে দেয় না—তারা শুধু বিশ্লেষণ করে দেখে যে লোভপরায়ণ সমাজ ব্যবস্থার অকাট্য ব্যারাম হল এই শ্রেণীসংগ্রাম। এই সংঘাত রয়েছে বলেই যুদ্ধের নির্মম বিড়ম্বনা মানুষের ভাগ্যে বারবার ঘটতে থাকে। বহুজনের উপবাস, যন্ত্রণা ও মৃত্যু যে কারণে সমাজে ঘটছে তা যদি আমরা আয়ত্ত করতে না পারি তো সেই কারণের নিরসন ঘটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। শ্রেণী-সমাজের চরিত্র ও পদ্ধতি তাই আমাদের পক্ষে জানা নিতান্ত প্রয়োজন। রোগ নির্ণয় না হলে চিকিৎসা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই শ্রেণীসমাজের প্রকৃতি না জানলে 'শিবের অসাধ্য' যে-রোগ সেই সমাজকে আক্রমণ করেছে, তার নিরাকরণও সম্ভব নয়।

মার্ক্সীয় বিচার বলে যে, প্রাচীন সমাজদেহের অভ্যন্তরেই নূতন সমাজ আজ জন্মের জন্য অপেক্ষা করছে। সোভিয়েট দেশে এবং অন্য কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যে সেই নব সমাজের আবির্ভাব ঘটেছে। সর্বদেশেই আজ সেই নবজাতকের সূচনা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পূর্ব থেকে যদি মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে সেই অনিবার্য নবজন্মকে অভ্যর্থনা করতে পারে, তা হলে জন্মকালীন কষ্ট ও ক্লেদ অনেকাংশে নিবারিত হতে পারে। অধিকাংশ মানুষ যখন নূতন শ্রেণীহীন সমাজ কামনা করে, তখন কেন অক্লেশে আমরা আজকের বিড়ম্বিত জীবন থেকে শ্রেণীহীন সমাজে সংক্রমণ করতে পারব না? এখানে কিন্তু ইতিহাস আমাদের সতর্ক করে দেয়। যারা সমাজে কর্তৃত্ব করছে, শোষণ ও শাসনের ভার পেয়ে যারা নিজেদের কর্তৃত্ব ও সম্ভোগকে চিরস্থায়ী করার জন্য লালায়িত, তারা সহজে স্বার্থত্যাগ করবে না—বিপ্লবের ইতিহাস বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে ক্ষমতার লোভে তারা গৃহযুদ্ধ বাধিয়েছে, দেশভক্তি ভুলে গিয়ে বিদেশিকে দিয়ে নিজেদের দেশ আক্রমণ করিয়েছে, স্বদেশবাসীদের শিরদাঁড়া ভাঙার জন্য দুর্ভিক্ষ ঘটাতে সংকোচ বোধ করেনি, অর্থনৈতিক অবরোধের অস্ত্রব্যবহারে কুণ্ঠিত হয় নি। জনগণের শত্রু যারা, তারা কিছুতে বিপ্লবের সাফল্য বরদাস্ত করতে পারে না বলেই জনগণকে সকল বিপত্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হয়। তাই মার্ক্স্‌বাদ আমাদের সতর্ক করে দেয় যে ভদ্র, মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে, অধিকাংশের মতো নির্ঝঞ্ঝাটে সংগ্রহ করে বিপ্লবের লক্ষস্থলে উপনীত হওয়ার দুরাশা যেন আমরা না করি, শ্রেণীশত্রুর ক্রূরতা ও শক্তি সম্বন্ধে যেন আমরা উদাসীন না হয়ে পড়ি। এই বিপদ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করে দেওয়া এবং শ্রেণীশত্রুর বিরোধিতাকে পরাভূত করার জন্যই মেহনতী জনগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাদের নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি।

জনগণের মধ্যে যারা সবচেয়ে সক্রিয়, সবচেয়ে সচেতন ও কর্মঠ, তাদেরই একত্র সংঘবদ্ধ করে পার্টি জনগণের অন্তরের কামনাকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। শ্রমিকশ্রেণী এবং তার গণসংগঠনসমূহের মধ্যে পার্টির অটল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। একটা সৈন্যবাহিনীকে সংগ্রাম করতে হলে কয়েকজন নেতার দরকার হয়, কর্মনির্বাহকদের সংস্থা এবং সকলের যথোপযুক্ত সংগঠন দরকার হয়, আরো দরকার হয় সমরনীতি ও যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান। শ্রমিকশ্রেণীর সুশৃংখল অগ্রণীসংঘ হিসাবে পার্টি এই কাজগুলির ভার গ্রহণ করে।

কিন্তু শুধু এই অগ্রণীর দল ধনতন্ত্রের পতন ঘটাতে পারে না। শ্রমিকদের পার্টি ছাড়াও আরো বহু সংগঠন অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে থাকবেই। হাজারে হাজারে মেহনতী মানুষ সমবেত হয় ট্রেডইউনিয়নে, কিসান সভায়, সমবায় আন্দোলনে, যুবসংঘে ও অন্যান্য বহু সংস্থায়। যারা সাম্যবাদী, যারা প্রকৃত সমাজবাদে বিশ্বাসী, তারা সবাই এই সমস্ত সংগঠনের মধ্যে নানা বাধা সত্ত্বেও কাজ না করে পারে না; এই সংগঠনগুলিই জীবনের তাগিদে এবং জনতার চেতনায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের মুখপাত্রে পরিণত হবে। স্বভাবতই আধুনিক শিল্পের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে শ্রমিকরা একাজে অগ্রণী, কিন্তু মেহনতী জনতার অন্যান্য শাখার সঙ্গে শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে কৃষকশ্রেণী সম্বন্ধে লেনিনের (এবং স্টালিনের) শিক্ষা ও বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সর্বদা স্মরণ করা উচিত। কৃষিকর্ম যাদের বৃত্তি, তারা ঐতিহাসিক কারণেই অনেক সময় বুর্জোয়া এবং নিঃস্বশ্রেণীর মধ্যে যে সংগ্রাম, তাতে দোদুল্যমান ভাব দেখায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীকে

তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বোঝাতে হবে কি ভাবে মুষ্টিমেয় জমিদার-পুঁজিদার দেনার দায়ে কৃষকদের ডুবিয়ে রাখে, কি ভাবে ধনিক শাসনব্যবস্থা করভারে তাদের পিষ্ট করে, কি ভাবে ছোটোখাটো চাষী ক্রমশ একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়, নিছক ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়তে থাকে, কি ভাবে ধনিক ব্যবস্থায় তাদের দুর্দশার অবসান সম্ভব নয়, আর কি ভাবে তাদের প্রকৃত মতামত নিয়েই ভূমিব্যবস্থার অদলবদল করা প্রয়োজন (এ বিষয়ে এঙ্গেল্‌সের 'The Peasant Question' দ্রষ্টব্য)।

রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করতে না পারলে সমাজবাদ স্থাপন অসম্ভব। এই রাষ্ট্র সম্বন্ধে অনেকদিন ধরে যে গম্ভীর বুজরুকি চলে এসেছে, তা সাম্যবাদীরা স্বীকার করে না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষার যারা অভিভাবক তাঁরা শুধু বুঝিয়ে এসেছেন যে রাষ্ট্র শ্রেণীভেদ ও স্বার্থভেদকে অতিক্রম করে সকলকেই ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ দেয়—ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বাধীনতা নাকি একমাত্র রাষ্ট্রজীবনেই সম্ভব। মহাপণ্ডিত হেগেল্‌ তো রাষ্ট্রকে প্রায় এক অলৌকিক স্তরে স্থাপন করেছিলেন, এবং তাঁকে অনুসরণ করে রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সত্যই যদি রাষ্ট্র একটা চমৎকার ব্যাপার হয়ে থাকে তো এতকাল ধরে অত্যাচার অনাচার, যুদ্ধবিগ্রহ, শোষণ লাঞ্ছনার অবধি নেই কেন? এতদিন নানাদেশের ও নানাযুগের রাষ্ট্র কি কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুখ-সুবিধারই বন্দোবস্ত করে নি? তাদের ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্যই কি রাষ্ট্রের অলঙ্ঘ্য শুচিতা সম্বন্ধে এত প্রচার চলে আসে নি?

ইতিহাস বলে যে এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। শ্রেণীবিভাগ যখন প্রথম সমাজে দেখা দিল, শোষক ও শোষিতের আখ্যান যখন আরম্ভ হল, তখনই রাষ্ট্রের সূত্রপাত। রাষ্ট্র সনাতন, শাশ্বত ব্যাপার নয়; সমাজপতিরা যখন বহুজনের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করল, তখন সেই কর্তৃত্বকে অটুট রাখার অস্ত্র হল রাষ্ট্র এবং তার দণ্ডব্যবস্থা। আগেই দেখা গেছে যে দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা, জায়গীরদারি, জমিদারি, পুঁজিদারি— সকল ব্যবস্থাতেই অল্প কয়েকজনের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে, তারাই হয়েছে 'দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা'। তাদেরই স্বার্থে প্রচার করা হয়েছে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার চেয়ে দুষ্কর্ম আর নেই, চরম দণ্ড তার শাস্তি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে অটুট রাখার নামে সমাজপতিদের জবরদস্তি আর জনসাধারণের লাঞ্ছনাকে সমর্থন করা হয়েছে। রাষ্ট্রের 'স্বরূপ' সম্বন্ধে কাল্পনিক ভাববিলাস সুশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগে শ্রেণীনির্বিশেষে সকল পৌরজনের পরম কর্তব্য বলে প্রচারিত হয়েছে। রাষ্ট্রের নামে প্রভুশ্রেণীর একাধিপত্যে জনসাধারণ যে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, সে কথা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ধনতন্ত্রের যুগ, তার ক্ষয়িষ্ণুতা প্রকট হলেও পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা আজও ধনতন্ত্রের অধীন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ বল হচ্ছে অর্থবল। যে যুদ্ধ রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী স্বরূপকে প্রকট করে দেয়, সেই যুদ্ধের জনক হচ্ছে ধনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনিকশ্রেণীর স্বাভাবিক সাম্রাজ্যলিপ্সা। অর্থবানরা আজকের সমাজপতি; তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত সংখ্যাল্প অর্থবানদেরই কল্যাণকল্পে রয়েছে। লেনিন ঠিকই বলেছিলেন যে আধুনিককালে রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে 'ধনিক শ্রেণীর কার্যনির্বাহক সভা'।

এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে চেপে রাখে যে অস্ত্র দিয়ে, সেই অস্ত্র হল রাষ্ট্র। একথা শুধু রাজতন্ত্র নয়—প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র সম্বন্ধেও খাটে। সর্বসাধারণের ভোট দেওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তাই এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছিলেন যে 'এতে এইমাত্র বোঝায় যে শ্রমিকশ্রেণীর নাবালক অবস্থার

অবসান ঘটেছে'। কিন্তু বুর্জোয়া কর্তৃত্বে গণতন্ত্রের আসল ধাপ্পাবাজি এই যে ভোটের ঘুষ দিয়ে সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখা চলে, বড়োলোকদের মোড়লী বজায় থাকে, টাকার অভাবে গরিবের পক্ষে প্রচার চলে না, নির্বাচনে জয়লাভ দুরূহ হয়ে পড়ে, আর রাষ্ট্রশক্তি হাতে না এলে গরিবের গরীবানা ঘোচানো সম্ভব হয় না। ভোট থাকলেই যদি গরিবের সব মুশকিলের আসান হত, তা হলে যাত্রার দলে যে রাজা সাজে তারও দুঃখ ঘুচত।

একদা কোনো কোনো "মার্ক্‌স্‌বাদী" পণ্ডিত বলতেন, আর এখনো কোনো কোনো 'সমাজবাদী' দল প্রাণপণে প্রচার করে যে ধীরে-সুস্থে ঘষে-মেজে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সাম্যবাদে পরিণত করা চলে আর পার্লামেন্টের পাকা সড়ক দিয়ে অক্লেশে সাম্যবাদের রাজ্যে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিপ্লবকে দূরে পরিহার করে রাষ্ট্রের পুরানো ঠাট্ বজায় রেখেছিল বলে জার্মানিতে পার্লামেন্টের মোহমুগ্ধ 'সমাজবাদী'দের শাস্তি হল হিটলারের হিংস্র কবলে পড়া। পার্লামেন্টের সদিচ্ছা যতই থাকুক, গরিব আর বড়োলোকের শ্রেণীস্বার্থে সংঘাত রয়ে গেলে সাম্যবাদের কাছাকাছিও পৌঁছানো যাবে না। সবাই জানে যে জমিদারের দাপট যতই হোক, সত্যই বাঘ আর ছাগলকে এক ঘাটে জল খাওয়ানো সম্ভব নয়।

পার্লামেন্টের মতো ব্যাপারের যে কোনো সার্থকতা নেই, মার্ক্‌স্‌বাদ কখনো তা বলে না। স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী পার্লামেন্টের পদ্ধতিকে গণআন্দোলন ও সংগ্রামের কাজে নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু মূলগত ব্যাপার হল এই যে বুর্জোয়া আমলে সেই শ্রেণীরই কর্তৃত্ব যখন গণতন্ত্রের মুখোস পরে থাকে এবং যখন ভালো মানুষের মতো সেই শ্রেণী নির্বিবাদে সাধারণ মানুষের শাসন মেনে নেবে না, তখন এক শুভ মুহূর্তে সমাজবাদের অবাধ আবির্ভাবের স্বপ্নমুগ্ধ না হয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য এবং তারপর সেই শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী প্রতিরোধ ও চক্রান্ত চূর্ণ করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। নৈরাজ্যবাদীদের মতো শ্রমিকশ্রেণী শোষণের প্রতীক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দিয়েই খুশি হতে পারে না। রাষ্ট্র চিরকালই শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করার অস্ত্র; তাই নিঃস্বশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা আর বিরোধীদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটাবার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে যাওয়ার প্রয়োজন হবে। শ্রেণীহীন সমাজ তো আর একদিনে তৈরি হয় না; যুগযুগান্তের ধারা নিমেষের মধ্যে অন্তর্ধান করবে না। সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ যখন আসবে, শোষকের অস্তিত্বই যখন থাকবে না, তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজনও মিটবে, তার অস্তিত্ব লোপ পাবে—'চরকা আর কুঠারের মতোই তাকে তখন জাদুঘরে পাঠানো চলবে'। কিন্তু যতদিন শ্রেণীহীন সমাজ না আসছে, ততদিন রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করতে হবে মেহনতী মানুষের হাতিয়ার হিসাবে, ততদিন চলবে নিঃস্ব শ্রেণীর একাধিপত্য। সেই একাধিপত্যের চেহারা দেশে দেশে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন হবে, কিন্তু মূলগতভাবে তার প্রয়োজন অকাট্য।

জনসাধারণের একাধিপত্যের মর্মার্থ হল এই যে সমাজের শতকরা ৯৯ জন যা চায় তাই বাহাল হবে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার চেয়েছিলেন 'শতকরা ৯৯ জনের জন্য স্বরাজ'); মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কর্তৃত্ব আর বরদাস্ত হবে না। তাই বলা যায় যে এ ব্যবস্থা হচ্ছে যথার্থ গণতন্ত্রের চূড়ান্ত। বড়োলোকের প্রভুত্বে চলুক, গরীবের উপর জুলুম যেমন আবহমান কাল থেকে চলছে তেমনই চলুক, ভোটের অধিকার না হয় সকল প্রাপ্তবয়স্ককেই দেওয়া হোক— এই ধাপ্পাবাজিই বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত আছে। এরই অবসান বিনা প্রকৃত মানবকল্যাণ আজ সম্ভব নয়।

বর্তমান যুগে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকেই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে; উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রকরণের সঙ্গে উৎপাদনের ফলস্বরূপ মানুষের পরস্পর সম্পর্কের যে অসঙ্গতি ঘটেছে, তারই অবসান হবে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠায়, সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতিতে। বর্তমান যুগে বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল প্রতিটি বিপ্লবে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষের সমর্থন এসেছিল বলে; সেই সাধারণ মানুষের দাবি আজ বুর্জোয়া শাসনে পূরণ হয় নি। কিন্তু সাধারণ মানুষের কতগুলো মৌলিক অধিকার মৌখিকভাবে অন্তত স্বীকৃত হয়েছে বলে বর্তমান সমাজের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি সবাইয়ের কাছে ধরা পড়ছে। শ্রমিক যেমন তার অত্যন্ত ন্যায্য এবং পরিমাণের দিক থেকে সামান্য দাবি নিয়ে দেখে যে মালিক নাছোড়বান্দা, তখন সে বোঝে যে এই বর্তমান ব্যবস্থায় গোড়ায় গলদ, মানুষকে অমানুষ করে না রাখলে কয়েকজনের বাদ্‌শাহী চলে না, তেমনই ভোটের জোরে দুঃখ মোচন করতে না পেরে সাধারণ মানুষ বুঝতে আরম্ভ করে যে গোড়ায় গলদ দূর করতে হলে এই সমাজকে একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে। ভোটের লড়াই যখন হয়, পার্লামেন্টে যখন বাক্‌বিতণ্ডা হয়, তখন সাধারণ লোকের মনের কথা প্রকাশের সুযোগ কিছুটা আসে বলে বুর্জোয়াশ্রেণী আজ তার নিজেরই প্রচারিত আদর্শ থেকে ক্রমাগত বিচ্যুত হচ্ছে, সামান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নিজেরাই হস্তক্ষেপ করছে। বুর্জোয়াশ্রেণী যে আজকের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কত অসার্থক, তা দিনের পর দিন স্পষ্ট হচ্ছে।

১৮৫৬ সালে মার্ক্সের এক বক্তৃতায় একটা চমৎকার কথা আছে। তিনি বলেছিলেন : "জার্মানিতে মধ্যযুগে শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেবার জন্য 'ফেম্‌গেরিখ্‌ট্‌' নামে এক গোপন সংস্থা ছিল। কোনো বাড়ির গায়ে লালক্রসের চিহ্ন আঁকা দেখা গেলে সবাই বুঝে নিত যে 'ফেম্‌'-এর বিচারে ঐ বাড়ির মালিকের প্রাণদণ্ড স্থির হয়েছে। আজ ইয়োরোপের সব বাড়ির গায়ে ঐ রহস্যাবৃত লালক্রসের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। ইতিহাস আজ বিচারক; আর দণ্ডবিধাতা হল নিঃস্বশ্রেণী।" ১৮৫৬ সালের পর সব দেশে অনেক দিন ধরে অনেক কাঠখড় পুড়েছে। তাই মার্ক্স্‌ যেখানে 'ইয়োরোপ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেখানে আমরা 'সারা দুনিয়া' এই কথাটি বসাতে পারি। শোষণের অবসান ঘটিয়ে সর্বত্র জনতার নবশক্তির দৃপ্ত আবির্ভাবের আর খুব বেশি বিলম্ব নেই।

মার্ক্স্‌বাদের দার্শনিক ভিত্তি

যিনি বলেন যে দর্শনশাস্ত্রের কোনো ধার তিনি ধারেন না, জীবনের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তিনি কিন্তু ঐকথার মধ্যেই জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা প্রকাশ করছেন, মনের মধ্যে যত্ন করে চিন্তার একটা ছক তৈরি না থাকলেও তাঁর মোটামুটি একটা মত আছে মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে। সাধারণত যাঁরা বলেন যে তত্ত্বের বালাই তাঁদের মনে নেই, তারা গতানুগতিকতারই পক্ষপাতী, সংসার যেমন চলে এসেছে মোটামুটিভাবে তেমনই চলতে থাকবে, এই তাঁদের ধারণা। আর সঙ্গে সঙ্গে বহুকাল ধরে যে কথা আমাদের মনে শিশু বয়স

থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে এসেছে, সেই অজ্ঞেয় কিন্তু করুণাময় বলে বর্ণিত ভগবানের বিধান ভক্তিভরে না হলেও বিনা প্রতিবাদে মেনে চলার প্রয়োজন তাঁরা মুখে না বললেও কাজে স্বীকার করে থাকেন।

লেনিনকে একবার মার্ক্স্ কোথায় তাঁর 'ডায়ালেক্টিক্স্'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেন, 'কোথায় মার্ক্স্ ডায়ালেক্টিক্স্-এর কথা লেখেন নি?' মার্ক্স্বাদী চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি হল এই 'ডায়ালেক্টিক্স্' দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (''Dialectical Materialism'') হল সাম্যবাদীর জীবনদর্শন, সাম্যবাদীর বিশ্ববীক্ষা। এই দর্শনের গুরুত্ব সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন যে নিঃস্বশ্রেণীর অভ্যুত্থান বিনা দর্শনের সার্থকতা ঘটবে না, আর দর্শনকে আয়ত্ত না করলে নিঃস্ব শ্রেণীও অভ্যুত্থানে সক্ষম হবে না। এ থেকে যেন মনে না করা হয় দার্শনিক কচ্‌কচি সম্বন্ধে একটা পণ্ডিতী মোহ মার্ক্স্বাদীদের আছে। মার্ক্স্ শুধু জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করে ক্ষান্ত হন নি, শ্রমিক সংগঠন ও সংগ্রামে তাঁর ছিল অক্লান্ত আগ্রহ, শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার (''First International'') তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। চিন্তা ও চেষ্টা, তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় তাঁর জীবনে ও শিক্ষায় প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর একটা কথা তাই সর্বদা স্মরণীয় : ''দার্শনিকরা নানা রকম ধরনে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আসল কাজ হল এই জগৎকে বদলে দেওয়া।''

ইতিহাসে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে, তা কতগুলো অন্ধ শক্তির আকস্মিক সমাবেশের ফল কিংবা কোনো অতিপ্রাকৃত দৈব বিধানের নিয়তি, এই ধারণা বিভিন্ন ছদ্মবেশে এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে। তাই যুক্তিকে বর্জন করে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় নিয়েছেন, জীবনের গূঢ়ার্থ সর্বদাই অজ্ঞেয় থেকে যাবে মনে করছেন, এবং এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধোগতির কথাই তাঁরা বলেন, মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজ বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের তাই হতাশা ও ব্যর্থতার সুর এত স্পষ্ট, তাই সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করে মানুষ যে নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এ বিশ্বাস আজ বুর্জোয়া সমাজে ছিন্নমূল। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়—'বিশ্বপ্রকৃতির কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কি সম্ভব? আমরা কি নিয়তির দাস হয়ে না থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি?'—তা হলে কমিউনিস্টরা অসংকোচে উত্তর দেবে 'হাঁ, নিশ্চয়ই'। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার আলো আজ তাই সাম্যবাদই জ্বেলে রেখেছে।

বস্তুবাদী এবং ভাববাদী এই দুটো প্রধান ধারা দর্শনের ইতিহাসে চলে এসেছে। বস্তুবাদ বলে যে বস্তুজগতের আবির্ভাব হয়েছিল মনের আবির্ভাবের বহুপূর্বে, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করার মতো ব্যক্তির বহুপূর্বে বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্ব ছিল। শুধু সময়ের দিক থেকে যে বস্তু মনের পূর্বগামী তা নয়; বাস্তব ভিত্তি বিনা চিন্তাই সম্ভব নয়, মনের প্রকাশই অভাবনীয়। সুতরাং যদি ইতিহাস বাস্তবিকই জানতে হয়, যদি শুধু রাষ্ট্র নয়, ধর্ম ও দর্শনেরও ইতিহাস আয়ত্ত করতে হয়, তো তৎকালীন বাস্তব পরিবেশ না জানলে যথার্থ জ্ঞান হয় না, বস্তুর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করলে প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, ভাববাদ বলে যে মনই হল পূর্বগামী (ব্রহ্মা তাই হলেন স্বয়ম্ভু), বস্তু যা কিছু আছে তা হল জড়পদার্থ, মনের ছায়াপটে প্রতিফলিত হয় বলেই তাদের অস্তিত্ব আমাদের বোধগম্য হয়, মন বিনা বস্তুর কোনো সত্তা নেই। এই চিন্তাধারায় অবশ্য বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা আছে। কিন্তু এর মূল কথা হল যে বিশ্বের

উদ্ভব হল মন থেকে, কোনো এক পরমদেবতার মন থেকে কিংবা 'অ-বাঙ্‌-মনসো-গোচর' (মনের এবং বাক্যের অগোচর) কোনো এক রহস্যাবৃত ব্রহ্মের চিরগুহ্য লীলা থেকে। সুতরাং জগতে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে, তা মূলত মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত ব্যাপার; জীবনের দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা, অপঘাত সবই এক অপরিজ্ঞেয় লীলার খেলা। সহজেই বোঝা যায় যে মেহনতী মানুষ ভাববাদকে তখনই গ্রহণ করতে পারে যখন দুঃখ ভোলাবার জন্য তাকে ধর্মের সান্ত্বনা দিয়ে বিমূঢ় করে রাখা হয়, কিন্তু যখন সে সচেতনভাবে চিন্তা করে তখনই সে বোঝে যে তাকে দুনিয়ার বোঝা মুখ বুজে বইবার জানোয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কাজেই এই ভাববাদ সাহায্য করে এসেছে। মেহনতী মানুষের যে জীবনদর্শন বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তারই কথা বলেছিলেন মার্ক্স্‌ : 'যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতেরই অংশীভূত আমরা, সেই বস্তুজগৎ হল একমাত্র বাস্তব...মনে হতে পারে যে আমাদের চেতনা ও চিন্তা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের বহু উর্ধ্বে, কিন্তু সেই চেতনা ও চিন্তা মনেরই সৃষ্টি, এবং মনে হল বস্তুরই সর্বোচ্চ সৃষ্টি।' ('সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক্স্‌', ইংরেজি সং, প্রথম খণ্ড পৃ: ৪৩০-৩১)

ভাববাদের আর একটি প্রধান বক্তব্য হল এই যে অনেক ব্যাপারই এত নিগূঢ় যে তা অজ্ঞাত থেকে যাবেই। এখনো অবশ্য বহু ব্যাপারই অজ্ঞাত রয়েছে, কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ থেকে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী, আর আজ যা অজানা ভবিষ্যতে তা জানার মধ্যে আসবে না। মার্ক্স্‌ শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেই আমরা এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে রসায়নে আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণে এমন দ্রব্য উৎপাদন করতে পেরেছি যা আমাদের কাছে নূতন। সুতরাং আমাদের প্রত্যক্ষ চেতনার বাইরে যে একটা বস্তুজগৎ রয়েছে, যার সঙ্গে বাস্তব পন্থায় আমরা পরিচয় স্থাপন করতে পারি আর পরিচয়ের সঙ্গে যে জ্ঞান আসে সেই জ্ঞানের প্রয়োগে তাকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারি। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে মানুষের এই জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। হঠাৎ দৈব অনুগ্রহে এই জ্ঞান আমরা পাই নি, ক্রমাগত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতির উপর শক্তি বিস্তার করতে পেরেছি। এই বস্তুজগতের অস্তিত্বকে ভাববাদীরা যতই ভাষা ও চিন্তার নানা ভঙ্গিতে অস্বীকার করুন না কেন, তাঁদেরও অতি বাস্তব উপায়ে জীবন নির্বাহ করতে হয়, দার্শনিকপ্রবর খাওয়াপরা সম্পর্কে উদাসীন হলেও উপবাসী হয়ে বাঁচতে পারেন না, উলঙ্গ হয়ে সমাজে বাস করতে পারেন না, মায়াপ্রপঞ্চ বোধে সংসার ত্যাগ করলেও সংসারকে একেবারে 'নস্যাৎ' করে দিতে পারেন না। তাই সন্ন্যাসীদের মধ্যেই প্রবাদবাক্য প্রচলিত যে সাধুজী কম্বলকে ছাড়লেও কম্বল সাধুজীকে ছাড়ে না! বস্তুজগতের প্রকৃত সত্তাকে অস্বীকার করে মোহময় ধূম্র বিস্তার সম্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু মানুষের মনে সে অস্বীকৃতি বাস্তবিকই কখনো স্থান পায় নি, পেতে পারে না।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মার্ক্স্‌-এরই (এবং তাঁর সহকারী এঙ্গেল্‌সের) বিশিষ্ট অবদান। তাঁদের পূর্বে যে বস্তুবাদ প্রচলিত ছিল— যান্ত্রিক ('mechanical') বস্তুবাদ যার আখ্যা—তদনুসারে প্রকৃতির অন্তর্ভূত বিভিন্ন বস্তু ও পদ্ধতিকে বিচার করা হত খণ্ডিত, স্বতন্ত্র অবস্থায়, বস্তু-জগতের সমগ্র বিপুল পরস্পরসম্পর্ক থেকে তাদের বিচ্যুত করে; সুতরাং বিশ্লেষণ হত তাদের স্থিতিশীল অবস্থার, সদাস্বচ্ছন্দ গতিশীলতার নয়; ধরে নেওয়া হত যে তাদের সত্তা সততই নির্দিষ্ট, সর্বদা পরিবর্তনশীল নয়, অর্থাৎ তাদের পর্যবেক্ষণ করা হত জীবন্ত নয়, মৃত অবস্থায়

(এ বিষয়ে এঙ্গেল্‌সের ''অ্যান্টি-ড্যুরিং'' পৃ: ২৭, দ্রষ্টব্য)। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বহু সরলচিত্ত বস্তুবাদী বিশ্বের এক ''আদি কর্তা'' (First Cause) কল্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন, সদর দরজা বন্ধ রেখে খিড়কি দিয়ে ভাববাদকে মনের ঘরে প্রবেশ করিয়েছেন। যাই হোক্, মার্ক্‌স্‌বাদ শিক্ষা দেয় যে বিশ্বপ্রকৃতি পরস্পর-অসংলগ্ন বহু বস্তু ও ঘটনার আকস্মিক সমাবেশ নয়, তার একটা নিজস্ব বিধিসঙ্গত গঠনধারা আছে এবং তার অন্তর্ভূত সর্ব বস্তুরই পরস্পর-সম্পর্ক রয়েছে।

তাই বস্তুজগতে (এবং মানুষের সামাজিক ইতিহাসেও) বস্তুর প্রতিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রতিবেশও বস্তু কর্তৃক প্রভাবিত হয়। তাই মানুষের মন (যা বস্তুরই সর্বোচ্চ প্রকাশ) তার পারিপার্শ্বিক দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিস্তারের ফলে পারিপার্শ্বিকের উপরেও প্রভাব ফেলে। একটা গাছের উপর প্রভাব পড়ে জমি, জল, হাওয়া ইত্যাদির, এবং গাছও তার পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মোটের উপর বলা যায় যে সর্ব বস্তুই পরস্পর সম্পর্কের বন্ধনে বাঁধা রয়েছে আর পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই তথ্যের রীতিমত গুরুত্ব রয়েছে। কোনো বিশেষ ঘটনা বিচার করতে হলে তার পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা এবং তৎকালীন পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে বিচ্যুত করে দেখলে ভুল হবে। পরিস্থিতি যদি ভিন্ন হয়, পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্য যদি স্বতন্ত্র হয়, তা হলে ঘটনার বিচারও আলাদা হতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আজকের শান্তি আন্দোলনের কথা ধরা যেতে পারে। যান্ত্রিক কায়দায় এর বিচার করতে গেলে আমরা এর তাৎপর্যই বুঝব না—তখন হয়তো বলব শান্তি কেমন করে হয়, সর্বত্র অশান্তি, শান্তি চাইলেই কি শান্তি পাওয়া যায়? কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের রীতি অনুসারে ঐ ঘটনারই বিশ্লেষণ করতে গেলে পারিপার্শ্বিকের বিচার করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলির কথা ভাবতে হবে—তখনই আমরা বুঝব যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর দেশে দেশে জনজাগরণের জোয়ার এসেছে, যার ভয়ে ভীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের জিগির তুলছে, স্থানে স্থানে যুদ্ধ বাধিয়েও দিচ্ছে, সোভিয়েট এবং চীনের মতো দেশকে ধ্বংস করব বলে হুমকি দিয়ে নিজেদেরই দুর্বলতা জাহির করছে, এবং এই পরিবেশে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতা ও স্বস্তির সংগ্রাম একান্তভাবে সংযুক্ত। তেমনই ভারতের পক্ষে মার্কিন সাহায্য গ্রহণের তাৎপর্য স্থির করতে হবে আজ পৃথিবীতে মার্কিন পরিকল্পনার ব্যাপক পটভূমিতে। এই ভাবে বিভিন্ন সমস্যার বিচারে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যে রীতি, তা আমাদের নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে। মার্ক্‌স্‌বাদ এই অমোঘ বৈজ্ঞানিক অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে বিশ্বপ্রকৃতি (মানবসমাজ যার অন্তর্ভুক্ত) নিয়ত পরিবর্তনশীল, কখনো বিকাশ পাচ্ছে কখনো বা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন : ''বালুকণা থেকে সূর্য পর্যন্ত, আদি জীবকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত, সব চেয়ে ছোটো থেকে সব চেয়ে বড়ো জিনিস পর্যন্ত বিশ্বপ্রকৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। অবিরাম আন্দোলন ও অদলবদল, নিয়ত আবির্ভাব ও তিরোধান সেখানে ঘটছে।'' এ-থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে মানবসমাজ সতত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, ধনতন্ত্রের আবির্ভাব যেমন হয়েছিল তেমনই তার তিরোধান ঘটছে। এই দিক থেকে মার্ক্‌স্ অপরিসীম অধ্যবসায় নিয়ে বিশেষ করে ইতিহাস ও অর্থনীতির পর্যালোচনা করে

(আর এঙ্গেল্‌স্‌ প্রধানত প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশুনায় বেশি মনোযোগ দেন) তার অন্তর্নিহিত সূত্র আবিষ্কার করতে পারেন, বর্তমান সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির নিরসন ঘটিয়ে সমাজবাদ ('সোশালিজ্‌ম্‌') যে অনিবার্যভাবে আসছে, তা নিঃসংকোচে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শিক্ষা দেয় একটা সরল রেখায় পরিবর্তন ঘটে চলার ফলে মানবসমাজের বিকাশ হয় বলে ভাববাদীরা যা বলেন তা ভুল। সমাজের ইতিহাস থেকে বরঞ্চ আমরা জানতে পারি যে সোজা লাইনে না এগিয়ে সমাজ যেন আঁকাবাঁকা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, কখনো কখনো লাফ দিয়ে অনেকটা রাস্তা পার হচ্ছে, কখনো বিপর্যয় ঘটছে, বিপ্লব দেখা দিচ্ছে, কখনো বা কিছুকাল ধীর মন্থরগতিতে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে, আবার কখনো পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হচ্ছে (লেনিন-কৃত 'কার্ল্‌ মার্ক্‌সের শিক্ষা' দ্রষ্টব্য)। যখন মামুলি কায়দায় কতকগুলো অদলবদল হয় তখন ঘটে ''পরিমাণগত পরিবর্তন'', অর্থাৎ বস্তু বা সমাজের চরিত্রে কোনো মূলগত পার্থক্য দেখা যায় না, কিন্তু যখন সমাজ বা বস্তু যেন লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন ঘটে 'গুণগত পরিবর্তন', অর্থাৎ চেহারাই তখন বদলে যায়। এ সম্পর্কে অনেক দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন ধরা যাক জল। জল গরম করতে থাকলে সেটা জলই থাকে, কিন্তু গরম করতে করতে এমন একটা স্তরে উপস্থিত হওয়া যায় যখন জলের চরিত্রই বদলে যায়। জল হয়ে দাঁড়ায় বাষ্প। কিংবা উলটো কায়দায় জলকে ঠাণ্ডা করতে করতে এক সময় সেটা বদলে হয় বরফ। ডিমের মধ্যে মুরগীর বাচ্চা বদলাতে বদলাতে ক্রমে এমন একটা অবস্থায় হাজির হয় যখন সে আর ডিমের খোলের মধ্যে আটক থাকতে পারে না। লাফ ('leap') দিয়ে যেন সে বেরিয়ে পড়ে, তার বিবর্তনের ইতিহাসে তখন একটা বিপ্লব ঘটে যায়। সে আর তখন ডিম নয়, তার নূতন মুরগী-জীবন আরম্ভ হয়ে যায়, পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ ('break') হয়ে যায়।

মানবসমাজ সম্বন্ধে এই নীতি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে সমাজের বিকাশ ঘটে শুধু ধীর, স্থির, ক্রমান্বিত পরিবর্তনের পরম্পরায় নয়, এক একটা সময় আসে যখন সমাজ যেন 'লম্ফ' দিয়ে অগ্রসর হয়, পূর্বাবস্থার সঙ্গে তার 'সম্পর্কচ্ছেদ' হয় বিপ্লবের মাধ্যমে, যখন প্রবর্তন হয় দ্রুত ও মৌলিক, যখন সমাজের চরিত্রই রূপান্তরিত হয়ে যায়। ইতিহাসে লক্ষ করা যায় যে এক এক সময় ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থে প্রত্যক্ষ সংঘাত কম, বিপ্লবভীরু 'সংস্কারবাদীরা' ('reformist') তখন শ্রেণীসহযোগিতার কথা উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে, শ্রেণী সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবিতাকে অস্বীকার করে (যেমন ১৮৯৯-১৯০০ সালে জার্মান সোশালিস্ট পণ্ডিত বের্ন্‌স্টাইন্‌ করেছিলেন)। কিন্তু বিপ্লবী মার্কস্‌বাদীকে সতর্ক থাকতে হয়, কখন কি ভাবে সংঘাত আসছে তা বাস্তব আলোচনা ও কর্মতৎপরতার গুণে জানবার চেষ্টা করতে হয়। জানতে হয় কখন সংস্কারবাদী কায়দায় শ্রেণীসহযোগিতা বজায় রাখতে গেলে সমাজের সংকটই বাড়তে থাকবে। যারা ধীর, সুস্থির গতিতে সমাজবিবর্তনে বিশ্বাস করে তারা কেবল ছোটোখাটো অদলবদল চাইবে। সমাজের গুণগত পরিবর্তন এবং নূতন পর্যায়ে সমাজের সংক্রান্তি তারা চাইবে না। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কষ্টিপাথরে ইতিহাসের গতিকে বিচার করে মার্ক্‌স্‌পন্থীরা দেখবে যে ইতিহাসে অনেক সময় 'বিশ বৎসরকে মনে হয় যেন মাত্র একদিন। আর এক এক সময় এমন কয়েকটা দিন আসে তখন যেন তার মধ্যে জমাট হয়ে থাকে বিশ বৎসরের নির্যাস'' (মার্ক্‌স্‌), আর যখন সেই ''বিশ বৎসরের নির্যাসে জমাট'' দিনগুলো আসে, তখনই হয় বিপ্লব। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আয়ত্ত থাকলে, মানব সমাজের বাস্তব

ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্যে একটা সঙ্গতির সন্ধান পেলে, তবেই প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া সম্ভব। প্রকৃত বিপ্লবী জানবে, কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জানবে, যে কখন বাস্তব কারণেই সমাজ-বিবর্তন চলতে থাকে শম্বুকগতিতে, জানবে কেমন করে তখনই সবচেয়ে যারা সচেতন সেই শ্রমিকশ্রেণীকে আগামী দিনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে, জানবে কেমন করে ট্রেড ইউনিয়ন বা অনুরূপ গণসংস্থায় দৈনন্দিন দাবির জন্য আন্দোলন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের 'চরম লক্ষ' সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে সজাগ ও সক্রিয় রাখতে হবে, কেমন করে বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ যখন আসে তখন বিভ্রান্ত না হয়ে, উদাসীন না থেকে, ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস পরিহার করে শ্রমিকশ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকায় সার্থকভাবে নামাতে হবে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শিক্ষা দেয় যে বিরোধী ধারার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সমাজের বিকাশ ঘটে, আর পূর্বতন পরিস্থিতির সঙ্গে "বিপ্লবী সম্পর্কচ্ছেদ" তখনই হয় যখন জায়মান, প্রগতিশীল ধারা প্রাচীন, ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে পরাভূত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ধনতন্ত্রের কথা তুলতে পারি। ধনতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে বহু অসঙ্গতি। আর সবচেয়ে শাণিত অসঙ্গতি হল উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনফলের উপর সম্পত্তিগত অধিকারের মধ্যে, কিংবা একথাই ঘুরিয়ে বলা যায়, উৎপাদন-ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে। একটা চেয়ার বানাতে হলে কিছু লোককে গাছ কাটতে হয়, আবার কিছু লোক জঙ্গল থেকে কারখানায় সেই কাঠ পাঠিয়ে দেয়, আরো অনেকে সেই কাঠ কাটে, আবার কেউ কেউ চেয়ারের ছোটো ছোটো অংশ তৈরি করার কাজে লাগে, আর তারপর সব একত্র হলে চেয়ার তৈরি হয়। কিন্তু তার আগে কোনো কোনো লোককে গঁদ তৈরি করতে হয়, মাটি খুঁড়ে কয়লা কেটে আনতে হয়, লোহা-কারখানা থেকে ইস্পাত বানিয়ে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে হয়। তা ছাড়া অবশ্য এই সব শ্রমিকের জন্য আর একদল লোককে মেহনত করতে হয় তাদের খাওয়াপরার জিনিস পয়দা করার জন্য। এভাবে অসংখ্য লোক নানাভাবে কাজ না করে গেলে আজকের সমাজব্যবস্থায় একটা চেয়ার বানানো যায় না। উৎপাদনের দিক থেকে ধনতন্ত্র হল একটা প্রকাণ্ড সংগঠন, যার মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক নানা দেশে কাজ করে যাচ্ছে সমাজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য, যেখানে এক একটা কারখানাতেই হাজার হাজার শ্রমিক মেহনত করছে, যেখানে এক কারখানার কাজের সঙ্গে আর এক কারখানার কাজ একেবারে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, যেখানে এক কারখানার তৈরি জিনিস আর এক কারখানায় কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পণ্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন কি ঘটে? লক্ষ কেন, কোটি কোটি শ্রমিকের সহযোগিতায় হরেক রকমের দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্য বহুজনের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সৃষ্ট হল তার মালিকানা থাকে সংকীর্ণ একটা শ্রেণীর হাতে, মাত্র কয়েকজন মালিকের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় এই বিরাট উৎপাদন-সংগঠনের পরিশ্রম ফল! এই হল ধনতন্ত্রের মর্মভেদী অসঙ্গতি, এরই মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে স্ববিরোধ, যে অসামঞ্জস্য, যে অস্বস্তি, তাই হল শ্রমিক ও ধনিকের সংঘাতের মূল হেতু। শ্রমিক-ধনিকে সাময়িক বিবাদ ও বোঝাপড়া যতই হোক না কেন, এই স্ববিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে অবিরত, কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রত্যক্ষ রূপে, আর এর নিরাকরণ নেই যতদিন না সামাজিক উৎপাদনের শক্তিপুঞ্জ উৎপাদনের উপকরণাদির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির শক্তিকে পরাজিত করে। ধনিক ব্যবস্থার মধ্যে তাই সর্বদা মন্দগতিতে পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু যখন ঐ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছায়, যখন তার ভিতরকার ব্যারামকে আর চেপে রাখা

বা প্রলেপ দিয়ে শান্ত করা সম্ভব থাকে না, তখন দ্রুত পরিবর্তন অনিবার্য, তখন নূতন সমাজস্তরে সংক্রান্তি অবশ্যম্ভাবী, তখন বিপ্লবজনিত রূপান্তর অকাট্য, তখনই ধনতন্ত্র পরাজয় স্বীকার করে সমাজবাদের কাছে, তখনই উৎপাদনের উপকরণাদির উপর ব্যক্তিগত স্বত্বের পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সমাজেরই সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বলা চলে, মার্ক্সের ভাষায়, যে যারা অপরকে উৎখাত করেছিল, তারাই উৎখাত হয়ে যায়, নূতন সোশালিস্ট সমাজের স্থাপনা ঘটে।

মার্ক্স্বাদের ভিত্তিস্বরূপ এই জীবনদর্শনকে অস্বীকার করে সোশালিস্ট-নামধেয় অনেকে মনে করে যে দাগের পর দাগ ঔষধ খাইয়ে যেমন রোগ সারানো যায় তেমনই এক এক করে ধনতন্ত্রের সব জঞ্জাল সরিয়ে এক শুভদিনে আমরা সমাজবাদে পৌঁছে যেতে পারি। মার্ক্স্বাদীরা অবশ্য দৈনন্দিন সংগ্রামে ধনিকশ্রেণীর কাছ থেকে মাহিনা বৃদ্ধি কিংবা অনুরূপ দাবি আদায় করার কাজে অবহেলা কখনো করে না, কারণ তারা জানে যে ঐভাবেই দিনের পর দিন শ্রমিককে লড়াই করে যেতে হয়, ঐভাবেই তার চেতনা ধনতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু মার্ক্স্বাদীরা আরো জানে যে শ্রমিকের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য ছোটোখাটো দাবি নিয়ে লড়াই করতে করতে এমন একটা সময় আসে যখন মালিকের পক্ষে দাবি মানার অর্থ হল মালিকশ্রেণীরই চূড়ান্ত পরাজয়, যখন ডায়ালেক্‌টিক্-এর ভাষায় বলা যায় যে পরিমাণগত পরিবর্তন সমাজের গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। তখনই আসে প্রকৃত সংকট, তখনই আসে সংক্রান্তির উপযুক্ত সময়। তখন দুই বিরোধী শ্রেণীকে সংগ্রাম চালাতে হয়—ধনতন্ত্রের অবসান হয় শ্রমিকের লক্ষ, শ্রমিকের দাবি নাকচ করা হয় ধনিকের লক্ষ্য। প্রকৃত মার্ক্সবাদী চেতনার একান্ত বেদনাকর অভাব ছিল ১৯৩২ সালের জার্মানিতে যখন এই ধরনের সংকট সময় উপস্থিত হয়, তখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী ও দূরদর্শী ছিল না, "সোশালিস্ট" নেতারা কমিউনিস্ট-বিরোধের জ্বালায় পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাই হিটলারকে সামনে রেখে ধনিকশ্রেণী প্রতিবিপ্লবের চূড়ান্ত পরিচয় দেয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস পাশবিকতায় যে ফ্যাশিজ্‌মের ঘৃণ্য মূর্তি প্রকট হয়েছিল সেই ফ্যাশিজ্‌ম্ জার্মানির বুকের উপর চেপে বসে। তার পূর্বেও দেখা গেছে যে ডায়ালেক্‌টিক্-এর অভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং পরে বিপ্লবের যে ব্যাপক সুযোগ ছিল, লেনিন পরিচালিত রুশ বলশেভিক পার্টি ছাড়া আর কোথাও অনুরূপ বিপ্লবী অগ্রগতি ঘটল না। যাই হোক, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের শিক্ষা হল এই যে ইতিহাসে কোনো মালিকশ্রেণী কখনো বিনাযুদ্ধে নিজের ক্ষমতা পরিত্যাগ করে না বলে জনগণকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে বাতুলতা, আর মেহনতী জনতার বিপ্লবী দর্শন তাদের কর্মে উদ্দীপ্ত করবে, তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করবে।

পরিমাণগত পরিবর্তনের গুণগত পরিবর্তনের রূপান্তর সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে কয়েকটা উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। জল কেমন করে বাষ্প কিংবা বরফে পরিণত হয় তা আমরা জানি। আধুনিক রসায়ন বিদ্যা যখন আবিষ্কার করে যে অণুপুঞ্জের বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশের ফলে বস্তুর আবির্ভাব ঘটে, তখন এই বিধানেরই সমর্থন মেলে। জীববিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'লম্ফ' (leap) রূপান্তর ('mutation') সেখানেও এই বিধানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একথা সযত্নে স্মরণ করা দরকার, কারণ এরই সঙ্গে বিপ্লবের যে মূলনীতি তার সম্পর্ক রয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে সমাজে পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে এমন একটা পর্যায় এসে উপস্থিত হয় যখন যেন আকস্মিকভাবে গুণগত

পরিবর্তন ঘটে। বিপ্লবের বিশ্লেষণ ও বৃত্তান্ত থেকে এই শিক্ষা আমরা পাই যে বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে একটা অনপনেয় অসঙ্গতি নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'আপনি বিপ্লবের পক্ষে না বিবর্তনের পক্ষে?' তখন জবাব দেওয়া যায়, 'আপনি সাইকেলের সামনের চাকা না পিছনের চাকাকে বেশি পছন্দ করেন?'

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই বিধানের সমর্থন দেখা যায়। টাকার পরিমাণ যখন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন তা আর শুধু টাকা থাকে না, তাকে বলা হয় পুঁজি। কোনো ব্যক্তি যখন একাকী, তখন তাঁর ব্যবহার হয় এক রকম, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন জনতার মধ্যে থাকেন, তখন তাঁর ব্যবহার ও মনোভাব হয় ভিন্ন। নেপোলিয়ন যখন মিশরে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে এঙ্গেল্‌স্ একটা উদাহরণ দেন : ''দুজন 'মাম্‌লুক' (মিশরী যোদ্ধা) নিশ্চয়ই তিনজন ফরাসি যোদ্ধাকে পরাজিত করতে পারত; একশো মাম্‌লুক আর একশো ফরাসি যোদ্ধা ছিল প্রায় সমকক্ষ; তিনশো ফরাসি তিনশো মাম্‌লুককে প্রায়ই হারাতে পারত; কিন্তু এক হাজার ফরাসি যোদ্ধা দেড় হাজার মাম্‌লুককে সর্বদাই পরাজিত করতে পারত।'' পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয় বলেই গণতন্ত্রের বড়াই যারা করে থাকে অথচ ধনিক প্রভুত্ব যারা বজায় রাখতে চায় তারা একটা পর্যায়ে পৌঁছাবার পর আর কিছুতে গণতান্ত্রিক অধিকার বাড়ায় না তো বটেই, বরঞ্চ সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে সংকুচিত করে চলে। আজ ধনিক জগতে এই ব্যাপারই ঘটেছে। যারা একদা প্রাণপণে আশা করেছিল যে ফ্যাশিজম্‌কে সামনে রেখে সমাজবাদী সোভিয়েট এবং সকল প্রগতিমূলক অভিযানকে ধ্বংস করা যাবে, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী জনতার দৃপ্ত মূর্তি দেখে প্রাণপণে নিজেদের ক্ষুদ্র, হেয় স্বার্থরক্ষার জন্যই নূতন যুদ্ধের আবর্তে সব দেশকে ফেলে দিতে সংকোচ বোধ করছে না, তারা (আর তাদের বহুরূপী সহায়কের দল) আজ তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আমলে যে সব নাগরিক অধিকার অকাট্য, তাকেই খণ্ডিত ও খর্ব করে তুলতে ব্যস্ত। স্টালিন তাই বলেছিলেন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ১৯-শ কংগ্রেসে তাঁর শেষ বক্তৃতায় যে আজ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকা পর্যন্ত ধূলায় লুটিয়ে রয়েছে আর কমিউনিস্টরা ছাড়া সেই পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কেউ নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী এইভাবে যে নিজেরই প্রাক্তন কৃতিত্বকে বিস্মৃত হতে চাইছে, তার মূল কারণ হল এই যে গণতন্ত্র ব্যাপারে পরিমাণগত পরিবর্তনকে যদি আরো বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় তা হলে গুণগত পরিবর্তন সমাজে আসবে, বিপ্লব ঘটবে, বুর্জোয়া সমাজ-মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হয়ে নূতন সমাজের আবির্ভাব হবে—সুতরাং কিছুতেই মালিকের দল সে-অবস্থা বরদাস্ত করতে পারে না। ভালোমানুষের মতো হার মানবে না তারা, নিজের পায়ে কুড়ুল ইতিহাসে কোনো মালিক শ্রেণীই মারতে চায়নি। তাই আজ শুধু যারা কমিউনিস্ট তারা ছাড়াও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেকটি মানুষকে বুঝতে হবে যে ইতিহাসে নবযুগে সংক্রমণের পথে বাধা হয়ে রয়েছে ধনিক ব্যবস্থা আর তার অপসরণ ঘটাবার জন্যই জনতার অবিরাম আয়োজন একান্ত প্রয়োজন।

'ডায়ালেক্‌টিকস্' আমাদের শেখায় যে ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, সমাজদেহের অভ্যন্তরেই অসঙ্গতি যখন সুপরিণত হয়ে ওঠে, তখন গুণগত প্রবর্তন বিনা সমাজজীবন চলে না, তখনই আসে বিপ্লব, নূতন সামাজিক পর্যায়ে উন্নতি। আদিম সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে সেই সমাজের অভ্যন্ত রীতিনীতিই স্ববিরোধে অভিভূত হল, দাসপ্রথার উদ্ভব হল। দাসপ্রথাও যখন তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির টাল সামলাতে পারল না, তখন তার অবসান

ঘটল। ভূমিদাস প্রথার উপর ভিত্তি করে জায়গীরদারি জমিদারি ব্যবস্থার উৎপত্তি আমরা দেখলাম। আবার সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজদেহের ভিতর বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম হওয়ায় প্রাক্তন ব্যবস্থা ক্রমে অচল হয়ে উঠল, জনতার সহায়তা নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব নিল, নূতন বুর্জোয়া সমাজ ইতিহাসের মঞ্চে উপস্থিত হল। আবার বুর্জোয়া ব্যবস্থারই অনিবার্য ফলস্বরূপ আধুনিক যুগের শ্রমিকশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়াল, উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রকট হতে থাকল, আর সেই স্ববিরোধ, সেই অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিরই পরিণতি রূপে বিপ্লব হল—যে বিপ্লবের যুগ আজো চলছে। দেশে দেশে জনতার মুক্তি অভিযানের মধ্যে তারই আগমনী আজ মানুষ শুনছে।

কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছেন যে সমাজবাদ ও সাম্যবাদের পূর্ববর্তী সকল ব্যবস্থাই আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির ফলে রূপান্তরিত হয়েছে, এই যখন ইতিহাসের ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের শিক্ষা, তখন সাম্যবাদী সমাজই কি শুধু সেই বিধানের ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে, সে সমাজও কি ভবিষ্যতে তার স্ববিরোধের জালে আটকে গিয়ে নূতন শক্তির কাছে পরাভূত হবে না? এর সোজা জবাব হল যে নিশ্চয়ই ডায়ালেক্‌টিক্‌ পদ্ধতি স্তব্ধ হয়ে যাবে একথা মার্ক্‌স্‌বাদীরা বলে না, কিন্তু আজকের কর্তব্য হল সমাজবাদ ও সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া, সাম্যবাদী সমাজে ডায়ালেক্‌টিকের প্রকাশ কি হবে বা না হবে, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা নয়। আরো বলা যায় যে সাম্যবাদ যখন সমগ্র মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই প্রকৃত মানুষের ইতিবৃত্ত আরম্ভ হবে—এঙ্গেল্‌সের ভাষায় বলা চলে যে তখনই 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসান হবে, ইতিহাসের প্রারম্ভ ঘটবে'—আর সেই নবযুগে নিশ্চয়ই ডায়ালেক্‌টিক্‌ পদ্ধতিতে সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্র নবধারায় প্রস্তুত হবে, শুধু শ্রেণীকণ্টকিত সমাজের স্ববিরোধ ও আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির তুলনায় তখন হয়তো সম্পূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব দেখা যাবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের চেষ্টা আজ অসার্থক এবং একেবারে অহেতুক। মানুষ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, সে সমস্যার সমাধান নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন আজ নেই।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সম্যক আয়ত্ত করতে হলে শুধু অধ্যয়ন যথেষ্ট নয়— বিনা বিচারে নিছক বিশ্বাসও মার্ক্‌স্‌বাদীর অকর্তব্য। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুঝতে হলে অধ্যয়ন ছাড়াও একান্ত প্রয়োজন বিপ্লবী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং তারই অভিজ্ঞতা থেকে অধ্যয়নের সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ীকরণ। এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বর্ষীয়ান নেতা টি. এ. জ্যাকসন্‌-কৃত 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌' গ্রন্থে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যাচাই তিনি করেছেন নিজের জীবনের এবং সমকালীন সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে। মার্ক্‌স্‌বাদী কোনো গুহ্যতত্ত্বে বিশ্বাস করে না, শুধুমাত্র আবেগসঞ্জাত মনোভাব তার কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়, দৈব অনুগ্রহে বা কোনো অতিমানবিক প্রক্রিয়ার ফলে স্বর্গরাজ্যের দ্বার একদিন উন্মুক্ত হবে সে-আশার কুহকে সে মুগ্ধ নয়। মার্ক্‌স্‌বাদী জানে যে ইতিহাসে যে শক্তিপুঞ্জ সক্রিয় হয়ে রয়েছে, মানুষ তারই অঙ্গীভূত। মার্ক্‌স্‌বাদী জানে, বিশেষত অতীতের পর্যালোচনা করে জানে, যে আজ নিয়তির মতো অনিবার্যভাবে ভবিষ্যৎ সমাজ এসে উপস্থিত হয় না। সমাজের বিবর্তন অকাট্যভাবে ধনিক ব্যবস্থার পতন এবং সমাজবাদের অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করছে বটে, কিন্তু সেই শুভ ঘটনার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হয়ে নেই, মানুষের স্বকীয়, সংহত প্রচেষ্টা নির্বিশেষে বিপ্লব সাঙ্গ হবে না, নব সমাজের আবির্ভাব ঘটবে না। সমাজবাদের অভ্যুদয় সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কল টিপে পুতুল বেরিয়ে আসার মতো একদিন নূতন ব্যবস্থার জন্ম হবে

না। 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌'-এর আলোচনা থেকে আমরা বুঝি মহামতি স্টালিনের কথার সত্যতা, যখন তিনি বলেছিলেন : 'জয় কখনো স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এসে হাজির হয় না; তাকে হাত ধরে টেনে আনতে হয়।'

দিন আগত ঐ

১৮৮২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক চিঠিতে এঙ্গেল্‌স্‌ লেখেন: 'হয়তো ভারতবর্ষে— হয়তো কেন, খুবই সম্ভবত— একটা বিপ্লব হবে... আর আমাদের পক্ষে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।' মার্ক্‌স্‌ এবং এঙ্গেল্‌সের মনে ধনতন্ত্রের পরিণতি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব এবং তার ভূমিকা সম্বন্ধে চিন্তা সততই ছিল। তাঁরা তাই বলেছিলেন যে ইয়োরোপ 'পৃথিবীর প্রান্তে একটা ছোট্ট এলাকা' বলে সেখানকার বিপ্লব 'নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য... যদি আরো অনেক দূরবিস্তৃত এলাকা জুড়ে বুর্জোয়া সমাজের প্রাধান্য বজায় থাকে' অর্থাৎ এশিয়া এবং অন্যত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করে বুর্জোয়াশ্রেণী যদি তা আধিপত্যকে সুদৃঢ় করতে থাকে, তা হলে ইয়োরোপের বিপ্লব জয়লাভ করতে পারবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ এইভাবে একসূত্রে গ্রথিত থেকেছে। পূর্ববর্তী যুগে ভারতবর্ষের মতো দেশের দৌলত ইয়োরোপের বণিকরা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল বলে শিল্পবিপ্লব সেখানে সবৈব হয়, বড়ো বড়ো কলকারখানা ফাঁদার মতো পুঁজি তারা এশিয়ায় বাণিজ্য করেই সংগ্রহ করতে পেরেছিল। আধুনিক যুগে ইয়োরোপের জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করছে এশিয়ার মতো অঞ্চলেও সেই স্বাধীনতা স্থাপিত হওয়ার উপর, ঠিক যেমন ইয়োরোপের মালিকশ্রেণীর সম্পদ ও প্রভুত্ব একদা নির্ভর করেছিল এশিয়াতে তাদের লুণ্ঠনবৃত্তির সাফল্যের উপর। বাস্তবিকই আজ বলা যায় যে স্বাধীনতা হল অবিভাজ্য, (''freedom is indivisible'') অপর দেশের স্বাধীনতা হরণ করে কোনো এক দেশের প্রকৃত স্বাধীনতা অসম্ভব। সর্বদেশে স্বাধীনতার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুনিয়াজোড়া গণসংগ্রামই সৃষ্টি করছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস— বিশেষ করে সাম্প্রতিক ইতিহাস— সম্বন্ধে মার্ক্‌সের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রচনার তুলনা নেই। মার্ক্‌স্‌বাদ মাত্র একটা দেশ বা মহাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, সমগ্র মানব সমাজেরই বিকাশ, বিবর্তন ও বিপ্লব সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌বাদের শিক্ষা অমূল্য। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাই মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন-স্টালিন এই চার মহারথীর আগ্রহের অন্ত ছিল না; ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ধারা তাঁরা অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করতেন। ১৯০৮ সালে যখন রাজদ্রোহের অপরাধে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয় তখন বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী যে ঐতিহাসিক হরতাল করে, তাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে লেনিন লেখেন : ''ভারতবর্ষে 'সুসভ্য' ইংরেজ বণিকদের 'স্থানীয় গোলামেরা' সম্প্রতি তাদের 'প্রভুদের' দারুণ অসুবিধা আর দুশ্চিন্তা ঘটাচ্ছে।... স্বাধীন ব্রিটেনে জন্‌ মর্লির মতো যারা রাজনীতিতে খুব উদারচেতা আর অগ্রসর বলে পরিচিত, তারা ভারতবর্ষ শাসন করতে গিয়ে এক একজন চেঙ্গিস খাঁ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর অধীনস্থ প্রজাদের 'ঠাণ্ডা' করতে

গিয়ে সব রকম ব্যবস্থা, এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারে যারা প্রতিবাদ জানায় তাদের চাবুক মারারও ব্যবস্থা অবলম্বন করছে।... কিন্তু ভারতবর্ষের নিঃস্বশ্রেণী ইতিমধ্যেই এতটা সুপরিচিত হয়ে উঠেছে যে শ্রেণী-সচেতন হয়ে তারা একটা ব্যাপক রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমেছে, আর তাই সে দেশে ইংরেজ আর রুশ কেতায় অত্যাচার বেশিদিন চলবে না।... আজ ইয়োরোপের শ্রেণীসচেতন শ্রমিকরা এশিয়ায় নূতন সাথীর দল খুঁজে পেয়েছে, আর এদের সংখ্যা বেশ জোরেই বেড়ে চলবে।" এর কিছু পরে তিনি লেখেন : "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ড নিঃসংশয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রবেশ করেছে ; জগৎজোড়া বিপ্লব প্রচেষ্টার আবর্তের মধ্যে আজ প্রাচ্যের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।" এই যুগেই তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর আশা প্রকাশ করেন— ভারতবর্ষ, চীন ও রুশদেশের জনতা যদি একজোট হয়ে বিপ্লব করে তো দুনিয়ার চেহারা একেবারে বদলে যাবে। রুশ আর চীন বিপ্লবের মহাবর্ত দিয়ে এগিয়ে গেছে—বাকির বোঝা নিয়ে এখনো আমরা পিছনে পড়ে রয়েছি।

কিন্তু আমরা এখনো যে পেছনে রয়েছি, তার কারণ এই নয় যে মার্ক্‌স্‌বাদ ব্যাপারটা আমাদের দেশের ধাতে সইছে না। আগে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা হয়েছে, আবার বলতে দোষ নেই যে এখানকার অনেক মাতব্বর এখনো বলে থাকেন গম্ভীরচালে : "কমিউনিজম জিনিসটা রাশিয়ার (আর আজকাল চীনেরও! কাণ্ড, তবে ও কাণ্ড আমাদের দেশে অচল") অবশ্য এঁরা বেমালুম চেপে যান যে পার্লামেন্ট মার্কা গণতন্ত্র হল বিলিতি মাল, এদেশের 'আদি ও অকৃত্রিম' 'পেটেন্ট' নয়, তবে সেইটা নাকি আমাদের ধাতে সয়ে গেছে, কারণ মহানুভব ইংরেজ দয়া করে দেশ শাসনের ভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, আমাদের হাতেখড়ি দিয়ে শিক্ষাদীক্ষার জোরে সাবালক করেছে, ইংরেজদের গুণাবলী আয়ত্ত করার স্বপ্ন আমরা পুরুষানুক্রমে দেখে আসছি পলাশীর যুদ্ধের পর হতে; আর 'গুরুমারা বিদ্যে'র জোরে কি তাদের পার্লামেন্টারি কেতায় দুরস্ত হতে পারব না? তা যাই হোক, পার্লামেন্ট-মার্কা গণতন্ত্রের প্রশংসায় যারা শতমুখ, তারা অন্তত কমিউনিজমকে বিদেশি মাল বলে উড়িয়ে যে দিতে পারে না, এটা অবধারিত সত্য। কমিউনিজমের তত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতির যাঁরা প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, সেই মার্ক্‌স্‌ আর এঙ্গেল্‌স্‌ ছিলেন জাতিতে জার্মান; কমিউনিজমের মূল প্রামাণিক গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' লেখা হয়েছিল ইংল্যান্ডে; শিল্পের দিক থেকে সবচেয়ে অগ্রসর সেই দেশের ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ক তথ্যের অপূর্ব সমাবেশে অকাট্য যুক্তি তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফ্রান্সের বিচিত্র উদ্দীপনাময় রাজনৈতিক ইতিহাসের সারমর্ম মার্ক্‌স্‌বাদের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্ভূত হয়েছে, আদিম যুগ থেকে সমাজ বিকাশের ইতিবৃত্ত এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং তার পশ্চাৎপটেরই উপর মার্ক্‌স্‌বাদের সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়েছে; রুশ দেশের লেনিন, এশিয়ার অন্তর্গত জর্জিয়ার স্টালিন, আর জীবিতদের মধ্যে চীনা মাওৎসে-তুং মার্ক্‌স্‌বাদের সার্থক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বর্তমান জগতে মার্ক্‌স্‌-এর প্রদর্শিত পথ ভিন্ন অন্য পথ নেই। এই মার্ক্‌স্‌বাদকে যারা রুশদেশের কাণ্ড বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা যে মুর্খ তা নয়, তারা এভাবেই ধনিকশ্রেণীর এবং শ্রেণীসমাজের অনিবার্য অবলোপকেই যথাসাধ্য রোধ করে রাখতে চায়, একেবারে নির্বোধের মতো মিথ্যা কথা জোর করে প্রচার করেই যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার আশা থাকে, তো সে-প্রচার তারা করবে না কেন?

কিন্তু শত প্রচারেও আজ সাধারণ মানুষকে দুনিয়া সম্বন্ধে অন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

হিমালয়ের ভৌগোলিক অধিষ্ঠানের ফলে যেমন বিরাট একটা এলাকার আবহাওয়ার উপর তার প্রভাব পড়ে, যে-প্রভাবকে প্রাণপণ প্রচারেও পরিবর্তন করা যায় না, তেমনই আজ দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে যে সোভিয়েট দেশ রয়েছে, দুনিয়ার এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা যে নূতন চীনে বাস করছে, পূর্ব ইয়োরোপের যে গণতন্ত্রগুলি সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলছে শ্রেণীশত্রুকে পথের কাঁটার মতো সরিয়ে দিয়ে, সেখানে যে অর্থনৈতিক সংকট বলে'কোনো বস্তু নেই— এ-সব ঘটনার ছাপ পড়ছে সারা পৃথিবীর উপর, তাকে রোধ করা কারো সাধ্য নয়। যে-চীন আমাদের প্রতিবেশী, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরে যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ, যার সুপ্রাচীন অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার খ্যাতি আমাদেরই ইতিহাসের সঙ্গে তুলনীয়, যার প্রাচীন সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ-পিষ্ট বর্তমানের গ্লানি আমাদেরই অনুরূপ, সেই চীন যখন নূতন রাস্তায় চলছে, মার্কস্‌বাদের অমোঘ শিক্ষা ও অমিত শক্তি যখন তার প্রাণে নব সঞ্জীবন এনে দিয়েছে, তখন আমরাই যে মুখ ফিরিয়ে থাকব, মনের দরজায় তালাচাবি ঝুলিয়ে রাখব, বাস্তব জীবনের দাবিকে অস্বীকার করে চলব, তা হতে পারে না। মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট ব্যবস্থা যদি বোখারা-সমরখন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তো কাশী-কাঞ্চীই বা মান্ধাতার যুগে মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসে থাকবে কেন? আমরাই বলে থাকি যে মন্বন্তরে মনু চলে যায়, আসে নূতন সংহিতা—যদি তাই হয় তো কত মন্বন্তর ঘটে গেল, কত বিপ্লবের জোয়ার বয়ে গেল পৃথিবীর বুক দিয়ে, কিন্তু মার্ক্সের নাম শুনলে আমরা ভ্রূ কুঁচকে পুরানো মনুকে ডেকে আনতে যাব কেন? ধর্মের প্রবোধ, বিশ্বাসের প্রলেপ আর বিত্তবানদের মোহময় প্রচারের জোরে আমাদের দেশের মানুষের বহুযুগব্যাপী দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে মুছে দেওয়া কি সম্ভব হতে পারে? কোটি কোটি মানুষকে দরিদ্র করে রেখে হঠাৎ একদিন দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আর হরিজনের প্রশস্তি, পরকালের মহিমা কীর্তন করে ইহকালের প্রবঞ্চনাকে ধামাচাপা দেওয়া ইত্যাদি মার্জিত ধাপ্পাবাজি চিরকাল সবাইকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। দারিদ্র্য, গোলামি, শোষণ, অত্যাচার অন্য দেশের মতো ভারতবর্ষকেও সইতে হয়েছে। আর অতীতের এই নোংরা বোঝাকে ঝেড়ে ফেলার লড়াইয়ে রুশ, চীন প্রভৃতির মতো ভারতবর্ষও এগিয়ে চলবে।

ভারতবর্ষ সোনার দেশ, প্রাচুর্যের দেশ, সমন্বয়ের দেশ সুতরাং এখানে ধনী-নির্ধনে দ্বন্দ্ব সর্বদাই প্রশমিত হয়েছে, জনতার মনে সন্তুষ্টিই সর্বদা থেকেছে— একথা মাঝে মাঝে আমাদের শুনতে হয়। কিন্তু কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। বেদের যুগ থেকে আজকের পূজা অর্চনা পর্যন্ত 'ধণং দেহি' অবিরত উচ্চারিত হয়ে এসেছে; নির্ধনের জীবনে অশেষ বিড়ম্বনা বলেই এই প্রার্থনা। কল্পদ্রুমাবদানে বর্ণিত কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসাদে অনেকেই জানেন : শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষের হাহারব যখন জেগে উঠেছিল, বুদ্ধ তখন ভক্তদলকে ডাকলেন, আর রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন, ধর্মপাল প্রভৃতি রাজকরভারে ক্লিষ্ট বলে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় অনাথপিণ্ডদেব কন্যা ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া 'দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা' মেটাবার ভার নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের ইতিবৃত্ত আমাদের অযুতবর্ষব্যাপী যন্ত্রণার সাক্ষ্য দিচ্ছে। যে দেশের ঐশ্বর্যের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল, সে দেশেরই সাধারণ মানুষের জীবনে প্রকৃত স্বস্তি আজ পর্যন্ত আসেনি— এদেরই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর

বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

তাই বাংলা দেশের ব্যবসাবাণিজ্য যখন যথেষ্ট বিস্তৃত বলে আমরা শুনি, তখনই ফুল্লরার 'বারোমাস্যা' থেকে পাই দরিদ্র জীবনের সংবাদ— বারোমাস 'অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তাতে।' তাই কোম্পানির আমলে বাংলাদেশে স্বদেশি-বিদেশি শোষণের মারাত্মক ত্র্যহস্পর্শের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা পাই রামপ্রসাদের রচনায় :

কারে দিলে ধন-জন, মা, হস্তী-অশ্ব-রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেউ নয়?
কেউ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমনি হই,
মাগো আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে
দিয়াছিলাম মই?

সরল কবি কিন্তু তার পরের পদেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন :

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অম্‌নি অই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি শ্যামা হ'লে পাষাণময়ী।

কিন্তু আজ ইতিহাসের যে যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে, যার বিজয়-কেতনকে সগর্বে উড্ডীন দেখে লোভজর্জর শোষকের দল বিনিদ্র রজনী যাপন করছে, সে যুগে অতীতের এই গ্লানি ও যন্ত্রণার বোঝা বহন করে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নূতন, শ্রেণীহীন সমাজে মেহনতী মানুষ যে অসাধ্য সাধন করতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাশিজ্‌মের পরাজয় এবং মহাচীনের বিস্ময়কর জাগরণের মতো যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যে তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ মিলেছে। মার্ক্‌স্‌বাদের মহিমা আজ জল্পনাকল্পনার ব্যাপার নয়, মেহনতী মানুষের মনে আজ সে মহিমা সত্যের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সোভিয়েট দেশে যা ঘটছে তার বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সোভিয়েট সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য আজ আর কারো কাছে গোপন রাখা সম্ভব নয়। সে দেশে বেকারী নেই, অবিরাম উৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে চলেছে, উৎপাদনের লক্ষ হল সমাজের সকলের স্বস্তি ও সুখ, 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' সেখানে একটা স্বপ্ন নয়, কারণ সেই 'লক্ষ্মীলাভে' বাধা দেয় যে স্বার্থসর্বস্ব সম্পত্তিবান শ্রেণী, তার অস্তিত্বই সেখানে লুপ্ত হয়ে গেছে। সোভিয়েটে রোজগার বা বেতনের নিম্নতম হার এমনভাবে নির্দিষ্ট হয় যে গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত, সবচেয়ে অকর্মা পর্যন্ত। যাকে বলা হয় আসল রোজগার, (''real Hage'') তা সোভিয়েট বেতনের অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ সন্তান পালনের ব্যয় অনেকখানিই সরকার বহন করে, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রসূতি-পরিচর্যা ইত্যাদির ব্যয় প্রায় সবটাই সরকারি। বার্ধক্যে(বা কোনো কারণে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে) সকলেরই 'পেন্সন' বাঁধা। সোভিয়েটে বেতন বা মজুরির

অসাম্য কমিয়ে আনাই সরকারি নীতি। তাই তার নিম্নতম সীমাটা হুহু করে উপর দিকে উঠছে। সেখানে যাদের রোজগার বেশি, তারা কোনো মালিকানার জোরে বিনা শ্রমে রোজগার করে না, বরঞ্চ সমাজের কোনো প্রকৃত মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে বলেই তাদের পারিশ্রমিক বেশি। যারা উৎপাদনের কাজে উন্নতি আনতে সাহায্য করেছে, তাদের রোজগার বেশি, সম্মান অপরিসীম। এইভাবে অনেক শ্রমিক (মেয়ে ও পুরুষ) কারখানার ডিরেক্টর বা ম্যানেজারের চেয়ে বেশি রোজগার করে কাজের গুণে। সবচেয়ে বেশি রোজগার সে দেশে করে বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী, নটনটী, সংগীতজ্ঞ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সমাজ-সেবা সংক্রান্ত কর্মী এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রের বিশিষ্ট কর্মবীর, যাদের সোভিয়েটের সমৃদ্ধি সাধনে প্রকৃষ্ট অবদান রয়েছে। কিন্তু বেশি রোজগার যারা করে, তারা পুঁজি হিসাবে তাদের অর্থ ব্যবহার করতে পারে না। মোটরগাড়ি কিনতে পারে বটে কিন্তু মোটরগাড়ির কারখানা ফেঁদে অপরের মেহনত ক্রয় করতে পারে না, তাদের রোজগারীর উদ্বৃত্ত ধন সরকারি ব্যাঙ্কের মারফতে সর্বসাধারণের কাজে লাগিয়ে কম রোজগারীদের জীবনযাত্রার মান বাড়াবার ব্যবস্থাই চলতে থাকে। সে দেশের সবায়ের রোজগার সমান নয় শুনে যারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রচার করে যে সেখানে ধনিকব্যবস্থা রয়েছে, তারা মার্কসের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সমাজবাদ বা সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাদের প্রকৃত ধারণা নেই। সমাজবাদের বীজমন্ত্র হল ধনতন্ত্রের ধ্বংস; উৎপাদনের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণের উপর থেকে ব্যক্তিস্বত্বাধিকার তুলে দেওয়া হল সেই ধ্বংসের অব্যর্থ উপায়। সেই সমাজবাদ সোভিয়েটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর তারপর থেকে, হাজার বাধা কাটিয়ে, সোভিয়েটে এগিয়ে চলেছে পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজের দিকে, যে সমাজে সকল নাগরিকই তার সামর্থ্য মতো পরিশ্রম করবে, এবং প্রয়োজন মতো পারিশ্রমিক পাবে। এখন সমাজবাদী ব্যবস্থায় মূল রীতি হল যে সবাই সামর্থ্যমতো পরিশ্রম করবে, কিন্তু কাজের পরিমাণ ও গুণের অনুপাতে পারিশ্রমিক মিলবে। এতে ভড়কে যাওয়ার কোনো কথা নেই, কারণ ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি-ব্যবস্থাকে দূর করে সেখানে বেকারীকেও দূর করে দেওয়া হয়েছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ভার রাষ্ট্র নিয়েছে, সংস্কৃতির সুযোগ সবায়ের কাছে সমানভাবে খোলা, সমাজকল্যাণের জন্য পরিশ্রম করছে বলে সবাই সেখানে কাজ করে যাওয়াকে একটা আনন্দ ও গৌরবের বিষয় বলেই মনে করে।

একজন বড়ো আইরিশ্ লেখক প্রায় বিশ বৎসর আগে বলেছিলেন যে দুটো কারণে তিনি সোভিয়েটের বন্ধু— একটা হল এই যে সোভিয়েট দেশে আছে আধুনিক ফরাসি ছবির সবচেয়ে ভালো সংগ্রহ, আর একটা হল যে সোভিয়েট দেশে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের যত্ন নেওয়া হয় জগতের সব দেশের তুলনায় অনেক বেশি। প্রথম কারণটা আমাদের অনেকেরই কাছে বোধগম্য না হলেও দ্বিতীয় কারণটার গুরুত্ব আমরা সহজে বুঝতে পারব। তবে আমাদের কাছে হয়তো সব চেয়ে আশ্চর্য ও সবচেয়ে মনোহর লাগবে সোভিয়েটের অধিবাসী প্রায় দুশো বিভিন্ন জাতির বিকাশ সম্পর্কিত নীতি ও তার প্রয়োগ। আমাদের দেশে যেমন বহু আদিম জাতি উপজাতি থেকে সভ্যতার উচ্চ স্তরের মানুষ দেখতে পাই, সোভিয়েটে তেমনই আছে কাজাক্, তাজিক্, বেদিয়া, নিনিৎস, চকচু, এস্কিমো থেকে রুশ, জর্জিয়ান, ইউক্রেনিয়ন্ প্রভৃতি নানা জাতি উপজাতির ভিড়। আমরা আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে কিছুই এখনো করে উঠতে পারিনি, কিন্তু সোভিয়েটের সুবিশাল এলাকায় একদিকে যেমন বিরাট অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে বিশ কোটি লোকের জীবনের মানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটানো হয়েছে, তেমনই প্রতিটি জাতি উপজাতির যে স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে সাংস্কৃতির সৃজনশীলতার বীজ

রয়েছে, সেই স্বতন্ত্র সত্তাকে সযত্নে রক্ষা ও বিকশিত করে তোলার চেষ্টা নিরন্তর চলেছে। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় শুনে যে একদা যাযাবর কাজাক্ জাতির নিরক্ষর চারণ মহাকবি জাম্বুল রুশ প্রভৃতি সভ্যতায় অগ্রসর জাতির সকলের কাছে পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, আজেরবাইজানের কবি সদ্‌রুদ্দীন আঈনি মস্কো থেকে সোভিয়েটের সর্বত্র পেয়েছেন অপরিসীম সম্মান। আরো আশ্চর্য হতে হয় জেনে যে, আফগানিস্তানের সংলগ্ন, আমাদেরই কাশ্মীরের প্রতিবেশী তাজিকিস্তানে বিপ্লব জীবনে এনে দিয়েছে নব সমারোহ, যা এখনো আমাদের কাছে কল্পনার বস্তু হয়ে রয়েছে (এ-সম্পর্কে রজনী পাম দত্ত কৃত 'আজিকার ভারত' দ্রষ্টব্য)। এখানে এ-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব নয় বলে শুধু সোভিয়েট দেশে পৃথিবীর 'সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ' স্বচক্ষে দেখে এসে আমাদের রবীন্দ্রনাথ সেখানকার 'এনর্মাস্ ডিফিকাল্‌টিজ্' (প্রচণ্ড মুশকিল) অতিক্রমণের যে বৃত্তান্ত তাঁর স্বদেশবাসীকে শুনিয়ে অনুপ্রেরণা ও ভবিষ্যৎ-গঠনের ভরসা দিয়েছিলেন, সে-কথা স্মরণ করব। বিশেষ করে মনে রাখব যে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েটে গিয়েছিলেন ১৯৩০ সালে, যখন প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ হয়নি, যখন সোভিয়েট শত্রুর জাল থেকে মুক্তি পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলার বিশেষ অবসর পায় নি। তখনই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'শোনা যায় ইয়োরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈব কৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে— এখানে তাই হোলো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে— পদাতিকের অধম যারা ছিল, তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি বশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।' (রাশিয়ার চিঠি)

সেই সোভিয়েট দেশে আজ অণু পরমাণুর শক্তিকে মানব কল্যাণকর উৎপাদনে ব্যবহার করা আরম্ভ হয়েছে। কিছুকাল আগে ইউনাইটেড নেশন্‌সের (সম্মিলিত জাতিসংঘ) অধিবেশনে সোভিয়েট মুখপাত্র ভিশিন্‌স্কি যে-কথার ইঙ্গিত দেন, আজ তা কাজে পরিণত হচ্ছে। ১৩০০০ টন, অর্থাৎ প্রায় ৩,৫২,০০০ মন কয়লার জোরে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা সৃষ্টি করতে পারে আধ সের য়ুরেনিয়াম্ ধাতু। এর প্রয়োগে উৎপাদন বাড়বে অকল্পনীয় বেগে, কিন্তু সোভিয়েট সমাজ তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয়। ধনিকব্যবস্থায় উৎপাদন হয় মুনাফার লোভে, বাজারকে সংকুচিত করে চড়া দামে কম জিনিস বিক্রয়ে লাভ বেশি, সুতরাং বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা অভাবক্লিষ্ট জনতাকে যেন বিদ্রুপ করে বলে থাকেন 'অতিরিক্ত উৎপাদন' আর তার ফলে অর্থনৈতিক সংকটের কথা। সমাজবাদেই মানুষের কল্যাণ, সমাজবাদী ব্যবস্থাতেই মানুষ জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারে সকলের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে। বুর্জোয়া শাসকের দল যে অণুকে ('অ্যাটম্') ব্যবহার করতে চায় কেবল ধ্বংস কার্যের জন্য, নিজেদের সংকীর্ণ ঘৃণ্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সেই অণুরই প্রয়োগ ঘটছে সোভিয়েটে সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই সোভিয়েট থেকে বারবার অনুরোধ আসছে, বোমা বা অন্যান্য ধ্বংস ব্যাপারে অ্যাটমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করো, মানবকল্যাণে অ্যাটমের প্রয়োগ চালু করো। ধনিকের দল তাতে কর্ণপাত করছে না অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই, কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সোভিয়েটের এই অনুরোধের মর্মার্থ তারা খুব বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না।

যাঁরা মার্ক্‌স্‌বাদে সুপণ্ডিত সেজে উপহাস করেন এই বলে যে মার্ক্‌সের মত অনুসারে শিল্পব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রসর একটা দেশেই বিপ্লব প্রথমে ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি এবং বিপ্লব রুশ দেশের মতো একটা (ইংল্যান্ড, জার্মানি বা আমেরিকার তুলনায়) পশ্চাৎপদ

দেশে বিপ্লব ঘটেছিল বলে প্রকৃত বিপ্লব সেখানে হতে পারে নি। মার্কস্‌বাদের নাম উচ্চারণ করে, মার্কস্‌বাদ এবং মার্কস্‌বাদীদের হেয় করা হল এঁদের লক্ষ। এঁরাই আবার বলে থাকেন যে লেনিন খুব একজন কর্মবীর ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কস্‌বাদী হিসাবে তাঁর অবদান নগণ্য। আর স্টালিনের তো কথাই নেই, তিনি ছিলেন লেনিনের কঠোর শিষ্য, একাগ্রচিত্ত ও অক্লান্তকর্মী কিন্তু মার্কস্‌বাদের মূল নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। এ-ধরনের কুৎসার উত্তর দেওয়ারই আজ দরকার নেই, কিন্তু এরকম কুৎসা যে নানা ছদ্মবেশে রটানো হয়, তা জানা দরকার। মার্কস্‌বাদেরই নামে মার্কস্‌বাদের কলঙ্ক ছড়িয়ে সরল মানুষদের মধ্যে অন্তত কাউকে যদি সোভিয়েটবিরোধী করে তোলা যায়, এই আশা নিয়ে ঐ রটনা চলে আসছে।

বারবার মনে রাখতে হবে যে মার্কস্‌বাদ কতকগুলো আপ্তবাক্যের সমষ্টি নয়, মার্কস্‌বাদ কর্মকে নির্ভুল পথে পরিচালনা করে। মার্কসের কোনো কথাকে তার পরিবেশ থেকে আলাদা করে দেখে তারই পুনরাবৃত্তি বাতুলতারই নামান্তর। মার্কসের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষমতা মার্কস্‌বাদীর পরিচয় নয়; যদি তাই হত, তো বের্নস্টাইন, কাউটস্কি, প্লেখানভ প্রভৃতির পদস্খলন হত না, ট্রট্‌স্কি-বুখারিন প্রমুখের উপর ইতিহাসের অকরুণ কশাঘাত পড়ত না। মার্কস্ অবশ্যই মনে করতেন যে খুব সম্ভব শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রসর একটা দেশে বিপ্লব প্রথমে ঘটবে, কিন্তু তিনি ফলিত জ্যোতিষের ব্যবসা খোলেন নি, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান থেকে কবে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী করতে বসেন নি। ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী রূপ তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তার বিশদ বিচার তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, সে-বিচার করেন প্রধানত লেনিন। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আর তার অব্যবহিত পূর্বে বিপ্লবের সুযোগ একাধিক দেশে এলেও রুশদেশেই যে বিপ্লব ঘটল, তার কারণ হল তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদের পরিস্থিতি, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলের অসমান বিকাশ, এবং সমসাময়িক বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী সাম্যবাদী পার্টির প্রস্তুতি বা প্রস্তুতির অভাব। রুশ সম্রাট জারের সাম্রাজ্য ছিল ১৯১৬-১৭ সালে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দুর্বলতম অংশ, আর সেখানেই যখন যুদ্ধক্লান্ত, ভূমিচ্যুত জনতার আঘাত পড়ল, লেনিনের অতুলনীয় নেতৃত্বে সুসংহত বলশেভিক পার্টির নির্দেশে যখন জনতার অভিযান নিয়ন্ত্রিত হল, তখন বিপ্লব যে রুশদেশে দুর্বার শক্তি নিয়ে দেখা দিল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সোভিয়েট বিপ্লব ঘটার পর তার শত্রুরা ক্রমাগত বলেছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য, আর বন্ধুর ছদ্মবেশে ট্রটস্কির মতো শত্রুরা বলেছে যে মার্কস্‌বাদের 'নীতি' অনুসারে একদেশে সমাজবাদ যখন সম্ভব নয়, তখন হয় অন্তত সারা ইয়োরোপে যেমন করে হোক (এমন কি গায়ের জোরে) বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হবে, নয় পরাজয় স্বীকার করতেই হবে। আবার মার্কস্‌বাদের প্রকৃত সৃষ্টিশীল প্রয়োগ দ্বারা স্টালিনকে বোঝাতে হল যে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশব্যাপী সোভিয়েট দেশ অর্থনীতি ও ভূগোলের দিক থেকে এমনভাবে অবস্থিত যে সেখানে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সম্ভব, শত্রুর বহুবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সম্ভব; তাঁকে বোঝাতে হল যে মার্কসের নীতি যে বিপ্লবকে দেশ থেকে দেশান্তরে আমদানী-রপ্তানীর মাল মনে করা যায় না; তাঁকে বোঝাতে হল যে, ঘরে বাইরে যে শত্রু সর্বদাই ওৎ পেতে আছে, সেই শত্রুকে দমন করে সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে পারলে সেটাই হবে বিশ্ববিপ্লব সাধনের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। সোভিয়েটের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে একথাই স্পষ্ট করে দেয় যে মার্কস্‌বাদ এক জায়গায় স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তার বিকাশ ঘটে কাজের মধ্য দিয়ে—যে কাজ করে গেছেন সর্বাগ্রগণ্য লেনিন ও স্টালিন। সেই কাজই আজ

করছেন চীনের মহান কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান নেতা মাওৎসে-তুং; তাই বলা হয়েছে যে তাঁর চিন্তায় ও কর্মে মার্ক্স্-লেনিনের মূল শিক্ষার সঙ্গে চীনদেশে যে বিপ্লব ঘটেছে তার বাস্তব অভিজ্ঞতায় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এইভাবে, সৃজনশীল ভঙ্গিতে মার্ক্স্বাদ বিকাশ চীনদেশে হচ্ছে বলে অতি-বিপ্লবী কোনো কোনো ধুরন্ধর বলছেন যে সেখানে মার্ক্স্বাদ থেকে বিচ্যুতি ঘটছে। এঁদের সম্বন্ধে মনে হয় সেই প্রবাদের কথা : 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'। বিপ্লব সম্বন্ধে কতকগুলো গালভরা কথা যাদের পুঁজি, উত্তপ্ত আবেগ বিনা যাদের কর্মক্ষমতার স্ফূরণ হয় না, তারা মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধেয় কি অশ্রদ্ধেয় বিচার না করে বলা উচিত যে বিপ্লবের ক্ষেত্রে তাদের স্থান নেই; প্রায়ই এই ধরনের লোক হয়তো বা অজ্ঞাতে বিপ্লবের শত্রুদেরই লক্ষ্যসাধনে সহায়তা করে। মার্কস্বাদ সম্বন্ধে নিয়ত স্মরণ রাখতে হবে যে মার্ক্স্বাদ বেদবাক্যের সমষ্টি নয়, মার্ক্স্বাদ জ্যোতির্বিদের মতো দিনক্ষণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে না, মার্ক্স্বাদ সমাজ বিকাশের বিধানকে আয়ত্ত করে, সমাজে পরিবর্তন সাধনের জন্য বাস্তব কর্তব্য সম্বন্ধে মূলগত নির্দেশমাত্র দিতে পারে, জীবনের ক্ষেত্রে মার্ক্সের প্রয়োগ পুঁথিপড়া বিদ্যার উপর নির্ভর করে না, নিছক আবেগের জোরেও সম্ভব হয় না, সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান ও বিপ্লবী কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নির্ভুল মার্ক্স্বাদী সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়।

চীনদেশে যে রূপান্তর এসেছে, তার বর্ণনা পাঠক অন্যত্র পাবেন। সে রূপান্তরের বিবরণ যেন একটা মহাকাব্য। কোটি কোটি মানুষ সেখানে যুগযুগান্তের তমসা অতিক্রম করেছে। এখনো সেখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থা নির্মূল হয় নি, কিন্তু অবিসংবাদিতভাবে সমাজবাদের দিকেই সে দেশ এগিয়ে চলেছে। শ্রমিকশ্রেণীর জীবদর্শন সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টিকে সতত অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে, পথ চলার রসদ জুগিয়েছে নিদারুণ যন্ত্রণার দিনেও। সেখানেও আজ মার্ক্স্বাদের সৃজনশীল প্রয়োগ চলেছে, পাখিপড়া বুলির মতো মার্ক্সের 'বয়েৎ' আউড়ে তারা তুষ্ট নয়; গোটা দেশকে ঢেলে সাজার কাজ যে সহজ ও সস্তা নয়, তা তারা জানে, নিজেদের অত্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তারা জানে। বুর্জোয়াশ্রেণী পরাজিত হয়েও যে শক্তির অধিকারী, তাকে কম করে দেখলে মস্ত ভুল করা হবে। আর মনে রাখতে হবে মার্ক্সের সতর্কবাণী : "তোমাদের পনেরো, কুড়ি কি হয়তো পঞ্চাশ বছর ধরে অন্তর্যুদ্ধ ও দেশে দেশে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে, কারণ তোমাদের কাজ শুধু সমাজে পরস্পর-সম্পর্ককে বদলে দেওয়া নয়, কাজ হল নিজেদেরও বদলে ফেলা, যাতে নূতন সমাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করার শক্তি তোমাদের হয়।" হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে সোশালিজম্ হয়েছে দেখা যায় না। হঠাৎ একদিনে সোশালিস্ট সমাজ স্বর্গরাজ্য এনে দিতে পারে না; হাজার কায়দায় শ্রেণীশত্রু মৃতপ্রায় হয়েও লড়তে থাকে; নিজেদের মনের মধ্যে শ্রেণীমানসের কতকগুলো ভগ্নাংশ অনেক সময় অজ্ঞাতে বেঁচে থাকে, সময়ে-অসময়ে সেগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে, অতীতের ক্ষুদ্রতা ও মলিনতার জের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে সময় লাগে। তাই সোভিয়েট বা নূতন চীনে কোথাও যে কিছুমাত্র গলদ নেই তা মনে করা নেহাৎ ছেলেমানুষীর সামিল (সেদেশে ক্রমাগত যে 'সমালোচনা' ও 'আত্মসমালোচনা' হয়ে থাকে, তার কথা ভাবা দরকার)। তবে এটা ঠিক, হাজারবার ঠিক যে সমাজবাদ যেখানে এসেছে (বা চীনের মতো অবধারিতভাবে আসছে), সেখানে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের অপরিসীম লজ্জা ও দুঃখ নেই, সেখানে রামরাজ্যের ব্যাখ্যা করে— গান্ধীজীর মতো বলতে হয় না যে রামরাজ্যে রাজা আছে, ভিক্ষুকও আছে আর উভয়ের মধ্যে গলাগলি ভাব! সমাজবাদ যেখানে এসেছে বা

আসার উপক্রম করছে, সেখানে মানুষ অতীতের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নূতন জীবন গড়ছে, যে জীবন শোষণ ও শ্রেণীশাসনের কলঙ্ক থেকে একবারে মুক্ত।

এই কারণেই সর্বদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আত্মবিশ্বাস এত প্রবল, জনতার লক্ষসিদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিতি এত নিঃসন্দিগ্ধ। এই কারণেই আজ কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান শুধু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি নয়— শ্রমিকশ্রেণীকে পুরোভাগে রেখে ধনিক ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য যারাই আজ বঞ্চিত, যারাই আজ জীবন সংগ্রামে বিনা দোষে বিধ্বস্ত, যারাই আজ নিজেদের পরিশ্রমের বদলে গ্রাসাচ্ছাদনের দুরূহ চেষ্টার জ্বালায় জর্জর, যারাই আজ ধনিক শাসনের আনুষঙ্গিক সাম্রাজ্যলোভ, বীভৎস যুদ্ধলিপ্সা ও সংস্কৃতিধ্বংস ব্যাপারে ঔদাসীন্য লক্ষ করে চিন্তাগ্রস্ত, যারাই আজ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ গণতন্ত্রগর্বী দেশগুলিতে অবলীলাক্রমে হতে দেখে মানুষ হিসাবে লজ্জিত, যারাই আজ সর্বদেশে সর্বসাধারণের কল্যাণ-কামনাকে মানবিকতার অঙ্গ বলে মনে করেন, তাদের সকলের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান পৌঁছাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে কমিউনিজমের জীবনদর্শন, কমিউনিজমের ইতিহাস ব্যাখ্যা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।

বিপ্লব কোথাও আজ পঞ্চম অঙ্কে, কোথাও বা প্রথম অঙ্কে হাজির হয়েছে, কিন্তু সন্দেহ নেই যে বিপ্লবের বারতা আজ দেশে দেশে দিকে দিকে অমোঘ গতিতে ছুটে চলেছে। সন্দেহ নেই যে ধনিক সমাজব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপের দিন সন্নিকট হয়ে আসছে। সন্দেহ নেই যে ধনিক ব্যবস্থারই দেহসঞ্জাত অসঙ্গতি সুপরিণত হয়ে আসছে, প্রাক্তন সমাজের গর্ভ থেকে নবসমাজের জন্ম হতে অতিরিক্ত বিলম্ব আর নেই। নবজাতের মূর্তি ও স্বভাব সর্বত্র সমান হবে না, কিন্তু নবজাতককে তাই বলে অস্বীকার করাও আজ সম্ভব নয়। ইতিহাসের সন্ধিমুহূর্তে আমরা বাস করছি; বিপ্লব সংসাধনে যথাসাধ্য অংশগ্রহণেই আমাদের জীবনের সার্থকতা।

মহাভারতে গল্প আছে যে পুণ্যবতী গান্ধারীকে যখন অনুরোধ করা হয় যে তাঁর শতপুত্রের যুদ্ধে জয় হোক বলে তিনি আশীর্বাদ করুন, তাঁর বাক্যের কখনো অন্যথা হবে না, তখন তিনি নিজেরই গর্ভজাত পুত্রদের জয়কামনা করতে অস্বীকৃত হয়ে বলেন— 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'— সত্যই জয়ী হবে, মিথ্যা কখনো জয়ী হবে না। মার্ক্‌স্‌বাদী তেমনই জানে যে সত্য বলে, বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, সর্বদা বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত বলে, মার্ক্‌স্‌বাদ জয়ী হবে-ই। মার্ক্‌স্‌বাদকে সত্য জেনে, বুঝে যদি আমরা অগ্রসর হতে পারি তো আমাদের বিজয় নিবারণ করতে পারে এমন কোনো শক্তি কোথাও নেই। জয় অবশ্য সহজে আসবে না, সস্তায় কিস্তিমাৎ করে কখনো ইতিহাসের চেহারা বদলানো যায় না, আমাদেরই এক মহাপুরুষের কথায় বলা যায় যে চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না, বিপ্লব তো দূরের কথা। সে জয়ের জন্য প্রয়োজন যে নিষ্ঠা, যে সংকল্প, যে অনলস অভিযান তাই আজ সূচিত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে দুনিয়াজোড়া মেহনতী জনতার জাগরণে। তাই আজ সর্বদেশের সাধারণ মানুষ সগর্বে বলতে পারে বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ স্টালিনের ভাষায় যে, ইতিহাসের বিধানকে কখনো কামান দাগার আইন পরাভূত করতে পারে না। তাই আজ সর্বদেশের কমিউনিস্ট নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে বর্তমানের বিড়ম্বনা যতই কঠোর মনে হোক না কেন, শ্রেণী সমাজের কলঙ্ককালিমাকে লুপ্ত করে প্রভাতে অরুণোদয়ের মতোই একান্ত সুনিশ্চিতভাবে নূতন সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটবে, অদৃষ্টের অনুগ্রহ হিসাবে নয় মানুষেরই সংহত প্রচেষ্টার ফলে।

চক্ষুষা কাণঃ

উৎসর্গ

স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতা যাঁকে অভিমানভরে
ত্রিশবৎসরাধিক কাল প্রবাসী করে রেখেছে,
অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কিছুকাল বাংলার
অধ্যাপক ছিলেন,
সাহিত্যবিষয়ে যাঁর গবেষণা বিদ্বজ্জনের প্রকৃত সমাদর পেয়েছে,
সেই ঋজুচিত্ত, স্নেহশীল, জ্ঞানব্রতী
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ-এর
করকমলে

ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে লেখা আমার কতকগুলো প্রবন্ধ এখানে একত্রে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে তাদের পুনঃপ্রকাশকে আমি দুঃসাহস বলেই মনে করি। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে এর জন্য আমার চেয়ে বেশি দায়ী হলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে। সাহিত্যবিচারে প্রযোজ্য মানদণ্ড একেবারে নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার না করে বোধ হয় সুহৃদোচিত দাক্ষিণ্যবশে তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ দিয়েছেন। সে-উৎসাহের সুযোগ গ্রহণের লোভ সংবরণে যদি আমি অসমর্থ হয়ে থাকি তো আশা করি ক্ষমার্হ হব।

বাংলাদেশে আমি অপরিচিত বলে সত্যের অপলাপ করব না, কিন্তু আমার পরিচিতি প্রধানত রাজনীতিকে অবলম্বন করে আছে বললে ভুল হবে না। কিন্তু রাজনীতির শুষ্ক ক্ষেত্রে একটা অস্বস্তিবোধের ভার থেকে নিস্তার কখনো আমি পাই নি। অন্য পরিবেশে সম্ভবত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আমার ব্রত ও বৃত্তি হত। যাই হোক, আমার ধনুকে অনেকগুলো দড়ি থেকেছে বলে লক্ষ হয়তো কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়েছে, মনের যে প্রশান্তি বিনা ঐকান্তিক একাগ্রতা সম্ভব হয় না তা আমার ভাগ্যে মেলে নি, আর এরই ফলে বিক্ষিপ্তচিত্ততার লক্ষণ এ-সংকলনে ছড়িয়ে রয়েছে।

ছেলেবেলায় যদি দেখা যায় যে চারদিকে বই আর কাগজের গাদা, যদি তখনই মোটামুটি কাছ থেকে দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় মিলতে থাকে, যদি খবরের কাগজ যারা চালায় (লেখা থেকে ছাপা পর্যন্ত) তাদের সঙ্গে মেলামেশা ঘটে, যদি সাহিত্য যাদের নেশা তাদের কথাবার্তা শোনা অভ্যস্ত হয়ে যায়, তো মনের গড়ন এক ধরনের হওয়া প্রায় অনিবার্য। তখন মনের দরজায় এসে ধাক্কা দেয় নানান ব্যাপারে আগ্রহ, তখন কথা থেকে গান আর গান থেকে ছবি আর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ভাবনা কখনো হালকা আর কখনো ভারী হয়ে মনে বাসা বানায়, তখন স্বাদেশিকতার মায়াজালে সানন্দে বন্দী হয়েও তার আনুষঙ্গিক এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রায়-অনিবার্য ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা সহজে সম্ভব হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বিপদ ঘটে এই, যে সমসাময়িক জীবনের বিপুল ব্যাপ্তিকে আয়ত্ত করার সাধ বাড়তে থাকে কিন্তু সাধ্য থাকে না।

মার্ক্‌স্‌বাদের মুক্ত বোধি দিয়ে সকল বিক্ষিপ্তির নিরসন ও স্থিতপ্রজ্ঞার প্রচেষ্টা স্বল্প শক্তি নিয়ে করেছিলাম। কিন্তু যে নিষ্ঠা, যে নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন ছিল, তা আয়ত্ত হয় নি। 'নাল্পে সুখমস্তি'— তাই সুখ আমার মেলে নি। কিন্তু যে-সুখের কথা আমি বলছি তা অতি দুর্লভ, তার স্বাদ পাওয়া যায় বহু সুকৃতির গুণে, যে সুকৃতির দাবি আমার নেই।

সাহিত্যব্যাপারে বাঙালির একটা দুর্বলতা আছে, তাই সাহিত্যের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে বহুজনেরই রয়েছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় উনিশ-শো বছর আগে মহাকবি অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় ''বুদ্ধচরিত'' ও ''সৌন্দরনন্দ কাব্য'' লিখেছিলেন। তখনো পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম ও নীতি প্রধানত প্রচারিত হয়েছিল সাধারণবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় মাধ্যমে। কিন্তু অশ্বঘোষ তাঁর ''সৌন্দর-

নন্দকাব্য''-এর শেষ দিকে বলেছেন যে বহুজনের কাছে সত্যধর্মকে মোহনীয় রূপে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি কাব্যরীতি অবলম্বন করেছিলেন। তার সঙ্গে আধুনিক বাংলার রাজনীতিকদের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু আমার মনে পড়ছে এক প্রখ্যাত লেখকের কথা যে বাংলায় যারা রাজনীতি করে তাদেরও মনে আশা থেকে যায় যে সাহিত্যেব এলাকায় একটু জায়গা যেন তারা পায়।

আমি জোর করে বলতে পারি যে আমার আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যযশ নয়। আকাঙ্ক্ষা একটা আমার আছে, আর তা হল এই যে চিন্তার কাপট্য এবং অনুভূতির অপরিণতি থেকে মুক্তির জন্য যে আমরা সচেতন প্রয়াস করি— এই দুস্তর প্রয়াসে অংশীদারী করার চেয়ে বড়ো কোনো কাজ আমি দেখি না। আর যে বিষয় নিয়েই আলোচনা করি না কেন, তা খেলাই হোক আর কাব্যবিচারই হোক, সে-আলোচনা যেন আমি ঐ-প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। আমি জানি এ কথা বলার পর বিশেষ করে এ সংকলনে আমার অক্ষমতার পরিচয় বার বার মিলবে, কিন্তু তাতে অন্তত প্রয়াসের স্বকীয় মহিমা ক্ষুণ্ণ হবে না।

মনীষী বলে যাঁরা স্বীকৃত, তাঁদের বক্তব্যে হয়তো অচেতন আত্মপ্রবঞ্চনা লক্ষ করে শুধু মানসিক নয়, যেন দৈহিক আঘাতও আমি অনেক সময় অনুভব করেছি। এ দেশের মনীষীদের সঙ্গে পরিচয় স্বভাবত বেশি বলে তাঁদেরই কথা বেশি জানি। কিন্তু আমার বক্তব্য আরো প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ব্যাপারও আমাকে বিচলিত করে, হয়তো অযথা— কিন্তু বাস্তবিকই বিচলিত করেছে। যখন দেখি বাঙালি বিদ্বানেরা ''প্যারী'' বা ''রেনেসাঁ'' লেখেন কিংবা পাস্কালের ''পেন্‌সীজ''-এর উল্লেখ করেন, তখন অকারণে বিদেশি কথার উচ্চারণ জানি বলে তাঁদের অহমিকা সন্দেহ করি, আর ক্রুদ্ধ না হয়েও একান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি। আমার মনোবিকলনে পাঠকের আগ্রহ প্রত্যাশা করি না, তাই এ-আলোচনায় ক্ষান্ত হব। কিন্তু হয়তো যা বলছি তা জানা থাকলে সংকলনের প্রবন্ধগুলোর মূলগত অভিপ্রায় বোঝা সহজ হবে।

একবার আমার মায়ের চোখ থেকে জল পড়তে দেখেছিলাম— একেবারে মুক্তোর মতো ঝরঝর করে কয়েক ফোঁটা পড়ল। আর আজো আমি তা ভুলতে পারি নি, কখনো পারব না। ছবি, কথার সুর, গানের রেশ, পাথরে খোদাই-করা মায়া আর অরণ্যদাহের মতো সর্বজয়ী মানবীয় অনুভূতি— এ তো অসত্য নয়, আর নয় বলেই বাঁচতে পারি, গ্লানির কর্দমে শ্বাসরুদ্ধ হয়েও বাঁচতে পারি, বাঁচাতে চাইতে পারি।

শক্তি থাকলে সাহিত্যসৃষ্টি করতাম, কিন্তু শক্তি নেই, তাই কতকটা উপরোধে, আর কতকটা নিজেরই তাগিদে মাঝে মাঝে লিখে এসেছি। এ-সংকলন মারফৎ সে-লেখা যদি কারো কাজে লাগে তো সুখী হব।

যাঁকে এ-বই উৎসর্গ করছি, তিনি সহজে সুখী হন না, তবে প্রসন্ন তিনি যে হবেন তা আমি জানি। তাঁর কাছে আমার অনেক ঋণ, যা পরিশোধ করা আমার সাধ্য নয়।

"চক্ষুষা কাণ

"চোখ" কথাটার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় কতগুলো আছে তা জোর করে বলার সাহস নেই, কিন্তু চোখ চেয়ে দেখার অভ্যাস আমরা বোধ হয় গত কয়েক শ বছর ধরে হারিয়ে আসছি। অকারণে নিজের দেশের নিন্দা করতে চাই না, কিন্তু যখন অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টির কথা শুনি, যখন প্রেমের কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার বাহুল্যে পীড়িত হই, তখন মনে হয়, জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকরকে উন্মীলিত চক্ষে প্রণাম করে নিত্যকর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি যে দেশে যুগ ধরে প্রবর্তিত থেকেছে, সে দেশের এ দুর্দশা হল কেমন করে?

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত জনপ্রিয় এক নাটকের অন্তর্ভূত বহু-আবৃত্তি-বিড়ম্বিত কয়েকটি পঙ্ক্তির কথা মনে পড়ছে। "কী বিচিত্র এই দেশ" বলে সেকেন্দর শাহের ভূমিকায় নটযশঃপ্রার্থীদের বহুবিদ ভঙ্গিমা হয়তো অনেকের স্মরণে আসবে। কিন্তু প্রকৃতই আমাদের এই সুবিস্তৃত মাতৃভূমির অনন্তপার বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব যেন আমাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। শিক্ষিত মনের মধ্যে কী অনপনেয় সংকীর্ণতা যে প্রবেশ করে রয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সম্প্রতি এদেশের বহু সজ্জন বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে আসার সুযোগ পেয়েছেন। গত দু'বছরের মধ্যে মস্কো থেকে পিকিং আব পূর্ব ইউরোপের অর্ধপরিচিত অঞ্চলের নবরূপ পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির হয় নি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চক্ষুষ্মান যে ছিলেন না তা বলব না— বলা অন্যায় হবে। কিন্তু হয়তো একথা বললে অপরাধ হবে না যে অধিকাংশের পক্ষে মস্কো বা পিকিং যাওয়া কিংবা মানিলা ও লিস্‌বন্ যাওয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ প্রভেদ লক্ষ করা যায় নি। যে দেশে মানুষ অযুতবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিগড়কে চূর্ণ করে নূতন জীবনের সন্ধান পেয়ে বিচিত্র-বীর্যরূপে দেখা দিয়েছে, সেখানকার বৃত্তান্তের মধ্যে ভোজনপ্রাচুর্য ও আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা বিনা অন্য বিবরণ যেন একান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

ইয়োরোপে, বিশেষত ইংল্যান্ডে, ভারতবাসীর সংখ্যা নগণ্য নয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছাত্র, হৃদয়-মনের সংবেদনশীলতা যে বয়সে প্রখর, সে বয়সে তাঁরা ইয়োরোপে থেকেছেন। তবুও মুক্ত জীবনের ব্যাপ্তি ও মাধুর্যের যে আস্বাদ আধুনিক যুগের সর্বাগ্রগণ্য মহাদেশে সহজলভ্য, তা থেকে আমরা যেন বঞ্চিত থেকেছি। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন আমরা জেনেও জানি না, ইয়োরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যেন তেমনই অস্পষ্ট ও অসার্থক থেকে গিয়েছে। তাই ইয়োরোপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনায় পর্যন্ত ফাঁক এবং ফাঁকি লক্ষ করে লজ্জিত হতে হয়। এ যে কী অসহনীয় বিড়ম্বনা, তা কথায় বোঝানো অসম্ভব।

যে দেশে একদা চৌষট্টি কলার প্রচলন ছিল, যে দেশে পর্বতগাত্রকে মানুষ বস্তুনিষ্ঠ শিল্পদক্ষতায় রূপায়িত করেছে, যে দেশে বিশ্বকর্মা শ্রমিকের আদর্শ ও উপাস্য হয়ে এসেছে, সেদেশে কেমন করে এ দুর্গতি ঘটল তা আজ অনুশীলনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা গাছের নাম জানি না, ফুলের নাম জানি না, পাখির নাম জানি না; না জানার

দুঃখও আমরা বড় একটা রাখি না। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরিতাপ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তবুও শান্তিনিকেতনের পশুপক্ষী সম্বন্ধেও কেউ পড়বার মতো কিছু লিখেছেন বলে জানি না, যে কাঠবিড়ালীগুলো দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত থেকে খাবার নিয়ে যেত, তাদের জীবনযাত্রা পর্যন্ত কেউ পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না।

মানুষেরই খোঁজ আমরা রাখি না তখন আর "অন্যে পরে কা কথা।" প্রধানমন্ত্রী মশায়ের কাছে শুনি আসামের আদিবাসী অঞ্চলে কাজ করতে পারে এবং চায় এমন কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া শক্ত, সেখানকাব ভাষা আর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের যেন অপার ঔদাসীন্য। ভারতের ভাষাগত বৃত্তান্ত সংকলন করে বিদেশি, অবশ্য আমাদের অনিচ্ছুক সাহায্য নিয়ে— কিন্তু আমাদের যেন সে বিষয়ে আগ্রহ নেই। "জ্ঞাতুম্ ইচ্ছ"— জিজ্ঞাসা— যেন আমাদের মন থেকে মুছে গিয়েছে, স্বদেশবাসী সম্বন্ধে কৌতূহলও তাই আমাদের অত্যন্ত স্বল্প।

এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা থাকলেই আজ আমরা দেশকে জানতে পারতাম। আর দেশকে না জানলে যে বদলাতে পারা যায় না, মার্ক্‌স্‌বাদের এই চূড়ান্ত শিক্ষাকে আয়ত্ত করে কর্মের পথে অগ্রসর হতে পারতাম। কিন্তু আমরা দেশকে জানি না, জানি না বলে বিশেষ যে দুঃখিত তাও নই, বাকচাতুরির উপরই তাই আমরা এখনো প্রধানত নির্ভর করে থাকছি। ফলাফল যে মর্মান্তিক হতে পারে, এই সহজ বোধও যেন আমাদের নেই।

পশ্চিম বাংলার যিনি বর্তমান রাজ্যপাল, [ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়] তাঁর কাছে বহুদিন পূর্বে শুনেছিলাম নির্মম দারিদ্র্যের কথা। তিনি বলেছিলেন যে অন্ধ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে কিছুকাল বহুজনকে আহারের জন্যে ফসল-কেটে নিয়ে-যাওয়া ক্ষেতে ইঁদুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে মাটি খুঁটে গলাধঃকরণ করার মতো কিছু শস্যকণা সংগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়। রয়ালসিমা প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্যের চিরসাথী হয়ে রয়েছে। সেখানকার এবং তুলনীয় বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন বৃত্তান্ত কোথায় পাওয়া যায় জানি না।

সেদিন একজন বন্ধুর কাছে শুনছিলাম হিমাচল প্রদেশের ক্ষুদ্র, নিভৃত নগর চম্বার কথা। পরিপূর্ণ বিশ্রামের যদি প্রয়োজন হয় তো যাওয়া যায় চম্বায়। সেখানে আছে ছোট্ট নদী, আছে ঝরনার ছড়াছড়ি, আছে পাহাড়, আছে দূরাবস্থিত তুষারশৃঙ্গের হাতছানি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, যার নিত্য গ্লানি নারীর অপরূপ দেহসৌন্দর্যকেও ম্লান করে রেখেছে। সেখানে আছে সমাজ ও অর্থনীতিতে নিয়তির মতো কঠোর শোষণব্যবস্থা, আর আছে শৈলখণ্ডপিষ্ট দুর্বাদলের মতো লোক-সংস্কৃতির মৃত্যুঞ্জয় প্রকাশ। চম্বায় কিন্তু আমরা যাই না, আর গেলে শুধু চাই নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম, কিন্তু সেখানে যায় মার্কিন পর্যবেক্ষকের দল, ক্যামেরা কাঁধে ফেলে সারা এলাকার ছবি তারা তুলে নিয়ে যায় নিজেদের স্বার্থে, আর নিজেদের স্বার্থেই স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাতে চেষ্টা করে।

অন্ধ্রপ্রদেশগঠন সম্বন্ধে আইন হয়েছে, অনতিবিলম্বে সেখানে স্বতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠার কথা। অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানির্ধারণ নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে, যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় বেলারী শহরের সমস্যা। তেলুগুভাষী অন্ধ্র এবং কন্নড়ভাষী কর্নাটকী এই শহরের উপর দখল দাবি করেছে। কিন্তু দেখা গেল যে বেলারী শহরে আছে তিনটি সম্প্রদায়— তেলুগুভাষী অন্ধ্র, কন্নড়ভাষী কর্নাটকী এবং হিন্দুস্তানীভাষী মুসলমান, আর এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে শেষোক্তই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ তেলুগু জানে কেউ কেউ কন্নড় ভাষা জানে;

তারা সবাই দো-ভাষী; কিন্তু তাদের মাতৃভাষা তেলুগু নয়, কন্নড় নয়, তাদের মাতৃভাষা ফরাসি হরফে লেখা হিন্দুস্তানী। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা যায় এরা কারা, কবে এরা বেলারী ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে। আর মুসলমান বলেই কি এরা উর্দুভাষী, না অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে? প্রশ্নের অন্ত নেই, কিন্তু কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রশ্নই কেউ বড় একটা এ সব ব্যাপারে করছে না, "জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা" প্রায় কারো নেই।

কেন এমন ঘটবে? দক্ষিণ ভারতের মুসলমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ কি সকলেই উত্তর ভারত থেকে গিয়েছিল? অন্ধ্রপ্রদেশের মুসলমান শিশু মায়ের কোলে শুয়ে কোন্ ভাষা শেখে— তেলুগু না উর্দু? যদি উর্দুতেই তার প্রথম বাক্স্ফোটনা ঘটে, তো অন্ধ্রের জাতীয় গণ্ডী থেকে সে কি বহির্ভূত? কে এ ধরনের প্রশ্ন করে অকারণ নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করবে?

স্টালিন একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন হলে দেখা যাবে যে কয়েকশত ভাষাভাষী তখন স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইবে। এ কথার তাৎপর্য কি আমরা খোঁজ করে বোঝার চেষ্টা করেছি? ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য আন্দোলন করছি বলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় কি?

নূতন চীন তার প্রাচীন সভ্যতার বহু অনাবিষ্কৃত নিদর্শন সাম্প্রতিক প্রযত্নের ফলে খুঁজে পেয়েছে। আমরা জগন্নাথ মন্দিরে যাই জাগ্রত বিগ্রহকে তুষ্ট করে নিজের সদ্গতিকে নিশ্চিত করার চেষ্টায়, কিন্তু কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি না থাকলে আমাদের খুব কম লোকই কোনারকের পরিত্যক্ত সূর্যমন্দিরের মহিমার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। চন্দ্রভাগা নদীর সাগরসঙ্গম যেখানে ঘটছে, তার কাছে কালাতিপাতের কল্পনাও আমরা করি না। পক্ষীতীর্থে পুণ্যার্থী সংখ্যার শেষ নেই, কিন্তু মহাবলিপুরমে যায় অতি স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি আর তাদের মধ্যে বিদেশির অনুপাত কম নয়। আমরা হিমালয়লঙ্ঘনের জন্য ব্যাকুল নই, তিস্তার বহুবর্ণ তটভূমির সন্ধানে যাই না, সমুদ্রের আহ্বান আমাদের কানে প্রবেশ করে না, অন্তর্দৃষ্টির অহিফেন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে মুদিত করে রেখেছে।

সেদিন পূর্ববাংলার একজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে কথা হল। শুনলাম তাঁর জন্মস্থান আজ ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলে যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ। জানতে চাইলাম এ বঞ্চনার বেদনা কত গভীর, কত দুঃসহ। তিনি হেসে জবাব দিলেন যে বহুকাল কলকাতায় কাটিয়ে দেশের মায়াকেও প্রায় কাটিয়ে উঠেছেন। অবাক হয়ে গেলাম, মনে পড়ল নিতম্বমাধুর্যের মতো চন্দ্রালোকিত পদ্মাতরঙ্গের অবিস্মরণীয়তা, মনে পড়ল (আমার "In city pent" মনে) দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির স্নিগ্ধ শোভা, যার কোনো মূল্যই যেন এই প্রখ্যাত পূর্ববঙ্গবাসী আজ পাকিস্তান-বিরোধিতার বশ হয়ে, দিতে অস্বীকৃত হচ্ছেন।

তত্ত্ব নিয়ে আমরা গত কয়েকশ' বছর ব্যস্ত থেকেছি, কিন্তু তথ্যকে বাদ দিলে তত্ত্বের প্রাণ যে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা আমরা ভুলে গিয়েছি। শুধু চিন্তার জোরে মানুষ প্রকৃতির কোনো বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে না, জ্ঞান তখনই প্রকৃত জ্ঞান যখন তা হয় শক্তি, নব নব উন্মেষসাধনের অধিকারী। সেই জ্ঞানের প্রকরণ চোখ বুঁজে ধ্যান নয়, চোখ খুলে দেখা এবং বোঝা। কিন্তু চোখ বুঁজে ধ্যান সম্বন্ধে এখনো আমাদের এত মোহ কেন?

আমরা ক্লান্ত, ভারত সভ্যতার প্রাচীনত্ব আমাদের অবসন্ন করে রেখেছে, সংসারপ্রপঞ্চ আমাদের মনকে বৈরাগ্যের পথে যেন উদ্যত করে রেখেছে, দ্বিধাবিভক্ত চৈতন্য আমাদের জাড্যের পথে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মধ্যে প্রাণশক্তির যে প্রকাশ আছে,

তাকে অস্বীকার করবে কে? ভারতবর্ষের কৃতিত্বের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠার যে নিদর্শন আছে, তাকে অস্বীকার করবে কে? ভারতবর্ষের ইতিহাসে কর্মবিগর্হিত চিন্তার যে বারবার সর্বাঙ্গীণ অবনতি এনেছে তা অস্বীকার করবে কে?

অন্ধ্রদেশে বিতর্ক চলছে, নন্দিকোণ্ডা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে নাগার্জুনকোণ্ডার বহুবিধ প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যায়— সুতরাং কিং কর্তব্যম্? নন্দিকোণ্ডা পরিকল্পনাকে এখনই কাজে লাগাতে হবে, সুতরাং নাগার্জুনাচার্যের সভ্যতার নিদর্শন চুলোয় যাক— এই হল অনেকের মত। আর কেউ কেউ বলছেন যে কিছুতেই নাগার্জুনকোণ্ডার ধ্বংস করা যাবে না, আমরা বহুকাল ধরে দুঃখ পাচ্ছি, না হয় আরও কিছুকাল কষ্ট পেয়ে চলি, পরিকল্পনা পিছিয়ে যাক কিংবা বদলানো হোক। খুব কম লোকই বলছে যে আজকের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য নন্দিকোণ্ডা পরিকল্পনাও চলুক সঙ্গে সঙ্গে নাগার্জুনকোণ্ডাকেও বাঁচিয়ে রাখা হোক, এটা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক কৌশলের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়।

জাতি হিসাবে জন্মান্ধ আমরা নই, শুধু কয়েকশ' বছরের বিড়ম্বনা আমাদের চোখ বুজে সহজ স্বস্তির সন্ধানে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে স্বস্তির দাম যে অতি অল্প, তা বোধ হয় আমরা বুঝছি। তাই অন্ধতা বর্জন করে দীপ্ত, দৃপ্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের এসেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আর জগতের বর্তমান বিকাশের দিকে লক্ষ রাখলে জানব যে চোখ খুলে দেশের মানুষকে চিনে জেনে, তবেই আমরা এগোতে পারব। তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয়জাত যে জ্ঞান তারই অঞ্জনশলাকা দ্বারা আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হোক, সর্বব্যাপী রৌদ্রের মতো আমাদের শক্তি সর্বত্র সঞ্চারিত হোক, পুরাতন ভারতবর্ষে নূতন জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক।

আধুনিক বাংলা কবিতা

এ সংকলনের সার্থকতা সম্বন্ধে হয়তো প্রশ্ন উঠবে, আর বিশেষ করে প্রশ্ন তুলবেন তাঁরা, যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতাকে কবিতা বলে মানতেই রাজি নন। যে ধরনের কবিতা কিছুকাল থেকে লেখা হচ্ছে আর যার পরিচয় দেওয়াই এ সংকলনের উদ্দেশ্য, তাকে বিদ্রূপ করবার লোকের অভাব এদেশে নেই। এমনও হয়তো অনেকে আছেন, যাঁরা অধিকাংশ আধুনিক কবির লেখাকে বেয়াড়া মনের বেয়াদবি মনে করে থাকেন, আর ভাবেন যে এই কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাবার নেশা বেশি দিন টিকতে পারে না। আর আমাদের এই মান্ধাতাগন্ধী দেশে নতুন কিছু দেখলেই অনেকে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, ত্রিকালদর্শী ঋষিদের কৃপায় সমাজ ব্যবস্থার রজ্জুতে আমাদের সমাজ-চৈতন্যকে সংকীর্ণতম পরিধির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে বর্তমান যুগের অস্থির, অশান্ত, পথান্বেষী সমাজের ছায়া সাহিত্যে দেখলে অভিশাপ তাঁদের জিহ্বাগ্রে এসে পড়ে। কাব্যের স্বাধিকার প্রত্যার্পণের জন্য রবীন্দ্রনাথ যখন প্রচলিত প্রথার অন্ধকূপ থেকে তাকে আলোকে টেনে আনছিলেন— তখন তাঁকে অর্বাচীন অপোগণ্ড বলে যাঁরা উপহাস করেছিলেন, অপমান করেছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। দুরূহতার

দোহাই দিয়ে বা নিছক নিন্দাবাদের জোরে তাঁরাই আজকের কবিতা দেখে নাসিকাকুঞ্চন করছেন, সহজ তাচ্ছিল্যের সরস ব্যাখ্যান দিয়ে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করছেন। অবশ্য আধুনিক কবিতাকে আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া করলে নানান দফায় অভিযোগ পেশ করা চলে। কিন্তু কাব্যবিচারের কানুনে জবরদস্তি ভাগ যে অনেকটা কম, তা ভুললে চলে না, আর আধুনিক কবিতাব বহু অপকর্ম সত্ত্বেও যুগাবর্তের উৎকণ্ঠিত লক্ষণ এবং কাব্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলেই এ সংকলনের সার্থকতা রয়েছে।

বাংলার কবিকাহিনী নিয়ে বাঙালির আত্মপ্রসন্ন অহঙ্কার সমীচীন কিনা সে আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথের অমিত প্রতিভা আজো অপরিম্লান; তিনি শুধু জ্যেষ্ঠ নন, তিনি শ্রেষ্ঠ, তাই বিনয়রহিত কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, স্বসৃষ্ট ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে দুঃসাহসীরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল, তাদেরই দলে যোগ দিতে সঙ্কোচ করেন নি। রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে অল্পবিস্তর যাঁরা মুক্ত হয়েছেন বা হতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই লেখা থেকে এ সঙ্কলন, অথচ এখানে সর্বাগ্রে পাওয়া যাবে সর্বাগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তির প্রয়াস মাত্রই যে শ্রদ্ধেয়, তার কোনো অর্থ নেই। আর সে-প্রভাবকে সম্পূর্ণ বর্জন করার চেষ্টা হচ্ছে হাস্যকর ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ সকল বাঙালির সম্পত্তি; রবীন্দ্রনাথ পড়ি নি বা ভুলে গেছি বলে বড়াই করা হয় অনৃতবাদন, নয় দুঃশীলতা। যে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিমিত, সে-ঐতিহ্যের সঙ্গে অপরিচয় হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক। কিন্তু আজ একথাও স্বীকার না করে চলে না যে সে-ঐতিহ্যের ছত্রচ্ছায়ায় কাব্যরচনায় এখন বিড়ম্বনা ঘটছে, যে বৃহৎ বাধাহীন লীলাজগতে নানা আস্বাদনে নিজেকে উপলব্ধি করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টি করতে পেরেছেন, সে-জগতের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আর আকাশ থেকে ধরণী পর্যন্ত সৌন্দর্যের যে প্লাবন, তার মধ্যে কোনো জবরদস্ত পাহারাওয়ালার তকমার চিহ্ন রবীন্দ্রনাথ আগে দেখেন নি, কিন্তু আজ সে তকমা যেন দৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে পড়েছে। তাই গত বিশ বছরের কবিতায় এত গ্লানি, এত জিজ্ঞাসা; তাই লীলাসঙ্গিনীর কঙ্কণঝঙ্কার অলীক পূর্বস্মৃতি মাত্র হয়ে পড়েছে; তাই গানের ধুয়োর মতো নানা দেশের কবির লেখায় নানা ছদ্মবেশে এলিয়েটের প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে;

> "... Please, will you
> Give us a light?
> Light
> Light." (Triumphal March)

তাই আলোর সন্ধানে বেরিয়ে বাঙালী কবিরাও দেখছেন যে "অগ্রজের অটল বিশ্বাস" না ফেরাতে পারলে কিংবা অনুরূপ কোনো চিন্তাধারাকে মনের পটভূমিকাতে বসাতে না পারা গেলে কবিতার ভবিষ্যৎ নেই। প্রকৃত সাহিত্যকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" মনে করার মতো তুরীয় ভাব আধুনিক কবির পক্ষে সম্ভব নয়। "যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ, শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ, ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন"— বলে যে পরম রূপদক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রেরণা আর তাকে স্পর্শ করে না। তা ছাড়া পশ্চিমের যে সংস্কৃতিব প্রতিফলিত ভাতি দেখে আমরা মুগ্ধ, যা অনুকরণ ও আমাদের সমাজে সাহিত্যে সংযোজনের জন্য আমরা ব্যস্ত, সেই সংস্কৃতি এখন

ব্যাধিগ্রস্ত। যে মহাযুদ্ধ সভ্যতার সমাধি হবে বলে বহুবার শোনা গেছিল, সে যুদ্ধ আজ হাজির হয়ে গেছে। বর্বরদের হাতে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর অবশ্য কয়েকজন পুরোহিত প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাংশকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এ যুদ্ধের পরও হয়তো সে রকম কিছু ঘটতে পারে; কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ না থাকলে তার প্রাণশক্তি লুপ্ত হতে বাধ্য। সে যোগ ছিল না বলেই নাৎসিরা জার্মান সাহিত্যিকদের উপর অবলীলাক্রমে নির্যাতন করতে পেরেছিল, "নিছক আর্টিস্ট"-এর বোরখাও তাঁদের বাঁচাতে পারে নি। সমসাময়িক ইতিহাসকে অবজ্ঞা করে নিজেদের মুক্ত পুরুষ ভেবে আত্মতুষ্টি নিয়ে আর কতদিন চলবে— এ প্রশ্ন তাই কবিরাও তুলতে শুরু করেছেন। অস্থির, অশান্ত, জিজ্ঞাসু জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লে রূপসৃষ্টিও যে প্রাণহীন হবে, তা তাঁরা বুঝছেন।

All the poet can do to day is to warn
That is why the true poet must be truthful.

ওয়েনের এ-কথা তাঁদের কানে আর এখন অর্থহীন ঠেকতে পারে না। বর্তমানকে বর্জন করলে, যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করলে একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাচীনের মহিমা পুনঃপ্রচার করা আর নিজেকেই জ্ঞাতসারে মায়ামুগ্ধ করা—

Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and dryer than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still. (Ash Wednesday.)

এলিয়ট আমাদের অতীতজ অনুভূতির উপর মোহজাল বিস্তার করতে পারেন বটে, কিন্তু আমাদের মনকে ভোলাতে পারেন না যে তাঁর সাম্প্রতিক পলায়নীবৃত্তি সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় রূপায়িত হলেও সমাপ্তপ্রায় যুগেরই প্রকাশ, ভোলাতে পারেন না যে বর্তমান সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি নানা ঐতিহাসিক কারণে শিথিল হয়ে আসার প্রধান সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর কবিতা।

পশ্চিম থেকে বহু সম্ভার এনে মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজো পশ্চিম থেকে আমদানি চলেছে— আমাদের কাছে তা ভালো লাগুক বা না লাগুক। তাই দেখি বাঙালি কবি উনিশ শতকের বিখ্যাত খেয়ালীদের "ঐশী অতৃপ্তি"-র নামকরণে আত্মগ্লানি ছাড়া কথা খুঁজে পান না। আধুনিক কবি বৈদগ্ধ্যের ভক্ত, প্রেরণা বলতে তিনি বোঝেন পরিশ্রমের পুরস্কার, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "বিশ্বের যে আদিম উর্বরতার কল্যাণে গাছ একদিন বাড়ার আনন্দেই আকাশের দিকে হাত বাড়াত, সে উর্বরতা আজ আর নেই, সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু আর জন্মায় না।" আধুনিক কবিতার দুরূহতার পশ্চিমী প্রতিরূপ রয়েছে, আর পশ্চিমেরই মতো তার আবহাওয়াতে আছে শূন্যতার, অবসাদের ভাব— সবই যেন অনিশ্চিত, সবই নিরর্থক, আশা আর ছলনায় প্রভেদ নেই, উদ্যম— অহমিকারই রূপান্তর। আধুনিক কবিতায় আছে একদিকে ছন্দের যন্ত্রকৌশল বর্জন, অন্যদিকে ছন্দের বৈচিত্র্য নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা। তাছাড়া আছে সাম্যবাদের ধুয়ো— ভালো-মন্দ-মাঝারি গলায় আধুনিক কবিরা বিপ্লবের আগমনী গেয়েছেন।

এ পশ্চিমী প্রভাব অনেকের মনোমত নয়, কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় এ প্রভাব যে স্বাভাবিক, তা অকাট্য, আর এ প্রভাব গৃহীত হয়েছে এই কারণে যে সকল দেশের কবি আজ স্বীকার করছেন, হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করছেন, যে শিল্প ও সাহিত্যকে অভেদ্য বেড়ো দিয়ে জীবন থেকে নিঃসম্পর্কিত করে রাখা আর চলছে না। অবশ্য ভালেরির মতো শ্রদ্ধেয় কবি বলেছেন যে, ইতিহাসের বালাই মন থেকে মুছে ফেলে নিজেদের "ivory tower" থেকে রূপসৃষ্টিই একমাত্র উপায়। কিন্তু এ কথার মধ্যে যেন একটা অস্বস্তির স্বীকৃতি রয়েছে যে ইতিহাস নিয়ে খেলা চলে না, আর কবিশেখরের নির্জন দুর্গও "আকাশস্থ বায়ুভূতো নিরালম্ব নিরাশ্রয়ঃ" কিছু হতে পারে না। কবিজীবনের প্রথম দিকে কবি য়েটস্ বলেছিলেন—

Come away, O human Child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world's more full of weeping than
You can understand.

শেষ জীবনে "The Herne's Egg" -এ আবার তিনি বাস্তবস্পর্শশূন্য উদ্ভট কল্পনার চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু এ দুই পর্যায়ের মধ্যে নিজের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে তিনি বস্তুজগত আর কল্পজগতের ব্যবধান দূর করার চেষ্টায় ছিলেন, আর সেই চেষ্টা তাঁকে অনবদ্য কবিতা লিখিয়েছিল। Parnassian, Symbolist, Naturalist— সকলেই চেয়েছিল আর্টিস্টের স্বয়ম্বশ স্বাতন্ত্র্য, চেয়েছিল কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনের মালিন্য ও অশুদ্ধি থেকে সরিয়ে অধিষ্ঠিত করতে এক সুরম্য শূন্যদেশে যেখানে বাস্তবতা একেবারেই অস্পৃশ্য। কিন্তু যাকে রেণাঁ বহুদিন আগে বলেছিলেন ছায়ার ছায়া আর খালি শিশির উবে যাওয়া গন্ধ, তা নিয়ে আত্মরতি যে অসহ্য, তার সাক্ষ্য আমাদের কবিরা দিচ্ছেন। কিন্তু এ আবিষ্কার আবিষ্কারমাত্র থেকে গেছে বলে সুধীন্দ্রনাথের মতো নিঃসন্দিগ্ধ কবিও অনুভব করছেন যে তাঁর পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারে না। তিনি শুধু দেখছেন যে সভ্যতার স্টীম রোলার যেন চিরকালের কীর্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙে চুরে দানবীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে, আর দুঃসাহসী কবি রয়েছেন সৌন্দর্যের দরজা আগলে। "তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হলেও সে আমাদের নমস্য" (স্বগত)। কবির বিবেককে তুষ্ট করতে হলে যদি এই সিদ্ধান্তে নোঙর ফেলতে হয় তা হলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, বর্তমান বিশ্বের সংক্রামক ব্যাধির তাড়নায় মন অনড় হয়ে পড়ে, চাঞ্চল্য পরিণত হয় শুধু নিষ্ফল ক্ষোভে, সে ক্ষোভকে জ্বলন্ত খড়্গের মতো ব্যবহার করবার স্পৃহা পর্যন্ত জাগ্রত হয় না, প্রলয়ের কোলাহল ছাপিয়ে নতুন যুগের নবসৃষ্টির পদধ্বনির বদলে শুনতে হয় কবির নিজের হতাশ ক্ষীণ বাণী, বলতে হয়—

মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব, সখা,
বেদনা, শুধুই বেদনা সূচীর সাথী। (অর্কেস্ট্রা)

যুগধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে এলিয়েট আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন এক বাতাহত শৈলের ছায়ায়, "rock" এর ওপর বীজ পড়লে সূর্যরশ্মিও তাকে প্রাণ দিতে পারে না জেনেও ক্যাথলিক চার্চকে বরণ করেছেন, তাই কবিতার কাছে প্রায় বিদায় নিতে গিয়েও তিনি বলতে পেরেছেন—

Consequently. I rejoice having to construct something
Upon which to rejoice

সুধীন্দ্রনাথ যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারে নি, বিশ্বাসবলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাঁর মনঃপূত নয়, সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই তাঁর কাছে—

মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

"Heartbreak House" তাঁর আবাস— "This strangely happy house, this agonising house, this house without foundations"— আর মৃত্যুর সুরে তাঁর কবিতা অনুরণিত— সে মৃত্যু যেন মড্ বডকিনের ভাষায় "death without moral, legal and social implications"! সমাজস্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানের যাঁর অভাব নেই, সেই ছন্দস্বচ্ছন্দ, সংস্কৃতিসমৃদ্ধ কবি কি এভাবে নিজেকে ব্যাহত করেই চলবেন?

আজ যাঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি তাঁদের লেখার পিছনে নানা সুরে নানা ভঙ্গিতে, নেতিবাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যেও রয়েছে হপকিনসের প্রার্থনা— "mine —O thou lord of life, send my roots rain!" এলিয়টের The Waste Land -এর ধুয়াও হচ্ছে তাই। আর সেই সঙ্গে রয়েছে ওয়েনের যুদ্ধক্ষত মনের বেদনা—

Was it for this the clay grew tall?
—O what made fatuous sunbeams toil
To break earth's sleep at all?

আধুনিক কবিতা যে দুরূহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তার প্রধান কারণ আধুনিক মনের অপ্রকৃতিস্থ জটিলতা। কিন্তু কবি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন যে পাঠক আসবেন সহানুভূতি নিয়ে, বৈরিতার লগুড় নিয়ে নয়। আর যে প্রাক্তন কবিতার মহত্ত্ব এখন অনস্বীকার্য, তা যে সর্বদা সহজে বোধগম্য তা একেবারেই নয়। ধ্বনিমাধুর্য— শুধু শব্দার্থ নয়, শব্দের আবেগও সমাবেশ— কাব্যরূপের অপরিহার্য অঙ্গ বলে হয়তো কোলরিজের কথায় অনেকটা সত্য আছে— "poetry gives most pleasure when only generally and not perfectly understood." আজকের কবিতার প্রসঙ্গ প্রায়ই বিভ্রান্ত বলে তার রূপেও যে প্রসঙ্গের প্রতিফলন পড়বে, তা স্বাভাবিক।

সকলে মিলে যখন গান করেছে, নৃত্য করেছে, উৎসব করেছে, তখনই কবিতার সৃষ্টি— প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নয়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে, "the cadence of consenting feet"-এর মধ্য দিয়ে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ সে সহযোগিতার প্রতিকূল। উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হয়েছে নির্লজ্জ স্বার্থের সম্বন্ধ। তাই কবি ক্রমে সমাজজীবন থেকে সরে গেছেন, স্কাইলার্ক বা নাইটিংগেল সেজে গোপন গহ্বর থেকে গান গেয়েছেন, আর বোধহয় শুধু কাব্যের ঐতিহ্য ভুলতে না পেরে নিজেদের "unacknowledged legislators" আখ্যা দিয়েছেন—স্মরণ করেন নি যে জীবননিরপেক্ষ সজ্জাই তাঁদের legislation-কে "unacknowledged" অবস্থায় রেখেছে। ভিক্টোরিয় যুগে কবি-জীবন থেকে সাময়িক অবসর গ্রহণ করে "the meditative lucidity of a waking dream" -এ আশ্রয় খুঁজছেন। আজ আর কবির সে আশ্রয়ও নেই, ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত পৃথিবীতে

থেকে নিরালায় ভজন পূজন সাধন আরাধনা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই কবিদের বক্তব্য হয়েছে অরাজক. কামনার অনল নির্বাপিতপ্রায় হয়েছে, আর ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁরা বিষ্ণু দে-র মতো কবিতার সূক্ষ্মাংশকে অনবদ্য করার চেষ্টায় লেগেছেন. প্রত্যেক রন্ধ্রপূরণ করেছেন কবিতার অষ্টধাতু দিয়ে। অর্থঘনত্বের প্রয়াস আর সংযমের আতিশয্য বিষ্ণু দে-র কবিতার বিশেষ লক্ষ করা যায়; সে প্রয়াসে তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভও করেছেন। কিন্তু আজকের ক্রুর পৃথিবীতে মনীষা ও প্রজ্ঞার যোগ্যস্থানের অভাব দেখে আত্মসমাহিতিক্লান্ত মন বিচলিত বলে তাঁর কবিতা যেন জীবনকে খণ্ড, ক্ষুদ্র করে দেখছে, তাঁর ব্যঙ্গোক্তি পর্যন্ত যেন তিক্ততাকেও মোহনীয় করতে চায়, সমাজব্যাধি উন্মূল করা সম্বন্ধে মনস্থির করে নি। এলিয়ট পাউন্ডের তিনি ভক্ত, কিন্তু তাঁর স্মরণ রাখা উচিত যে পাণ্ডিত্য কবিতাকে গুরুত্ব দেয়, মহত্ত্ব দিতে পারে কিনা সন্দেহ। তবে এ আশা হয়তো সমীচীন যে "ঘোড়সওয়ার" ও "পদধ্বনি"র লেখক একক অতৃপ্তির দৃষ্টিকোণ ছেড়ে আসছেন। সম্প্রতি যে অবিকল্প ভঙ্গি ও প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় দেখা দিয়েছে তাতে ভরসা হয় যে মাত্র কয়েকজনের জন্য ইঙ্গিতবহুল ভাষা বর্জন করতে তাঁর কবিবিবেক আর বাধা দেবে না।

সাম্যবাদী কবিতা আজকাল বাংলাদেশে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন, কিন্তু তাঁরা যদি সকলেই কবি না হন, তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁরা "যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদিঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন", সেই প্রবর্তনায় যে কবিতা লিখতে পারবেন না, এমন কথা কেউ জোর গলায় বললে অন্যায় করবেন। সমাজতত্ত্বজ্ঞান সরেস না হলে কবির কবিতাও যে নিরেস হবে এমন কথা কেউ বলছে না; বুদ্ধিমান মার্ক্স্‌পন্থী না হলে যে কেউ কবি হতে পারে না, তা বলার মানে বুদ্ধিভ্রংশ; মার্ক্স্‌পন্থা যে কাব্যরাজ্যেরও পাসপোর্ট, তাও বলা হচ্ছে না। কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরানো রাস্তায় সংস্কৃতিবিকাশের আশা নেই বুঝলে— যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কর্মিষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে—

যব্ গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিদুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি।

—হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যনাভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকলমজুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা, কবিক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়। অবশ্য "Mine be the dirt and the dross, the dust and the scum of the earth." বলে পতিতের বন্দনা প্রচার করলেই সাম্যবাদী কবিতা লেখা হবে, তা আশা করাই অন্যায়। কারো হুকুমে রাতারাতি প্রলেটেরিয়ন আর্ট এদেশে দেখা দেবে ভাবা হচ্ছে বাতুলতা। ঐতিহ্যের শক্তি যেখানে বেশি, সেইখানে কাব্যরূপান্তরে বিলম্ব ঘটতে বাধ্য। তাই Proletcult আন্দোলনকে লেনিন বলেছিলেন "bunk" আর ১৯২৫ সালে রুশদেশের সাম্যবাদী দল প্রস্তাব করেছিল : The party must fight against all thoughtless and contemptuous treatment of the old cultural heritage as well as of literary specialists... It must also fight against a purely hot-house proletarian

literature." সাম্যবাদী আন্দোলন যতই এদেশে দৃঢ়মূল হবে, ততই দেখা যাবে যে কবিদের অভিজ্ঞতা প্রেমের প্রয়াস আর দখিন হাওয়া আর অসামাজিক ব্যবহারের মধ্যে কবিতার মালমশলা সংগ্রহ করার ব্যর্থ চেষ্টাকে অতিক্রম করবে।

সার আর্থার কুইলার-কুচ্ একবার হিসেব করে বলেছিলেন যে গত শতাব্দীর প্রধান ইংরেজ কবিরা প্রায় সকলেই ধনীবংশে জন্মেছিলেন; একমাত্র কীট্‌সের অবস্থা খুব ভালো ছিল না। মহৎ লেখকের যে পরিবেশ প্রয়োজন, তা সাধারণ ইংরেজের অনধিগম্য; আড়াই হাজার বছর আগের এথীনিয়ন ক্রীতদাসের এ বিষয়ে যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, উনিশ শতকের ইংরেজেরও তার বেশি ছিল না। আজো নেই। আমাদের দেশের কবিরা যে ঐ দিক থেকে এখানকার বহুগুণ অপকৃষ্ট অবস্থার কথা ভাববেন না, তা অসম্ভব। বর্তমান সমাজের মেরুদণ্ডহীনতা আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিড়ম্বনা দেখে কবিরা বিচলিত বলেই তাঁরা দেশের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহিত্যের আশা খুঁজে পাবেন, এ কথা মনে করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। এ কথাকে যদি কেউ সাহিত্যের অপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলে উপহাস করেন, তো উপায় নেই।

আধুনিক বাংলা কবিতায় এক এক সময় দেখা যায় যে কবির সমাজচৈতন্য বেড়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে কিন্তু ভাষায় ও ভাবের ঐতিহ্য অনস্বীকার্য বলে কবিতায় স্পষ্টতা নেই, কঠোরতা আছে। এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও জ্ঞান হচ্ছে শক্তি, আর সমাজবোধের স্বচ্ছন্দে বহন করার ভাষাকে কবিরাই তৈরি করবেন। জীবনের নূতন পর্যায়ের সঙ্গে প্রাক্তন প্রকাশভঙ্গির মিলন তখনই সম্ভব হবে যখন কবিচিত্তে সমাজবোধ অনুভূতির স্তরে উপনীত হবে। তাই এখনো ভাববিলাসী ধারায় ভালো কবিতা লেখা অসম্ভব নয়। এখনো রবীন্দ্রনাথ যখন হঠাৎ দেখে ফেলেন যে সৌন্দর্যের কল্পরাজ্যে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরানীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই, তখন মনে হয় যে শুধু ভাষায় নয় ভাবেও আর্ষপ্রয়োগের অধিকার তাঁর আছে। তাই বুদ্ধদেব বসুর গদ্য প্রবন্ধে আত্মজিজ্ঞাসা প্রকট হলেও তিনি (এবং পাঠক সমাজে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কয়েকজন কবিও) এখনো এমন আত্মঅচেতন খেয়ালী কবিতা লিখতে পারছেন, যাকে সমাজবদ্ধ আধুনিক মনও অস্বীকার করতে পারে না।

নিষ্কপট ভাববিলাসকে অশ্রদ্ধেয় বলার লোভ সংবরণই করা উচিত, আর স্বভাবজ ভাববিলাসের দ্রুত বিপর্যয়ের ফলে ভূরি ভূরি সাম্যবাদী রূপক ব্যবহারের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যও অহেতুক। কিন্তু সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সাম্যবাদী কবি হিসাবে যাঁদের পরিচিতি, তাঁদের কবিযশ এখনই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা যেন প্রতি সাম্যবাদীর প্রতিপাদ্য— অনুশাসন কবিতার ক্ষেত্রে অচল মনে না করেন। সমর সেনের কাছে অভিযোগ করলে অন্যায় হবে না যে তাঁর লেখায় এক এক সময় সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুর বেজে ওঠে, আর তাঁর অনুরাগীদের মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি প্রায় আড়চোখে আর্তসমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহুজনের ব্যক্তিগত বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্যরচনা করছেন, মার্ক্‌স্ পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য। ('অকর্তব্য' কথাটিতে তিনি অন্তত গুরুমশায়ী সুর পেয়ে বিরক্ত হবেন না আশা করি)। পুরানো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ার আগে সে পৃথিবীকে গণশক্তিবলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি তাঁর বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় যেন পাওয়া যায় না। বিপ্লবী মনোভাবকে আত্মস্থ না করাতে তাঁদের কবিক্ষমতা কি ত্রিশঙ্কুরাজ্যেরই প্রতিভূ হয়ে থাকবে? সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার নানাগুণ সত্ত্বেও দেখা যায়

যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে-সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অরুণ মিত্রের ''লাল ইস্তাহারের'' ক্ষুদ্র পরিধিতে যে অবৈকল্য আছে, তার সন্ধান ঐ দুই কৃতী কবির লেখাতেও দুর্লভ।

আধুনিক বাঙালি কবিরা যদি সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, জগতের মৌলিক পরিস্থিতির বহু পর্যায় থেকে অনুভূতি সংগ্রহ করে কবিলিপিতে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলেই তাঁদের চেষ্টা সার্থক হবে। বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জন যে তাঁদের উদ্দেশ্য হতে পারে না, তা তাঁরা বুঝেছেন। কিন্তু এ যুগের অগ্রগতির ও উৎকর্ষের সব পথ আপাতদৃষ্টিতে বন্ধ মনে হয় বলে এ পরিস্থিতির অসহনীয়তা মাত্র নিয়ে কাব্যসৃষ্টিতে যদি তাঁরা তুষ্ট হন তো তা একরকম আত্মঘাতই হবে।

অনেকে হয়তো ভাবেন যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকের অনধিকার প্রবেশকে বরদাস্ত করা উচিত নয়, বিশেষত যখন আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হলেও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ নিয়ে যে সমস্যা তার সমাধান হবে না, সে সমস্যা সনাতন, অচঞ্চল, অভেদ্য। কিন্তু আসলে মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের চেয়ে বিজ্ঞান তাড়াতাড়ি বদল করে দিচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক। অবশ্য ফ্রয়েড্ যাকে বলেছেন ''সভ্যতার বোঝা'', তা সর্বযুগেই মানুষকে বহন করতে হয়েছে; সাম্যবাদ এলে সে-বোঝা যে এখনই সরে যাবে, তা মনে করা ঠিক হবে না। কিন্তু সে-বোঝা আজ অসহ্য বলেই, নতুন সমাজের কথা কবিকে ভাবতে হয়েছে। তাই কবির কাছে আহ্বান যাচ্ছে আর্টকে ব্যবহার করতে অস্ত্ররূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত। কবি বুঝেছেন যে বিপ্লব যখন আগত বা আসন্ন, তখন আর্টের চেহারা বদলাবে। সে চেহারা হয়তো মনোরম নয়। কিন্তু সামাজিক সমস্যার নির্বন্ধ লঘু না হওয়া পর্যন্ত কবিতার নতুন মূর্তি আমাদের কাছে প্রকট হবে না। আধুনিক কবিতার অসমান কৃতিত্ব আর সংশয়ী অতৃপ্তি দেখে নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই : "All is well; it must be worse before it is better."

আধুনিক বাংলা কবিতার এই সঙ্কলন আমরা দুজনে মিলে করেছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু পার্থক্য আছে বলে সস্তা বাহাদুরীর অভিযোগ অসম্ভব নয় জেনেও আমরা আলাদা ভূমিকা লিখেছি।

কয়েকজন খ্যাতনামা কবিকে আমরা বাদ দিয়েছি; তাঁদের লেখায় আধুনিক ভাব বা ভঙ্গির সন্ধান পাই নি বলে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা যে অবজ্ঞেয় নয়, আর অন্তত কয়েকজন নিঃসন্দিগ্ধ কবি যে আসন্ন সমাজবিপ্লবের কথা ভেবে কবি ও নাগরিকের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান দূর করার দুস্তর প্রয়াসে লেগেছেন, আশা করি এ সংকলনে তার পরিচয় মিলবে; কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা আর অন্ধ বাউলের অন্ধদৃষ্টিতে মুগ্ধ এই দেশে সাহিত্য যে গ্রাম্যতা ও কৃত্রিমতার উভয় সংকটকে বর্জন করতে অক্ষম হবে না, সে ভরসার কিছু হেতুও পাওয়া যাবে।

লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকগণকে এই গ্রন্থে কবিতামুদ্রণের অনুমতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে বাংলা কবিতা কয়েক দশক ধরে প্রকৃত পরিণতির স্তরে উপনীত হয়েছে। সেই পরিণতিকে নব নব উন্মেষে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে একজন অগ্রণী। তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা" যে সংকলিত হয়েছে, এটা আমাদের সাহিত্যে একটা রীতিমতো ঘটনা।

বাং সাহিত্যের আদিযুগে যখন কবিতার আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তাতে ছিল এদেশের মাটির স্নিগ্ধ স্বাদ— যে স্বাদের তারিফ বহুকাল পরে এমার্সন করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে। তারপর বৈষ্ণব কবিদের রচনায় গূঢ়ার্থবাদকে অনায়াসে ভেদ করে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কবিতাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করল। মুকুন্দরাম, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র পর্যন্ত দেশজ আবেগ ও সহজ বুদ্ধির সুঠাম ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু যে ঔজ্জ্বল্য ছিল নগরসভ্যতার আনুষঙ্গিক ও সুশোভন সজ্জা, তখনো তার লক্ষণ দুর্লভ। পাশ্চাত্য শক্তির ধাক্কায় আমাদের জীবনে যে নতুন ব্যাঘাত এসে হাজির হল তার দ্বিমুখ প্রকোপে সাহিত্যে এল অজ্ঞাতপূর্ব বিচলিতি যার ইঙ্গিত ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা এমনকি দাশু রায়েও লক্ষ করা যায়। প্রভূত প্রতিভার সম্ভাবনা অথচ প্রকৃত প্রতিভার অভাবের ভার বইতে হয়েছিল বলে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় থেকে গেল একপ্রকার বঞ্চনা। নতুন জীবন অগ্রাহ্য আর প্রাচীন জীবন ছিন্নমূল— এই উভয়সংকটে পড়ে বাঙালির প্রাণান্ত হল। সাহিত্যে যেন একটা ছেদ পড়ে গেল— পথের নিশানা প্রাচীনপন্থীরা দেখতে পারলেন না, কিন্তু নবীনপন্থীদের অভ্যুদয় তখনো হয় নি।

বিলিতী মদের নেশার মতো ইংরেজ প্রভাব কিছুকাল শিক্ষিত বাঙালির মাথায় চড়ে গিয়েছিল। তার পুরো ঝোঁক যখন কাটল, তখন এক ধরনের স্থৈর্য তাদের মনে আসে। এই স্থৈর্য কিন্তু ছিল অনিশ্চিত— কথাটা হেঁয়ালি, কিন্তু তা স্পষ্ট হবে যদি আমরা মনে রাখি যে মাইকেল মধুসূদনের মতো যাঁর প্রতিভা ছিল বিরাট তাঁকে এই টানাপোড়েনে ভুগতে হল সবচেয়ে বেশি। নিজের সত্যপথ তিনি নির্মাণ করতে পারলেন না, কিন্তু করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ত্রুটি তাঁর হয় নি। আর সেই প্রচেষ্টারই ব্যপদেশে বাংলাকাব্যে তিনি আনলেন বিপুল বদল। তাঁর আগে প্রায় সব বাঙালি কবি নিজেদের "মেটে ঘরে শ্রীবৃন্দাবন" কল্পনা করেই শ্রীহরির আগমনে রোমাঞ্চিত হতেন, কিন্তু মাইকেল প্রথম সেই "মেটে ঘর" বর্জন করে বিদগ্ধ রাজকীয়তাকে বাংলাকাব্যে আসন দিলেন, গতানুগতিকতা পরিহার করে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ আর তার দশানন জনকের অনস্বীকার্য মহিমায় মুগ্ধ হলেন, কৃষ্ণের লীলা যে বৃন্দাবনের চেয়ে দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে অনেক বেশি, তারই আভাস দিলেন। বাংলা কবিতায় এল ভাস্বর, উদাত্ত তেজ— মমতার সিঞ্চনেও তার দার্ঢ্য খণ্ডিত হল না।

তার পর এলেন রবীন্দ্রনাথ, দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তাঁর অজর লেখনীর কিরণ বিচ্ছুরিত হল—প্রাচীন ও অর্বাচীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সর্ববিধ রসভাণ্ড থেকে মধু আহরণ করে গৌড়জনকে তিনি পরিবেশন করলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা— সর্বোপরি তাঁরই বর্ণাঢ্য পক্ষবিস্তারে বাংলা রচনার সুবিচিত্র সৌন্দর্য সূচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণভার এতই বিপুল যে তাকে আমরা দান বলেই আত্মসাৎ করেছি, ঋণ পরিশোধের দম্ভ রাখি নি। কিন্তু রূপাঞ্জনশলাকা দিয়ে আমাদের মনশ্চক্ষুকে উন্মীলিত করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের গুরু, তেমনি আবার অমিত প্রতিভার ছটায় মোহাবিষ্ট করেছিলেন বলে মোহভঙ্গেরও আমাদের প্রয়োজন ছিল। একদা তাই রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ বর্জনের ব্যগ্রতা নিয়ে যে কথঞ্চিৎ অবিমৃষ্যকারী প্রচেষ্টা হয়েছিল আমাদের কাব্যক্ষেত্রে তা একেবারেই অসার্থক হয় নি। মনীষীশ্রেষ্ঠ কার্ল্ মার্ক্স, একবার বলেছিলেন : Thank God I am no Marxist! শিষ্যদের গরুড়সুলভ ভজনপ্রবৃত্তি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরও মনে অনুরূপ বিরক্তি সঞ্চার করেছিল। যথার্থ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর অপরিমেয় অবদান সম্বন্ধে সজাগ থেকেই স্বতন্ত্র পথে বাঙলা কবিতাকে প্রবাহিত করার কামনা অপরাধ নয় বরঞ্চ কর্তব্য বলেই প্রকৃত লেখকের মনে হওয়া অনিবার্য।

কিন্তু "স্বতন্ত্র" বলতে সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গির কল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁদের ব্যর্থতা ঘটেছে নিতান্ত সঙ্গত কারণেই। ইতিহাসবোধ যদি না থাকে তো তার মূল্য কবিকেও দিতে হয়। বায়ুভূত ও সুরভিত নৈঃসঙ্গ সত্য নয়, সার্থকও হতে পারে না। বাংলার কবিকাহিনী যে পরম্পরা সৃষ্টি করেছে, যে পরম্পরাকে রবীন্দ্রনাথ ষড়ৈশ্বর্যে ভূষিত করেছেন, তাকে অস্বীকার করার চেয়ে সাহিত্যিক প্রত্যবায় আর নেই।

দীর্ঘ হলেও এ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ বহু সতীর্থের তুলনায় এই পরম্পরা সম্বন্ধে সমধিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণু দে-র কবিচেতনাকে সমুজ্জ্বল করেছে, আর তাঁর কবিতা এই পরম্পরাকে পশ্চাৎপটরূপে রেখেই বিচার করা চাই। ইতিহাসবোধের দিক থেকে কোনো লেখকেরই চেয়ে তিনি ন্যূন নন। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য বিষয়ে তাঁর অনুশীলন ব্যাপক ও গভীর। ইংরেজি এবং কিয়ৎপরিমাণে ফরাসি কবিতার আস্বাদ তাঁর কাছে শুধু সুপরিচিত নয় অন্তরঙ্গ। তাঁর সম্বন্ধে বাংলা কবিতার পাঠকদের তাই প্রত্যাশা প্রচুর।

প্রত্যাশাকে তিনি অপরিতুষ্ট রেখেছেন কেউ বলবে না। মনের যে আপাতমধুর তরলতাকে আমরা সহজে অভ্যর্থনা করে এসেছি তার পরিবর্তে ভাবঘনত্ব কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি অনেকের কাছে দুর্নাম পেয়েও প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আবেগকে প্রকাশ করতে হলে তাকে স্বচ্ছ প্রস্রবণ বা চকিত বিস্ফোরণের আকার দেওয়া কবিযশঃপ্রার্থীদের পক্ষে দুরূহ নয়। কিন্তু গভীর কথা বলতে গেলে যে গভীর সুরেরই প্রয়োজন আর সঙ্গীততরঙ্গের মধ্যে শ্রুতের চেয়ে অশ্রুতের মহিমা ও মাধুর্য যে কম নয়, এই বোধ সহজ জনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ করে বাংলা কবিতায় সঞ্চার করার কাজে রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষ্ণু দে-র অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ইংরেজি কবিতায় অশান্ত জিজ্ঞাসার যে অর্ধনিগূঢ় বাতাবরণ দেখা দিয়েছিল, তাকে বাংলা কবিতার বাচনপদ্ধতির মধ্যে রূপায়িত করার প্রায় একক সাফল্য বিষ্ণু দে-র। সমসাময়িক ঘটনার সত্য মূল্যকে কাব্যরীতির সঙ্গে সুসমঞ্জস রেখে প্রকাশ করার বিশিষ্ট ও মোহন ভঙ্গি তিনি অর্জন করেছেন। লেখনী তাঁর অক্লান্ত; কোনো কোনো শক্তিমান কবি ঝোড়ো হাওয়ায় বালিতে-মুখ-গোঁজা উটপাখির মতো মাঝে মাঝে কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে পরাজয় স্বীকার করেন নি। মহৎ কবির বহুগুণ সম্বলিত হয়ে তিনি কাব্যক্ষেত্রে বিরাজ করছেন; তাঁর কাছে কাব্যামোদীজনের ঋণ প্রভূত।

কারো শ্রেষ্ঠ কবিতা সঞ্চয়ন সম্পর্কে পাঠকদের মতদ্বৈধ অনিবার্য, কিন্তু কবি যখন স্বয়ং সঞ্চয়নের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত নন, তখন আপত্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। বিংশ বর্ষ ধরে যে সম্ভারের তিনি স্রষ্টা, তার পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট।

কিন্তু একথাও বলতে সংকুচিত নই যে প্রতিভার যে দ্যুতি তাঁর রচনায় বহুদিন থেকে লক্ষ করা গিয়েছে, তার অখণ্ড বিকাশে যেন কোথাও বাধা পড়েছে। এজন্য হয়তো কবিকে ততটা দায়ী করা ঠিক নয় যতটা দায়ী হল আমাদের বর্তমান জীবনব্যবস্থা। যেখানে সামাজিক পরিবেশ বহু ভিন্নধর্মী ধারার অস্বস্তিকর সহ-অবস্থানের ফলে জটিলতা ও নৈরাশ্যব্যঞ্জনায় দূষিত হয়ে রয়েছে, সেখানে কবির সংবেদনশীল মনে জর্জরতার পরিমাণ এত অধিক হওয়া প্রায় অনিবার্য যে মুক্তকণ্ঠে স্বচ্ছচিত্তে যুগবাণীকে কাব্যরূপ দেওয়ার চেয়ে সুকঠিন কর্ম কিছু নেই।

যে সাহিত্যে কবিতার ঐতিহ্য স্বল্প ও শৈলীর বিকাশ নগণ্য, সেখানে বরং কৃতী কবির পথ সুগম, কিন্তু বাঙালি কবির সৌভাগ্য (ও দুর্ভাগ্য) হল এই যে আমাদের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য— সার্থক রচনা সেখানে দাবি করে প্রগাঢ় অনুভূতির এমন ব্যঞ্জনা যা বাক্‌বহুল নয়, যা অতি উচ্চ বা অতি অনুচ্চ তারে বাঁধা নয়, যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন পুনরুক্তিদুষ্ট নয়, যা মূলগতভাবে সর্বজনবোধ্য বলেই রুচি ও মূল্যজ্ঞানকে বিকৃত করার সম্ভাবনা রাখে না, যা সমসাময়িক বাঙালি মনের প্রকৃত কিন্তু হয়তো অচেতন স্বপ্নকেই প্রকাশ করে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কাব্যরস সম্ভোগকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলে কল্পনা করেছিলেন; তার চেয়ে বড়ো দাবি তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাদের আধুনিক দাবির সংজ্ঞা ও আধেয় অন্য হলেও মূলত অভিন্ন। সে-দাবি পূরণ করতে এখনো আমাদের কবিকুল অপারগ। বিষ্ণু দে-কেও এই অসামর্থ্যের দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সাম্প্রতিক বাঙালি কবিদের মধ্যে যাঁদের কাছে প্রত্যাশা ছিল বেশি, তাঁরা অল্পাধিক হতাশই করে আসছেন। মনে হয় যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বুঝি স্বেচ্ছায় আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনিচ্ছায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন, আর ফেলে যে অন্তর্দাহে পীড়িত হচ্ছেন তার লক্ষণও দেখাচ্ছেন না। অবাধ্য নিয়তি সুকান্তকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাই উচ্চৈঃস্বরে যা সে বলতে চেয়েছিল, সে কথাকেই অবিকল কাব্যের চিত্তজয়ী ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার অবসর পর্যন্ত তার মিলল না। প্রথম থেকেই সর্বজন হতে অনপনেয় পার্থক্যবোধ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে যেন প্রকৃত কাব্যসিদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে। একদাখ্যাত বুদ্ধদেব বসু অপরিণতির জালে উর্ণনাভবৃত্তিতে সজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। গুণগ্রাহিতার অভাবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সুরপ্রধান কবিশক্তির স্ফুরণে অবিরাম প্রতিবন্ধক ঘটেছে। গণচেতনার প্রতিভূত্ব দাবি করে কয়েকজন কৃতী কবি দেখা দিয়েছেন বটে, মধ্যে মধ্যে মুগ্ধও হয়তো করেছেন, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠে জাদু নেই, বাক্যচ্ছটায় সংযমের মহিমা নেই, পর্যবেক্ষণে গভীরতা নেই বলে অনুভূতির মধ্যে বঞ্চনা ও বিকৃতি প্রতীয়মান হয়।

বিষ্ণু দে সম্বন্ধেও বলব যে তাঁর ক্রমান্বিত রচনাগৌরব আমার কাছে শ্রদ্ধেয় হলেও তাঁরই নিজের একান্ত অন্বিষ্ট সিদ্ধির নিঃসংকোচ লক্ষণ দেখি না বলে আমি ক্লিষ্ট।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তিনি "ঘোড়সওয়ার"-এর মতো কবিতা লিখেছেন। "উর্বশী ও আর্টেমিস্" তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ; পরিচ্ছন্ন হাত, মার্জিত মন আর ঈষৎ পুলকিত আত্মশ্লাঘা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অচিরে "চোরাবালি" বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নিঃসন্দিগ্ধ

প্রতিভার আবির্ভাব সূচিত করল। তারপর ''পূর্বলেখ'' ও ''সাত ভাই চম্পা'' থেকে ''নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'' পর্যন্ত তাঁর অশ্রান্ত পরিক্রমা চলেছে— নিদিধ্যাসনগুণে কবি যেন প্রাক্তন দ্বিধাবিভক্তিকে অতিক্রম করেছেন!

স্বপ্নে আজ চেতন অবচেতন
যুক্তপাণি, মনে জীবনে দ্বন্দ্ব
রক্তে তবু নীল গোলাপ বন।
স্বপ্ন আর মানে না কারাবন্ধ
বাগানে আর বাদায় বোনে ক্রান্তি
ত্রিকালে নাচে মুহূর্তের ছন্দ
মুঠিতে বাঁধে ঝঞ্ঝাময় শান্তি।

(''অম্বিষ্ট'' পৃ. ৪৫)

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা বাংলা সাহিত্যে সৌম্য, সৎ, সচেতন গভীরতার অতি ক্ষীণ ধারাকে পুষ্ট করেছে, সন্দেহ নেই। বহু পাঠক অবশ্য অনুযোগ করবেন স্নিগ্ধতার অভাব সম্বন্ধে; কিন্তু বাঙালী রচনায় স্নিগ্ধতা প্রায়শই কাল হয়েছে। বহুতর অভিযোগ আসবে যে তাঁর রচনা-শৈলী স্বচ্ছ নয়, কিন্তু যে স্বচ্ছতা সুপ্রচুর আয়াসসাধ্য নয় তা অন্তত বাংলার কবিকুলের পক্ষে বর্জনীয়— অনায়াস কল্পনার রোমন্থনে আমাদের কাব্য কলঙ্কিত না হলেও ভারাক্রান্ত।

কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে এমন হ্রদ দুরধিগম্য নয় যার জল গভীর অথচ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, পাতাল পর্যন্ত তার মৃদু তরঙ্গায়িত মধুরিমা সর্বজনের দৃষ্টি ও মানসের গোচর। কবিতা যখন সিদ্ধির সেই শৃঙ্গে আরোহণ করে, তখন গভীরতা ও স্বচ্ছতা পরস্পরের অনুষঙ্গ নিয়ে থাকে। সে কৃতিত্ব দুষ্কর ও দুর্লভ; তার উদাহরণ একান্ত অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বল্প। এখনো বিষ্ণু দে-র রচনায় তার আবির্ভাব ঘটে নি। এখনো তাঁর কণ্ঠ স্বকীয় অনুভূতির গর্বেই যেন কথঞ্চিৎ স্তিমিত: এখনো তাঁর মুখ থেকে 'শৃন্বন্তু বিশ্বে'-র অমিত শ্লাঘা নিয়ে চলমান জীবনের মর্মবাণী নিঃসৃত হওয়ার লক্ষণ নেই; এখনো যেন তাঁর বিচরণপথে আছে শঙ্কা; এখনো পর্যন্ত অখণ্ড অনুভূতির অজর আনন্দ তাঁর লেখনী বিকিরণ করতে পারে নি।

কবি হিসাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেই আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হয় নি। অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু তিনি ছিলেন বিচিত্রবীর্য, আর তাঁর অবদানের পরিমাণ ও গুণ মিলে এক অপরূপ সম্ভারের সৃষ্টি করেছে। তাঁরই উত্তরসাধকরূপে যাঁরা আজ লিখছেন, তাঁদের সম্বন্ধে প্রত্যাশা উর্ধ্বমুখী হওয়া অনুচিত নয়। কিন্তু যে-প্রত্যাশার সংকেত ইতিপূর্বে দিয়েছি, তার পরিতুষ্টি বহু ভাগ্য বিনা সম্ভব নয়। আমাদের সে-ভাগ্য হবে কি না, এ-প্রশ্নের উত্তর না খোঁজাই বোধ হয় শ্রেয়।

অত্যন্ত সভয়ে একটি কথা বলে শেষ করব। ভারতবর্ষের বিদগ্ধ চিন্তায় নিরাসক্তির ঐতিহ্য এতই দীর্ঘ ও দৃঢ় যে তার ফলেই বোধ হয় আমাদের কবিতার স্বকীয় মাহাত্ম্যে কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের স্থান গরীয়ান বটে, কিন্তু চীনে কয়েক সহস্র বৎসর ধরে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে পরম-আসক্তি জাত যে কবিতা লেখা হয়েছে তার তুলনা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নেই। ইয়োরোপের কবিকুলের কাছে তাই চীনা কবিতা মহামূল্য কিন্তু ভারতবর্ষের কবিতা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। অবশ্য কালিদাস-প্রমুখ মহাকবির প্রতিভা অস্বীকার করার চেয়ে বাতুলতা নেই। বেদ, উপনিষৎ, পুরাণে প্রোজ্জ্বল, স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার উদাহরণ

স্বল্প নয়। মহাভারত-রামায়ণে অগণিত শ্লোক আছে যা কবিতার অষ্টধাতুতে ভরা। কিন্তু পুষ্করিণীর জলে একটি পত্রের পতনে যে রোমাঞ্চ কবিমনকে সৃজনব্যাকুল করে তোলে, তার প্রতি কথঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য আমাদের চিন্তায় বহুকাল হতে বাসা বেঁধে এসেছে। বিশ্ববীক্ষার জন্য একান্ত অধীরতা আমাদের দেশের বিদগ্ধ মনকে জীবনের বহু সামান্য অথচ সুগভীর ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অনীহাগ্রস্ত করেছে, কবিতাকে প্রায় শুধু মনীষার সগোত্র করে রেখেছে। যারা সমসাময়িক অথচ পশ্চাৎমুখী ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে, যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজে অন্তেবাসী হয়ে থেকেছে, যারা আয়াসলব্ধ আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানবীয় অনুভূতিকেই পরমার্থ বলে মনে করেছে, প্রধানত তাদেরই কাছ থেকে আমরা পেয়েছি নিছক কবিতা। বর্তমান যুগের জটিলতা দাবি করে— কবির কাছেও দাবি করে— চিন্তার মুক্তি, অনুভূতির ঐশ্বর্য ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, যে ত্রিধারায় পুষ্ট না হলে কাব্য-মন্দাকিনীর লাবণ্যও ম্লান হয়ে যায়। আমাদের কবিজনকে এ বিষয়ে সম্যক্ সচেতন করার কাজে বিষ্ণু দে-র শ্রদ্ধেয় ভূমিকা এই সংকলনে সুস্পষ্ট। বাঙালি পাঠক এ-গ্রন্থের সমাদর করবে সন্দেহ নেই।

আমাদের ইতিহাস

হাইকোর্ট পাড়ায় একবার পরিহাস শুনেছিলাম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি" সম্বন্ধে। টেবিলের পাশে যে ক'জন বসেছিলেন তাঁরা সবাই বললেন নিশ্চয়ই, "ভাইয়ের, মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ" পদ দুটো তো অকাট্য। পার্টিশান মামলার সংখ্যা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি!"

কিন্তু পরিহাসের কথা থাক, জাতিগর্বে দিশাহারা বিপদ ও নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেই আমরা বলতে পারি, সত্য এদেশ অতুল, কত বৈভব এর সর্বত্র, কত বৈচিত্র্য এর নিসর্গ লীলায়, কত গৌরবোজ্জ্বল এর ইতিহাস।

প্রথমেই অবশ্য স্বীকার্য যে আমাদের ইতিহাসে বার বার পড়েছে কলঙ্কের ছায়া, বার বার এসেছে এমন যুগ যখন বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনার অবধি আমাদের ছিল না। আরো সর্বদা স্মরণীয় যে শ্রেণীভেদ কণ্টকিত পৃথিবীর সর্বত্র যেমন মেহনতী মানুষকে সভ্যতার পিলসুজ সাজার যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, আমাদের এদেশেও তেমনই যুগ যুগ ধরে গণদেবতার অবমাননা চলে এসেছে, ধর্মের নামে অধর্ম আমাদের জীবনকে কলুষিত করেছে, "সম্ভবামি যুগে যুগে"র আশ্বাস স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের জন্যই অভিপ্রেত থেকেছে।

কিন্তু এখনো যখন পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্যের সম্মোহন মনের উপর পড়ে, এখনো যখন প্রাচীন ভারতীয়দের রূপদক্ষতায় গুহাভ্যন্তর পর্যন্ত উদ্ভাসিত দেখতে পাই, এখনো যখন দক্ষিণ ভারতের ধ্যানগম্ভীর ভূধরশ্রেণী হতে সংগৃহীত প্রস্তরের পুনর্জন্ম অভ্রচূড় মন্দিরের আকৃতিতে দেখা যায়, এখনো যখন কোণারকের অপরূপ মন্দির প্রাকার থেকে চন্দ্রভাগা নদীর সমুদ্রসঙ্গম দেখা যায়, এখনো যখন বুলন্দ দরওয়াজা কি মোতি মসজিদ কি হুমায়ুনের কবর কি চিতোরের জয়স্তম্ভে বহুজাতিক ভারতবর্ষের বিচিত্রবীর্য সভ্যতার পরিচয় পাই, তখন গর্বে

মন উদ্ধত না হয়ে প্রশান্তির স্পর্শে যেন প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভারত ভূমির বহুযুগব্যাপী গ্লানি তখন অপহৃত হয়ে আত্মগোপন করে।

এই ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় আজো আমাদের ঔদাসীন্য ও অকর্মণ্যতার চেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার আর কি হতে পারে? এখনো ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুশীলন ও ব্যাখ্যা বিষয়ে বিদেশির মুখাপেক্ষিতা আমরা করে চলেছি। ইতিহাস পর্যালোচনা যাঁদের বৃত্তি, তাঁরা প্রায় সকলেই গতানুগতিকতার অনুরাগী, বিদ্যার ক্ষেত্রে যে সব কায়েমী স্বার্থ-এর উদ্ভব ঘটেছে, তাদের কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়ে নিরাপদ ইতিহাস চর্চা করে দিনগত পাপক্ষয়ই যেন তাঁদের কাম্য। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্প্রতি ভারতীয় উদ্যোগে যা লিখিত বা প্রকাশিত হচ্ছে, তার কোনো গুণগত প্রভেদ নেই গতানুগতিক ইতিহাস থেকে। যে সব প্রশ্ন বিদেশি গবেষককে পর্যন্ত বিচলিত করেছে, সেগুলিও এঁদের মনকে যেন নাড়া দেয় না। বহু প্রশংসিত এক ইতিহাসে পণ্ডিত-পরিচিতি-সম্পন্ন ভারতীয়ের রচনা থেকে দেখা যায় যে মৌর্য যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিপুল কৃতিত্ব সম্বন্ধে একান্ত গতানুগতিকভাবে বলা হল যে, তার আগে এ দেশে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চর্চা ছিল না (অর্থাৎ হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মতো মৌর্যযুগে ঘটল শিল্পের একটা বিরাট আবির্ভাব) আর খুব সম্ভবত পারসীক এবং গ্রীক প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ফলেই মৌর্যযুগের শিল্পসমৃদ্ধি আমরা দেখতে পেয়েছি! এখনো যে-শিল্পসিদ্ধি ছিল প্রাচীন ভারতেই সর্বগরিষ্ঠ অবদান, সে সম্বন্ধে সার্থক কিছু জানতে হলে বিদেশিদেরই শরণ নিতে হয়। আর ভারতীয়দের মধ্যে যিনি ছিলেন এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য, সেই আনন্দ কুমারস্বামীকে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছিল বিদেশে, শিল্প-আলোচনার যে-ধারা ও তৎসম্পর্কে যে-ইতিহাসবোধ তিনি প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, তা যেন আজ এদেশে বিস্মৃত!

আমরা যারা মার্ক্স্‌বাদী বলে পরিচয় দিই, তাঁদের মধ্যে ইতিহাসের ছাত্রসংখ্যা নগণ্য নয়! মার্ক্স্‌বাদী হতে হলে ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান একান্তভাবে অপরিহার্য। অথচ আমরাই অন্য দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যতটা তৎপর, নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই ততটা নই। এটা মার্ক্স্‌বাদ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই ক্ষতিকর, সন্দেহ নেই। আমাদের এই একান্ত স্বকীয় কলঙ্ক অপনোদন কত দিনে করতে পারব জানি না, কিন্তু এ বিষয়ে যদি এখনো সচেতন না হই তবে পরে অনুতাপ করতে হবে।

গবেষণার পক্ষে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস দুরূহ, সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর না হওয়া অর্থহীন। মার্ক্স্‌বাদ এমন এক তত্ত্ব যা জীবনে সর্ববিধ প্রকাশকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। অখণ্ড জীবন বোধ বিনা প্রকৃত মার্ক্স্‌বাদী কেউ হতে পারে না। তাই যেখানে যথেষ্ট তথ্যের অভাব আছে, সেখানে মার্ক্স্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করে নিয়ে প্রতিভাদীপ্ত অনুমান নিশ্চয়ই অবান্তর নয়, অসঙ্গত নয়। কিন্তু প্রতিভাদীপ্ত অনুমানের কথা অসংকোচে বলতে হলে যে পাণ্ডিত্য ও মনের যে ব্যাপ্তি ও প্রখরতার প্রয়োজন, তার অভাবই আমাদের ম্রিয়মান করে রেখেছে। ভারতীয় মার্ক্স্‌বাদী ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে এখনো উল্লেখযোগ্য অবদান দিতে পারে নি।

অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে তথাকথিত সিন্ধু-সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের যেন এক নবরূপ আবির্ভূত হয়েছে। প্রাক-বৈদিক যুগের এই সভ্যতার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, এর বিস্তৃতি

যে কত বিপুল তার পরিচয় আমরা পেয়েছি, রাজস্থানে, পাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের মনে এ-ব্যাপারে আগ্রহের এমনই অভাব যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে একযোগে খনন কার্যের পরিকল্পনা বিষয়ে জনমতের কোনো চাপই কর্তৃপক্ষের উপর পড়ে না। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা দুই-ই আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত; কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বিভিন্ন রাষ্ট্র হলেও ভারত-ভূখণ্ডে সভ্যতার ইতিহাস অখণ্ড আর সে ইতিহাসের সন্ধানও চাই অখণ্ড উদ্যমের মধ্যস্থতায়। এ বিষয়ে কোথাও কোনো সাড়াশব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না; যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা নিরাপদ বিদ্যাচর্চায় আগ্রহান্বিত হতে পারেন, কিন্তু যে বিষয়ের উত্থাপনে রাজনীতিক সমস্যা জড়িত, সে বিষয়ে তাঁরা নীরব থাকাই সুবিবেচকের কাজ মনে করেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমাদেরও যে কর্তব্য আছে, তা আমরা বিস্মৃত হয়েছি।

বৈদিক যুগের সভ্যতার তুলনায় সিন্ধুসভ্যতা ছিল উৎকৃষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রাক-বৈদিক যুগে এ দেশে নগর ছিল, যার সমৃদ্ধির বহু পরিচয় মিলেছে, যার নাগরিক শাসনের জটিলতা ও সাফল্য বহু আধুনিকের বিস্ময় উদ্রেক করবে। বেদের ইন্দ্র হলেন "পুরন্দর", পুর ধ্বংস তিনি করেছিলেন, বেদের অরণ্য ও গ্রামভিত্তিক সভ্যতার তিনি ছিলেন হোতা, দেবগণ ছিলেন তার সশস্ত্র উদ্‌গাতা। এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা চলে ঈজিয়ন সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করে গ্রীকদের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। দুই ঘটনারই হেতু সন্ধান করলে দেখা যাবে যে প্রাচীনতর সভ্যতা নানা দিক থেকে উৎকৃষ্ট হলেও লৌহের ব্যবহার তখনো অজ্ঞাত ছিল, আর অশ্বকে যুদ্ধকার্যে প্রয়োগ করতে সেই প্রাচীনরা জানত না, অশ্ব তাদের অঞ্চলে অপরিচিত বলে। তাই যখন লৌহাস্ত্র নিয়ে এবং বেগবান, অদৃষ্টপূর্ব অশ্বসমারোহণে আক্রমণকারীরা এসে উপস্থিত হল, তখন সভ্যতাগর্বী সমাজ পরাভূত হল, যারা নিকৃষ্ট তাদের জয় হল, ইতিহাসকে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা দিয়ে চলতে হল। এমন ঘটনা জগতের ইতিহাসে বারবার হয়েছে, কিন্তু তার প্রকৃত হেতু অনুসন্ধান করলেই বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, মার্ক্‌স্‌বাদ সেখানে বিপুল সহায়ক হবে, মার্ক্‌স্‌বাদী ঐতিহাসিকের সামনে যেন সোনার খনি খুলে যাবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি বলে যে ব্যাপারের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কনে, শিল্পায়নে, চৌষট্টি কলার চর্চায়, অপরদিকে প্রকাশ হয়েছে ধর্মে, সাহিত্যে, দর্শনে। বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির সঙ্গে তৎকালীন চিন্তাধারার সম্পর্ক সন্ধানে আমরা যদি অগ্রসর না হই, তো আমাদের ইতিহাস কতকগুলো ঘটনার সমষ্টিমাত্র হয়ে থাকবে, তার সার্থক অনুশীলন ঘটবে না। লোকায়ত দর্শন কী ভাবে কর্তৃপক্ষীয়দের হাতে নিষ্পিষ্ট হয়েছে, তার জীবনীশক্তি যে কত দুর্জয়, তার বহু লক্ষণ ছড়িয়ে রয়েছে সাহিত্যে, জনসাধারণের প্রিয় কাহিনীতে, রাষ্ট্রব্যবস্থার আকস্মিক বিপর্যয়ের রহস্যের মধ্যে। এদিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট যে-ভাবে হওয়া উচিত, তা এখনো একেবারে হয় নি। লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা এ পর্যন্ত যাঁরা করেছেন, তাঁরা মার্ক্‌স্‌বাদী নন।

সহস্র সমস্যায় আমাদের ইতিহাস কণ্টকিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু এখানে অন্তত একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়— এমন একটা সমস্যা যা ঐতিহাসিকের মন মাতাতে পারে। পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) ও পাটলিপুত্র থেকে আগ্রা ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসে শহরের অভাব ছিল না। গ্রীক পর্যটক মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে দেখি যে রোমের সমৃদ্ধি যখন চরমে, তখনকার তুলনাতেও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল আয়তনে

রোমের দ্বিগুণেরও বেশি, আর পাটলিপুত্রের পৌরশাসন ছিল এত সুমার্জিত যে সেখানে জন্মমৃত্যুর হিসাবরক্ষার ব্যবস্থা করত পৌরসভা। চীনা এবং অন্যান্য বিদেশি পর্যটকের বিবরণ মারফৎ আমরা ভারতীয় নগরজীবনের চমৎকারিতার বহু পরিচয় পেয়েছি। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির-নগরের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়নগর দেখে বিদেশিরা বিমুগ্ধ হয়েছিল, তার ধ্বংস যখন ঘটে তখন সেই ধ্বংসের রূপ পর্যন্ত ছিল মনোহারী। তাম্রলিপ্তি থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বাংলাদেশে নগরের যে ঐতিহ্য, তারই পরিচয় আমরা পাই যখন পলাশীর যুদ্ধের সময়কার মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেন যে মুর্শিদাবাদ সমসাময়িক লন্ডন থেকে কোনো অংশে ন্যূন ছিল না, বরঞ্চ কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু এদেশে নগর-সভ্যতার এত দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও ইয়োরোপের মতো এখানে বুর্জোয়া (নাগরিক) শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল না কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনুসন্ধান করতেই হবে। নচেৎ আমাদের বর্তমানকেও আমরা বুঝতে পারব না।

শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি আমাদের পুরাকালে হয়েছে, শিল্পীসংঘ ও ব্যবসায়ী শ্রেণী সম্প্রদায়ের বিকাশেরও সংবাদ আমরা পেয়েছি। কিন্তু মার্ক্‌সের ভারতবিষয়ক অতুলনীয় প্রবন্ধাবলী থেকে আমরা অতি সুস্পষ্টভাবে জেনেছি যে পল্লীসমাজই এদেশের জীবনের কাঠামো থেকে গেছে, আর সেই কারণেই আমরা এখানে ইয়োরোপের মতো কুটির শিল্পেরই বৃহৎ, সংঘবদ্ধ রূপ দেখতে পেলাম না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিল্পকৌশলের দিক থেকে আমরা ইয়োরোপের তুলনায় কম যেতাম না, কিন্তু পুরাকাল থেকে একেবারে মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত পল্লীসমাজের প্রাধান্যই এদেশে রয়ে গেল বলে বুর্জোয়ার আবির্ভাব এখানে হল বিলম্বে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায়।

অনুসন্ধান করে দেখা দরকার যে সম্ভবত আমাদের অর্থনীতিতে স্থাণু ভাবের কারণ হল এই যে, যেটুকু বাণিজ্য ও শিল্পীসংঘ এখানে গড়ে উঠেছিল, তা বিলাস-ব্যসনের দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণেই নিবদ্ধ রইল। শহরগুলি ইয়োরোপের মতো নবজাত, সামন্ততন্ত্র বিরোধী বুর্জোয়া শ্রেণীর বাসভূমি হয়ে উঠল না। ভারতবর্ষের জীবন আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজেই আটকে থাকল, শহরগুলো হয়ে রইল পরগাছা, অন্তঃসারশূন্য। রাজা-বাদশার দরবারে বণিক-মহাজন বলে যারা খাতির পেয়েছিল, তারা যদি শহরে অনেক কারিগরকে একত্র করে শিল্প সংগঠন করত, তা হলে ইয়োরোপে যেমন 'স্বাধীন শহর' গড়ে উঠেছিল, বুর্জোয়ারা যেমন সেখানে একজোট হয়ে নিজেদেরই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজবিপ্লবে অগ্রণী হয়েছিল, তেমনই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এদেশে হত। কিন্তু গ্রাম্য ব্যবস্থাই ভারতের মূল সমাজরূপ হয়ে রইল। বৎসরের পর বৎসর গ্রামের উৎপাদনপ্রথা নিশ্চল হয়ে থাকত, উৎপাদনের চাকা পুরুষানুক্রমে একভাবে ঘুরে চলত, উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো উন্নতি দেখা দিত না। গ্রাম্য সমাজে যতটুকু বাড়তি উৎপাদন হত, তা শোষকশ্রেণীর ভোগে যেত। তখন কর্তৃপক্ষের কাজ প্রধানত ছিল জলসেচ ও অন্যান্য কিছু জনহিতকর কাজে সামান্য খরচ করে বাকি রাজত্ব শাসনের কলকজা বজায় রাখতে ও আমীর-ওম্‌রাহ্ জাতীয় লোকের ভোগবিলাসে ব্যয় করতে; যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ এবং ফৌজ মজুদ রাখার খরচ অবশ্য চালাতে হত। পল্লীসমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে ভারতের অধিকাংশ মানুষ শিল্পব্যাপারে নৈপুণ্য সত্ত্বেও গ্রামের সংকীর্ণ পরিধিতে আদিম জীবন যাপন করতে বাধ্য হত আর সমাজের বিধান এই নিশ্চল, স্থবির ব্যবস্থাকে কায়েম করল। শহরগুলো আত্মনির্ভর না হয়ে রাজারাজড়ার মর্জিকে অবলম্বন করে তাদেরই

হুকুম তামিল করে অর্থার্জন করত, নূতন সমাজ সৃষ্টির বাস্তব সম্ভাবনাকে তারা এইভাবে খর্ব করেছিল। রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে তাই নগরের অবলুপ্তি পর্যন্ত ঘটল: নগরের স্বতন্ত্র, স্বাধীন অস্তিত্ব ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল: নগর হয়ে রইল পল্লীসমাজেরই 'অন্তেবাসী'।

এখানে সমস্যার অবতারণা মাত্র হল, সমাধান দেবার দুঃসাহস যথেষ্ট অনুশীলন বিনা সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্যা সম্বন্ধে এবং চোখে তার মনোহারিত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় মার্ক্‌স্‌বাদীদের চেতনা কবে প্রকৃতই জাগ্রত হবে?

সম্প্রতি তিব্বত বিষয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। সেদিন ছোটোদের একটা বইয়ে পড়ছিলাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা হয়তো কারো কারো মনে পড়বে—

> বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে
> ভয়ঙ্কর,
> জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি
> দীপঙ্কর।

বাংলাদেশের এই প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌বাদী আলোচনা কি আজ আমাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করছে? তিব্বত সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই বাংলার সঙ্গে তার সুপ্রাচীন সম্পর্কের কথা উঠবে— স্মরণে আসবে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি মহাবিদ্যালয়। তিব্বতের সঙ্গে হাঙ্গেরির সম্পর্ক অনুমান করে হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত সমা-ডি-করস্‌ গেছলেন সেই তুষার দেশে, আজো তাঁর দেহাবশেষ প্রোথিত রয়েছে বাংলারই অন্তর্ভুক্ত দার্জিলিঙে। আমাদের মনে কি সেই "জ্ঞাতুম্‌ ইচ্ছ"— সেই জিজ্ঞাসার উদ্রেক লক্ষ করছি?

মার্ক্‌স্‌বাদ আমাদেরই এই শিক্ষা দিচ্ছে, জ্ঞান ও কর্ম একই সূত্রে গ্রথিত— জ্ঞান বিনা কর্ম ব্যর্থ, কর্ম বিনা জ্ঞান অসার্থক। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নিয়ে যথোচিত ব্যস্ত নই বলেই কি আমরা জ্ঞান সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ? কিন্তু উত্তর যাই হোক না কেন, জ্ঞান ও কর্মের এই গ্রন্থিবন্ধন জীবনের মধ্যে রূপায়িত না করলে মার্ক্‌স্‌বাদী হিসাবেই আমরা বিড়ম্বিত হব। সেই অনিবার্য বিড়ম্বনার বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মনোবৃত্তি ও অধ্যবসায় যেন আমাদের আসে।

প্যারিস ১৯৪৪

ছেলেবেলায় কয়েকবার কথকতা শুনেছিলাম। বিশেষ করে একজন কথকের কথা এখনো পরিষ্কার মনে আছে। বোধ হয় খানিকটা আধুনিক কায়দা ছিল তাঁর বলবার ধরনে। প্রথমেই তিনি তাই কোনো দেবদেবীর শরণ না নিয়ে একটা গান গাইতেন, 'অযুত ঋষির পদরজঃপূত, পুরাণ প্রচারে ধন্য', মহাতীর্থ নৈমিষারণ্যকে স্মরণ করে প্রণতি জানাতেন।

রাজপুতানার কোনো চারণ কিংবা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের কোনো 'ক্রবাদুর' যদি আজ বিপ্লবের গাথা শুনিয়ে বেড়াতেন, তো বোধহয় প্রথমেই গাইতেন প্যারিসের কথা, বহু বিপ্লবের গৌরবকাহিনী যে শহরকে বিশ্বমানবের পীঠস্থানে পরিণত করেছে, তার বীরকুলের মহিমা কীর্তন করতেন।

পশ্চিমী পুরাণে এন্‌সিলেডস্ নামে এক দৈত্যের আখ্যান আছে। এই দৈত্যকে দেবতারা যখন কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারেন নি, দেবরাজ জুপিটার যখন একেবারে নাস্তানাবুদ, তখন মিনার্ভা নাকি বুদ্ধি খাটিয়ে এট্‌না পাহাড়টা দিয়ে এন্‌সিলেডস্‌কে চেপে ফেলেন, যুদ্ধে দেবতাদেরই জয় হয়। দৈত্য কিন্তু মরেও মরবার পাত্র ছিল না, তাই বুঝি যখনই সে ক্লান্ত হয়ে একটু হাত-পা ছড়াবার চেষ্টা করে, তখনই এট্‌না পাহাড়ের মুখ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হয় আর সারা সিসিলি দ্বীপটা তোলপাড় করতে থাকে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়োরোপের একটা কিংবদন্তী ছিল যে ফ্রান্স হল ইয়োরোপের এন্‌সিলেডস্। ভগবানের হুকুম-নামা নিয়ে প্রভুত্ব করছি বলে যারা বড়াই করত, সেই বুর্‌বঁ রাজবংশের বিরুদ্ধে ফ্রান্স লড়েছিল। কিন্তু ঘটনার অনেক হেরফেরের পরে দেখা গেল যে সেই বুর্‌বঁ রাজতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে ফ্রান্সকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স কিছুতেই সে-বন্দোবস্ত মেনে নেয় নি। আর যখনই ফ্রান্স তার হাত-পা ছাড়াবার চেষ্টা করেছে, তখনই একটা অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, সারা ইয়োরোপে বিপ্লবের ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

এই কিংবদন্তীরই লোকায়ত সংস্করণ একটা ছিল। সাধারণ লোক বলত যে ফ্রান্সের হাঁচি পেলে ইয়োরোপের সব দেশেরই যেন সর্দি ধরে যায়।

১৯১৭ সাল থেকে দুনিয়ার বিপ্লবীদের কাছে লেনিনগ্রাদ, মস্কোর কদর প্যারিসের চেয়ে বেড়ে গেছে। কিন্তু ফরাসিদের বিপ্লবপরম্পরার মহিমা তাদের কাছে, একটুও ম্লান হয় নি। বিপ্লবের ঐতিহ্যগৌরবে প্যারিস পৃথিবীর পুরোধা।

এই বছরের ২৩শে আগস্ট তারিখটা তাই ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ব্যাপার। হিটলারী বুটের চাপে যে ফ্রান্স জীবন্মৃত হয়েছিল, দেশের মধ্যে বিভীষণ-বাহিনীর চক্রান্ত যে ফ্রান্সের স্বাধীন সত্তাকে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করছিল, সেই ফ্রান্সই সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো জেগে উঠেছে, কেশর আন্দোলিত করেছে। আর পূর্বের মতোই ফ্রান্সের নবজাগরণে প্রথমে সতেজ দুন্দুভিনিনাদ করেছিল বিপ্লব-স্মৃতিপূত মহানগরী প্যারিস।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্স থেকে ফ্যাশিস্ট দুঃশাসন উৎপাটিত করার লড়াইয়ে লেগেছিল। কিন্তু শুধু বিদেশি মিত্রের উদ্যমে ও বিক্রমে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না। তাই দেশের যেটা হল মর্মস্থল, সেই প্যারিসে ঘটল বিপুল জন-অভ্যুত্থান। পূর্বপুরুষেরা রাস্তায় ব্যারিকেড্ বানিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন; তাদেরই বংশধরেরা কোথাও ব্যারিকেড্ খাড়া করে, আর কোথাও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালিয়ে শত্রুনিপাতে লাগল। পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র আর কয়েক লাখ নিরস্ত্র দেশভক্ত মিলে প্যারিসের পূর্বগৌরব পুনঃস্থাপনের সংগ্রামে নামল।

বার বার ফরাসিদের ইতিহাসে দেশভক্তদের মনের কথা ফুটে উঠেছে আমাদের কবির ভাষায়—

হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে জয়তূরী,

জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

প্যারিসের মুক্তি হল ফ্রান্সের সর্বত্র অপরাজেয় জনজাগরণের সঙ্কেত। হঠাৎ যেন ফ্রান্সে বিপুল দেশপ্রেমের উল্লাস বয়ে গেল, আর তারই স্রোতে তৃণের মতো ফ্যাশিস্ট দুর্দানব ভেসে যেতে লাগল।

জয়তূরী হাতে নিয়ে প্যারিসের জয়যাত্রা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। ফ্রান্সের দেশভক্তেরা নিদারুণ অত্যাচার অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ চালিয়ে আসছিল, মুহূর্তের জন্যও তাদের পরম দেশপ্রেমিক কর্তব্যে অবহেলা করে নি। বিদেশি মিত্রপক্ষের কাছ থেকেও যখন বেতারে পরামর্শ আসত যে যথাসময়ে ফরাসিদের খবর দেওয়া হবার আগে ফ্যাশিজম্‌কে আঘাত করার চেষ্টায় তারা যেন শক্তি ক্ষয় না করে, তখনো তারা চুপচাপ বসে থাকতে রাজি হয় নি, মিত্রপক্ষের পরামর্শ মেনে নেওয়া সঙ্গত মনে করে নি।

ফরাসিদের কানে পৌঁছেছিল আর এক ধরনের পরামর্শ। ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টির আহ্বানে একদিনের জন্যও প্রতিরোধ ক্ষান্ত হয়ে থাকে নি। ফ্যাশিস্ট শাসকরা এর প্রতিশোধ নেবার জন্য নিদারুণ অত্যাচার প্রবর্তন করেছিল। তাই ফ্যাশিস্ট শাসনের প্রথম তিন বৎসরে একা কম্যুনিস্ট পার্টিরই দশ হাজার সভ্য দেশের সেবার মৃত্যু বরণ করে। ফ্যাশিস্ট জল্লাদের হাতে গাব্রিয়েল পেরি, পিয়ের সেমার, জ্যাঁ কাথ্‌লা প্রভৃতি কত দেশভক্ত প্রাণ হারায় বটে, কিন্তু দেশবাসীর স্মৃতিতে তারা চিরঞ্জীব হয়ে আছে।

প্যারিসের মুক্তিতে ভারতীয় সৈন্যদের অবদানের কথা জেনে আনন্দে, গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। স্বাধীনতার যারা পূজারী, সর্বদেশেই তারা প্যারিসের, ফ্রান্সের ভক্ত। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান যে-দেশে প্রথম উঠেছিল, সে-দেশকে ভালোবাসে না কে? সে-দেশের প্রতি আমাদের গভীর মমতা জানাবার জন্যই ভারতের পুরুষশ্রেষ্ঠ রামমোহন রায় ইয়োরোপে যাবার সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করেও ফরাসি জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। নাৎসী বন্দিশালা থেকে পলায়ন করে ভারতীয় সৈন্যেরা যে প্যারিসের শৃঙ্খলমুক্তিতে সহায়তা করেছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

হয়তো নাৎসীবন্ধন থেকে মুক্তির দিন ফরাসিরা উৎসব করে প্রতিপালন করবে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখ যেমন ফরাসিদের জাতীয় দিবস, তেমনই ১৯৪৪ সালের ২৩শে আগস্টও হয়তো প্রতি বৎসর সারা দেশ আনন্দ করবে, মুক্তিসংগ্রামের সদাস্মরণীয় কর্তব্য মনে জাগরূক রাখবে।

প্যারিসের 'ফোবুর্গ (যে শহরতলীগুলিতে প্রধানত শ্রমিকেরা বাস করে) আর প্রসিদ্ধ 'প্লাস্ বা পথের কেন্দ্রগুলি প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই তারিখে কী অপূর্ব উল্লাসে যে মুখরিত হয়ে ওঠে, তা যারা দেখেছে তারা কখনো ভুলতে পারে না। জানা-অজানা ছেলেমেয়ের হাতে হাত বেঁধে সারা দিনে উৎসবব্যস্ত প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা বোঝে ফ্রান্সের দেশপ্রেম কি বস্তু!

১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কথা মনে আসছে। তখন ফ্রান্সে 'ইউনাইটেড ফ্রন্টের' জয়জয়কার চলেছে। প্যারিসের শ্রমিকদের মনে বিপুল উৎসাহ। বহু লক্ষ লোক মিলে তারা মিছিল নিয়ে যাচ্ছে। মিছিলের মাঝামাঝি একটা গাড়ির ওপর বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও

শ্রমিকবন্ধু আঁরি বারবুস্। বারবুসের পোশাক লাল নিশান দিয়ে ঢাকা, চারিদিকে উৎসাহোদ্দীপ্ত জনতা।

মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন শ্রমিক-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতার দল— কার্শ্যাঁ, মার্তি ও আরো অনেকে। মার্তি লিখে গেছেন যে প্রায়ই শ্রমিকেরা এসে তাঁকে বলছিল, 'বারবুস্‌কে মাথায় টুপি দিতে বল, রৌদ্রে বৃদ্ধের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে।' কিন্তু বারবুস্‌কে এ-কথা জানালে তিনি রাজি হন নি, হেসে জানিয়েছিলেন যে জনতার সামনে মাথার উপর টুপি বসাতে তিনি রাজি নন।

১৭৮৯-৯৪ সালের ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহ্য সমগ্র মানবজাতির একটা পরম সম্পদ। কেবল তত্ত্ব নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করার সংগ্রামে ফ্রান্স বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকারের কথা ফ্রান্সের দেশভক্তেরা প্রচার করেছে, স্বার্থসর্বস্ব সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় কুণ্ঠিত হয় নি।

সাম্যবাদী আন্দোলনে ফ্রান্সের অবদান একেবারে অনবদ্য। সাম্যবাদের নীতি যখন ছিল কল্পনাশ্রয়ী, যখন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগপদ্ধতি ছিল অজ্ঞাত, তখন ফরাসি চিন্তানায়কেরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন, অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছিলেন। প্রথম ফরাসি বিপ্লব যখন স্বার্থান্ধ নেতাদের কবলে পড়ে পথভ্রষ্ট হল, তখন বাব্যফ্ প্যারিসে এক সাম্যবাদী অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিলেন। সাম্যবাদী পদ্ধতি আয়ত্ত করার সুযোগ বাব্যফের হয় নি, অভ্যুত্থান তাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু বাব্যফের কথা এখনো প্যারিস ভুলতে পারে নি।

১৮৩০ সালে আবার ফ্রান্সে বিপ্লব হয়, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সংকল্পই প্যারিস গ্রহণ করে। কূটরাজনীতিবিশারদের ষড়যন্ত্রে সংস্কৃত রাজতন্ত্রই আবার স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু প্যারিস সহজে তাকে মেনে নেয় নি। প্যারিস এবং লিয়ঁ-র মত শিল্পবহুল শহরে শ্রমিকসাধারণের জাগৃতির লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। তাই ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে শ্রমিকদের অবদান ছিল অনেক বেশি।

১৮৪৮-৫১, এই কয় বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন স্বয়ং কার্ল মার্ক্স্। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্রান্সের ভাগ্যনির্দেশের সংগ্রামে দুটো আলাদা ধারা রয়েছে। শ্রমিকেরা যেতে চায় এক দিকে, আর বিপ্লববহ্নিভীত-শ্রেণীরা যায় অন্যদিকে। শ্রমিকদের শক্তি ও সংহতি তখনো অসম্পূর্ণ, বিপ্লবের আর্থনীতিক পশ্চাৎপট তখনো অব্যবস্থিত, তাই, শ্রমিকশক্তি পরাজিত হল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে প্যারিসের শ্রমিক পরাজয় মেনে নেয় নি। প্যারিস আর তার শহরতলীর রাস্তা গরিবের রক্তে রঙীন হয়ে উঠেছিল, বুর্জোয়ারা মর্মে মর্মে বুঝেছিল জনতার শক্তি, জনতার অটল প্রতিজ্ঞা।

প্যারিসের ইতিহাসে সব চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হল ১৮৭১ সালের কথা। শত্রু প্রাশিয়ান্‌দের কাছে হার মেনে ফরাসি বুর্জোয়ারা একটা মিটমাটের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু প্যারিসের বীর নরনারী এই দেশদ্রোহী সংকল্পের বিরোধিতা করল। ঘরের শত্রু বিভীষণেরা বিদেশি বৈরীদের সঙ্গে যখন্ হাত মেলাল, তখন একা প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী দুর্জয় বীর্য দেখিয়ে নিজস্ব 'কম্যুন্' প্রতিষ্ঠা করল, স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাণপাতের জন্য প্রস্তুত হল।

অতি নৃশংসভাবে হাজার নির্দোষ নরনারীকে অসংকোচে হত্যা করে ফরাসি বুর্জোয়ারা বিদেশি প্রাশিয়ান্‌দের সাহায্য নিয়ে আবার দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করছিল বটে, কিন্তু প্যারিস

'কম্যুনের' তিন মাসের অভিজ্ঞতা বিশ্বের জন-আন্দোলনকে যে শিক্ষা দিল, সে শিক্ষা আত্মস্থ করার ফলেই ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল।

প্যারিস 'কম্যুনের' লড়াই হল প্রলেটারিয়েটের প্রথম লড়াই। সোভিয়েট বিপ্লবের ঐ হল মহড়া। সর্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য নিষ্করুণভাবে স্থাপন না করলে যে জনসাধারণের বিজয় সম্ভব নয়, এই হল 'কম্যুনের' শিক্ষা। মার্কস্ 'কম্যুনের' কোনো কোনো কার্যকলাপের সমালোচনা করে বললেন যে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'কম্যুন' যে অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছে আর যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে, শ্রমিক-আন্দোলন কখনো তা ভুলবে না।

১৮৭১ সালের মতোই ১৯৪০-৪৪ সালে ফরসি দেশভক্তদের একযোগে লড়তে হয়েছে দেশদ্রোহী ফরাসি আর বিদেশি জার্মান ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে। - ১৮৭১ সালে তারা সফল হয় নি, ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের দেশপ্রেম জয়মণ্ডিত হয়েছে।

চার বৎসর আগে ফ্রান্স যখন ফ্যাশিস্ট আক্রমণে ভেঙে পড়ল, শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের বেঁধে রেখে ছদ্মবেশী ফরাসি ফ্যাশিস্টরা যখন তাদের হিটলারী মালিকদের হাতে সোনার দেশকে তুলে দিল, তখন শুধু যে একটা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বা রাজনীতিক ঘটনা ঘটল, তা নয়, তখন ঘটেছিল ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটা বিরাট যুগের পতন। ইয়োরোপের সংস্কৃতির যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার নিদর্শন খুঁজতে হলে প্রায় গত দুশো বৎসর ধরে ফ্রান্সের কাছেই যেতে হয়েছে। প্যারিস ছিল সত্যই মানবসভ্যতার রাজধানী, সোভিয়েট-বহির্ভূত জগতের মুকুটমণি। সেই ফ্রান্স যখন তার বিপ্লবী ঐতিহ্যের গৌরবকাহিনী ভুলে গিয়ে, আত্মসর্বস্ব সমাজপতিদের নিবীর্য স্বার্থান্ধতার ফলে ক্লৈব্যের শিকল বাঁধতে রাজি হল, তখন ঘটল একটা মন্বন্তর, একটা বিপুল বিপর্যয়।

'প্যারিসের পতন' বলে এরেনবুর্গ যে উপন্যাস লিখেছিলেন, তার কথা আজ মনে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে তাঁর প্রতিশ্রুতি যে এবার 'প্যারিসের মুক্তি' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন। তাঁর লেখার প্রধান কথা ছিল এই যে, ফ্রান্সে মন্বন্তর অবশ্য ঘটেছে, কিন্তু এইবার পুরানো মনু যাবে চলে, আর নতুন সংহিতা ফ্রান্সের জনগণই তৈরি করবে। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে সে-সংহিতার প্রথম পরিচ্ছেদগুলো লেখা আরম্ভ হয়ে গেছে।

চার বৎসর ধরে প্যারিস আর সারা ফ্রান্স নরকভোগ করেছে। প্যারিস শহর ছিল অক্ষত, উদ্ধত ফ্যাশিস্ট-বাহিনী প্রবেশ করতে চেয়েছিল অটুট, সুন্দর প্যারিসে। চার বৎসর ধরে প্যারিস ভেবে এসেছে যে তার সৌধসমারোহই ফরাসি দেশপ্রেমকে বিদ্রূপ করছে, অপমান করছে! প্যারিসের দেহ ছিল অক্ষত, কিন্তু তার মন, তার আত্মা ছিল দুর্বিষহ বিষাদ ও অবসাদের হিমে সম্পূর্ণ অবসন্ন।

আজ তাই প্যারিসের নবজন্মে সর্বদেশ এত উল্লসিত, আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় সর্বদেশ আজ আশান্বিত। আর প্যারিসে যারা থেকেছে, প্যারিসের আকাশে বাতাসে যে সহজ প্রফুল্ল আত্মীয়তা ছড়িয়ে আছে তার পরিচয় যারা পেয়েছে, তাদের আনন্দ শুধু নৈর্ব্যক্তিক সমাজবোধে অনুপ্রাণিত নয়, তাদের আনন্দে আরো আছে যেন স্বজনেরই প্রতি মমত্ব।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ

'পরিচয়'-সম্পাদক ফরমায়েস্ করেছেন যে 'প্রগতি লেখক সংঘ' যখন প্রথম এদেশে স্থাপিত হয়েছিল, তখনকার কিছু খবর তাঁর পাঠকদের জন্য দরকার। ইতিহাসে আমাদের আগ্রহ কম বলে বড়ো সহজে আমরা সাম্প্রতিক ঘটনা পর্যন্ত ভুলে যাই আর তাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হয় না। পনেরো ষোল বছর আগে প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনার মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার কথা স্মরণ করলে আমরা উপকৃত হব সন্দেহ নেই।

আমাদের একজন খ্যাতিমান লেখক একবার বলেছিলেন যে সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমরা প্রায় ইয়োরোপেরই অন্তর্ভুক্ত একটা প্রদেশে বাস করি। কথাটার অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু তাকে একেবারে অসার বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। ইংরেজি ভাষা মারফত ইয়োরোপের সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলা রচনা ও রসবোধকে বড়ো কম প্রভাবিত করে নি— তার ফল সু কিংবা কু, যাই হোক না কেন। প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়েছিল এদেশে নয়, বিদেশে; লন্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে-আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠায়। সে আলোচনায় যারা যোগ দেয়, তারা সবাই যে লেখক তা নয়; আজো প্রগতি লেখক আন্দোলনে লেখক আর পাঠকদের প্রায় সমান স্থান রয়েছে বললে হয়ত একেবারে ভুল হবে না। মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্, সজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইক্‌বাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশ্‌রফ্ এবং আরো ক'জন মিলে যে আলোচনা চলে, তারই জের এ-দেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয়। ১৯৩৬ সালে ঈস্টারের ছুটিতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় মুন্সী প্রেমচন্দের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়।

১৯৩০-৩২ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর দিয়ে বিপুল আর্থনীতিক সংকটের ঝড় বয়ে যায়। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলনও ব্যাপক হয়ে ওঠে। সংকটকে প্রশমিত করার বহুবিধ চেষ্টা অবশ্য হয়। কিন্তু সমাধানের কোনো হদিস মেলে না। পুঁজিবাদীরা সন্ধান পায় শুধু একটিমাত্র রাস্তায়, আর তা হল ফ্যাশিজম্; সে-রাস্তায় চলতে হলে জনসাধারণকে চাবুক মেরে শায়েস্তা করা আর জাতিবৈরীর বিষে বিকৃত করা ছাড়া উপায় ছিল না। ফ্যাশিজ্‌মের নগ্ন, কদর্য মূর্তি দেখে সব দেশের দরদী মানুষ শিউরে উঠল। যাদেরই হৃদয় আছে, মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে চেতনা আছে, তারাই ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়ান যে কর্তব্য তা অনুভব করল। আমাদের দেশে সভ্যতার এই সংকট-সময়ে সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন দৃপ্ততেজে ফ্যাশিজম্‌কে ধিক্কৃত করলেন; ১৯৩০ সালে সোভিয়েট দেশে 'ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ' তিনি দেখে এসেছিলেন, তাঁর কবিকণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল ফ্যাশিজমের যে অপার কলঙ্ক মানুষের চিন্তা ও কর্মকে কলুষিত করছিল তার বিরুদ্ধে। মার্জিত রুচি নিয়ে বিবিধ তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে তখন সদ্যপ্রচারিত 'পরিচয়' পত্রিকা সাহিত্য ও সমাজের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অসংকোচে স্বীকার করে বাঙালি সাহিত্যিককে তার স্বাধিকার

প্রতিষ্ঠার জন্যই নতুন রাস্তায় চলার সম্বল সংগ্রহে সাহায্য করল। প্রগতি লেখক আন্দোলনের বনিয়াদ এদেশের বাস্তব জীবনই সৃষ্টি করে দিল।

১৯৩৫ সালের শেষাশেষি সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। তখন যে ইশ্‌তেহার প্রচার করা হয় তাতে বলা হয়েছিল : "সনাতনী সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের নূতন সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে, পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ করে কল্পলোকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ফলে তার রচনাভঙ্গি অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকারগ্রস্ত।

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা, এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য।...

"...আমরা চাই জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ; আমরা চাই যে সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করছি তাকে এগিয়ে আনুক।

"ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, আমরা তার উত্তরাধিকারের দাবি করি। আমাদের দেশে নানা মূর্তিতে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না। ...যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি-বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে পরীক্ষা করে আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃংখলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

বাংলাদেশের প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সম্পদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ১৯৪৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর অকালমৃত্যু ঘটে; আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ইনি; তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, অসামান্য জ্ঞান, অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসা, মার্ক্‌স্‌বাদকে ভারতীয় গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার বিপুল আগ্রহ, পরম সাহিত্যনুরাগ এবং বক্তৃতা ও রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের কথা যদি আমরা কখনো ভুলি তো তা হবে অমার্জনীয় অপরাধ। প্রগতি লেখক আন্দোলনে এই অজাতশত্রু পথিকৃতের অবদান যেন আমরা বার বার স্মরণ করি।

লক্ষ্ণৌ শহরে ১৯৩৬ সালের ঈস্টারের ছুটিতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা ছিল নানা কারণে স্মরণীয়। সভাপতির মঞ্চ থেকে জওহরলাল নেহরু যে ভাষণ দেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। বিভিন্ন বামপন্থী ধারাকে একত্র করে বিদেশে ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশে ফ্যাশিজ্‌মেরই সগোত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান তখন এসেছিল; কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে নেহরু সে-আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং এমন ভাষায় যা সহজে ভুলবার নয়। লক্ষ্ণৌয়ে নেহরুর বক্তৃতা উদ্ধৃত করে এখনো অনেকে তাই দেখান যে তাঁর তখনকার কথা আর আজকের কাজের মধ্যে বিকট অসঙ্গতি রয়েছে। লক্ষ্ণৌ-ফৈজপুর-হরিপুরা-ত্রিপুরী কংগ্রেসের বিবরণ বেশ স্পষ্টভাবে এদেশের সব চেয়ে শক্তিশালী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রগতিবাদী ধারার উত্থান-পতন এবং আভ্যন্তরীণ অসামঞ্জস্যের পরিচয়

দেয়। যাই হোক লক্ষ্ণৌয়ে যখন কংগ্রেস বসেছিল, তখন সেখানকার এক হলে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হল। সভাপতি ছিলেন উর্দু এবং হিন্দী লেখকদের শিরোমণি প্রেমচন্দ্; যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মওলানা হস্‌রৎ মোহানী (জাতীয় আন্দোলনের এই প্রবীণ নেতা উর্দু ভাষার একজন বিখ্যাত কবি)। উত্তর ভারতের লেখকদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন; যশ্‌পাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রশীদা জহাঁ, ফয়েজ আহমদ্ ফয়েজ (আজ যিনি পাকিস্তানে বিপ্লবের চক্রান্তে জড়িত বলে আটক রয়েছেন), সজ্জাদ জহীর (বর্তমানে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি) প্রভৃতি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারত থেকে প্রসিদ্ধ তেলুগু কবি আব্বুরি রামকৃষ্ণ রাও যোগ দেন। বাংলা থেকে জন চার প্রতিনিধি গিয়েছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নিজে যেতে পারেন নি; কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক ধারা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। যখন প্রবন্ধটি সম্মেলনে পড়া হয় তখন চারদিকে প্রকৃতই 'ধন্য ধন্য' রব ওঠে; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এমন সাহিত্যসমালোচনার নিদর্শন আর কোনো প্রদেশ থেকে আসে নি। পরে 'টুয়ার্ডস প্রগেসিভ ক্রিটিসিজ্‌ম্'' নামে এক গ্রন্থে অপর কয়েকটি প্রবন্ধের সঙ্গে এই রচনা মুদ্রিত হয়েছিল; এখন তা দুর্লভ, হয়তো একেবারেই অপ্রাপ্য।

লক্ষ্ণৌয়ে সম্মেলন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও স্পষ্ট স্মরণ আছে। দল বেঁধে সাহিত্য করা সম্ভব কি না এই নিয়ে সুরসিক আলোচনা তিনি করেছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত যখন আমরা সবাই রাজি হলাম যে দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি করা যাক বা না যাক, লেখক আর পাঠক মিলে (সুতরাং কিছুটা দল বেঁধে) আলোচনা ইত্যাদি করলে সাহিত্য সৃষ্টিতে নিশ্চয়ই সাহায্য ঘটে, তখন শরৎচন্দ্র সানন্দে লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের জন্য তাঁর বাণী আমাদের হাতে দিলেন।

১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন তারিখে বিশ্ববরেণ্য ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু হয়। প্রগতি লেখক সংঘের বিভিন্ন শাখা 'গর্কি দিবস' পালনের উদ্যোগ করে। সংঘের সাধারণ সম্পাদক সজ্জাদ জহীর এ-বিষয়ে বিবৃতি দেন। এই সময় কলকাতার 'স্টেট্‌স্‌মান' কাগজে সংঘের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার আরম্ভ হয়। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনি; 'স্টেট্‌স্‌মানের' প্রতিপাদ্য বিষয় হয় এই যে প্রগতি লেখক সংঘ কমিউনিস্ট পার্টিরই এক ছদ্মবেশী রূপ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ্ যে-সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাকে এইভাবে বর্ণনা করতে 'স্টেট্‌স্‌মান' এবং তার বন্ধুদের সংকোচ হয় নি।

আমাদের দেশে প্রগতি লেখক সংঘের যোগাযোগ ছিল 'ওয়ার্লড কংগ্রেস ফর দি ডিফেন্স অব পীস'-এর সঙ্গে; রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতি মনীষী ফ্যাশিজ্‌ম্ যে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের চক্রান্ত করছিল তার বিরুদ্ধে প্রধানত লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে সংগঠনের আহ্বান দেওয়ায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিস, ব্রাসেল্‌স, মাদ্রিদে এর অধিবেশন হয়েছিল, মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্ ভারতীয় লেখকদের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যোগ দিয়েছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, তারিখে ব্রাসেল্‌সে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয় সেখানে প্রধানত বাঙালি প্রগতি লেখকদের উদ্যোগে একটি ইশ্‌তেহার ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে পাঠান হয়। এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, প্রেমচন্দ্,

জওহরলাল নেহরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নন্দলাল বসু প্রভৃতি। বিবৃতিতে বলা হয় : "... উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া ও জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য নিয়ে খেলা করছে আর সংস্কৃতিতে ধ্বংস করার উপক্রম করছে। এ-সময়ে আমাদের নীরব থাকা হবে অপরাধ। সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তার ঘোর ব্যত্যয় করা হবে।" ভারতবর্ষে জনসাধারণকে শুধু যে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা নয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা তাদের নেই এবং বিশেষত সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থাদি 'সী কাস্টম্‌স্' আইন অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'-র ইংরেজি অনুবাদ নিষিদ্ধ, সিডনী ও বীট্রিস ওয়েবের "সোভিয়েট কমিউনিজম্" গ্রন্থের আমদানী বন্ধ, সেন্সর-নীতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতা শুধু হাস্যকর নয়, দেশের পক্ষে দারুণ অমঙ্গলেরই সূচনা তাতে দেখা যায়—এই ধরনের অনেক কথা এই বিবৃতিতে ছিল। আর বলা হয়েছিল "যুদ্ধকে আমরা ঘৃণা করি, যুদ্ধকে আমরা পরিহার করতে চাই, যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। যুদ্ধ মারফত কদর্য ফ্যাশিজ্‌ম্ কায়েম হতে চায়।" ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিবৃতির মূল্য অপরিসীম। প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে যে এর প্রকাশ ঘটে তা গর্ব করার বস্তু।

১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে বহু স্থানে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়। একে বাংলা, তায় লেখকদের ব্যাপার, সুতরাং সাংগঠনিক দিক থেকে আন্দোলনে অবশ্য অনেক গলদ থেকে যায়, তবুও কাজ যা হয়েছিল তা একেবারেই তুচ্ছ নয়। ঐ বৎসর আবার রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে সংঘের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'প্রগতি' নামে এক সংকলন সম্পাদনা করেন; এর ভূমিকা লিখে দেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত; আর যাঁদের রচনায় সংকলন সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিনায়ক ভট্টাচার্য, সমর সেন। কার্ল মার্ক্‌স্, আঁদ্রে জিদ্, ঈ. এম্. ফর্স্টার, টি. এ. এলিয়ট, সোভিয়েট কবি আলেকজান্দার ব্লক্, গোলাম গফুর ও কারাবিয়েভের লেখার অনুবাদ সংকলনে থাকে; অনুবাদকদের মধ্যে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আবদুল কাদির, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা যথাসময়ে না পাওয়ার জন্য ছাপান যায় নি। ভূমিকায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছিলেন : "মানবের মানবত্বকে আশংকিত ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব মানবের সংহত চেষ্টার প্রয়োজন। মানবের সকল শক্তির আজ প্রয়োজন হইয়াছে সংহত হইয়া এই দুর্ধর্ষ ধ্বংসপ্রচেষ্টার গতিরোধ করিবার। যাহার বাহুতে বল আছে, চিত্তে আছে যার ধীশক্তি ও ভাবুকতা, কণ্ঠে আছে যার বাগ্মিতা, লেখনী যার শক্তিমান—সকলের সমবেত চেষ্টা আজ প্রয়োজন মানবের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রগতিকে দৃপ্ত শক্তির মূর্ত অকল্যাণের হস্তে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার।" আজো নরেশবাবুর সেদিনকার কথার আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি আমরা করতে পারি।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের বিবরণ দিতে গেলে অনেক কথাই আজ মনে পড়ে। কিন্তু তার অবতারণা করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাবে। তবে ১৯৩৮ সালের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তার উল্লেখ না করলে খুবই অন্যায় হবে। সাহিত্য বিষয়ে বাংলাই যে প্রমুখ, এ-বিষয়ে

অন্যান্য প্রদেশের লেখকদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। তাই কলকাতায় সম্মেলন সবাই চেয়েছিলেন এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌ বলেন, যে নানা দেশে সাহিত্যিকদের সভায় তিনি যোগ দিয়েছেন কিন্তু কোথাও কলকাতার মত এত বেশি লোকের সাহিত্য সম্বন্ধে এত বেশি আগ্রহ লক্ষ করেন নি। আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে দু'দিন ধরে সম্মেলন চলেছিল; সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন পাঁচজন— মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন (যতদূর মনে পড়ে, গুজরাতী লেখক উমাশংকর জোশী উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর জায়গায় বুদ্ধদেব বসুকে সম্মেলন নির্বাচিত করে)। রবীন্দ্রনাথ যে বাণী প্রেরণ করেন সেটি প্রথমে পাঠ করে সভার কাজ আরম্ভ হয়; প্রেমেন্দ্র মিত্র, হিরণকুমার সান্যাল, আহ্‌মদ আলি, বলরাজ সাহ্‌নী, আবদুল হালিম প্রভৃতি আলোচনায় যোগ দেয়; অধ্যাপক শাহেদ সোহ্‌রাওয়র্দি ও অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু দেশবিখ্যাত কোবিদ্‌ উপস্থিত থেকে আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সৌহার্দ্য প্রকাশ করেন। উর্দু কবিদের মধ্যে দুজন এসে বাংলাদেশের লেখকদের চিত্ত জয় করেছিলেন— তাঁদের নাম হল মজাজ্‌ ও আলি সর্দার জাফ্‌রি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। প্রগতি লেখক আন্দোলনে এই বর্ষীয়ান সাহিত্যিকের অকৃপণ সাহায্য আমরা পরম কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আজো যখন দেখি যে চিন্তার প্রখরতায় ও অনুভূতির ঔদার্যে সমাজবিষয়ে তাঁর প্রতিটি সাম্প্রতিক রচনা ক্ষুদ্র হলেও প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে, তখন আশা হয় যে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি দেখে তিনি তাঁর পূর্বাভ্যস্ত কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে দূরে থাকতে পারবেন না।

সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আর যিনি ছিলেন আমাদের প্রত্যেকটি উদ্যোগে বন্ধু ও উপদেষ্টা, সেই সাংবাদিকশিরোমণি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। তখন তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক; তাঁর আপিস ছিল যেন প্রগতি লেখক সংঘের কার্যালয়। প্রধানত তাঁর এবং তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় তদানীন্তন সাংবাদিক মহল থেকে প্রগতি লেখক আন্দোলন প্রচুর সমর্থন পেয়েছিল।

কলকাতায় প্রগতি লেখক সংঘের নিখিল ভারত সম্মেলনের সময় দেখা যায় যে প্রকৃত অনুরাগ নিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেরই সহায়তা পেতে দেরি হয় না। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাজশেখর বসুর মতো বহুমানভাজন সাহিত্যিক সাগ্রহে সম্মেলনকে স্বাগত জানান। মনে আছে আলোচনার সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র উপস্থিত থেকে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা তখনই বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি। মুল্‌ক্‌রাজ তো বললেন যে এমন সম্মেলন তিনি কখনো দেখেন নি। শৈলজানন্দ বললেন, আমার অভিভাষণ হবে রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" আবৃত্তি—

> যাহারা তোমার বিষাইয়ে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে আন্দোলনের যোগ তখন ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ; বাংলায় তখন 'পরিচয়'ই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রগতি আন্দোলনের মুখপত্র। সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সভ্যরূপে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা প্রকাশ হয়েছিল আন্দোলনের ইংরেজি মুখপত্র 'নিউ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' ত্রৈমাসিক; আবদুল হালিমের সম্পাদনায় এবং বিভিন্ন প্রদেশের লেখকদের সহায়তায় এই পত্রিকা কিছুকাল চলেছিল, কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার

জন্য এর প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয়। এর পুরো "ফাইল" হয়তো পাওয়া এখন শক্ত, কিন্তু জোগাড় করে রাখা আমাদের দরকার।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ হল : ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার অতর্কিতে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জনতার সংগ্রাম চলছিল। প্রগতি লেখক আন্দোলন সংগঠন হিসাবে শক্তিশালী হয়ে তখন ছিল না। কিন্তু তার প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে, সোভিয়েটের স্বপক্ষে, জনতার পার্শ্বে স্থান নিয়ে দাঁড়াতে আমাদের লেখক-শিল্পীরা ইতস্তত করেন নি; তাঁদের হাতে অস্ত্র ছিল লেখনী, কিন্তু ব্যবহারপদ্ধতি ভিন্ন হলেও জনতার হাতিযারের যে লক্ষ তা ছিল মূলত লেখনীরও লক্ষ। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ভাষায় বলতে গেলে, "সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে, জনতার মুখরিত সখ্যে" যোগ দিতে আমাদের লেখকরা কখনো সংকোচ করতে পারেন না।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশিজ্‌মের কবল থেকে সভ্যতাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন লেখকেরা। আজ সেদিনকার ফ্যাশিজম্ অপসৃত হলেও নবকলেবরে তার পুনর্জন্ম ঘটিয়ে যুদ্ধের নৃশংস তাণ্ডবে দুনিয়াকে জোর করে টেনে নামাবার প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন আবার কেন আমরা পূর্বের মতোই তুচ্ছ ভেদাভেদের কথা বড়ো করে না দেখে হৃদয়বান ও সমাজ সচেতন সকল সাহিত্যিককেই অকপট ঐক্যের জোরে সেই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করতে দেখব না?

কয়েকটি সোভিয়েট বই

কয়েকটি নতুন সোভিয়েট বই সম্প্রতি পড়েছি— পড়েছি আর আশ্চর্য হয়েছি।

কথাটা বোধ হয় খানিকটা নাটকীয় শোনাচ্ছে। সোভিয়েটের নামেই কীর্তনানন্দে-মাতোয়ারা ভাব দেখাচ্ছি বলে অভিযোগও হয়তো অনেকের কাছেই শুনব।

কিন্তু আশ্চর্য হবার কারণ যথেষ্ট রয়েছে। সোভিয়েট দেশের মজুরকিষাণ বিশ বছরের অমানুষিক পরিশ্রমে হাজার বাধা দূর করে সভ্যতার যে নতুন ইমারত বানিয়েছে, এ খবরটা তথ্যপূর্ণ বই মারফত আসেই শুনেছিলাম। কিন্তু আজ যেন সে-খবরটা নতুন করে আসছে। যুদ্ধের নৃশংস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোভিয়েটের নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি যেন স্বর্ণদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে!

কয়েকমাস আসে মারাঠাদেশে স্টালিনগ্রাদ-গাথা শুনে এসেছি। লেনিনগ্রাদ, মস্কো, সেবাস্তোপোল, স্টালিনগ্রাদে লালফৌজের বীর কাহিনী আর সোভিয়েট দেশপ্রেম নিয়ে হয়তো কখনো মহাকাব্য লেখা হবে। নিজের দেশের মাটির জন্য মানুষ কেমন লড়তে পারে, সংকল্পের মহত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক যোদ্ধারই লেশমাত্র সন্দেহ না থাকতে কী অটুট বীর্য ও মনোবল নিয়ে মানুষ লড়তে পারে, বর্বর শত্রুর অকথ্য ক্রূরতাকে 'বজ্রসম দহিবার' মতো বিপুল ঘৃণা যখন হয় জাগ্রত জনসেনার সুদর্শনচক্র, তখন মারণাস্ত্রই যে কেমন করে নতুন আলোয় ঝলমল করে ওঠে পিতৃভূমির জন্য ন্যায়যুদ্ধ সোভিয়েটের সর্বত্র, সর্বজাতির মধ্যে, ছোটোবড়ো, স্ত্রীপুরুষ,

সকলেরই মনের বনিয়াদে যে কী অপূর্ব আলোড়ন এনেছে—তাই নিয়ে আজ আমাদের কাছে চেনা, অচেনা ও প্রায়-অচেনা সোভিয়েট শিল্পী ছবি আঁকছেন, সংগীতসৃষ্টি করছেন, গীতিকবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন, হয়তো বা কেউ মহাকাব্য বা উপন্যাসমহীরুহেরও পরিকল্পনা করছেন। যুদ্ধ চলছে— সর্বগ্রাসী, সর্বসংহারী যুদ্ধ। আর সঙ্গে সঙ্গে চলছে স্বাধীন মানুষের স্বকীয় মহিমার স্ফুরণ, সংস্কৃত বা সমাজের সৃষ্টিপ্রেরণাকে প্রলয়ের কালকোলাহল ব্যাহত করতে পারে নি।

ট্রেটিয়াকভ্ গ্যালারিতে যুদ্ধকালীন সোভিয়েট ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেছে। তার কয়েকটা প্রতিকৃতি প্রকাশ হয়েছে, মস্কো থেকে প্রকাশিত পাঁচ ভাষায় ছাপা 'ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচর' বলে মাসিকপত্রে। হয়তো কেউ কেউ দেখে থাকবেন। শস্টকোভিচ্ শত্রু-অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে বসে যে নতুন সংগীত সৃষ্টি করেছেন, তার বিবরণ আলেক্সাই টলস্টয়ের কলম-মারফত পেয়েছি, হয়তো বা কারো তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। সিমনভের একটা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনুবাদ ('প্রতীক্ষা') আমাদেরই একজন খ্যাতনামা কবি করেছেন। টিখনভের 'লেনিনগ্রাদের গল্প' প্রভৃতি বই থেকে কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ এরই মধ্যে হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক মহলে এই নিতান্ত সম্প্রতিকার সোভিয়েট লেখা বোধ হয় এখনো ঠিক প্রবেশ পায় নি। মাত্র কয়েকখানা কপি কলকাতায় আসে; আজকের দিনে সস্তাদরে সুশোভন বই খাস্ সোভিয়েট থেকে সোজাসুজি আসছে বলে তখনই অনেকে সেগুলো লুফে নিই। আমাদের অনেকেরই কাছে সোভিয়েট ছাপা সোভিয়েট বই বলে তার বাড়তি কদর খুবই; তাই সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া জরুরি কর্তব্য বলে জানলেও হাতছাড়া করতে মায়া হয়, নিজের কাছেই সেগুলো থাকে। অধিকাংশ সাহিত্যিক কষ্ট করে 'পোলিটিকল' বইয়ের দোকানে যান না, গেলে যে আজকাল মাঝে মাঝে দারুণ দাঁও হাতে পড়তে পারে জানেন না। আমাদেরই মতো কারুর মুখে এই টাট্‌কা সোভিয়েট লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে হয়তো তাঁরা ভাবেন যে আমরা সোভিয়েট সম্বন্ধে নিছক ভাবালুতায় হাবুডুবু খেয়ে থাকি। মোটের ওপর ফল হয় এই যে, সোভিয়েট সভ্যতার যে ভাস্বর প্রকাশের সঙ্গে তুলনা করার মতো আজ যুদ্ধরত কোনো দেশেই কিছু নেই, তার সঙ্গে আমাদের লেখক ও শিল্পীদের পরিচয় অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে, বহুক্ষেত্রে একেবারেই পরিচয় হচ্ছে না।

সময় ও সামর্থ্যের অভাবে আজকের সোভিয়েট সাহিত্য সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চেষ্টা করছি।

কয়েকমাস আগে সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীদের এক সভায় আলেক্সাই টলস্টয় বলেন, "অনেকে ভেবেছিলেন যে আজ কামানের গর্জন শিল্পের মধুকণ্ঠকে ডুবিয়ে দেবে। যুদ্ধের সময় সাহিত্য তার উৎকর্ষ হারিয়ে ফেলবে, সাহিত্য বিকৃত হয়ে পড়বে, হয়তো বা একেবারে নীরব হয়ে যাবে। কিন্তু ফ্যাশিজ্‌ম্ যে বর্বর বাহিনী পাঠিয়ে সোভিয়েট দলন করতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সোভিয়েট শিল্প ও জনগণের বিপুল বীর্যের বহুরূপী প্রকাশ সাধন করছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লব জনতার হাতে শিল্পের মহাস্ত্র তুলে দিয়েছিল; তখনই রাতারাতি অবশ্য জনশিল্প জন্মায় নি, কিন্তু বহু বাধা অতিক্রম করে সোভিয়েট শিল্প আজ জনগণেরই শিল্প হয়েছে, সোভিয়েট সংস্কৃতি আজ বহু বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করছে।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল, তখনো যুদ্ধমান দেশগুলির সাহিত্যের উপর তার প্রতিরূপ পড়েছিল। সহজ দেশপ্রেম নিয়ে তখন রিউপার্ট ব্রুকের মতো কবি কিছু লিখলেন, কিন্তু তার পরেই এল এক রকম প্রতিক্রিয়া। ওয়েন ও সিগ্‌ফ্রিড্ সাসুনের মতো নিঃসন্দিগ্ধ কবি

অনবদ্যভাবে লিখলেন, সাধারণ সৈনিকের সহজাত চরিত্রবলের ছবি আমরা পেলাম, কিন্তু ফলের মধ্যে তখন যেন পোকা ঢুকে গিয়েছিল। যে উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই, যাদের নায়কত্বে লড়াই, সে-উদ্দেশ্যে ও সে-নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোনো আশা, কোনো ভরসা রাখাই আর তখন সম্ভব ছিল না, উদ্দীপনার উৎস যাচ্ছিল শুকিয়ে, জীবন হয়ে উঠছিল নিরর্থক, আশাভঙ্গের বেদনাকে ভোলার জন্যই বুঝি সৌন্দর্যের দরজা আগলে বসে কবি গান গেয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় লাগলেন।

যুদ্ধ শেষ হল। "At the going down of the sun and in the morning, we shall remember them."— লরেন্স বিনিয়ন্ যাদের কথা বলতে চেয়েছিলেন, কেউ তাদের কথা ভাবল না। সমাজপতিরা কালনেমির লঙ্কাভাগেই ব্যস্ত রইলেন। জীবন একটা বিরাট পরিহাস হয়ে উঠতে লাগল। "ওরে আশা নেই, আশা শুধু মিছে ছলনা"— একথা বলা শুধু কবির একটা সাময়িক বিলাস মাত্র রইল না, একথাই জীবন ব্যাপারে অকাট্য সত্য হয়ে উঠল। "Waste Land"-এ ইংরেজি ভাষায় বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি শিল্পীমানসের ছবি আঁকলেন— 'these fragments I have shored against my ruins!'

ইংরেজির মতো অন্যান্য সাহিত্যের ছবির উপরেও এই কাল ছায়া পড়ল। জীবনকে অস্বীকার না করলে সৃষ্টি-প্রেরণাকে আহ্বান করা যেন আর চলল না। নিছক কবিতার সাধনা শুরু হল; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেতন-অবচেতন রাজ্য থেকে অষ্টধাতু সংগ্রহ করে নতুন কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করান হল। অতি নিগূঢ় মনোবিকলনের রাজ্য থেকে কথাশিল্পী রূপসৃষ্টির মশলা হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। সভ্যতার উন্মাদরোগ মোচনের জন্য অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হল, রক্তক্ষরণ অনিবার্য হল। এলিয়ট এবার বললেন যে এই দুই যুদ্ধের মধ্যে বিশ বছর আমরা হারিয়েছি, স্পেন্ডরকে উপদেশ দিলেন, "ভুলে যাও এ যুদ্ধের কথা, এ জঘন্য কাণ্ডকে অস্বীকার করো। অনন্যচিত্ত হয়ে লিখে যাও।" জীবন যখন কঠোর ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল, তখন জীবন থেকে সরে যাওয়া ছাড়া এদের গত্যন্তর রইল না, আত্মরতির চূড়ান্ত পর্যায় আরম্ভ হয়ে গেল।

যুদ্ধ চলছে, পৃথিবীর ভাগ্যনির্ণয় হচ্ছে রক্তক্লেদের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ চলছে, শুধু দূর রণক্ষেত্রে নয়, আমাদের চোখের সামনে দিনের পর দিন তার ছায়া পড়ছে। কিন্তু সোভিয়েট ছাড়া সব দেশেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই যেন চোখ বুজে আছেন, ভাবছেন এ করাল তাণ্ডব চুকে যাক, আবার সৃষ্টির ঐশ্বর্যে সংস্কৃতি সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, আজ উপায় নেই কিছু, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রাণপণে শুধু যেমন করে হোক আশাকে জিইয়ে রাখতে হবে।

সোভিয়েটে যা ঘটছে, তা হল সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যুদ্ধের ক্রূর তাণ্ডব সোভিয়েট জনসাধারণ যেমন দেখেছে, তেমন আর কেউ দেখে নি, আর কাউকে তেমন সইতে হয় নি। পূর্ব ইয়োরোপের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার বর্বর প্রতিজ্ঞা নিয়ে হিটলারী পঙ্গপাল অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে, যন্ত্রণার অন্নসত্র খুলে দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েট মুহূর্তের জন্যও নতজানু হয় নি, আর শুধু যন্ত্রের মতো লড়ে যায় নি; জীবন যে অর্থহীন, ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার অনিশ্চিত, সৌন্দর্য সৃষ্টি যে জীবন বহির্ভূত গুপ্তসাধনা; এমন দুশ্চিন্তা তার মনে ঢোকে নি। জীবনের জয়ধ্বজা উড্ডীন রেখে সে লড়ছে, অতিবর্ষণের মধ্যে সুবিচিত্র রামধনু কখনো তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে নি।

যে সব লেখকের নাম আগে আমরা জানতাম না, যাদের মধ্যে অনেকে সাধারণ যোদ্ধা কিংবা কোনো না-কোনো ভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট, তাদের লেখা গল্প তাই এতটা চমক লাগিয়ে দেয়। অন্য দেশের সাহিত্যকে যুদ্ধ একেবারে স্পর্শ করে নি বলা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হবে, কিন্তু খুব কমই করেছে বলা অন্যায় হবে না। আর কোনো দেশে শত্রুর প্রতি অটুট ঘৃণা শিল্পক্ষেত্রেও হাতিয়ার হয়ে ওঠে নি, যুদ্ধ জয়ের পর নতুন দুনিয়া গড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিতিও কোথাও নেই, দেশের সকলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় নানাভাবে মিলে থেকে যে নতুন মহাভারতের উপকরণ দিনের পর দিন শিল্পীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, এ-বোধও অন্য কোনো দেশে নেই।

Tikhonov, Sobeler, Wanda Wasilewska, Kozhovnikov, Dovzhenko প্রভৃতি অল্পখ্যাত ও অখ্যাত লোকের লেখা ছোটো-ছোটো গল্প শুধু যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়। সোভিয়েট নাগরিক কেমন করে আজ নিজেদের হাতে গড়া দুনিয়াকে বাঁচাচ্ছে, সাধারণ মানুষের সহজ বিক্রম যে আজ শিল্পের পরম উপজীব্য, শত্রুকে ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বমানবের প্রতি সতেজ সহানুভূতি যে কেমন করে অপরাজেয় যোদ্ধা সৃষ্টি করতে পারে, সৈন্যদলের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সকল অংশের সম্পর্ক যে কত নিবিড়— তার সরল, ঘটনাবলম্বী, বক্তৃতাকণ্টকশূন্য ব্যঞ্জনা আমাদের সামনে এনে দিয়েছে।

তাড়াহুড়ো করে লেখা এ প্রবন্ধ নিতান্ত অসম্পূর্ণই থেকে যাবে, কিন্তু অন্তত একটা বইয়ের নাম না করলেই না। এটা হল ইলিয়া এরেন্‌বুর্গের লেখা 'The Fall of Paris'; বেশ বড়ো উপন্যাস, আধা roportage, আধা-কল্পনা, ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের পতনের সব চেয়ে চমৎকার বিবরণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত ফরাসিদেশের বহু বিশিষ্ট রাজনীতিকের ছবি এতে আছে, কোথাও নাম দিয়ে, কোথাও নাম না দিয়ে। জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে ইয়োরোপের রাজনীতির ছবি বদলে দেবার যে চেষ্টা কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে হয়েছিল, সে-চেষ্টাকে বিফল করার জন্য যে বহু-বিস্তৃত চক্রান্ত চলেছিল, জাতির জীবনবীণাকে নীরস করে দিয়ে যে-চক্রান্ত ১৯৪০ সালে ফ্রান্সকে হিটলারের পদানত করেছিল, তার বিবরণ এ-বইয়ে রয়েছে।

'বিবরণ' কথাটা শুনে যদি কেউ আঁতকে ওঠেন তো অন্যায় হবে। ফ্রান্সের পতন শুধু একটা সামরিক বা রাজনীতিক ঘটনা নয়, ফ্রান্সের পতন হল ইয়োরোপের সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার নিদর্শন খুঁজতে হলে প্রায় গত দুশো বছর ধরে ফ্রান্সের কাছেই যেতে হয়েছে। সেই ফ্রান্স যখন তার আত্মসর্বস্ব সমাজপতিদের নিবীর্য স্বার্থান্ধতার ফলে ক্লৈব্যের শিকল বাঁধতে রাজি হতে বাধ্য হল, তখন ঘটল একটা মন্বন্তর, একটা বিপুল বিপর্যয়।

মন্বন্তর যে ঘটবে, পুরানো মনু যে চলে যাবে, নতুন সংহিতা যে ফ্রান্সের জনগণই তৈরি করবে— এই হল এরেনবুর্গের লেখার প্রধান কথা। কোথায় ফ্রান্সের অপরাজেয় শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, স্বার্থের সূক্ষ্মজাল বুনতে গিয়ে ফ্রান্সের ধনপতিরা কি ভাবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেশকে ফ্যাশিস্ট্ রসাতলে নিয়ে চলেছিল, ফ্রান্সের সাধারণ দেশপ্রেমিক, ফ্রান্সের লেখক-শিল্পী-বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিজীবী, সমাজপতিদের পাপের প্রায়শ্চিত করে যে আবার নবতেজে জেগে উঠবে— এরেনবুর্গ তাই আমাদের বলেছেন। আর তিনি এ সব কথা বলেছেন এমন ভাবে, যা কঠোর সমালোচককেও রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করতে হবে

সোভিয়েট লেখায় যে নতুন ব্যাপকতা এসেছে, 'The Fall of Paris'-এ তা অতি স্পষ্ট। বিরাট পটভূমিকায় সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এরেনবুর্গ ছবি এঁকেছেন, কম্যুনিস্ট জীবনধর্মকে

প্রত্যাখ্যান করতে করতে শেষে যে নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে— একথাটাই বলে গেছেন বারবার, কিন্তু কোথাও সঙ্কীর্ণ প্রচারসর্বস্বতার চিহ্নমাত্র নেই। নানাভাব এমন সার্থক সৃষ্টি বহুদিন সোভিয়েট লেখায় দেখা যায় নি।

ফ্রান্স আবার জাগবে, আবার তার পুরানো স্থান অধিকার করবে— এ কথা এরেনবুর্গের লেখা পড়লে বারবার মনে হয়। ঠিক এই কথাই সম্প্রতি বলেছেন জিদ্— আবার ফ্রান্স জাগবে। এতদিন ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী ও কলাসাধকরা উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি করতে গিয়ে জীবন থেকে সরে গেছিলেন, Love, Liberty, Fraternity প্রভৃতির মতো যে-সব চিন্তা, যে সব স্বপ্ন সহজ সাধারণ মানুষেরও অধিগম্য, তাকে বর্জন করে শিল্পের অদ্বিতীয়-ব্রতে তাঁরা লেগেছিলেন। জিদ্ তাঁদেরই বলছেন ফিরে যেতে, জীবনের কোলাহলের মধ্যে রূপসন্ধান করতে— আর কোনো পথ নেই, থাকার প্রয়োজনও নেই।

Valery বা Charles Maurras-র মতো যাঁরা ফ্যাশিজমের সঙ্গে মিতালি করতে রাজি, তাঁরা ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকুন। ফরাসি সাহিত্যিক আজ ভাবছেন Leuis Aragon-এর কথা, যিনি সোভিয়েটে থেকে সহজ, সরল যে কবিতা লিখছেন, তেমন নাকি গত একশো বছরে কেউ দেখে নি।

জার্মান লেখক Remarque লিখেছিলেন 'The Road Back'— যুদ্ধ থেকে ফিরে নতুন এক নরকে যাবার রাস্তার কথা। সোভিয়েট লেখকরা লিখছেন The Road to Life— স্বর্গে সিঁড়ির স্বপ্ন না দেখে জীবনের রাস্তাই আজ তাঁরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, নতুন দিনের নতুন আলোয় ঝলমল করে উঠবে যে পথ, তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

"ভারত আবিষ্কার'

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এই আধুনিকতম রচনার নাম হল "ভারতবর্ষ আবিষ্কার"। বইয়ের নাম শুনেই সকলের পড়তে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর আত্মজীবনীতে পণ্ডিতজি লিখেছিলেন যে, দেশে বিদেশে সর্বত্রই তিনি যেন নিজেকে একজন প্রবাসী বলে অনুভব করেন। তাঁর সে অনুভূতি যে বদলেছে, দেশের সঙ্গে প্রকৃত অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সূত্র যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন, এটা হল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই এ বইয়ের চাহিদা যে খুব দারুণ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৪৪ সালে আহ্মদ্‌নগর জেলে থাকার সময় তিনি এ বইটি লিখেছিলেন; মুক্তি পাবার পর লেখার আর তেমন সময় পান নি, কেবল ১৯৪৫ সালের শেষ দিকে 'পুনশ্চ' নাম দিয়ে ক'পাতা যোগ করেছেন। নেহরুজির রচনাসৌষ্ঠব বিশ্ববিখ্যাত; সুন্দর ঝরঝরে ভাষা, আর বিশেষ করে যখন তাঁর স্ত্রী কমলাকে স্মরণ করে তিনি নিজের দাম্পত্য জীবনের কথা লিখেছেন, তখন রচনা বাস্তবিকই অনবদ্য হয়েছে। বইটি পড়তে পড়তে অনেক সময় তাঁর কবিমনের সাক্ষাৎ মেলে এবং মনে হয় যে, ঘটনার যোগাযোগে পণ্ডিতজি আজ দেশের বহুমানভাজন নেতা, কিন্তু সে যোগাযোগ যদি না ঘটত, তো অন্তত লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ তিনি করতেন।

''ভারতবর্ষ আবিষ্কারের'' প্রশংসায় অনেকেই শতমুখ-হবেন, কিন্তু কেবল ''এমনটি আর হয় নি'' বলে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি চিত্তাকর্ষক সংক্ষিপ্তসার লেখক দিয়েছেন; কারাগারে অবসর সময়ে যে তিনি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, তার পরিচয় পাতায় পাতায় মিলবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের ইতিহাসে অল্প-পরিচিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অবতারণা তিনি করলেও মোটের উপর তিনি গতানুগতিক ভাবেই লিখে গেছেন। ইংরেজ আমলের ইতিহাস লেখার সময় কার্ল্ মার্ক্‌সে্র কাছে ঋণ স্বীকার না করলেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে মার্ক্‌সের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি অনেক সাহায্য পেয়েছেন, ইতিহাসে কার্যকারণ সম্বন্ধে নির্ণয় সেখানে করতে পেরেছেন। কিন্তু ইংরেজ আমলের আগের ইতিহাস লেখার সময় সচরাচর ইতিহাসেব পণ্ডিতেরা যা বলে থাকেন, তাবই পুরনাবৃত্তি করেছেন স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ভাষায়। সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ভারতবর্ষে বারবার কেন হয়েছে, তার সন্ধান তিনি পান নি, হয়তো করেনও নি।

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যে বিশিষ্ট স্বকীয়তা আছে, তার সাক্ষ্য যে ইতিহাস, একথা তিনি বোঝেন নি। ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর এমনই নিশ্চিতি যে মৌর্য বা গুপ্ত যুগে কিংবা মোগল বাদ্‌শাহদের সময় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে দেখে তিনি উল্লসিত হয়েছেন। সে সাম্রাজ্য কেন ক্ষণস্থায়ী হল, তা তিনি বোঝেন নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন, অঞ্চলের মধ্যে মূলগত ঐক্য বর্তমান থাকলেও তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ স্ফুরণের সুযোগ দিয়ে প্রকৃত ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য যে এ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসে স্থাপিত হয় নি, আর সেই ঐক্য স্থাপনই যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ এ কথা তাঁর কাছে সত্য হয়ে ওঠে নি। তাই ইতিহাসের নজির দিয়ে উকিলের মতো ভারতের ঐক্য প্রমাণ করতেই তিনি ব্যস্ত থেকেছেন, খণ্ডের মধ্যেই যে অখণ্ডের উপজীব্য রয়েছে, তা তিনি বোঝেন নি। মাঝে মাঝে তাই তাঁর লেখা হয়েছে অত্যন্ত হালকা ধরনের : ৩৯২-৩৯৭ পৃষ্ঠাতে বিভিন্ন প্রদেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা তিনি লিখেছেন, তা প্রায় হাস্যকর।

সাম্প্রতিক ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি ব্যাপারে নেহরুজির বক্তব্যই সাগ্রহে সকলে পড়বে; তাই সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মুসলিম লীগ আর জিন্নাসাহেবের দোষত্রুটি বার করতে হলে পুরু কাঁচের চশমা পরতে হয় না, কিন্তু তাই বলে মুসলিম লীগ স্থাপনটা স্রেফ ইংরেজ সরকারের একটা চাল (পৃঃ ৪১১) বলে দেওয়া যথেষ্ট বাড়াবাড়ি; পণ্ডিতজি যদি কষ্ট করে বদরুদ্দীন তৈয়াবজি, রহিমতুল্লা সায়ানি আর নবাব সৈয়াদ মুহম্মদ, কংগ্রেসের এই প্রথম তিনজন মুসলমান সভাপতির বক্তৃতা পড়ে দেখেন তো তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। মুসলমান পাঠকেরা যদি মনে করেন যে, তাঁদের প্রতি পণ্ডিতজির অবজ্ঞা একেবারে মজ্জাগত, তো বিশেষ অন্যায় করা হবে না। সাতশো এগারো পাতার বইয়ে কোথাও ওয়াহাবি আন্দোলনের উল্লেখ নেই; খেলাফত আন্দোলনের সাম্রাজ্যবিরোধী ভূমিকার কোনো পরিচয় নেই। আর নিতান্ত মার্কিন মার্কা সাংবাদিকের মতো সস্তা বাহবা পাওয়ার আশায় যেন তিনি লিখেছেন (পৃঃ ৪৩১) যে, জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগের প্রধান কারণ হল যে এক গাদা হিন্দীভাষী ময়লা-কাপড়-পরা লোকের সান্নিধ্য তাঁর পছন্দ হত না! কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপোসের আলোচনা করার সময় জিন্না সাহেব যে ব্যবহার কখনো কখনো করেছেন কিংবা পাকিস্তান দাবি নিয়ে ধনুকভাঙা পণ করে থেকেছেন, তার কঠোর সমালোচনা করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু কেবল ঐ কথা বলা, আর ১৯২৩ সাল থেকে বার বার সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার কারণ নির্ধারণের চেষ্টা না করা, এবং পাকিস্তান দাবি হাজির হওয়ার বহুপূর্ব হতে

জিন্নার ১৪ দফা দাবি কিংবা "নেহরু-রিপোর্টে" কিছু অদল-বদল করার দাবি আজ আমাদের কাছে সহজগ্রাহ্য মনে হলেও তখন প্রবলভাবে তাকে অগ্রাহ্য করার কারণ সন্ধানের চেষ্টা না করা, নেহরুজির একদেশদর্শিতারই যে পরিচায়ক, তা অস্বীকার করা চলে না।

দুই

বইটি প্রথম যখন হাতে পড়েছিল, আশা হয়েছিল যে নিশ্চয়ই দলিত ভারতবর্ষের কৃষক শ্রমিকদের সম্বন্ধে কয়েকটি দামি কথা লেখক বলেছেন। কিন্তু কৃষকদের উল্লেখ আছে মাত্র এক জায়গায়, যেখানে পণ্ডিতজি ভুল করে বাংলায় "কৃষক-প্রজা পার্টির" নাম দিয়েছেন কৃষক-সভা (পৃ: ৪৬২)। তিনি নিজে একবার ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেও কোথাও শ্রমিক সংগঠনের নামগন্ধই প্রায় নেই। অবশ্য তিনি বলতে ভোলেন নি যে গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মেদাবাদের "মজুর মহাজন" হল দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো আর সুসংবদ্ধ সংগঠন! বলা বাহুল্য, এই 'ইউনিয়নটি' ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দেয় নি। মজুরে-মালিকে মিতালি যে সম্ভব এবং কাম্য, এই হল এর কর্তাদের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশে তিনি যে দেশকে চিনেছেন, একথা অবশ্য পণ্ডিতজি বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ তাঁকে কি শিখিয়েছে, তা তিনি বলেন নি। বরং মনে হয়, যা কিছু শেখাবার, তা তিনিই তাদের শিখিয়েছেন; এক জায়গায় বেশ বর্ণনা আছে যে পণ্ডিতজির বাণী শুনে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাদের অসাড় মস্তিষ্কের মধ্যে ভারত মাতার সম্পর্কে ধারণা তিনি প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন (পৃ: ৫৪-৫৫)। 'রাজার নন্দিনী প্যারী যা করেন তা শোভা পায়!'

এ হেন মনোভাব নিয়ে যখন বইটি লেখা, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাঁর মত যে কি, তা আন্দাজ করা খুব শক্ত নয়। ৬২৮-২৯ পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন যে, কমিউনিস্টরা সর্বত্র সোভিয়েটের ধামা ধরে থাকে বলে শ্রমিকদের মজ্জাগত জাতিবোধ তাদের বিরোধিতা করেছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি কমরেড রজনী পাম দত্ত বলেছেন যে, পণ্ডিতজি চট করে আর একবার ইউরোপটা ঘুরে আসুন, তা হলে তিনি দেখবেন যে দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগসূত্র কত ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা অবশ্য অসীম, তাদের প্রভাব হল নগণ্য (পৃ: ৫২৪); অথচ গত নির্বাচনের সময় কেউ তাঁকে হয়তো বোঝায় নি যে কমিউনিস্টরা যদি বাস্তবিকই মশা হত তো নেহরুজির বক্তৃতারূপী কামান অবিশ্রান্তভাবে তাদের বিরুদ্ধে দাগতে হত না। ৬২৯ পৃষ্ঠাতে তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভাবে যে পৃথিবীর ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে। কমিউনিস্টদের হয়ে ওকালতি করার প্রয়োজন এখানে নেই কিন্তু নিজের দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে নেহরুজি যদি কিছু না জানেন তো সেটা তাঁর পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

তিন

পণ্ডিত নেহরুর যে কোনো রচনা পড়লেই মনে প্রশ্ন জাগে : সোভিয়েট সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা বা নিন্দা তিনি করতে পারেন না কেন? সোভিয়েটের প্রশংসা যে তিনি করেন না, তা একেবারেই নয়। কিন্তু সোভিয়েটের নামে যারা তেলে-বেগুনে-জ্বলে ওঠে, তাদের কথা ভেবে

কিংবা কোনো এক সহজাত দ্বিধাগ্রস্ততার চাপে তিনি সর্বদাই বলেন যে, "অনেক কিছু" সোভিয়েট করেছে যা তাঁর মনোনীত নয়। এ বইয়েও তাই সোভিয়েটের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সোভিয়েট প্রতিবেশী দেশগুলোকে তাঁবেদার করে রাখতে চায়, এ অভিযোগও করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সোভিয়েটের তারিফও আছে! ৬৬৯ পৃষ্ঠাতে একটা তাজ্জব কথা তিনি বলে ফেলেছেন : "রাষ্ট্রিক গণতন্ত্রের যা কিছু দোষ, তা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান; আর রাষ্ট্রব্যাপারে গণতন্ত্রের অভাবের যা-কিছু দোষ, তা আছে সোভিয়েটে!" যার মনে প্যাচ নেই, তার কাছে নিশ্চয়ই এ কথার অর্থ হবে যে, দোষেগুণে আমেরিকা হল সোভিয়েটের চেয়ে ভালো।

একটা কথা খুব উল্লেখযোগ্য; ১৯৪৫ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে লেখা প্রবন্ধ এ বইয়ে রয়েছে, অথচ আজাদ হিন্দ ফৌজের বিষয়ে একটিও কথা নেই; "জয়হিন্দ্" শব্দটির অনুপস্থিতিও লক্ষ কবার জিনিস। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে অনেক কথা আছে, কিন্তু কমিটি নিয়োগ করেছিলেন সুভাষ বসু, সে কথা নেই। ৫০৮-০৯ পৃষ্ঠায় আছে যে, সুভাষ বসু কংগ্রেস সভাপতি হলেও জাপানী জার্মান বা ইতালিয়ান ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনোভাব সমর্থন করতেন না, কেবল নেহরু প্রভৃতি কয়েকজনের খাতিরে মুখ বুজে থাকতেন!

গল্প আছে যে, বিলাতে রক্ষণশীল দলের একজন শিরোমণি লেডী অ্যাস্টর নেহরুজির সামনে সোশালিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু বলায় তিনি যখন আপত্তি করেন তখন জবাব আসে, "মিস্টার নেহরু, আমি আপনার মতো সোশ্যালিস্টের কথা বলছি না।" অ্যাস্টর-পরিবারে জলচল হয়ে নেহরুজি সুখী কি অসুখী হয়েছিলেন জানা নেই। কিন্তু এ বইয়ে ধর্ম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মা, কর্মফল, পুনর্জন্ম, বেদান্ত, বস্তুবাদ, মার্ক্সীয় পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে নেহরুজি হরেকরকমের এত প্রশ্ন তুলেছেন, অথচ তার জবাব দেন নি কিংবা জবাবের দরকারও স্বীকার করেন নি, যে তাঁকে "সোশ্যালিস্ট" বলতে যাওয়াই বাতুলতা। অবশ্য অনেক সময় মনে হয় যে, মত স্থির না করতে পারাটাই হল নেহরুজির বৈশিষ্ট্য। আর সঙ্কোচের এই বিহ্বলতা অনবদ্য ভাষায় তিনি প্রকাশ করতে পারেন বলেই তাঁর লেখা এত লোক আগ্রহ নিয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববিরাজ

সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজের দুর্নাম রটনা রুশবিপ্লবের দিন থেকেই চলে আসছে, আর তাতে বিস্মিত হওয়ারও কিছু নেই। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরে সেই অপবাদের মধ্যে একটা অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু কাল ধরে বলা হত যে সোভিয়েট দেশের যারা নায়ক— "the wicked men of the Kremlin" বলে যাদের কুৎসায় চার্চিল প্রায় গলা ফাটিয়ে বসেছেন— তারা দেশভক্তির ধার ধারে না, তাদের অনেকেই হল গৃহহীন, ভ্রাম্যমান ইহুদী, আর তারা শুধু তাদের এক উদ্ভট বিশ্ববীক্ষার (weltanschauung) নামে দুনিয়াটাকে কব্জা করার জন্য ব্যস্ত। তারপর থেকে সুর বদলে বলা হয় যে আর্ন্তজাতিকতা বলে কোনো বস্তু সোভিয়েটের ধারণার মধ্যে নেই, জারের প্রাক্তন সাম্রাজ্যকে নবকলেবরে সাজিয়ে তুলে ক্রমে

জগৎজয় করাই স্টালিন-প্রমুখ অসুরদের মতলব। তবুও পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সোভিয়েটের দিকে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে তাকিয়ে থাকছে দেখে আবার বলা হয় যে মুষ্টিমেয় কুচক্রী দেশে দেশে তাদের ভুল পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে, ছদ্মবেশী জার-সাম্রাজ্যের কবলে তারা যে কয়েদী হচ্ছে এই সোজা কথাটা এখনো জনসাধারণের মগজে ঢোকে নি। মোটের উপর একথাই চালাবার চেষ্টা চলেছে যে সোভিয়েট আর "internationalist" নয়, সোভিয়েট হল একেবারে 'nationalist', রুশ জাতীয় স্বার্থসিদ্ধিই সোভিয়েট ইউনিয়নের একমাত্র লক্ষ। "Red imperialism" ইত্যাদি বাক্য নিয়ে জিহ্বাস্ফোট আজকাল তাই এত সোরগোল ঘটিয়ে তুলছে।

সোভিয়েটের বহুমুখী কর্মকাণ্ড দেখে দিনের পর দিন নানা প্রকৃতির বহু সৎচেতা মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে বলে নানা দিক থেকে সোভিয়েটের এই "জাতীয়তাবাদী" দুর্নাম সম্বন্ধে রটনাও সম্প্রতি খুব বেড়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে কিছুকাল আগে শস্টাকোভিচ্ (Shostakovitch) প্রমুখ কয়েকজন সংগীতকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটে যখন প্রখর সমালোচনা হয়, পশ্চিম ইয়োরোপের ক্ষীয়মান সংস্কৃতিধারার দূষিত প্রভাব তাদের উপর পড়ছে বলে যখন সে দেশে আপত্তি ওঠে, তখন সোভিয়েট বিরোধীরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে আরম্ভ করেন যে এর মধ্যে সোভিয়েটের জাতীয় সংকীর্ণতা-সঞ্জাত মনোভাবই ধরা পড়ছে। আবার মিচুরিণের প্রধান শিষ্য লাইসেঙ্কো (Lysenko) যখন সোভিয়েট প্রাণিতত্ত্ববিদ্দের সঙ্গে "Mendelism Morganism" সম্বন্ধে দেশব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর স্বীয় মত যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আবার রব উঠল যে এ ঘটনাও হল রুশ জাতিগর্বেরই প্রমাণ, মিচুরিণকে জাতে তোলার জন্যই Mendel এবং Morgan-এর মতো পূর্বসূরীর গায়ে কাদা ছিটান হল, বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নয়।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্দের বিতর্কে 'ইতরে জনাঃ" প্রবেশ করবে না, কিন্তু বাস্তবিক যদি সোভিয়েটের প্রাণিতত্ত্ববিদ্রা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে, বিজ্ঞান যে সততা দাবি করে তারা যদি সেই সততা থেকে বিচ্যুত হয়, তা হলে তাদেরই হবে সমূহ বিপদ। আর সোভিয়েট বিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্য না হলে সোভিয়েটের যারা শত্রু তাদেরই হবে সবচেয়ে বেশি লাভ। সুতরাং লাইসেঙ্কো যদি আত্মম্ভরী এবং হাতুড়ে হয়, সোভিয়েটে জাতীয়তার দোহাই দিয়ে যদি বিজ্ঞানকে পাঁকে নামান হয় তা হলে "Western Democracy" অর্থাৎ আমেরিকা হল যে পালের গোদা তাদের খুবই উৎফুল্ল হওয়া উচিত। আসলে কিন্তু তারা একেবারেই উৎফুল্ল হয় নি। তারা বেশ জানে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের যাচাই সোভিয়েট করে নেয় কাজের ক্ষেত্রে, যে বিজ্ঞান বাস্তব পরীক্ষায় বাতিল হয় সে-বিজ্ঞানকে আঁকড়ে থাকা সেখানে সম্ভব নয়, আর লাইসেঙ্কোর সিদ্ধান্ত বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই না হলে এতদিনে তাকে বাতিল করা নিশ্চয়ই হয়ে যেত। তবুও এ-ধরনের প্রচার চলে শুধু জোর করে বলার জন্য যে সোভিয়েট বিজ্ঞানকেও নিছক জাতীয়তার ছোপ লাগিয়ে ছাড়ছে।

সংগীত ব্যাপারে শস্টাকোভিচ্-প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে যে সমালোচনা হয়েছিল তা ঠিক কি বেঠিক বলতে আমরা হয়তো পারি না, কিন্তু সংগীত বিষয়ে যে সব খবর আসে তা থেকে সোভিয়েটে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সংগীতকে বিকৃত করছে কি না, অনেকটা বুঝতে পারি। ১৯৪৯ সালে ২৪ জন সংগীতকার (Composer) স্টালিন পুরস্কার পেয়েছেন; এদের মধ্যে আঠারো জন রুশদেশ কিংবা যুক্রেনের বাসিন্দা, বাকি ছজনের মধ্যে একজন করে

মল্‌দাভিয়ান, আজেরবাইজানী, এস্থোনিয়ান্, লাট্‌ভিয়ান, তাতার এবং জর্জিয়ান্ আছেন। জাতিগত সংকীর্ণতার কোনো লক্ষণ এখানে দেখা যায় না। হঠাৎ এক সোভিয়েট পত্রিকা খুলে দেখি এক কারখানার মহিলা কর্মীর ছবি; অবসর সময়ে তিনি পিয়ানো-বাদন নিয়ে থাকেন আর তাঁর সবচেয়ে প্রিয় "Composer" হল জার্মান বেঠোফেন (Beethoven), পোলিশ শোপ্যাঁ (Chopin) এবং রুশ চেকভ্‌স্কি (Chaikovsky)। আরো দেখি যে শস্টাকোভিচ্ অনেক নতুন কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন; তাঁর সাম্প্রতিক রচনা "Song of the Forests"-এর "monumental oratorio form" সম্বন্ধে সমালোচক অকুণ্ঠ প্রশংসা করছে। সংকীর্ণতার পরিচয় তেমন মিলছে না বলেই তো মনে হয়।

সোভিয়েট পক্ষ থেকে একটা কথা সম্প্রতি নিঃসঙ্কোচে জানান হচ্ছে। কথাটা হল এই যে আন্তর্জাতিক মনোবৃত্তি এবং জাতিবৈরীভাব থেকে মুক্ত থাকার মানে বিশ্ববিরাজী হয়ে যাওয়া নয়; প্রকৃত "internationalism" থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে "cosmopolitanism" বস্তুটা সর্বথা বর্জনীয়। এই নিয়ে প্রতীচ্য জগতে কৌতুক পরিহাস যথেষ্ট হচ্ছে; "cosmopolitanism"-এর বিরুদ্ধে সোভিয়েটের এই প্রচার যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরই সংস্করণ মাত্র এই কথা বলা হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে "Western culture" বাঁচাতে হলে সোভিয়েটের বিনাশসাধন যে প্রয়োজন তা বার্ট্রান্ড রাসেল থেকে আরম্ভ করে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির মুখেই শোনা যাচ্ছে।

স্টক্‌হল্‌মে এক বক্তৃতায় সোভিয়েট সাহিত্যিক ইলিয়া এরেন্‌বুর্গ যা বলেছিলেন সেটা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :— "যুদ্ধ যারা চায় তারা তথাকথিত 'প্রতীচ্য সংস্কৃতি' নামে এক বস্তু আবিষ্কার করে যারা শান্তির জন্য সংগ্রামে নেমেছে তাদের বিরুদ্ধে খাড়া করেছে। যারা হাসি একেবারে ভুলে যায় নি তাদের কাছে আমি প্রশ্ন করি : "ফরাসি বৈজ্ঞানিক বের্থলে, পাস্ত্যর ও ক্যুরি-র কাজের কদর কে বেশি করে— অ্যাচিসন্ সাহেব না জোলিয়োক্যুরি? লুভ্‌র, উফিৎসি, প্রাদো চিত্রশালায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহ কার বেশি— জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর না পিকাসো-র? আজকের দিনে শেক্সপীয়রের অভিনয় দেখে এবং বোঝে কারা— মিসিসিপির সম্ভ্রান্ত, পরশ্রমভোগী মালিকরা না সোভিয়েটের সাধারণ মানুষ? শান্তির জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তাদের মতামত যাই হোক না কেন, আমরা সবাইকে শুনিয়ে বলব যে আমরাই প্রকৃতপক্ষে মানব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছি। ইয়োরোপের বিপুল, প্রাণবন্ত মধুভাণ্ডকে আমরা নষ্ট হতে দেব না, সকলের প্রিয় নগর, চিত্রশালা, বিদ্যায়তনকে আমরা রক্ষা করছি। সভ্যতার জন্মভূমি, জাগ্রত এশিয়ার সংস্কৃতিকে আমরাই রক্ষা করছি।"

সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা ("internationalism") যে বিশ্ববিজয়ী ("cosmopolitanism") রূপ পরিগ্রহ করবে, এ কথা সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীদের কাছে অগ্রাহ্য। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিকতা (অর্থাৎ জাতিবৈরীশূন্য মনোভাব) বিশ্ববিরাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তো বটেই, একেবারে পরস্পরবিরোধী। প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা কখনো জাতীয় সত্তার শক্তি ও গভীরতাকে অস্বীকার করে না; অপরপক্ষে সাহিত্য ও শিল্প জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে এবং জাতির বিশিষ্ট ঐতিহ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে তবেই গরিষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়। মস্কোর সাপ্তাহিক 'অগ্নিয়েক্' পত্রিকার সম্পাদক সুরকভ্ সম্প্রতি ভারতীয় সাংবাদিক ইক্‌বাল সিংকে বলেছিলেন : "প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব মূর্তি আছে; মহৎ শিল্প ও সাহিত্য যে জাতি থেকে উদ্ভুত তার মূর্তিকে প্রতিফলিত না করে পারে না"। জাতির এই

'মূর্তিকে' বিশ্ববিরাজ বিকৃত করে ফেলে; শিল্পীকে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিলে তার প্রেরণার উৎস ক্রমে শুকিয়ে যায়। গাছেব শিকড় কেটে দিলে মাটি থেকে রস সংগ্রহ করা যেমন অসম্ভব হয়, স্বীয় ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলে শিল্পীও তেমনই বন্ধ্যা হয়ে পড়ে। সমাজে যখন ভাঙন ধরে, বর্তমানের ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়াবহতা যখন প্রকট হয়ে ওঠে, প্রাচীন জীবনধারার প্রতি অবজ্ঞা ও নবজীবন প্রতিষ্ঠায় অনীহা যখন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যখন মুখ্য অনুভূতি হয়ে দাঁড়ায় জীবনের অসার্থকতা ও ক্রমবর্ধমান বিড়ম্বনা, তখন কোথাও খেই না পেয়ে, কোথাও খুঁটি খুঁজে না পেয়ে শিল্পী নিজেকে মনে করে বানের-জলে-ভেসে-আসা খড়কুটোর মতোই নিরালম্ব ও নিরাশ্রয়— তার দেশ নেই, জাতি নেই, মমতা নেই, আছে শুধু একান্ত স্বকীয় প্রতিভা এবং তার অনিবার্য ব্যর্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিতি।

এই বিশ্ববিরাজী মনোবৃত্তিকে আজ শুধু মুষ্টিমেয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিল্পীর চিত্তবিলাস বললে ভুল হবে। একদা নিশ্চয়ই বলা চলত—

"দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

সংকীর্ণ, আত্মম্ভরী, শক্তিলোভী, জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উত্তোলন করা একসময় শুধু নির্দোষ নয়, শিল্পীর পক্ষে অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। অনেকে যাঁরা শিল্পজগতে "cosmopolitan", যাঁরা Huxley, Auden, Isherwood-এর মতো বস্ত্রপরিবর্তনের মতো দেশ পরিবর্তন করেন, এবং "Ape and Essence"-জাতীয় রচনায় মানুষ জাতের প্রতি অপার ঘৃণা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হন না, Jean-Paul Sartre এবং Albert Camus-এর মতো যে বহু প্রশংসিত "Existentialist"-রা বলেন, "There is only one philosophic problem which is truly serious, and that is suicide"; যে বিশ্রুতকীর্তি নাট্যকার Eurgene O' Neil বলেন, "The life of a pipe dream is what gives life to the whole mis-begotten made lot of us, drunk or sober"; যে Henry Miller ("already among the greatest contemporary writers") বলেন!" "My home? Why, it is the world, the whole world!" আর সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো, ইহুদী, ইতালিয়ান্ ও অন্যান্য "primitive races" সম্বন্ধে অপরিসীম অবজ্ঞা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করেন এবং বলেন, "Action, as expressed in creating a work of art is a concession to the automatic principle of death", তাঁরা এবং তাঁদের মতো আরো অনেকে শুধু প্রলাপ বকে সারা হচ্ছেন বললে একেবারে ঠিক হবে না। সর্বপ্রকার প্রগতির এঁরা আজ বিরোধী; সোভিয়েট এঁদের চক্ষুশূল; সাধারণ মানুষ (তা যে কোনো দেশের হোক না কেন) এঁদের প্রচণ্ড ঘৃণা ভিন্ন অন্য কোনো অনুভূতি উদ্রেক করে না; দেশের মাটির প্রতি মমতা এঁদের কাছে নিছক হাস্যকর কাণ্ড; এঁদের একান্ত উপজীব্য হল আত্মশ্লাঘা— আর এঁদের রচনা ছড়িয়ে দেয় এঁদেরই বিকারগ্রস্ত মনের কদর্য বিষ, এঁদের তূণ থেকে নিক্ষিপ্ত শরের লক্ষ হল মানুষের আত্মসম্মান, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, একযোগে নবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়ার আগ্রহ। শিল্পজগতে এঁরাই হলেন প্রতিক্রিয়ার নির্লজ্জ সৈনিক। "বিশ্ব" (cosmos) শব্দটি ব্যবহার করে নিজেদের মনের ব্যাপ্তি ও ঔদার্য প্রকাশ করতে এঁরা চান বটে, কিন্তু এঁদের মুখোশ ভেদ করে আসল চেহারা সহজেই সবার চোখে ধরা পড়ে যাবে।

বিশ্ববিরাজের ("cosmopolitanism") বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সোভিয়েটে

রুশসংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তার ঘটছে বলে যে অভিযোগ পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকা থেকে প্রায়ই এসে থাকে তার জবাবে সোভিয়েট পক্ষের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত নানা জাতির স্বতন্ত্র, স্বাধীন অথচ দ্রুত অগ্রগতি সোভিয়েটে এতই নিঃসন্দিগ্ধ, সমান অধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির সহযোগিতা সেখানে এতই দ্বিধাহীন ও সফল, যে শত্রুপক্ষও তা অস্বীকার করতে পারে না। সোভিয়েট দাবি করে যে তাদের রাষ্ট্র হল বর্তমান যুগে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার ("internationlism") জাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত। সোভিয়েট দেশে রুশ অধিবাসীদের সংখ্যা হল পাঁচ কোটিরও বেশি; দাঘেস্তান পর্বত অঞ্চলে আবর্তসি (Avartzi) জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যা হল কয়েক হাজার মাত্র; কিন্তু তাদেরও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা করে সমগ্র রাষ্ট্র; কারণ সোভিয়েট পরিবারে কোনো জাতিভেদ নেই, বর্ণ বৈষম্যের ভিত্তিতে বঞ্চনার ব্যবস্থা নেই। কাজাক্ জাতির নিরক্ষর চারণ অধুনামৃত জাম্বুল (Jamboul) সোভিয়েট, ভূমির সর্বত্র রাজোচিত সম্মান পেতেন, কাজাক্ সংস্কৃতি আজ বহু শতাব্দীর সুযুপ্তির পর জেগে উঠে এগিয়ে চলেছে। আজেরবাইজানের মহাকবি নিজামী প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন; তাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্য সোভিয়েটের সর্বত্র সংস্কৃতি উৎসব হয়েছিল। তাজিকিস্তানের কবিশ্রেষ্ঠ সদরুদ্দীন আইনী সম্বন্ধে সোভিয়েটের নানা ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে, তাঁর জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, বৃদ্ধ হলেও তাঁকে দেশবাসী সসম্মানে সোভিয়েট পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত করেছে। মস্কো থেকে চার হাজার মাইল দূরে, একেবারে এশিয়ার মর্মস্থলে অবস্থিত টুভা (Tuva) সম্বন্ধে Douglas Carruther তাঁর "Unknown Mongolia" গ্রন্থে লিখেছিলেন, "this race must soon disappear"; সেখানকার অধিবাসীরা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রবর্গী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পড়লে লেখকের ভবিষ্যদ্‌বাণী নিশ্চয়ই ফলে যেত। কিন্তু সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থায় আজ তাদের মধ্য থেকে আসছে চিত্রকর, অভিনেতা, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের দল। দৃষ্টান্ত বাড়ান অত্যন্ত সহজসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই।

হয়তো কেউ মন্তব্য করতে পারেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা করেও রুশসংস্কৃতির প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকে; তাই 'বনগাঁয়ের শিয়াল রাজা' হয়ে সোভিয়েট হয়তো সেই ঔদার্য দেখাচ্ছে। কথাটা কিন্তু অত্যন্ত অসঙ্গত হবে। সোভিয়েটের বাইরে রয়েছে যে বিরাট মানব পরিবার, তার সঙ্গে সোভিয়েটের সম্পর্ক এবং তার প্রতি সোভিয়েটের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিশ্বসাহিত্যে যা কিছু জীবন্ত, শিল্পের সোনার কাঠির স্পর্শে যা কিছু মোহনীয়, তাকে সংগ্রহ করা ও জনতার সামনে পরিবেশন করায় সোভিয়েটের আগ্রহ ও উদ্যমের সীমা পরিসীমা নেই। তাই দেখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা সোভিয়েট দেশের নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে ন্যূনপক্ষে তিন কোটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে; ব্রিটেন ও আমেরিকায় এ রকম ঘটনা অকল্পনীয়। শেক্সপীয়রের দেশবাসীরা সোভিয়েটের বিভিন্ন অঞ্চলে— যাদের আদিম, অসভ্য বলে আমরা মনে করি তাদেরও নবনির্মিত রঙ্গমঞ্চে— শেক্সপীয়রের নাটক কি ভাবে এবং কত আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে অভিনীত হয় জানলে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে বাধ্য হবে। তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে সোভিয়েটের আগ্রহের খবর আমরা মাঝে মাঝে পাই। আধুনিক যুগে চীনের শ্রেষ্ঠ লেখক লু-সিনের রচনা অনুবাদে সোভিয়েটের প্রসিদ্ধ লেখক

ফাদেইয়েভ্ স্বয়ং প্রবৃত্ত হওয়ার কথা নিজে বলেছেন। ফির্দৌসী সম্বন্ধে তথাকথিত মুসলিম দুনিয়ার চেয়ে সোভিয়েট সাহিত্যসেবকদের অনেক বেশি আগ্রহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে সে-আগ্রহের প্রমাণ তাঁরা দিয়েছেন।

আরো দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে যাওয়ার কোনো হেতু নেই। জাতিবৈরী যে সোভিয়েট দেশে নেই, এ কথা অবিসংবাদী সত্য বলে সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। তাই বিশ্ববিরাজ ("Cosmopolitanism") সম্বন্ধে সোভিয়েট সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মনোভাব লক্ষ করার গুরুত্ব আছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাংবাদিক ইক্‌বাল সিং সোভিয়েট দেশ পর্যটনে গিয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি বলেন যে বিশ্ববিরাজ বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ কেউ সেখানে সকলের উপর চাপিয়ে দেয় নি; বহু দিন ধরে দেশব্যাপী আলোচনা চলেছিল, আর আলোচনায় শুধু লেখক নয়, পাঠকরাও যোগদান করেছিল। বিশ্ববিরাজী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাকে অটুট রাখতে হবে— এই হল তাদের সিদ্ধান্ত। তারা আরো বলে যে বিশ্ববিরাজের মুখোস পরে প্রতিক্রিয়ার জঘন্য চক্রান্তে অংশীদারী করেছেন কোনো কোনো শিল্পী জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক। এরূপ ব্যবহারের ফল অত্যন্ত মন্দ; তাই বিশ্ববিরাজী মনোবৃত্তিকে একটা নির্দোষ চিত্তবিলাস মনে না করে অপরাধ মনে করাই সঙ্গত।

সাধারণ জীবনে "Cosmopolitanism"-এর বিড়ম্বনা আমরা এ দেশে যথেষ্ট দেখেছি এবং দেখি। একদা খ্যাত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ এ দেশকে দেশ বলে মানত না, কিন্তু দেশ তাদের কোথাও জোটে নি, তাই অনুভূতির দৈন্যে ও প্রকৃত কৃতিত্বের অভাবে এ-সমাজের তুলনা মেলা ভার। নতুন পথের নির্দেশ দেওয়ার তাগিদ যারা অনুভব করে, দুঃসাহসী পরিবর্তন সাধনের ব্রত যারা গ্রহণ করে, তারা অবশ্যই সমাজের বহু বিধানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, কিন্তু মূলগত ভাবে জনজীবনের সঙ্গে গ্রথিত না থাকলে তাদের ব্রত উদযাপন কখনো হবে না, তাদের উদ্দেশ্য কখনো সাধিত হবে না। বিশ্ববীক্ষা প্রকৃত কর্মীকে বিশ্ববিরাজী করবে না তার পা থাকবে শক্ত মাটির উপর, আর সেই মাটির নীচে গভীর খাতে বয়ে চলবে জীবনের জল; দেশবাসীর শত ত্রুটি সত্ত্বেও তার মনে হবে— "We are members of one another"; মানবঘৃণা জাতিবৈরী, আত্মম্ভরিতা থেকে সে দূরে থাকবে। যে পথবাসী, যে গৃহহারা, সে গতিহীন হতে বাধ্য।

'বাঙালির ইতিহাস'

বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছিলেন : "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনো মানুষ হইবে না।" আগে ইতিহাস আয়ত্ত করে তার পরে বাঙালি মানুষ হবে, অথবা মানুষ হওয়ার পর ইতিহাস আয়ত্ত করা সম্ভব হবে, অথবা ইতিহাস আয়ত্ত করা আর মানুষ হওয়ার কাজটা একযোগেই চলবে, এ ধরনের 'তৈলধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল'-জাতীয় তর্ক তুলে বঙ্কিমচন্দ্রের কথার কদর্থ করা অসঙ্গত ও অসমীচীন হবে। সমসাময়িক শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও আগ্রহের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মতো মহদাশয় মনীষী ব্যথিত হয়েছিলেন, সাধ্যানুসারে বাংলার ও বাঙালির ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন।

নিছক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ছাড়া নিশ্চয়ই অন্তত আরো দুটো কারণে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের ইতিহাস সম্পর্কে অক্লান্ত আগ্রহ পোষণ করতেন। প্রথম হল তাঁর স্বাজাত্যাভিমান, যাকে ইতিহাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য ছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হল এই যে কল্পনার ঐশ্বর্য যাঁর আছে, তাঁর কাছে অতীত যুগ-যুগান্তরে মানুষের, এবং বিশেষ করে স্বদেশবাসী মানুষের, জীবনযাত্রা, সুখদুঃখ, কীর্তিকলাপ ও ধ্যানধারণার আলেখ্য চিত্রিত করার মতো ইষ্টকর্ম অতি অল্পই থাকতে পারে। বিদ্যা, জাতিগর্ব এবং শিল্পীমন বঙ্কিমচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

বাঙালির মনুষ্যত্ব আজো যথেষ্ট খর্ব হলেও বোধ হয় মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে আমরা কথঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েছি। তাই বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস অন্বেষণ করে সুপরীক্ষিত তথ্যপ্রচারে যাঁরা লিপ্ত আছেন, তাঁদের সংখ্যা আজ নিতান্ত নগণ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের ব্যাপ্তির পরিচয় আমরা পাই যখন দেখি যে তদানীন্তন বহু পণ্ডিতের মতো তিনি শুধু রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস রচনা কামনা করেন নি। বাংলার যে-ইতিহাস বলবে "রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত? রাজসৈন্য কত ছিল কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি?...রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য এ সকল কিরূপ ছিল?...তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কি রূপ?...বাণিজ্য কিরূপ?...পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্বাহ হইত?"...তেমন ইতিহাসই তিনি কামনা করেছিলেন।

আবার বহু বৎসর পরে "গৌড়রাজমালা" রচয়িতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিঃসংকোচ ভাষায় বলেছিলেন, "বাঙালির ইতিহাসের প্রধান প্রধান কথা— বাঙালি জনসাধারণের কথা। শুধু রাজা ও রাজপুরুষদের বৃত্তান্ত নয়, শুধু মুষ্টিমেয় বিত্তবানের কাহিনী নয়, "অকীর্তিতান্ আচণ্ডালান্" প্রভৃতি সকলকে নিয়ে বাঙালির যে-সমাজ তার ইতিহাস আমাদের চাই, বিভিন্ন সমাজবিন্যাসের উত্থানপতনের বিবরণ এবং তার প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয়ের উপাদান চাই, নতুবা ইতিহাস আলস্যমোচনের প্রক্রিয়া ও অবসরবিনোদনের উপকরণ মাত্র হয়ে থাকবে।

পূর্বসূরীদের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ করে নীহাররঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস রচনার যে প্রয়াস করেছেন, তা বাঙালির অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই রাখবে। এত বিশদ, এত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ভারতবর্ষীয় কোনো ভাষাতেই আজো প্রকাশ হয় নি। আচার্য যদুনাথ সরকার একে "মহাগ্রন্থ" আখ্যা দিয়েছেন; তাঁর একাগ্র, তথ্যনিষ্ঠ মন এ-যাবৎ প্রায় নিছক রাষ্ট্রিক ইতিহাস নিয়ে তন্ময় থেকেছে, কিন্তু নীহাররঞ্জনের ব্যাপক প্রচেষ্টা দেখে যে তিনি বিচলিত হন নি, বরঞ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠেছেন, তা আচার্যবরের জাড্যলেশহীন মনীষা এবং নীহাররঞ্জনের অসামান্য কৃতিত্বেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

নীহাররঞ্জন বারবার সবিনয় জানিয়েছেন যে তিনি শুধু কাঠামো রচনার চেষ্টা করেছেন। "এই গ্রন্থের অপূর্বত্ব ও গভীর মহিমা" আচার্য যদুনাথকে মুগ্ধ করেছে; তাই তিনি এর "ত্রুটিবিচ্যুতি" থাকলেও "ছিদ্রান্বেষী"-দের বিরুদ্ধে পাঠককে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কিন্তু "অনন্যপূর্ব" গ্রন্থ বলেই এর প্রকৃত সমালোচনা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় এমন বই নেই বলেই আমরা এর বিষয়বস্তু, এর গুরুত্ব, এর বিচারপদ্ধতির কথা ভাবব এবং সঙ্গে সঙ্গে যেখানে প্রলুব্ধ পাঠকের প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায় তখন তার উল্লেখ করতে চাইব। ছিদ্রান্বেষিতা-দোষে অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কার আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকা অকর্তব্য হবে।

গ্রন্থপঞ্জী এবং লিপিমালা-সূচী "বাঙালির ইতিহাস"-এর একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বিভিন্ন পরিচ্ছেদের বক্তব্যের সঙ্গে গবেষণাফলপ্রাপ্ত তথ্যের সম্পর্ক সূচিত করা নেইন সম্ভবত নীহাররঞ্জন যাঁদের মনশ্চক্ষুর সামনে রেখে লিখেছিলেন তাঁরা "সাধারণ পাঠক" নামেই মোটামুটি পরিচিত, এবং সেইজন্য তিনি অন্যান্য ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লেখা ইতিহাস গ্রন্থের রীতি অনুসরণ করেন নি। কিন্তু "সাধারণ" পাঠকের মনে এই অসাধারণ গ্রন্থপাঠের পর তথ্যসংগ্রহ ও বিচার সম্পর্কে একটা অ-"সাধারণ" আগ্রহ জাগা যখন একেবারেই অস্বাভাবিক নয়— এবং সেই আগ্রহ জাগরুক করা নীহাররঞ্জনের সুলিখিত বচনারই অনিবার্য উদ্দেশ্য— তখন তাঁর তথ্য ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিভিন্ন বিদগ্ধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সম্পর্ক পাদটিকায় সূচিত করা উচিত ছিল।

নীহাররঞ্জনের গ্রন্থে পুনরুক্তি দোষ মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। এত বড়ো রচনায় পুনরুক্তি কতক পরিমাণে অনিবার্য হলেও একই উদ্ধৃতি একই সিদ্ধান্তের পোষণে একাধিকবার একই ভাবে দেখা দিলে অস্বস্তি লাগে। আচার্য যদুনাথ এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ চেয়েছেন; পুনরুক্তি বাদ দিয়ে এবং তথ্যসমাবেশকে কথঞ্চিৎ লঘু করলে রচনার হানি তো হবেই না, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হতে পারে।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রখর সমাজচৈতন্য একীভূত হয়েছে বলে নীহাররঞ্জনের বাংলার ইতিহাস রচনাক্ষেত্রে অনন্যপূর্ব রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সমাজচৈতন্য সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে যেন উপনীত হতে পারে নি। তিনি অবশ্য বলেছেন— এবং বলে এই মান্ধাতাগন্ধী দেশের উপকারও করেছেন— যে যে-তথ্যের "কোনো ব্যঞ্জনা নাই, যে-তথ্য শুধুই বিচ্ছিন্ন তথ্য মাত্র, কোনো যুক্তিসূত্রে গ্রথিত নয়, ইতিহাসে তাহার কোনোই মূল্য নাই"। সকল তথ্যের পশ্চাতে "কার্যকারণ-পরম্পরার অমোঘ নিয়ম" তিনি অন্বেষণ করেছেন। "ধনসম্বল" "শ্রেণীবিন্যাস" "দৈনন্দিন জীবন" প্রভৃতি হল তাঁর সমৃদ্ধ পরিচ্ছেদগুলির আখ্যা। জনজীবনের পরিবর্তমান পর্যায়ের মধ্যে তিনি 'ইতিহাসের ইঙ্গিত' খুঁজেছেন। কিন্তু সেই অন্বেষণে ব্যাপৃত হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতির জালে যেন তিনি জড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর খবর তিনি দিয়েছেন, জীবিকার্জনের বিভিন্ন উপায়ের তালিকা তাঁর কাছে পাই, আহারবিহার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য তিনি হাজির করেছেন, নাগরিকের বিলাসব্যসন ও দরিদ্রের বঞ্চনার প্রতিকৃতি তাঁর বর্ণনায় ফুটে ওঠে, কিন্তু সমাজপতি ও ইতরজনের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ধোঁয়াটে হয়ে যায়, উৎপাদনের উপায় ও উপকরণ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেও ধনোৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিতের অধিক কিছু তিনি পাঠককে দেন না।

জানি বাংলার প্রাচীন ইতিহাস লিখতে হলে প্রতি পদক্ষেপে উপাদানের অভাবের জন্য আক্ষেপ করতে হয়। এ কথা নীহাররঞ্জনও জানিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি যখন তাঁর নিঃসন্দিগ্ধভাবেই আছে, তখন তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা কম হবে কেন? তাঁর কাছে চেয়েছিলাম সেই গুণ যাকে নিছক পণ্ডিতেরা দুঃসাহসিকতা ভাবতেন, কিন্তু সেই দুঃসাহসিকতার বলে নীহাররঞ্জন নিশ্চয়ই আমাদের দিতে পারতেন প্রতিভাদীপ্ত অনুমান, যা প্রতি বর্ণে নির্ভুল না হলেও প্রকৃতই "ইতিহাসের ইঙ্গিত" ফুটিয়ে তুলত।

বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে নাড়ীর টানে বাঁধা না থাকলে এমন বই লেখা কারো পক্ষে সম্ভব হত না। বিনয়বাহুল্য বর্জন করে নীহাররঞ্জন সেই দাবি করেছেন, অত্যন্ত ন্যায্যভাবেই করেছেন। সাধারণ বাঙালির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নিতান্ত খুঁটিনাটি খবর নিয়ে তাই তিনি আবেগভরে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যেন অনেকগুলো আলাদা কামরা রয়েছে— একটার দরজা খুললে অপরগুলো বন্ধ করতে হয়। তাই 'রাজবৃত্ত' অধ্যায়ে তিনি সাধারণ মানুষকে ঢোকাবার চেষ্টা করেও যেন পারেন নি। বিভিন্ন রাজশাসনের ভাগ্য পরিবর্তন ও উত্থানপতনের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ কতটা ছিল বা না ছিল বোঝাতে পারেন নি। বাংলায় ''গ্রামীণ'' সভ্যতা সত্ত্বেও সমৃদ্ধ নগরজীবন কেন কি ভাবে দেখা দিল এবং নগরসমূহেরই উত্থানপতন কিংবা গুরুত্ববৃদ্ধি ও হ্রাস কেন ঘটল তার বিশ্লেষণ করেন নি।

ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলের তুলনায় সংখ্যাল্প হলেও বাংলা দেশে বহুদিন থেকে শহরের অভাব ছিল না। তাদের বিবরণ নীহাররঞ্জন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাবেই দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কোনো যুগে বাণিজ্যসমৃদ্ধি এবং নগরশোভা যথেষ্ট বর্ধিত হলেও আমাদের ''গ্রামীণ'' সভ্যতা ও সমাজ অবাধ, অটুট থেকে গেল কেন, এ-প্রশ্নের অবতারণা তিনি করেন নি। আমাদের নগরপুঞ্জে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের মতো বুর্জোয়াশ্রেণীর পূর্বপুরুষ কেন দেখা দিল না, বিপুল শিল্পবৈভব সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনিবার্য গতিতে সমাজবিপ্লব দেখা দিল না, সে সম্বন্ধে আলোচনা তিনি করেন নি। তদানীন্তন শ্রেণীবিন্যাস ও উৎপাদনব্যবস্থা এমন ছিল যে তার ফলে গ্রামপরিবেষ্টিত নগরগুলির সত্তা যেন অস্বাভাবিক হয়েছিল; রাজা, রাজপুরুষ ও মুষ্টিমেয় শ্রেণী ও ভূম্যধিকারীর বিলাসব্যসনের অনুরূপ সামগ্রী উৎপাদনেই যে শিল্প ব্যাপৃত হয়ে রইল; বহির্বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ যে হল বিলাস চরিতার্থকরণের উপকরণ এবং অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশই যে তেমন হল না— ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা তিনি করেন নি। প্রাচীনকালে রাষ্ট্র যে যুদ্ধায়োজন, রাজস্বসংগ্রহ এবং পূর্তকার্য বিনা বিশেষ কোনো গুরুভার বহন করত না, এই তথ্যের উল্লেখ তিনি করেন নি। অথচ তা না করলে পল্লীসমাজের গঠন ও একান্ত আত্মনির্ভর সংকীর্ণতার কথা বোঝা যায় না, গ্রামের স্বল্পপরিসর জীবনের জাড্যে জনমনের চেতনা ও বিক্ষোভ যে বাঁধা পড়েছিল, তা বোঝা যায় না।

নীহাররঞ্জনের কাছে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে খ্রীস্টাব্দের ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাঙালির জীবনযাত্রার বর্ণনা তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন, বহু পণ্ডিতের গবেষণালব্ধ তথ্য বিচার করে তার সংক্ষিপ্তসার আমাদের জানিয়েছেন কিন্তু যে সমস্ত প্রশ্নের কথা তাঁরই ''ইতিহাসের যুক্তি'' ও ''ইতিহাসের ইঙ্গিত'' পড়ে মনে হয়, সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেন নি, প্রায়ই উত্তর দেবার প্রয়াসও করেন নি।

গুপ্তাধিকারের যুগ থেকেই আমরা বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। কিন্তু সর্বভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে নীহাররঞ্জনের অতিরিক্ত অনুরাগ আছে বলেই বোধ হয় প্রাচীন যুগের বাঙালির ইতিহাস রচনায় তাঁর মনোযোগ বাঙালির তদানীন্তন জীবন থেকে যেন কিছুটা দূরে সরে গেছে।

প্রাচীন বাংলা যে বৌদ্ধপ্রধান ছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রায় সমস্ত চিহ্নই সম্ভবত ব্রাহ্মণ-নেতৃত্বে বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করা হয়েছিল। সে-যুগের শ্রেণীসংগ্রামের এই যে নির্মম দৃষ্টান্ত আমরা পাই, তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হয়,

কিন্তু নীহাররঞ্জন সে-কামনা পূরণ করেন নি; তথ্যসংগ্রহ পর্যাপ্ত নয় বলেই হয়তো করেন নি, কিন্তু ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ-ঘটনাব তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু সার্থক আলোচনা হয়তো অসম্ভব ছিল না।

খুব সম্ভবত একজন বৌদ্ধ বাঙালির লেখা "আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে" রাজা শশাঙ্কের বিবরণ আছে এবং পরে প্রজারা অরাজকতার জন্য ভদ্র নামে একজন শূদ্রকে রাজপদে বরণ করেন বলে উল্লেখ আছে। এ-ধরনের তথ্যের বিচার এবং প্রজাপুঞ্জ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে রাজপদে বরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে নীহাররঞ্জনের কাছে আমরা বহু শিক্ষণীয় সিদ্ধান্ত আশা করেছিলাম।

মাৎস্যন্যায়-জর্জরিত বাংলায় প্রকৃতিপুঞ্জ "দাসজীবিন্", অর্থাৎ অতি নীচ শ্রেণীর শূদ্র, প্রথিতযশা গোপালকে রাজপদে বরণ করে ইতিহাসে নতুন এক যুগের সূচনা করে। এই বহুপ্রখ্যাত ঘটনার বিবরণ নীহাররঞ্জন অবশ্যই দিয়েছেন, কিন্তু এ-ঘটনার পূর্বমীমাংসার চেষ্টা তিনি করেন নি, জনজীবনের অসন্তোষ কি আকারে, কি প্রকৃতির নেতৃত্বে প্রকট হয়েছিল, তার সন্ধান করেন নি। হয়তো পাণ্ডিত্যের রীতি তাঁকে অনুমানের আশ্রয় নিতে দেয় নি, কিন্তু "ইতিহাসের ইঙ্গিত" এ-ক্ষেত্রে কি, সে-বিষয়ে কিঞ্চিত অনুমান হয়তো অবান্তর হত না।

"পঞ্চ-গৌড়েশ্বর" পালরাজগণ কিছুকাল উত্তর ভারতে সার্বভৌমত্ব উপভোগ করেন। কিন্তু সর্বভারতীয় আদর্শ এবং রাজ্যবিস্তারের অপূরণীয় কামনাই পালবংশের কাল হয়েছিল। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে কিছুকাল পালযুগে বাংলার আপামর জনসাধারণ প্রায় এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। ছড়া ও গানে তার কিছু কিছু নিদর্শন মেলে। পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা হয়তো বৌদ্ধবিদ্বেষ বশত পালযুগের শৌযবীর্য ও গুণগরিমার চিহ্ন মুছে দেবার চেষ্টা করেছিল। এখন "ধান ভানতে মহীপালের গীত"-কে বদলে "ধান ভানতে শিবের গীত" গাওয়া হয়। "চৈতন্য চরিতামৃতে" দুঃখ করে বলা হয়েছে : "জোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত, শুনে সব লোকে আনন্দিত।"

দশম শতাব্দীর শ্রেণীসংগ্রামের কথা নীহাররঞ্জন যত ভালো করে বলতে পারেন তেমন হয়তো আর কেউ পারেন না, কিন্তু সে-চেষ্টা তিনি করেন নি। জানতে ইচ্ছা যায়, "আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে...সাজতে সাজতে পড়ল সাড়া, সাড়া গেল বামুনপাড়া" যে-ঘটনাবলীর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে, তার প্রকৃত কি রূপ ছিল? ধর্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনের যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট ধর্মপালের শ্যালিকাপুত্র কামরূপ-বিজয়ী লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত ছিল কালু ডোম। ধর্মমঙ্গলে দেখা যায় ডোম সেনাপতি ইন্দ্রমেটে গৌড়ের শহর কোটাল, একজন চণ্ডাল চেকুরের শহরে কোটাল, আর কেচুরের ইছাই ঘোষ সম্ভবত গোয়ালা। "আর্যমঞ্জুশ্রী" কথিত পালরাজাদের জাতি এবং তাদের সামন্ত ও কর্মচারীদের জাতি দেখে তখনকার বাংলার সামাজিক স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায়। বাংলার সামাজিক চেহারা সেনযুগ থেকে দারুণ বদলে গিয়েছে। কিন্তু সেই পরিবর্তন ও তার অনুষঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের খবর আমরা তেমন জানি না, নীহাররঞ্জনও দেন নি।

পালবংশের পক্ষে সর্বভারতীয় প্রতিপত্তির মোহমুগ্ধ হওয়া সে-যুগে একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তার মূল্য দিতে হল বাঙালিকে— বিপুলবিভব ও শক্তিসম্পন্ন পালবংশের পতন ঘটল। বাঙালির ইতিহাস বাঙালি নিজে গড়বার যে-চেষ্টা কিছুকাল করল, তার অবসান হল।

আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি যে পালবংশকে দুর্বল করে তুলছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। কৈবর্ত-বিদ্রোহ, বরেন্দ্রীতে কৈবর্তাধিপত্য (১০৭৫-১১০০ খ্রী:), দিব্যের ভুমিকা, ক্ষৌণীনায়ক ভীমের চরিত্র ও কীর্তি সম্বন্ধে তাই অনেক কিছু জানার রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়

ঐতিহাসিকেরা দিব্য ও ভীম সম্পর্কে উদাসীন ও বিরুদ্ধভাবপোষক বলে যদি নীহাররঞ্জন তাদের বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য পূরণ না করেন তো বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তথ্যকে বিকৃত না করে তদানীন্তন সমাজবিক্ষোভের আলেখ্য তিনি নিশ্চয়ই দেবার চেষ্টা করতে পারেন।

বিদেশাগত, ব্রাহ্মণ্যবাদী, রাঢ় দেশের শূরবংশ এবং পূর্ববঙ্গের বর্মণেরা পালযুগের পর এসে বাঙালির গলায় যেন লৌহশৃঙ্খল পরাতে আরম্ভ করে। তারপর কর্ণাট থেকে সেনেরা এসে সেই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করে। তাই তুরস্কের শক্তিশেল যখন বাংলার বুকে বাজল, বাঙালি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবংশীয়রা তখন গৌড়দেশের জাঁক করে না, করে কেবল নিজের বর্ণের ও বংশের! আচার্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর ভাষায় বলতে গেলে "তারপর আসে দেবীবরের মেলবন্ধনের পালা, আর রঘুনন্দনের সতীদাহ ও আচারের কড়াকড়ির ব্যবস্থা"। এই বিবর্তনের পিছনে আছে বিক্ষোভ, আছে সংগ্রাম. আছে প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলির পরাজয়।

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়" বাঙালিকে চলতে হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতির জাড্য সত্ত্বেও বাঙালির ইতিহাসে আছে চলনশীলতা, আছে সংগ্রাম, আছে নৈরাশ্য, আছে দুঃসাহসিকতা।

নীহাররঞ্জনের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তথ্য বিচারে তাঁর সমাজসচেতন মন যদি অস্পৃষ্টকল্পনা পাণ্ডিত্যের হিমজাল থেকে আরো বেশি মুক্ত হতে পারত, তো আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি থাকত না।

ভূমিকায় নীহাররঞ্জন লিখেছেন : "এ-গ্রন্থ যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন বাংলাদেশ অখণ্ড এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত; আজ গ্রন্থরচনা যখন শেষ হইল, রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছায় ও কূটকৌশলে দেশ তখন দ্বিখণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাহার অনাদিকালের নাড়ীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে বাংলাদেশ কখনো এত গভীর ও ব্যাপক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় নাই। ইহার ফলে আজ বাঙালি জীবন যে-ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও হইতেছে, সপ্তম-অষ্টম শতকের মাৎস্যন্যায় এবং ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি বিপর্যয়েও তাহা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিধাতাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সীমানার এপার-ওপার লইয়া বাংলাদেশ ও বাঙালি এক ও অখণ্ড। এই গ্রন্থে আমি সেই এক এবং অখণ্ড দেশ ও জাতিরই ধ্যান করিয়াছি। অন্যতর ধ্যান সম্ভব নয়; বহুদিন পর্যন্ত তাহা সম্ভবও হইবে না।"

এই উক্তির সম্যক অনুধাবন ও উপলব্ধি আজ নিতান্ত প্রয়োজন। বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখতে হলে বাংলার ঐক্য ও অখণ্ডতা বিনা তা প্রকৃতই সম্ভব নয়; বাংলার প্রাণবন্ত তথাকথিত রাষ্ট্রবিধাতারা নিষ্পিষ্ট করলে বাংলা ও বাঙালির পক্ষে বৃহত্তর কোনো সংঘের মধ্যেই স্থান করে নেওয়া সম্ভব নয়। ভাষা, বৃত্তি সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতভূখণ্ডে বাঙালি ও অন্যান্য যে সমস্ত জাতি বাস করে, তাদের প্রাথমিক জাতীয় ঐক্য ও সত্তা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। পাকিস্তান ও ভারত-নামক রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার মতো স্বভাবধর্মবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া তখন অনিবার্য। গ্লানিমুক্ত নূতন ভারতবর্ষ নূতন অখণ্ড বাংলা বিভিন্ন ভারতবাসী জাতির অখণ্ড ঐক্যের পরিবেশই নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবে। "নান্যঃ পন্থাঃ"।*

*এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত "প্রগতি" গ্রন্থে প্রকাশিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ফুটবল প্রসঙ্গে

কিছুকাল আগে খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট খবর বেরিয়েছিল যে, মোহনবাগানের স্বনামধন্য গোষ্ঠবিহারী পালকে তাঁর অনুরাগীরা একটা অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানাবেন। সে অনুষ্ঠান হয়েছিল কি না, তার কোনো খবর অবশ্য কাগজ মারফত আর পাই নি। তারপর সেদিন "স্বাধীনতার" রবিবারের সংখ্যায় হাবুল সরকার মশায়ের লেখা ফুটবল সম্বন্ধে একটা চমৎকার প্রবন্ধে পড়লাম। তাই আগেকার দিনের ফুটবল খেলার কায়দা আর ময়দানের আবহাওয়া আজকের তুলনায় কেমন ছিল, সে বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ আছে ধরে নিচ্ছি।

আমরা যখন খেলা দেখেছি, তখন গোষ্ঠ পালের দোর্দণ্ড প্রতাপ চলেছে, কিন্তু হাবুল সরকার হলেন আরো পুরানো দিনের গুণী। আমরা তাঁকে যে একেবারে খেলতে দেখি নি তা নয়। কিন্তু ফুটবল ভালোবাসতেন বলেই তিনি তখন কালেভদ্রে খেলতেন, আর তাঁকে নামতে দেখেছি মোহনবাগানের হয়ে দ্বিতীয়শ্রেণীর খেলায়— দর্শকরা তাঁকে লক্ষ করে বলাবলি করেছে যে আগেকার বাঘা খেলোয়াড় বলে আজো বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কি খেলাতে পারে!

শিবদাস আর বিজয়দাস ভাদুড়ীর মতো যাঁদের খেলার তারিফে প্রাচীন ক্রীড়ামোদীরা প্রায় বিশেষণ খুঁজে পান না, তাঁদের দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। মোহনবাগানের ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী মহারথীদের মধ্যে কয়েকজনকে মাঠে দেখা গেলে লোকে আঙুল দিয়ে দেখাত— যেমন দেখাত সেন্টারফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষকে। উয়াড়ীর হয়ে একবার ঐ মহারথীদেরই অন্যতম 'কানু'কে (জে. রায়) খেলতে দেখেছিলাম। সেই প্রথম যুগের নামজাদা খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে হাবুলবাবু যদি মাঝে মাঝে "স্বাধীনতা" মারফত আমাদের গল্প শোনান তো চমৎকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে হকি আর ক্রিকেটের কথাও যেন তিনি বাদ না দেন।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দিনের কথা ভাবতে গিয়ে তাকে আজকের তুলনায় ভালো মনে করা মানুষের একটা স্বভাব। তাই আজকের ছেলেরা ভাবতে পারে যে আগেকার ফুটবলের তুলনায় আজকের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, এ কথা যারা বলে তারা শুধু বুড়ো হয়েছে বা হচ্ছে বলে নিজেদের যুগে সব কিছু সরেস আর আজ সবকিছু নিরেস বলতে চাইছে। এদিক থেকে হাবুলবাবুর লেখাটা নিশ্চয়ই অনেকের চোখ খুলে দিয়েছে। গল্প করতে বসেও তিনি বেশ নিক্তির ওজন ব্যবহার করেছেন যখনই তুলনার কথা উঠেছে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের দুর্জয় খেলার বাহবা তিনি করেছেন অকুণ্ঠভাবে। আর বলতে সংকোচ করেন নি যে বর্তমানে অন্তত ফুটবলের একটা বিভাগে উন্নতি হয়েছে— গোলকীপারের খেলা আগের চেয়ে নিঃসন্দেহে উঁচু কায়দার।

তবে একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে আজকের ফুটবল খেলার মান আগের তুলনায় সত্যিই অনেক নীচে চলে গেছে। এক সময় গর্ব করতাম যে আমাদের পার্টি হল একদিক থেকে সবাইয়ের সেরা— পার্টিসভ্য হিসাবে আমাদের মধ্যে আছে নানান ধরনের মানুষ, এমনকি ধ্রুপদী গাইয়ে আর ফুটবল ইন্টারন্যাশনাল খেলোয়াড়। এটা গর্ব করার বিষয় এই জন্য যে

অন্যান্য পার্টিতে নাম লেখান সভ্য থাকে অনেক, কিন্তু আমাদের পার্টিতে কাজ না করলে কারো জায়গা নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলব যে বীরেন ঘোষ (যিনি এরিয়ানের বি, ঘোষ নামে একদা বিখ্যাত ছিলেন) সাত বছর বন্দী হয়ে কাটাবার পর থেকে পার্টির কাজে লেগে রয়েছেন। আজ তিনি যুবসংঘের একজন নেতা। তাঁর মতো 'উইং ফরোয়ার্ড, দু'পা যাঁর চলত সমান নৈপুণ্যে, শটের জোর যাঁর ছিল প্রচণ্ড, এবং (বাঙালির পক্ষে) ঈষৎ স্থূল শরীরে ক্ষিপ্রগতি যাঁর ছিল অসাধারণ, তাঁর জুড়ি ঠিক আজকে দেখা যায় না।

লিখছি বলে খেলা সম্বন্ধে যে আমি একটা বিশেষজ্ঞ, তা একেবারেই নয়। খেলায় কোনো কালেই আমি সুবিধা করতে পারি নি, আর চোখ নেহাত খারাপ বলে খেলার জগতে আশা করার কোনো রাস্তাই আমার ছিল না। কিন্তু আমরা সেই যুগে মানুষ হয়েছি, যখন ভাইয়েরা প্রায় সব মিলে আর মাঝে মাঝে পাড়ার দু'চারজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়ির ছাদে কিংবা গলির রাস্তায় বাতিল টেনিস বল কিংবা এক পয়সা দামের নেকড়ার বল নিয়ে দিনক্ষণ বিচার না করে মাতা গেছে, ভালো খেলছে এমনি ছোটো এক ভাইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে রবি গাঙ্গুলী (যিনি মোহনবাগানের, এবং সর্বভারতীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'রাইট ইন' ছিলেন, অন্তত আমাদের সময়ে)। দুপুরে তিনতলার ছাদে ধুপ ধাপ শব্দ হওয়ায় গুরুজন বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু খেলা তবু একেবারে বন্ধ কখনো হয় নি। এখন খেলা ব্যাপারটা বেশ যেন অভিজাত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে— ''ক্লাস ফাইভের'' ছেলেরাও অন্তত তিন নম্বরের বল ছাড়া উঠোনে খেলতে নামা অমর্যাদাকর মনে করে।

ময়দানে খেলা দেখেছি আমরা ১৯২১-২২ থেকে, স্কুলে যখন পড়ি সেই সময়। একটু লায়েক হবার পর দু'চারজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালো লীগ আর শীল্ড খেলার অনেকগুলো দেখার চেষ্টা করা গেছে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত আমি থেকেছি বাইরে— তারপর থেকে খেলা দেখার সময় বিরল হতে শূন্যে এসে দাঁড়াবার উপক্রম করেছে।

আজকাল কয়েকবার খেলা দেখতে গিয়ে বিমর্ষ হয়ে ফিরতে হয়। কোনো কোনো দিক থেকে বিচার করলে খেলার বৈজ্ঞানিক কৌশলে হয়তো কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বুট পরে খেলা ব্যাপারটা অবশ্য অগ্রগতিরই পরিচায়ক (যদিও যে দেশে ছেলেবয়স থেকে বুট পরে আমরা খেলার সম্ভাবনা রাখি না, সেখানে বুট পরা ফুটবলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিত হতে হবেই)। ব্যক্তিগতভাবে আজকালকার কোনো কোনো খেলোয়াড় রীতিমত বাহবার যোগ্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলার প্রাণ যেন চলে গেছে, যে প্রাণ আছে তা বেশ খানিকটা বিকৃত বলেই আশঙ্কা করি।

আগেকার বড়ো খেলোয়াড়দের নাম করতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। অনেক ছড়িয়ে লিখলে তবে সেদিনকার ছবি ঠিকভাবে আঁকা যায়। তার সময় বা সামর্থ্য আমার নেই। তবে একথা ঠিক যে কতকগুলো নাম না করলেই নয়। গোষ্ঠ পালের নামই তো ছিল চীনের প্রাচীর— ক্যালকাটার লেফট উইং নাইট কি রকম গোষ্ঠকে দেখেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তা অনেকেরই স্মরণ হবে। হাফব্যাকদের মধ্যে ননী গোঁসাই, সুধাংশু বসু, চৌকশ বলাই চ্যাটার্জী (যদিও তাঁর খেলা আমার পছন্দ হত না), মণি দাস, মতি সেনগুপ্ত, তুলসী দাস, কিছুটা পরের যুগের নূর মহম্মদ প্রভৃতির নাম লিখতে লিখতে মনে পড়ছে। দুখীরামবাবুর হাতে গড়া যে সব খেলোয়াড়রা এরিয়ান্স এবং অন্যান্য ক্লাবে নাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ছনে' (এস. মজুমদার) যিনি সে যুগে বুট পরে খেলতেন অবলীলাক্রমে।

ফরোয়ার্ড লাইনে 'উইং' হিসাবে সামাদের তুলনা কোথাও কখনো পাওয়া শক্ত। তদানীন্তন ই. বি. আর, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিংয়ে এই আশ্চর্য খেলোয়াড় খেলেছিলেন। এক বছরে মোহনবাগানের ফরোয়ার্ড লাইনে ছিলেন সূর্য চক্রবর্তী (তিনি এরিয়ান্স এবং ইস্টবেঙ্গলে আগে এবং পরে খেলেছিলেন), রবি গাঙ্গুলী, মোনা দত্ত, কুমার এবং সামাদ; এর সঙ্গে তুলনা করা যেত শুধু রসীদ, রহিম, রহমৎ প্রমুখ ফরওয়ার্ড-বিভূষিত মহমেডান স্পোর্টিং-এর। কুমারের মতো কুশলী ও সব সময়ে মাথা ঠাণ্ডা খেলোয়াড় আর দেখা গেছে কিনা জানি না; বল উইংয়ে ঠেলে দেওয়ার কায়দায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মোনা দত্তের মাথার হেড আর পায়ের শট ছিল প্রচণ্ড। খেলার কায়দাও ছিল সুন্দর; শরৎ সিংহ বা রহমানের নামও এখানে করা উচিত।

অনেক নাম বাদ পড়েছে, সুতরাং নামের ফিরিস্তি না বাড়ানোই হয় তো উচিত। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের উল্লেখ বোধ হয় বেশি হয়ে গেছে— তার এক বড়ো কারণ হল এই যে প্রধানত মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে আমাদের স্বাদেশিকতা আমাদের ক্ষুব্ধ, আহত স্বাজাত্যভিমান প্রকাশ পেত; এতে তখনকার দ্বিতীয় প্রধান ক্লাব এরিয়ান্সকে কিংবা পরবর্তী ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং, কিংবা কুমারটুলী, হাওড়া ইউনিয়ন, ভবানীপুর প্রভৃতির মতো দলকে খেলো বলা হয় না একটুও।

তবে এটা অবিসম্বাদিতভাবে ঠিক যে মোহনবাগানের যারা অনুরাগী, তারা মোহনবাগান পল্লী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ রাখত না। মোহবাগানের পরিচালকদের অনেক কাণ্ড তারা রীতিমত অপছন্দ করত কিন্তু ফুটবল মাঠে ১৯২১ সালের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানকে দেশের গৌরব বলেই তারা মনের মধ্যে অমন চওড়া একটা জায়গা দিয়েছিল।

এর কারণও ছিল যথেষ্ট। ১৯২৩ সালে মোহনবাগান শীল্ড ফাইন্যালে ক্যালকাটার কাছে পরাজিত হল। তিনদিন ধরে অসম্ভব বৃষ্টিপাত হয়েছিল, মাঠ জল কাদায় একেবারে ডুবেছিল। একরকম জোর করে সেই অবস্থায় খেলা হয় (আজকের কোনো 'টিম' সে মাঠে খেলতে রাজি হত না) আর বিপর্যয় ঘটে। এর পেছনে বিদেশি প্রভুজাতির কারসাজি আমরা দেখেছিলাম। আর সেটা যে আমাদের ভুল নয়, তা বারবার প্রমাণ হয়েছে। ক্যালকাটার মেম্বারদের বেঞ্চিগুলি তখন ভর্তি থাকত, আর মোহনবাগানের পরাজয়ে সাদামুখোদের উল্লাস আমরা বহুবার দেখেছি। ক্রেটন নামে এক রেফারী ছিলেন; বুদ্ধিমান লোক, খেলার আইনকানুন তাঁর নখাগ্রে, কিন্তু ভারতীয় বিদ্বেষে ভরপুর— অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার লোক তখন হোমরাচোমরাদের মধ্যে ছিল না।

১৯৩৬ সালে একটা ঘটনা ঘটে— যার মধ্য দিয়ে এই রেফারি বিভ্রাট ব্যাপারের মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোষ্ঠ পাল মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন হিসেবে ছিলেন ধীর, স্থির সুবিবেচনার প্রতীক; কোনোদিন কেউ তাঁকে ফাউল খেলতে দেখে নি, রেফারির নির্দেশ অমান্য করতে তো নিশ্চয়ই দেখে নি। সেদিন তিনি ক্যালকাটার সঙ্গে এক খেলায় একেবারে ধৈর্য হারিয়ে ইচ্ছা করে হ্যান্ডবল করলেন, মাটিতে শুয়ে পড়লেন, ছ'খানা গোল নিজেদের বিরুদ্ধে করে দিলেন। পক্ষপাতী রেফারির দুষ্কর্ম বহু বছর সহ্য করার পর তাঁর এই বিদ্রোহ যারা দেখেছে, তারা তা ভুলবে না। ইংরেজ খেলোয়াড় অনেক সময় অবশ্য আমাদের চেয়ে ভালো খেলত, কিন্তু ন্যায়যুদ্ধ তাদের সঙ্গে আমাদের প্রায়ই হত না— এটা অবধারিত সত্য, পক্ষপাতী মনোভাব নয়।

'কিউ' করে টিকিট কেনার রেওয়াজ তখন আজকের মতো হয় নি। টিকিটঘরের সামনে ভিড়ের মধ্যে হুমড়ি খাওয়া, মাঝে মাঝে পুলিশ ঘোড়সওয়ারের তাড়া খাওয়া ইত্যাদি প্রায়ই ভাগ্যে জুটত। একবার বেশ মনে আছে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর আবার জড় হতে গিয়ে দেখি যে পাশেই আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের দুইজন স্বনামধন্য অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে আজো একজন জীবিত। নাম করার সাহস নেই। সাড়ে চার আনার গ্যালারির টিকিট কিনে ঢুকে দেখি সামনেই প্রশান্ত মূর্তিতে বসে আছেন দুইজন সহকর্মীকে নিয়ে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়। আজকাল হোমরাচোমরারা নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যত্র বসেন, মাঠেরই শোভা বর্ধিত করেন, খেলা দেখে উপভোগ করার জন্য প্রায়ই নয়। যাক সে কথা।

আজকে খেলার রেষারেষি অন্য একটা ঢঙ নিয়েছে, যেটা আমাদের কাছে খারাপ লাগে। আগের যুগে খেলার মাঠে বাঙালির (বা কদাচিৎ বাইরের কোনো অবাঙালি ভারতবাসীর) কৃতিত্ব দেখে আমাদের বুক দশ হাত হত, পরাধীনতার জ্বালা ভোলবার জন্য দরকার হয় অনেক রকম প্রলেপ, আর এই খেলা ব্যাপারটা তেমনই একটি প্রলেপ জোগাত। তখন তাই বোম্বাইয়ে Quadrangular ক্রিকেট সাহেবদের গো-হারান হারাচ্ছে বলে ভিঠল্, সি, কে, নাইডু, ওয়াজির আলি প্রভৃতির বাহবা শুনে আমরা স্বস্তি পেতাম। আর কেল্লার গোরাদের কিংবা আপিসের সর্বশক্তিমান সাহেবদের মধ্য থেকে বাছাই করা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে আমাদেরই কৃশকায় কিন্তু ক্ষিপ্রগতি ও বুদ্ধিমান খেলোয়াড়দের সাফল্য আমাদের মনে স্বস্তি আনত। মোহনবাগানের পরাজয়ে বাড়িতে হাঁড়ি চড়া বন্ধ ইত্যাদি রটনার পিছনে যে সত্যবস্তু ছিল, তার ধারণা পর্যন্ত আজ অনেকের কাছে অসম্ভব।

আজকের রেষারেষির ঢঙ কুৎসিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে খেলা দেখার বিড়ম্বনা কমছে না। বিশ বছর আগে মানুষ যা সইত, আজ আর তা সে সইতে পারে না। তাই স্টেডিয়াম না হওয়া পর্যন্ত শুধু যে ক্রীড়ামোদীদের অস্বাচ্ছন্দ্যের অবধি থাকবে না তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে যারা খেলা দেখে অসম্ভব অবস্থায়, তাদের 'নার্ভ' হবে খারাপ— এত খারাপ যে মনমেজাজ বিগড়ে গেলে রেফারির উপর চড়াও হওয়া বা খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা প্রিয়পাত্র তাদেরই উপর চটে তাঁবু পোড়াতে যাওয়া দৈনন্দিন ঘটনা হবার জোগাড় আজ হচ্ছে। খেলায় যাদের আগ্রহ আছে তাদের তাই সকলের আজ এই 'স্টেডিয়াম' ব্যাপারের দিকে নজর দিতে হবে। যে শহর হল ফুটবল পাগল, সেখানে 'স্টেডিয়াম' নেই— এর রহস্যভেদ করলে আজকের সমাজ জীবনে যে কত গ্লানি কত দিকে ছড়িয়ে রয়েছে তা খেলার দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে পারব।

কেরলে কয়েকদিন

ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে দিন ছয়েক মাত্র ছিলাম ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে। কিন্তু ঐ কটা দিনের কথা সহজে ভোলবার নয়।

গিয়েছিলাম রাজনীতিক কাজে— নির্বাচন তখন পুরো দমে চলছে, আমাদের পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সেই নির্বাচনী লড়াইয়ে যোগ দিতেই গিয়েছিলাম। একথা আজ সবাই-জানে যে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রসার খুব হয়েছে, আর কম্যুনিস্ট পার্টির কদর সেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে রীতিমত বেশি। কিন্তু শুধু সেই কারণে যে সেখানে কদিন ঘুরে আসাটা সহজে ভোলবার নয়, তা বলছি না।

জোর করেই অবশ্য বলব যে কোনো একজন কম্যুনিস্টের পক্ষে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে গেলে তার বুক দশ হাত না হওয়াই আশ্চর্য। বিশেষ করে নির্বাচনের হিড়িক যখন চলছে, তখন কম্যুনিস্ট পার্টি আর তার লাল ঝাণ্ডা সম্পর্কে সেখানকার সাধারণ লোকের মমত্ববোধ আর উৎসাহ উদ্দীপনা যে কত, তা জানার সুযোগ সহজে এবং খুব বেশি আসে। তাই কম্যুনিস্ট হিসাবে ঐ সময় সেখানে ঘুরে আসার কথা নিশ্চয়ই মনে রেখে দেবার মতো একটা ব্যাপার।

ব্যাঙ্গালোর থেকে কোচিন যাবার পথে এরোপ্লেন নামে কইম্বাটোরে। ছোট্ট বিমান ঘাঁটি, সেখান থেকে কইম্বাটোরের কলকারখানা দেখা যায় না। কিন্তু কইম্বাটোরের আগে আর পরে দেখা যায় পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি, কবিতায় যে পাহাড়কে "ধ্যানগম্ভীর" বলা হয়েছে তার যেন হদিস্ স্পষ্ট করে মেলে আকাশ থেকে। আর যেতে যেতে মনে হয় এই পাহাড় থেকেই পাথর সংগ্রহ করে সুদূর দক্ষিণের অপূর্ব মন্দির এবং মন্দির-নগর তৈরি হয়েছে, যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য যেন ডানা মেলে আকাশের তারাকে স্পর্শ করেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অতি সাধারণ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ রেখেছে।

কোচিন পৌঁছাবার কিছু আগে থেকে দৃশ্য একেবারে বদলে যায়— সেখানে পাহাড় নেই, বরং আছে জলাভূমি। সমুদ্র থেকে হাজার শাখা দেশের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, আকাশ থেকে মনে হয় যেন জালি করা রয়েছে চারদিকে। দূরে সমুদ্র, ঢেউ চোখে পড়ে না— নীচে জলের রেখা আর ঘন সবুজের ছড়াছড়ি।

প্লেন থেকে নেমেই শুরু হল ছোটাছুটি। এর্ণাকুলম শহরটাকে কেন্দ্র করে বেরুতে হল সভার পর সভা করার কাজে। যেতে হল দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত আর অন্যদিকে কোচিনের উত্তর সীমানায়। মোটর গাড়িতেই যাতায়াত, তা নইলে তাড়াতাড়ি নানা জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। তবে মাঝে মাঝে জল পার হতে হয়েছে; তখন হয় অপর পারে গিয়ে গাড়ি বদলান, নয়তো পূর্ব বাংলার মতো গাড়িশুদ্ধ "বার্জে" চাপিয়ে পার হওয়া।

ছ'দিনে প্রায় একশো ছোটো-বড়ো সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছিল। যতগুলো সভার আয়োজন সম্বন্ধে পার্টি ওয়াকিবহাল ছিল, সেগুলো ছাড়াও বহু সভা মাঝপথে করে যেতে হত— হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে লাল ঝাণ্ডার জয় রব তুলে একদল দাবি করল মালা পরতে হবে আর দুটো কথা বলে যেতে হবে। এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল বার বার। মালারও বৈচিত্র্য ছিল যথেষ্ট; বুনো ফুলের মালা থেকে আরম্ভ করে মোটা লাল পৈতার মতো গোছা কিংবা চমৎকার সুগন্ধি আর রূপোলি সোনালি কাজ করা মালার বোঝা বইতে হত প্রত্যেক জমায়েতে। গাড়িতে লাল নিশান দেখে রাস্তার মজুর আর মাঠের চাষি আর ভিটায় বিশ্রামরত গরিব আওয়াজ তুলে মনের উৎসাহ জানিয়েছে। মালয়ালম্ ভাষায় 'কমরেড' শব্দের তরজমা করেছে 'সখা', কী ভাগ্যি যে মেয়ে-কমরেডদের বেলায় 'সখী' শব্দটা নাকি চালু নয়! "সখা— জিন্দাবাদ" এতবার শোনা গেল যে 'জিন্দাবাদ' কথাটার ভারত-পরিক্রমা বেশ মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।

নিজের দেশের সৌন্দর্য সম্বন্ধে কেরলীয়েরা খুবই সচেতন। বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে শুনতেই হবে প্রশ্ন : "আমাদের দেশ কেমন লাগছে?" উত্তর সম্বন্ধেও প্রশ্নকর্তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই— কেরলভূমির নিসর্গ শোভায় বিদেশি যে অভিভূত হবে, এ তারা ধরেই নিয়েছে। দেশটা সত্যই ভারি সুন্দর। একেবারে দক্ষিণে কন্যাকুমারী মন্দিরের নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিকাংশ তামিলভাষী; ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক রূপ অনেকটা তামিলনাদেরই মতো। সেখানকার পাহাড় রুক্ষ; মানুষের চেহারাতেও কমনীয়তার ভাব কম। কিন্তু ত্রিবান্দ্রমের অল্প কিছুটা দক্ষিণ থেকে দেশের ছবি বদলে যায়; পাহাড়ে গাছপালা বেশি, ঘাস গজায় যথেষ্ট, চারদিকের রঙে তামিলনাদের শুষ্কতার কথা ভুলিয়ে দেয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের যে অঞ্চল সমতল, সেখানে জলের ভাগ বেশি; শাখাপ্রশাখা দিয়ে দেশের মধ্যে সমুদ্রের জল ঢুকে এসেছে; নারকোল গাছ অসংখ্য, জলের ধারে নারকোল গাছের সারির আর শেষ নেই। নদী আছে অল্প, আর তার অধিকাংশে বালির ভাগ কম নয়। আল্‌ওয়াই নদীর ধারে আল্‌ওয়াই শহরে যে সভা হয়েছিল, তার কথা স্পষ্ট মনে ভাসছে— পাশে বালির নদী, দূরবিস্তৃত, ছোট্ট টিলা ভেঙে সভাস্থলে নামতে হল, তারায় ভরা আকাশ, তার কোলে অল্পায়তন শহরের রাস্তার আলো টিমটিম করছে, ত্রিশ হাজারের শহরে সভা হলেও জমায়েতে বোধ হয় দশ হাজার হাজির। দূর থেকে অনেকেই হেঁটে এসেছে বক্তৃতা শোনার জন্য, ঠিক যেমন যাত্রা শোনার জন্য বাংলার পল্লী অঞ্চলে এখনো বহুজন এসে উপস্থিত হয়। যাত্রামোদীদের মতো এই বক্তৃতা-শ্রোতাদেরও প্রত্যাশা হল আমাদের কাছে কিছুটা অদ্ভুত। ২।৩ ঘণ্টা সভা চলার পর, কিংবা একজন বক্তা সারাক্ষণ চীৎকার করে যাওয়া সত্ত্বেও, তাদের ধৈর্যচ্যুতি তো নেই-ই, বরঞ্চ তখনই তারা বেশ স্থির হয়ে বসেছে, আরো অনেকক্ষণ পালা চলবে ধরে নিয়েছে। আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা কষ্টকর, কিন্তু স্থানীয় বক্তারা এ-ব্যাপারে অভ্যস্ত, তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা একটানে বক্তৃতা করে না যেতে পারলে আসল বক্তা বলে সুনাম সেখানে সাধারণত হয় না।

গভীর রাত্রে সভা করা তাই সেখানে একেবারেই কঠিন বলে মনে করা হয় না। তাই ছাত্রদের এক সভা হল কায়ম্‌কুলমে, রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। একেবারে দুপুর রাতে কোট্টায়ামে সিমেন্ট শ্রমিকদের সভা হল। টিলার উপর সভা, শ্রোতারা বসেছে টিলারই থাকে থাকে। প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার মতো ব্যাপার বললেই চলে। নাট্যশালার কথা মনে পড়ল বিশেষ করে, কারণ সিমেন্ট কারখানার মজুরেরা নাচ দেখালেন, ঢোলক এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান শোনালেন, নাচের সময় হাতে নিলেন মস্ত বড়ো তীর ধনুক। ত্রিবান্দ্রম্ শহরে ত্রিশ হাজারের সভা হয়েছিল, তার পাশে নিয়ন্ আলো জ্বলছে নিভছে আর পরিচ্ছন্ন বাস যাতায়াত করছে—তার চেয়ে অনেক ভালো লেগেছিল এই সিমেন্ট শ্রমিকদের সরল, অনাড়ম্বর বৈঠক।

আলেপ্পি শহরের কাছে কালাভূর বলে এক জায়গায় সভা বেশ মনে আছে। সমুদ্র থেকে বেশি দূর নয় বলে সভাস্থল বালিতে ভরা। বিশ হাজার লোক বসে আছে। প্রায় সবাই শ্রমিক, মেয়েদের সংখ্যা কম নয়, অনেকেই শিশু কোলে নিয়ে এসেছে। জমায়েতের মধ্যে দিয়ে যেতে হল সাজান মঞ্চের দিকে— সবাই হাত ধরতে চায়, হাত ধরার মধ্য দিয়ে মনের আবেগ বোঝাতে চায়। এমনি সভায় গিয়ে কতবার মনে হয়েছে, আমার দেশের মানুষের আজ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের কাছে কত প্রত্যাশা, আর এখনো সে-প্রত্যাশার কত অনুপযুক্ত আমরা।

"ঐক্যম্ জয়ীক্যম্ জনগণ পরিক্যম্"— এইরকম একটা আওয়াজ প্রায় সর্বত্র শুনেছি।

আর যেখানে মনে এসেছে সম্পূর্ণ হতাশা, সেখানেও সাধারণ লোকের নিশ্চিতি লক্ষ করেছি— আমরা যদি এক হয়ে দাঁড়াই তো জয়ী আমরা হব-ই। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের বিচিত্র, সুন্দর পরিবেশে সর্বত্র এই আশ্বাস যেন ছড়িয়ে ছিল।

দূর পাহাড়ের কোল পর্যন্ত সোনালি ধানের ওপর ঢেউ-খেলান হাওয়ার মোহে পড়েও কিন্তু সেখানে ভুলতে পারি নি একটা দৃশ্যের কথা। দৃশ্যটি অতি সাধারণ, অতি নগণ্য। ক্র্যাঙানোরে যখন নামলাম নৌকায় খাল পার হয়ে, তখন আমি যাঁর জিম্মায় ছিলাম সেই কমরেড ওয়ারিয়র বললেন; "নারকোলের ছিবড়ে নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের দেখবেন তো চলুন"। বললাম নিশ্চয়ই দেখব, কারণ এই ছিবড়ে (coir) হল কেরলের একটা প্রধান সম্পদ। নিয়ে গেলেন রাস্তা থেকে একটু দূরে এক জায়গায়, যেখানে দশ থেকে ষাট বছরের প্রায় জন দশ বারো মেয়ে কাজ করছিল একগাদা নারকোলের ছিবড়ে নিয়ে। দশ ঘণ্টা কাজ করে তারা নাকি মাত্র সাড়ে তিন আনা পায়, কিন্তু তার চেয়েও মর্মান্তিক লাগল যখন তারা আমায় বলল তাদের হাত ছুঁয়ে দেখতে। হাতের এমন দশা যে হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না— একেবারে ভাঙাচোরা উঁচুনীচু, কড়া খোন্দলে ভরা হাত— যে-হাত নিয়ে আদর করতে মন যায়, সেই হাত হয়ে উঠেছে বীভৎস। কাছাকাছি দেখলাম দুটি ১৭।১৮ বছরের ছেলে একটা চরকার মতো যন্ত্র নিয়ে নারকোল দড়ি পাকাচ্ছে আর ক্রমাগত একদিক থেকে আর এক দিকে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের বুক, হাত ছড়ে গিয়ে শক্ত ইঁটের মতো হয়ে গিয়েছে বলে ছুঁলে কোনো অনুভূতি সেখানে নেই। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের নিসর্গ শোভা ভুলতে পারি, কিন্তু ক্র্যাঙানোরের সেই মেয়েদের ভাঙা হাতের স্পর্শ ভুলব না।

মনে আছে ক্রুদ্ধ হয়ে এক মিনিট মাত্র তারপর বক্তৃতা করেছিলাম সভায়— যেখানে অন্তত আধঘণ্টা আমার গলাবাজি তারা চেয়েছিল। হয়েছিল রাগ আর লজ্জা, নিজের দেশের জন্য লজ্জা, আর যে হোমরা-চোমরার দল বলে যে আমাদের দেশের লোক পরিশ্রমে নারাজ তাদের ওপর ঘৃণা আর তাদেরও সম্পর্কে লজ্জা। আমার বক্তৃতা তরজমা করছিলেন তরুণ সাহিত্যিক কমরেড জনার্দন কুরূপ, তিনি বললেন যে অনুবাদ করার সময় কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল।

বেজায় তাড়াহুড়ো করে লিখছি, তাই গুছিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু ছবির মতো চোখের সামনে ভাসছে কেরলভূমির অন্তরঙ্গ নিসর্গশোভা, আর মনে হয় যেন দেখতে পাচ্ছি সকালবেলা ছোটো-ছেলেমেয়েরা দলে দলে স্কুলে যাচ্ছে, বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে খেয়াঘাটের দিকে। হঠাৎ রাস্তার মাঝে যারা জোর করে বক্তৃতা করাচ্ছে, তাদের মধ্যে দেখি ছোট্ট একটা ছেলে, পরনে কিছু নেই, গলায় ঝুলছে খ্রীস্টান ক্রুসের মাদুলী। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে অনেক মেয়ে, পরিষ্কার পোশাক, লালিত্যে ভরা চেহারা— চোখ-ঝলসান সুন্দরী দেখি নি, কিন্তু অসুন্দর মেয়ে প্রায় চোখেই পড়ে নি, বেঢপ আকৃতির একটি মাত্র মেয়ে দেখি নি; সহজ স্নিগ্ধ কমনীয়তা কেরলের স্ত্রীকুলের সাধারণ সম্পদ মনে হয়েছে। হঠাৎ দেখেছি মিশকালো রঙ, কাফ্রীদের মতো কোঁকড়ানো, শক্ত চুল— এ-অঞ্চলে বহু শতাব্দী পূর্বে ব্যবসাব্যপদেশে যে বিদেশিরা আসত, তাদেরই স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পেয়েছি। মেয়েদের মধ্যে যাঁরা প্রাচীনপন্থী, তাদের কেউ কেউ এখনো বুক খুলে রাখে, কাপড় দিয়ে ঢাকে না। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব

এই দেখে যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ওখানে কত ভালো, পাকা রাস্তার সংখ্যা কত বেশি, ছোটো

মফঃস্বল শহরেও থাকার বন্দোবস্ত কত পরিষ্কার। আরো হিংসা হয়েছে এই জন্য যে সেখানে আমাদের আন্দোলন নানাস্তরের সাধারণ মানুষের কত কাছে এসেছে, কত অন্তরঙ্গ হয়েছে— এদিক দিয়ে আমাদের কাজ অনেক বাকি। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনেও এখনো অনেক কিছু বাকি থেকে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে বাকি-র বোঝা যেন অসহ্য।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

প্রায় চার মাস বাইরে থাকার পর কলকাতায় ফিরে হঠাৎ একদিন মনে হল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। তখনই অবশ্য রাশ টেনে মন জানিয়ে দিল যে তিনি আর নেই, আর কখনো তাঁর সৌম্য উপস্থিতির প্রশান্তি আস্বাদ করতে পারব না।

খুব বেশি কাল তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ১৯৪৩ সালের আগে কখনো তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। তার আগে তাঁর অভিনয়ের কথা অবশ্য শুনেছি, আর তার চেয়েও বেশি শুনেছি তাঁর চরিত্রের খ্যাতি। কিন্তু থিয়েটারে নিতান্ত কালেভদ্রে গিয়েছি বলে তাঁর অভিনয়ও তখন দেখি নি (পরেও দেখেছি অতি অল্প)।

প্রথম তাঁকে দেখলাম ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের চারতলায়— যেখানে আমরা সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি আর প্রগতি লেখক সংঘের এককালে নামজাদা আস্তানা বানিয়েছিলাম। প্রগতি লেখকদের ডাকে তিনি এসেছিলেন আলোচনা সভায়—"সাহিত্যে প্রগতি" শীর্ষক ছোট্ট একটি প্রবন্ধ সেদিন তিনি পড়লেন। পড়া শুনে চমক লেগেছিল। কণ্ঠস্বরের ওজস্বিতার জন্য নয়, বিষয়বস্তুর উপর অসংকোচ অধিকার এবং নিপুণ পরিবেশন ক্ষমতা দেখে। পরে যখন তদানীন্তন সাপ্তাহিক "অরণি"তে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তখন সেটা ইংরেজিতে তরজমা করেছিলাম— তাঁর কাছ থেকে মঞ্জুরী পেয়েছিলাম কিনা মনে নেই, কিন্তু একান্ত আগ্রহেই তরজমা করেছিলাম।

বাংলাদেশে মাত্র তিন কি চারজনকে দেখেছি যাঁরা মার্কসবাদী বলে নিজেদের জাহির করেন না। কিন্তু সহজ, স্বচ্ছ অন্তরঙ্গ ভাবে মার্ক্স্‌বাদের অন্তর্বস্তুকে যেন আয়ত্ত করে নিয়েছেন। ভুল যে তাঁরা করেন নি বা করেন না, তা একেবারেই নয়। কিন্তু সহজ বোধের সঙ্গে মার্ক্স্‌বাদের সামঞ্জস্য তাঁরা করেছেন অনায়াসে, কষ্টকল্পনা পরিহার করে, বিদ্যাভিমানস্পৃষ্ট না হয়ে। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন তাঁদেরই একজন— আর হঠাৎ তাঁকে দেখলাম, তাঁর কথা তাঁরই তেজস্বী কণ্ঠে শুনলাম বলে সেই প্রথম পরিচয়ের দিনই চমক লেগেছিল, আর চমকের সঙ্গে সঙ্গে একটা সহজ আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

তারপর নানা সূত্রে, নানা উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে— তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই এমন এক স্থৈর্য ছিল যা মনের চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করার ক্ষমতা রাখত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের বিড়ম্বনা সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সজাগ ছিলেন নতুন সমাজে অভিনয় ও অভিনয়বৃত্তির ভূমিকা বিষয়ে— তিনি ছিলেন তেমনই একজন মানুষ যাঁরা যখন বর্ষণ চলতে থাকে তখন শুধু অন্ধকারই দেখেন না, ইন্দ্রধনুকেও

চাক্ষুষ করতে পারেন। তাই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করা যেন তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। এমন লোকের সম্পর্কেই মহাভারতে বলা হয়েছে যে এঁরা হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ, এঁরা অপরের আদর্শস্থল।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে বসি নি। তাঁর জীবনের অনেক কথাই আমার অজানা। তবে মনে হয় যে প্রথম জীবনে স্বদেশের শৃংখল মোচনের যে প্রতিজ্ঞা তিনি বহু সমসাময়িকের সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞারই পরিণতি থেকে অনেকের মতো তিনি অপসরণ করেন নি। প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন শুধু যে রাষ্ট্রবিপ্লব, তা তিনি স্বীকার করতে পারেন নি— পারলে জীবনে সহজ স্বস্তি তিনি পেতেন; খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও অধিকারী হতেন। যথার্থ বিপ্লবে যে মৌলিক পরিবর্তন আসে, সমাজে, অর্থ ব্যবস্থায়, জীবনের প্রতি ব্যঞ্জনায়— সেই পরিবর্তনের প্রতিই তিনি আকৃষ্ট হন। এই আকর্ষণকে চরিত্র ও কর্মের অঙ্গীভূত করতে তাঁর নিশ্চয়ই যথেষ্ট সময় ও প্রযত্ন লেগেছিল। কিন্তু একবার চিত্ত স্থির করার পর আর তাঁকে পিছনের টানে বিচলিত হতে হয় নি। মার্ক্স্‌বাদীদের খাতায় নাম লেখানোর তাঁর প্রয়োজন হয় নি— চেনা ব্রাহ্মণের মতো তাঁর আর পৈতার দরকার হত না। কিন্তু মার্ক্স্‌বাদকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, খানিকটা নিজের অজ্ঞাতেই করেছিলেন। তাঁর পরিচ্ছদে প্রায় সর্বদা থাকত খদ্দর; তাঁর ব্যবহারে সর্বদা থাকত সহজ.সৌজন্য, তাঁর চিন্তায় থাকত পরিচ্ছদেরই মতো পরিচ্ছন্নতা, বিপ্লব কামনায় তাঁর আগ্রহ ছিল অধীর, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠা ও মনস্তত্ত্ববোধ তাঁকে দিয়েছিল স্থিতধী-র গুণাবলী— এমন মানুষ বড়ো সহজে আর চোখে পড়বে না।

বড়ো সুখী হয়েছিলাম যখন তিনি যেতে পেরেছিলেন সোভিয়েট দেশে। যেদিন একজন সোভিয়েট প্রতিনিধি দিন দুপুরে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তাঁর চারতলার ফ্ল্যাটে তাঁকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। নানা বাধা সত্ত্বেও তিনি যে চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদলের নেতা হয়ে সোভিয়েট যেতে পেরেছিলেন, এতে আমি নিজে তাঁর আনন্দে অংশ দাবি করেছি। আর আনন্দ তিনি যে পেয়েছিলেন প্রচুর সে দেশে গিয়ে, তা আমরা জানি— সে আনন্দের ভাগ সবাইকে পরিবেশন করার একান্ত আকুলতা তাঁর ছিল।

সৌজন্য আর প্রকৃত সংস্কৃতি যে তাঁর কত বেশি ছিল, তার পরিচয় খুব স্পষ্ট করে পেয়েছেন তাঁরা যাঁরা সোভিয়েটে তিনি যে দলের নেতৃত্ব করেছিলেন সেই দলের ভ্রমণ সম্বন্ধে ফিল্‌ম্‌ দেখেছেন। তিনি নেতা, দলের কেউ কেউ সামান্য কথাটা ভুলে গিয়ে তাঁকে পেছনে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন— তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য ব্যাকুলতা নেই, যা তাঁর করণীয় তা করেছেন হৈ-চৈ বাদ দিয়ে, সহজ সৌষ্ঠব নিয়ে। ফেরার সময় বাংলায় বলেছিলেন তাঁর সোভিয়েট বন্ধুদের যে আমরা বাঙালিরা প্রিয়জনদের কাছে বিদায় নেবার সময় বলি "আসি", কখনো বলি না "যাই"— আবার আসব বলে তিনি সোভিয়েট দেশ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সোভিয়েট দেশ শুধু নয়, তাঁর স্বদেশ থেকে যখন তিনি বিদায় নিলেন জানুয়ারির এক শেষরাত্রে, তখনো বোধকরি তাঁর অনুক্ত বিদায়বাণী ছিল "আসি"— তাই যখনই তাঁকে স্মরণ করি, তিনি আসেন আমাদের কাছে, তাঁকে দেখতে না পেয়ে দুঃখ হয়, কিন্তু তাঁর মন ও মমতার সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছিল তাদের কাছে তাঁর মূর্তি, তাঁর স্মৃতি কখনো ম্লান হবে না।

কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় প্রচুর, কিন্তু কথা বাড়াব না। অল্পে তাঁর সুখ ছিল না, তাই স্বস্তির সহজ সন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হন নি। জীবনকে— শুধু নিজের জীবনকে নয়—

সর্বসাধারণের জীবনকে গ্লানিমুক্ত করাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কামনা। সে কামনা চরিতার্থ হতে বিলম্ব হচ্ছে বলে যদি আমরা গ্লানি-ই অনুভব করতে থাকি তো তাঁর স্মৃতিকে অসম্মান করা হবে। নূতন জীবনের অনিবার্য আবির্ভাব সম্বন্ধ যে নিশ্চিতি, দারুণ দুর্দিনেও তাঁর মনকে ভাঙতে পারে নি, সেই নিশ্চিতই আমাদের শক্তি দিক, মর্যাদা দিক, নিত্যকর্মে সার্থকতা এনে দিক।

"সাহিত্যপত্র" ও স্বদেশজিজ্ঞাসা

"সাহিত্যপত্র" নবকলেবরে প্রকাশ হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছি। এই কথাটা উপলক্ষ করেই এ-লেখার অবতারণা।

প্রথমেই স্বীকার করে রাখি যে 'সাহিত্যপত্র'-এর প্রতি আমার এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব আছে। এর কারণ কোনো কোনো কর্তৃপক্ষীয়ের সঙ্গে সৌহার্দ নয়, তবে একটা প্রধান কারণ অন্তত হল এই যে পত্রিকার নামকরণটি আমার বড়ো মনোমত লেগেছে।

আমি নিজে যে প্রকৃত সাহিত্যিক নই, বিলক্ষণ জানি। এটা বিনয়ের কথা নয়, যা আমার কাছে অকাট্য তারই পুনরাবৃত্তি। এসব ব্যাপারে প্রমাণ সাবুদ হাজির করা একটা বিড়ম্বনা, নিষ্প্রয়োজনও বটে। তবে লিখতে গিয়ে কয়েকটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যা আমার ঐ উক্তিকেই সমর্থন করবে।

ছাপার হরফে নিজের লেখা দেখতে চাওয়া বোধ হয় মানুষের একটা সহজ মার্জনীয় অপরাধ। আমারও যে সে উচ্চাভিলাষ ছিল না বা নেই, তা সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক যদি বাস্তবিক হতাম তো নিজের লেখা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত সঙ্গত মমতা নিশ্চয়ই থাকত, ছাপার হরফে লেখা যা কিছু বেরিয়েছে তার একটা হদিশ বোধ হয় রাখতাম। সম্ভবত সাংবাদিকতার আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম বলে শীঘ্রই লায়েক হয়ে উঠে ছাপার অক্ষরে যা বেরোয়, সে-সম্বন্ধে নাকতোলা মনোভাব পোষণ করা আরম্ভ করেছিলাম। আমার মনে হয় যে খাঁটি সাংবাদিকেরা নিজেদের সব চেয়ে সরেস লেখারও নকল রেখে দেন না। আমি খাঁটি সাংবাদিক বা নিছক সাহিত্যিক এ-দুইয়ের একটাও নই বলে নিজের লেখার কিছু নকল আছে, অধিকাংশ নেই।

বলতে চাইছিলাম অন্য একটা কথা। আমার প্রথম লেখা বোধ হয় ছাপা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনে। আর সেটা ছিল ইংরিজিতে। তারও আগে বেশ মনে আছে দেশ প্রেমের ঐতিহাসিক বনিয়াদের খোঁজে প্রাচীন ভারতবর্ষের গরিমা সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ এবং উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধ লিখি (তার ললাটের লিখন কি ছিল স্মরণ নেই, লেখাটার সন্ধান বহুকাল রাখি নি)—কিন্তু এ লেখাটাও যে ইংরিজিতে এবং যথারীতি ম্যাক্সমুলর প্রভৃতির রচনা থেকে উদ্ধৃতি-কণ্টকিত ছিল তা বলা বাহুল্য। ইংরিজি ভালো জানি বলে যত জাঁকই থাকুক, নিজের মায়ের কোলে বসে শেখা ভাষা নিশ্চয়ই আরো অনেক নিজস্ব, কিন্তু প্রথম যে লেখা আমার ছাপা হল তা বিদেশি ভাষায়। তারপর প্রথম যে বাংলা লেখা প্রকাশ হল ঐ কলেজ-

পত্রিকাতেই, তা ছিল একটা অনুবাদ— অধ্যাপক ভিন্তরনিৎস্-এর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার অনুবাদ। সাহিত্যিকত্ব থেকে আমার স্বাভাবিক দূরত্ব বোধহয় এ থেকে প্রমাণ হবে।

এমন কি, ছাত্রাবস্থা কাটাবার পর যখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর বৈঠকখানায় "পরিচয়"-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হলাম, তখনও প্রায় উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো আমার প্রথম লেখা হল একটা সমালোচনা— এঙ্গেল্‌স্-কৃত "অ্যান্টিড্যুরিং" গ্রন্থের সমালোচনা। সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশপত্র তখন মেলে নি, আজো না।

তবে কতকগুলো অপ্রাসঙ্গিক কারণে নানা প্রকৃতির সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ আমার ঘটেছে, আর তারই জোরে আজো 'সাহিত্যপত্র'-এর কাছ থেকে লেখার তাগাদা পাচ্ছি। এতে আমি খুশি, 'সাহিত্যপত্র' যদি খুশি হয় তো আরো ভালো।

কখনো যে সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলার স্পর্ধা রাখি নি, তা নয়। তবে যখনই কিছু বলেছি— আর বহুজনকে শোনাতে গেলে গলাটা আমার উচ্চগ্রামেই ওঠে— তখন নিজের মূলধনে ঘাটতির কথা মনে রেখেই তা বলেছি। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করেছি যে আমার মতো অন্তেবাসীদের কথা শোনার কিছু লোক আছে, হয়তো বা লেখকদের পক্ষেও অন্তত এক কান দিয়ে তা শোনার দরকার আছে, আর তাই হল স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

মনে পড়ছে যে অনেকদিন আগে আজো বর্তমানে এবং বহুল প্রচারিত এক মাসিকপত্র যখন প্রকাশ হয়, তখন সপ্তাহে পাঁচ ছ'দিন অন্তত তার আয়োজন কি ভাবে চলছিল দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখন আমার বয়স নিতান্ত অল্প, কিন্তু তখনই সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মহারথী বলে বিখ্যাত কয়েকজনকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। মনে আছে যে আমার পিতামহকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিদিন পদধূলি নিয়ে প্রণাম করতেন (প্রায় রোজ দেখা হওয়া সত্ত্বেও নিতেন বলে উল্লেখ করছি), আরো মনে পড়ে যে আমাকেই সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র নেবুতলার গলিতে চরকায় কাটা ভালো সরু সুতোর খোঁজে বেরিয়েছেন আর অফিসে ফিরে নিজের নির্দিষ্ট ঈজি-চেয়ারে যখন শুয়ে পড়েছেন, তখন "বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী" বলে বসুমতীর বিজ্ঞাপনপত্রের বর্ণনা নিয়ে তাঁর সামনেই হাসিঠাট্টা চলছে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকেই সে মালিকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে, কিন্তু পুরানো সে সব দিন ভুলতে পারি নি।

"পরিচয়"-এর খ্যাতি প্রবাসে থাকতেই কানে এসেছিল, তাই দেশে ফিরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এর অবারিত আতিথ্যে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর বৈদগ্ধ্যে পুলকিত ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হলেও 'পরিচয়' পত্রিকার একজন গৌণ অথচ মোটামুটি নিয়মিত লেখক হয়েও সম্পর্কটা কেমন যেন আত্মীয় হয়ে উঠতে পারে নি। মনে পড়ে যে তখনকার 'পরিচয়'-এর বিজ্ঞাপনে 'অভিজাত পত্রিকা' বলে বর্ণনায় বিরক্তি লেগেছে— পরবর্তী যুগে 'অভিজাত'-এর পরিবর্তে 'অভিনব' শব্দের আবির্ভাব সম্ভবত আরো কুশ্রী মনে হয়েছে। যাই হোক, বেশ কিছুকাল ধরে প্রায়ই 'পরিচয়'-গোষ্ঠীতে যোগদান সত্ত্বেও একটা বাধা যেন অতিক্রম করে উঠতে পারি নি।

তখনকার 'পরিচয়' বাংলাসাহিত্য ও সমাজে একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সন্দেহ নেই। জরাগ্রস্ত চিন্তাকে পরিহার করার সযত্ন প্রয়াস ঘটেছিল 'পরিচয়'-এর মাধ্যমে। স্বদেশ ও বিদেশের কর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করা হল সেদিনের 'পরিচয়'-এর স্মরণীয়

অবদান। মার্ক্স্‌বাদকে সাধ্যমতো জানতে, বুঝতে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা উৎসুক হয়েছিল, 'পরিচয়' শুধু তাদের সুযোগ দেওয়া নয়, সমাদরও করেছে। রাজনৈতিক বন্দিশিবিরে 'পরিচয়' তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষিত হত। সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষা ব্যাপারে 'পরিচয়' ছিল অগ্রণী, সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোত জীবনের মূল ব্যঞ্জনার সন্ধানে তার শ্রান্তি ছিল না।

কিন্তু আমার তখনই বার বার মনে হত যে কোথায় কি যেন একটা খটকা সেখানে লেগে রয়েছে। এ-কথা পরিষ্কার করে বোঝান শক্ত, তাই একদিনের একটা দৃষ্টান্ত দেব। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, যাঁকে ভুলে যাওয়া অপরাধ হলেও আজ প্রগতিবাদীরা পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছেন। সুধীনবাবুর বইয়ে বোঝাই, আরামচৌকিতে সাজান বৈঠকখানায় যথারীতি কয়েকজন হাজির হয়েছিলাম এক শুক্রবার। উপস্থিতদের মধ্যে যাঁকে বলতে পারি প্রমুখ, তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাচনভঙ্গির ঔজ্জ্বল্যে সকলের শ্রদ্ধেয়। সম্ভবত সুরেনবাবু আর আমাকে উগ্রপন্থার অনুরাগী জেনে তিনি কথায় কথায় মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ করলেন এবং অতি ক্ষিপ্র গতিতে তীব্র বাক্য প্রয়োগে তাঁর চরিত্র ও কর্মের উন্নাসিক বিশ্লেষণ শোনাতে চাইলেন। দুষ্টগ্রহ আমার ওপর ভর করেছিল নিশ্চয়ই, নইলে তাঁর চেয়ে আমি গান্ধীজী সম্বন্ধে অনেক বেশি বিরূপ হলেও একেবারে অধৈর্য হয়ে বললাম কেন, যে এত উৎকটভাবে শ্রদ্ধা ও বিনয়-রহিত হয়ে গান্ধীজী সম্পর্কে আলোচনা একান্ত অকর্তব্য? আলোচনায় তখনই ঘোর স্তব্ধতা নেমে এল, বৈঠক প্রায় ভাঙল, পরদিন দীর্ঘ পত্র লিখে আমি মার্জনা চাইলাম, উত্তর পেলাম সংক্ষিপ্ত, অপ্রসন্ন কয়েক পঙক্তির পত্রে। স্পষ্ট বুঝলাম যে 'পরিচয়' গোষ্ঠীতে প্রকৃত স্বীকৃতি লাভ করতে হলে যে মেজাজ দরকার তা আমার নাগালের বাইরে।

এক বাদশাহের নতুন, আশ্চর্য পোশাক সম্বন্ধে সুপরিচিত একটা গল্প আছে। সভার সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে পোশাক দেখার জন্য, দুনিয়া জোড়া নাম এমন এক দরজি নাকি সে জামা বানিয়েছে, সবুর কারো যেন সইছে না। বাদ্‌শাহ এলেন, কুর্নিশ করতে করতে দরজি আসছে সঙ্গে, আর অঙ্গভঙ্গি করে সবাইকে জামার তারিফ করতে বলছে— সবাই দেখল বাদশাহের পরনে পোশাক বলে কোনো কিছুই বালাই নেই, তিনি একেবারে নগ্নগাত্র, কিন্তু সেকথা তখন বলে কার সাধ্য, সবাই 'বাহবা' দিয়ে উঠল না-দেখা জামার জাঁকজমক।

সেদিনের 'পরিচয়' যা করেছে, তাকে অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি আমার নেই। যদি বলি 'পরিচয়' সম্পর্কে আমার একটা মমতা জন্মেছিল, তা হলে কেউ যেন অবিশ্বাস না করেন। কিন্তু কোথায় একটা খোঁচা যেন মনে লেগে রইল, আর ভাবলাম যে ঐ বাদশাহের পোশাকের মতোই 'পরিচয়'-এর পরিচয় আমি পেলাম না।

তারপরে 'অভিনব পত্রিকা' বলে প্রচারিত হয়ে 'পরিচয়' যখন প্রধানত আমারই সহকর্মীদের কর্তৃত্বে এল, তখনো কিন্তু আমার মনের খেদ গেল না। কোথা থেকে কতগুলো কাঁটা এসে গলায় ফুটে রইল, অস্বস্তি এসে যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসল। মনের এবং মর্মের যে ভাষা সাহিত্যপত্রিকায় খুঁজছিলাম, তা মিলল না। তবুও ডুবে না গিয়ে যে ভেসে থাকতে পেরেছি, তার কারণ এই যে প্রকৃত সাহিত্যিক মন আমার নয়, মুক্তা আহরণের জন্য গভীর জলে ডুব দিতেই আমি যাই নি।

একবার কয়েকজনের সহযোগিতায় 'লোকায়ত' নামে মাসিক প্রকাশের আয়োজনে নেমেছিলাম। মুখবন্ধ লেখার ভার ছিল আমার ওপর— লিখলাম, ফর্মা ছাপা হল, কিন্তু

কতকগুলো দুর্ঘটনায় পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হল। নিজের লেখা আমার প্রায়ই ভালো লাগে না, কিন্তু ঐ মুখবন্ধ লিখে পরিতৃপ্তি পেয়েছিলাম বলেই বোধ হয় তার নকল আমার কাছে আজো নেই।

আপাতত, বাংলা সাময়িকীর মধ্যে 'পরিচয়' এবং 'সাহিত্যপত্র'-এর সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। যদি বলি, 'Sufficient unto the day......' আর বাকিটা উহ্য রেখে দিই তো আশাকরি মার্জনা মিলবে।

আগেই বলেছি 'সাহিত্যপত্র' নামটি বড়ো ভালো। কিন্তু শুধু নামে কি আসে যায়? তবে এখনো 'সাহিত্যপত্র' সন্ত্রস্ত, কুণ্ঠিত, কিন্তু ঐতিহ্যভার মুক্ত বলেই হয়তো ভবিষ্যতে স্বচ্ছন্দে পদচারণায় সমর্থ হবে। এ-কথা বলছি বোধ হয় এইজন্য যে মাঝে মাঝে 'সাহিত্যপত্র'-এর পদক্ষেপকে অস্বাচ্ছন্দ্যের পরাকাষ্ঠা মনে হয়েছে।

বিনয়বর্জিত এই রচনার জন্য বার বার ক্ষমা ভিক্ষা না করে উপায় নেই, বিশেষ করে 'সাহিত্যপত্র'-এরই ঔদার্যের কাছে ক্ষমা চাইব। আর আশা করব যে বাংলা মাসিক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত স্মরণ করে, তার দোষগুণ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে, যথাসাধ্য স্বদেশজিজ্ঞাসা পূরণ করার প্রতিজ্ঞা যেন 'সাহিত্যপত্র' নিতে চেষ্টিত হয়।

'বঙ্গদর্শন' থেকে 'পরিচয়' পর্যন্ত যে পরম্পরা চলে এসেছে তার প্রধান শিক্ষা আমার চোখে এই যে পত্রিকামাত্রেরই প্রয়োজন হল লক্ষ, সংকল্প ও প্রযত্ন। লক্ষের অবিকল সংজ্ঞাসন্ধানের মতো দুর্বুদ্ধি যেন না হয়, কিন্তু লক্ষ যথাজ্ঞান স্থির হওয়া চাই। আর নিয়ত প্রয়াস ও পরিকল্পনা যেন পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত রচনায় প্রাণ সঞ্চার করে।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আজ আমরা এমন এক পরিবেশে রয়েছি, যখন জীবনের জটিলতা অভূতপূর্ব স্তরে উপনীত হয়েছে। এমন ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে, যাতে পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত যেন সরে গিয়েছে। সৎ এবং অসৎ এই দুই বর্গের ভেদ করতে গিয়ে যেন খেই হারিয়ে গিয়েছে। মনের মধ্যে যে সব পাহাড় আছে সেগুলো যে এত এবড়ো-খেবড়ো, তা যেন আগে জানতাম না। সহজ সাধনায় প্রশান্তি আসতে পারে জানি, কিন্তু তাতে তুষ্ট নই একেবারে; প্রকৃত প্রজ্ঞার জন্য আকুলতার অবধি নেই, অথচ তার সম্ভাবনা যেন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাইশ-তেইশ বছর আগে সিড্‌নী আর বীট্রিস্ ওয়েব্ পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পর সোভিয়েট দেশে যে 'নতুন সভ্যতা'-র সন্ধান পেয়েছিলেন, যার শাসনব্যবস্থাকে তাঁর 'জগতের সবচেয়ে সর্বব্যাপী ও সমানাধিকারমূলক গণতন্ত্র', বলে বর্ণনা করেছিলেন, হিট্‌লারী আক্রমণের নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় যার সোনাই দুনিয়া দেখেছিল, খাদ প্রায় খুঁজে পায় নি, সেই সোভিয়েট এবং তার কীর্তির মধ্যে কলঙ্কের রটনা এল— দুর্মুখ, দুরাশয়, বৈরীর মুখ থেকে নয়, সোভিয়েট দেশ থেকেই তা উৎসারিত হল। মানস-সরোবরে যেখানে জলের স্থিরতা হল একান্ত অপরিহার্য সেখানেই তরঙ্গ-ভঙ্গের আঘাত পড়ল।

'তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা', এ কথা কবিকণ্ঠ থেকে অতি-দুঃসময়েই উচ্চারিত হয়েছিল। আজকের সংকট অতিক্রান্ত হবে, সন্দেহ নেই। শুধু আমাদের ওপর একটা দায়িত্ব থেকে যাবে, যদি সাহিত্য আমাদের কাছে কোনো সত্যগুণের দাবি রাখে। ফরাসি ভাষায় কথা আছে : 'Souffrir passe; avoir suffert ne passe jamais' ('যন্ত্রণা কেটে যায়, কিন্তু যন্ত্রণাভোগের স্মৃতি কখনো যায় না')— তাই আজকের অনুভূতির ছবি এবং ছাপ যথাসময়ে দেখা দেবে, এ-বিষয়ে আমার সংশয় নেই। জানি না

এ সম্পর্কে 'সাহিত্যপত্র'-এর ভূমিকা নিয়ে কেউ অবহিত কি না।

জোর করেই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে যে সেই ছাপ মোটেই শুধু বিলাপ হবে না— বিলাপও বাঁচার একটা অঙ্গ, কিন্তু তা সব চেয়ে বড়ো কথা নয়। গত যুদ্ধের মধ্যে তেইশ বছর বয়সে নিহত ইংরেজ বৈমানিক রিচর্ড হিলরি, যিনি "The Last Enemy" লিখেছিলেন, তিনি "হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, ক্রুদ্ধ অবস্থায়" (কথাগুলো হিলরি-র) একটা চিঠিতে বলেন : "Humanity is irony from thc neck up, I guess that's the first thing you'vc got to realisc if you want to fight for it. You'll get nothing out of it, and if you don't find virtue being its own reward sufficient, you have to be human enough to be amused by it, otherwise God help you". এর অনুবাদ শুধু দুরূহ নয়, পীড়াপ্রদও বটে। 'সাহিত্যপত্র'-এর পাঠকেরা অনুবাদের দরকার বোধ করবেন না জানি বলে বেঁচে গেলাম। কিন্তু এই হিলরি-ই অবিচল মনে যুদ্ধে প্রাণ দিতে ইতস্তত করেন নি। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও যেমন বাঁচতে হয়, অনেক সময় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনেও যেমন শান্তির জন্য লড়তে হয়, তেমনই 'irony", এমন কি "tragic irony"-এর অকাট্য অস্তিত্ব সত্ত্বেও মানুষের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না।

শিরদাঁড়া খাড়া বলে মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু সর্বদাই এক ঋজুভঙ্গিতে যদি কেউ থাকে তো তা হয় হাস্যকর। প্রগতি প্রকৃষ্ট গতি বটে, কিন্তু সর্বদাই সুসন্নিবদ্ধ, অবক্র, সরলপথে সে-গতি ঘটে না। যে-নিউটন "প্রিন্সিপিয়া" লিখে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন, নরকের ভূগোল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা থেকে তিনি নিবৃত্ত হন নি। যে-ভারতবর্ষে মানুষ গরিমা প্রজ্ঞা ও বোধিকে পর্যন্ত আয়ত্ত করে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে" বলে আহ্বান জানিয়েছে সেখানেই দেখি পূতিগন্ধ ও পাতকের প্রাচুর্য। তাই যেখানে যুগ যুগান্তর ক্লেদ অপসৃত করার দুস্তর প্রয়াস হবে বা হয়েছে, সেখানে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা মানুষের মন যে এক উঁচু তারে বাঁধা থাকবে, এ অসম্ভব।

'সাহিত্যপত্র'-এ হয়তো এসব কথা অবান্তর, কিন্তু আমার শুধু আশা যে বাংলার যাঁরা লেখক, তাঁদের কাছ থেকে আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি ধ্যানের দাবি যেন তাঁরা মানেন। এদিক দিয়ে "সাহিত্যপত্র" কি করে, জানবার ঔৎসুক্য রয়ে গেল।

স্বদেশ-জিজ্ঞাসা বিষয়ে নিরন্তর অভিনিবেশের যে আজ কত প্রয়োজন, তা বলে উঠতে পারছি না। বিদেশকে অস্বীকার করি না, এক মুহূর্তের জন্যও নয়—"What does he know of India, who only India knows?" হঠাৎ মনে পড়ছে, লন্ডনে বর্লিংটন্ হাউসে আধুনিক ফরাসি ছবির প্রদর্শনী— গোগ্যাঁর একটা ছবি, দক্ষিণ সাগর দ্বীপের নিতম্বিনী, হাতে কটা আম, আর সতত সঞ্চরমান এই বিশ্ব যেন সেখানে অপলকে স্থির হয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসছে কোণারকের স্থাপত্যের হীরকদীপ্তি, কি কাঞ্চীর শত স্তম্ভের মৌন মায়া। আর ভাবছি আমাদের মৃত্যুঞ্জয় ভারতবর্ষের কথা, আর মানুষ অবিদ্যা ও অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েও কত মার্জিতচিত্ত, যার জীবনে ক্রূরতা ও ক্লেদের অভাব না থাকলেও শুচি, স্নিগ্ধ সৌকর্যের স্থান কত বিরাট।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পাঞ্জাবের গ্রীক রাজা বৌদ্ধ মেনাণ্ডরের "মিলিন্দপহ্ন"-এর কথা সেদিন পড়ছিলাম। দেখলাম তাঁর রাজধানী সকল-নগর (বর্তমানে শিয়ালকোট) সর্ব ধর্মের প্রচারকদের অভ্যর্থনায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হত। হর্ষবর্ধন তার প্রায় সাড়ে সাতশো বছর ধরে ধর্মসভায় তর্ক শুনে, হিউয়েন্‌সাং-এর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম

অবলম্বন করেন। বারবার দেখা যায় যথোপযুক্ত সৌজন্য ও সৌষ্ঠব নিয়ে বিতণ্ডা হচ্ছে, আর দক্ষিণ-ভারতের তামিল নরপতিরা জৈনধর্ম ছেড়ে শৈব বা বৈষ্ণব ধারার আশ্রয় নিচ্ছেন। আর অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমায় বৌদ্ধ আচার্যদের বাক্‌যুদ্ধে পরাজিত করলেন, পুরী, দ্বারকা, শৃঙ্গেরি ও বদরিনাথে মঠ স্থাপন করে একযোগে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' ব্রহ্মচিন্তা এবং মায়াময় মূর্তি পূজাকে ভারতমানসে সন্নিহিত করলেন। এ-সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে প্রখর তর্কের পর, শুধু সংহারশক্তির চাপে নয়। সংহারের দৃষ্টান্ত যে নেই, তা নয়— পরশুরাম তো তাঁর কুঠারের আঘাতে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক বাংলার বৌদ্ধদের নিধনকল্পে লেগেছিলেন, আরো বহু উদাহরণ সহজলভ্য। কিন্তু চিত্তের একটা বিশিষ্ট উৎকর্ষ এদেশে হয়তো ঘটেছিল, তাই দেখি কবীর, নানক, রামানন্দ, দাদু, চৈতন্য, রামদাস, মাণিক্য বচ্‌কর প্রমুখ ভারতীয় সাধকের মন ধর্মগত সংকীর্ণতাকে প্রায় সম্পূর্ণ পরিহার করতে পেরেছিল। সেন্ট ফ্রান্সিসের মতো মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের যাঁরা সাধক, তাঁদের চরিতকথা মনোমুগ্ধকর নিশ্চয়ই, কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের "dogma" সম্বন্ধে কবীর কিংবা চৈতন্যের মতো মনের মুক্তি নিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন কিনা সন্দেহ।

হয়তো এর একটা দুর্বল দিক আছে, যার ফলভোগ আমরা করেছি বিদেশি আক্রমণকারীর হাতে বারবার পর্যুদস্ত হয়ে। হয়তো যে-একাগ্রতা নিয়ে মুসলমান আক্রমণকারী আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার জ্বালিয়েছে কিংবা নালন্দা ও বিক্রমশিলাকে একেবারে ধ্বংস করেছে, যে-একাগ্রতা নিয়ে ক্যাথলিক আর তাদের বিপক্ষ পরস্পরকে আগুনে পুড়িয়েছে, সে-একাগ্রতারও একটা দাম আছে। ভয়ঙ্করের শুধু যে রূপ আছে, তা নয়; হয়তো তার একটা মূল্য আছে। এটা ভালো কি মন্দ, তা আলাদা কথা; কিন্তু জীবনের ইতিবৃত্ত মানুষকে এটাও হয়তো শিখিয়েছে।

খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্ব মানুষের 'আদিম পাপ' সম্বন্ধে কিংবদন্তী সৃষ্টি করে এই পরস্পরবিরোধী ধারার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ জীবন রহস্যকে সর্বগ্রাহ্য ও সহজবোধ্য করার প্রয়াস করেছে। মনন ও সৎকর্ম কর্তৃক সংসাররজ্জু ছিন্ন করে নির্বাণলাভের বাণী এসেছে গৌতম বুদ্ধের শ্রীমুখ থেকে। আবার জীবন ত্যাগ করে যেমন জীবনকে জয় করা যায়, তেমনই সমাজের অভ্যস্ত ধারা খণ্ডন করেই সমাজ জীবনকে প্রকৃষ্টতর স্তরে স্থাপনের সংকল্প বর্তমান যুগে হয়েছে। মহাভারত যেমন আকুমারীহিমাচল পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, এই নতুন এবং দুর্জয় সংকল্পও তেমনই সমগ্র জগতে বিস্তৃত হয়েছে। অমোঘ এর শক্তি, পশ্চাৎগমনও এর কাছে হল অগ্রধাবনেরই প্রস্তুতি।

কবির কর্ণকুহরে বিশ্ববীণার রব প্রবেশ করে থাকে— অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি স্রষ্টার শিবনেত্রের সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সর্বসাধারণের মনে আজ আভাস এসেছে যে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ শুধু নয়, তার সজাগ বোধিপ্রাপ্তিরও দিন সমাপন্ন হয়ে আসছে। যদি মনে হয় এ-সব ভুল কথা, তো নিরুপায়। কিন্তু অন্ধকার দেখেই শঙ্কিত যারা হয়, তাদের কাছ থেকে অগ্রগমন প্রত্যাশা করাই ভ্রম। আর ভোরের আলো ফুটে ওঠার অব্যবহিত পূর্বেই নাকি অন্ধকার সব চেয়ে ঘন হয়ে আসে।

অল্পে সুখ নেই

উৎসর্গ

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র

করকমলে

মুখবন্ধ

সু-সাহিত্য রচনা ও প্রকাশন ব্যাপারে আমার প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। গৌরীশঙ্করকে প্রথম যখন দেখি, তখন তার বয়ঃক্রম সম্ভবত ছিল ষোড়শবর্ষেরই সন্নিকটে। উভয়পক্ষে মিত্রবৎ আচরণ তাই আমাদের চলে এসেছে; দেশের ও দশের বিবিধ সমস্যা নিয়ে মতান্তর মাঝে মাঝে ঘটেছে কিন্তু মনান্তর কখনো হয় নি। তারই আগ্রহে ও প্রযত্নে কয়েকটি প্রবন্ধ এখন একত্র সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য প্রথমেই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখছি।

'অন্তেবাসী' শব্দটির বিবিধ অর্থ অভিধানে লিখিত আছে। তারই একাধিক অর্থে আমি সাহিত্যরাজ্যের অন্তেবাসী। সাহিত্যগুণের সামান্য সম্পৃক্তি যদি নানা উপলক্ষে রচিত আমার এই প্রবন্ধগুলিকে তুচ্ছ সাময়িকতার জড়স্পর্শ থেকে উদ্ধার করতে পেরেছে বলে বিবেচিত হয় তো কৃতার্থ বোধ করব।

বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করার দুঃসাহস আমার কেমন করে হল, এ-প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য আমাকে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অনন্তপার গরিমার যে পুণ্যচ্ছটা নিয়ে আমাদের অহংকার, তারই কথঞ্চিৎ প্রসাদকে অবলম্বন করে এই সংকলনের কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হয়েছিল। মার্ক্‌স্-কথিত সাম্যবাদী সুসমাচার বহুদিন হতে আমার চিত্ত জয় করে আছে। আমার একান্ত নিজস্ব ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে আর ইতিহাসে যুগ-যুগান্তের বঞ্চনা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে যে-প্রসার, যে-ঔদার্য, যে-প্রসন্নতা এবং যে স্তব্ধ, গম্ভীর প্রশান্তি অনুভব করেছি, সমসাময়িক জগতের বাত্যাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে তারই অনিবার্য নবরূপায়ণে কাল মার্ক্‌স্ যে চিন্তা ও কর্মধারার পরম পথিকৃৎ, সেই চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গতি ও ভূমিকা সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়।

বর্তমান বিশ্ব বহু বিকট ও প্রায়-অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কোনো বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক অনুধ্যানকে বক্র, জটিল, কঠোর ইতিহাসবর্ত্মের বর্তিকা মনে করা অনেকের মতে বাতুলতা বলে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে মুক্ত মন নিয়ে মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তার বিকাশ আজকের পৃথিবীতে সংঘটিত হলে তমিস্রা অপসৃত হবে, মানব সভ্যতার পথচারণ সার্থক হবে। ক্রিকেট থেকে কালান্তর পর্যন্ত নিয়ে কয়েকটি রচনায় মার্ক্‌স্‌বাদের তত্ত্ব ও কর্মপন্থা নিয়ে তাই স্বল্প আলোচনা করেছি। আমার মনে ঐ বিবিধ প্রবন্ধে আপাতপ্রভেদ সত্ত্বেও একটি ঐক্যসূত্র রয়েছে। যদি পাঠকের মন তাতে সায় দেয় তো সুখী হব।

"নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"—আমাদের এই ঋষিবাক্য যদি কার্ল মার্ক্‌সের জানা থাকত তা হলে হয়তো একেই তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নীতিসূত্র মনে করতেন। মার্ক্‌স্‌বাদকে নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় কথার কচকচি আর কাজের ক্ষেত্রে গণ্ডগোল এমন হয়েছিল যে উত্যক্ত হয়ে তিনি একবার বলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি নিজে মার্ক্‌স্‌বাদী নই!" কিন্তু তাঁরই ন্যস্ত উত্তরাধিকার ব্যবহার করে লেনিন ইতিহাসে নবযুগের সৃষ্টি প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছিলেন—যে-

সমাজবাদ "আকাশস্থঃ নিরালম্বো বায়ুভূতঃ নিরাশ্রয়ঃ" অবস্থায় কবিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল তা যেন হল ইতিহাসের নব সব্যসাচী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে তার বিপুল উন্মেষ আমরা দেখতে পেয়েছি। একই সঙ্গে দেখেছি বহুবিধ ভ্রান্তি আর অপকর্ম আর বিড়ম্বনা, যা সমাজবাদের ভাতিকেও অনেকের চক্ষে মলিন করে থাকতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক জগতে সমাজের নবরূপায়ণ আজ সম্ভাবনার ক্ষেত্র অতিক্রম করে বাস্তবে পরিণতির দিকে অগ্রসর যে হচ্ছে তা প্রশ্নাতীত। এখনো অবশ্য অন্ধকার বহুস্থলেই দূর হয় নি, এখনো অজস্র বাধা রয়েছে পথে। স্বয়ং মার্ক্‌স্‌ সাবধান করে দিয়েছিলেন যে সমাজবাদ যারা গড়বে তাদের নিজেদেরই যথাযথভাবে বদলে নিতে "কুড়ি, ত্রিশ, কি পঞ্চাশ বৎসর কিংবা তার চেয়ে বেশি" সময় লেগে যাবে। এখনো তাই পথের বন্ধুরতা শেষ হয় নি। কবে হবে, জোর করে বলার ধৃষ্টতা কারো না থাকাই ভালো। আর মানুষের মন তো অসাড় হয়ে থাকে না—ঘটনার গতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রকৃতি এবং মানবচরিত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান আসছে। মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তাধারা তাকে উপেক্ষা করতে পারছে না।

যদি কারো মনে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হয়ে থাকে তো বলে নিই যে মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধে হয়তো বাঁধা গতের বাইরে কয়েকটা কথা বলেছি, কিন্তু তাকে সংশোধন করার মতো দুঃসাহসী (এবং আমার চিন্তার অবান্তর ও ক্ষতিকর) প্রয়াসে নামবার উদ্দেশ্য আমার ঘুণাক্ষরেও নেই। মার্ক্‌স্‌বাদকে "শোধন" করে নেওয়ার কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে সমাজবাদের অগ্রগতিকে রোধ করতেই মনস্থ করেছেন; তাঁদের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র যোগসূত্র নেই। আমি শুধু চেয়েছি যে চিন্তারহিত, গুরুবাদী বিশ্বাসের জাল ছিন্ন হোক, ভারতীয় মানস সম্বন্ধে স্বচ্ছ, সুস্থ গবেষণা চলুক, দৃশ্যমান সংসারের নিত্যকর্ম প্রতিপালনের সঙ্গে মানুষের অন্তরাত্মার অদৃশ্য কিন্তু একান্ত বাস্তব মহিমা অস্বীকার করার মতো মানসিকতার পঙ্কে পড়ে মার্ক্‌স্‌বাদকেই বিকৃত করে ফেলা যেন না হয় এবং পরিবর্তমান বিশ্বে বিপ্লবী প্রখরতার সঙ্গে মানবিকতার শুভবুদ্ধিকে সুসংলগ্ন করার প্রয়াস যেন ঘটে, আমাদেরই এই সুপ্রাচীন দেশে যেন তা ঘটে। এই প্রতীক্ষিত প্রয়াসে স্বকীয় অংশ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো মোহ নেই। কেবল মনে আসে রামায়ণের সেই গল্প যেখানে সেতুবন্ধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। একশো বার শুনেও গা শিউরে ওঠে যখন স্মরণ করি, সামান্য কাঠবিড়ালীর অঙ্গে রামের করস্পর্শের কথা— যে-করস্পর্শের ছাপ আজো ঐ তুচ্ছ প্রাণীর সর্বদেহে।

আমাদের এই দেশে দৈনন্দিন কাজের ভিড়ে ডুবে থাকার সম্ভাবনা মার্ক্‌স্‌বাদীরা এখনো রাখেন বলে, কিংবা অন্য কোনো কারণে, মৌল চিন্তার দিকে আমাদের মনোযোগ সহজে যায় না। অবশ্যই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে আমাদের অক্ষমতা ও বহুবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু যেখানে সাধ্য নেই, সেক্ষেত্রে সাধ পর্যন্ত থাকবে না, এ হল উদ্ভট কথা। "Seek, and ye shall find"—যদি না চাই তো পাব কেমন করে? কাজের রোজনামচা আমরা অনেকেই সহজে বানাতে পারি আর তা দেখিয়ে কিছু আত্মপ্রসাদও পেতে পারি। কিন্তু বর্তমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে বাস্তব অবস্থা থেকেই যে-সমস্ত নীতিগত প্রশ্ন উত্থিত হচ্ছে, তাদের এড়িয়ে যাওয়া যায় কেমন করে? হিমালয় সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় চলেছে, কিন্তু যে-যুগে এশিয়া আর আফ্রিকার বহু পরাধীন দেশ সম্প্রতি মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে এবং পেয়েছে বলেই সমাজজীবনকে সমসুযোগের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের ঐকান্তিক প্রয়োজনকেও অনুভব করতে আরম্ভ করেছে, সেই যুগে

দেশপ্রেম এবং মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিচার হবে না তো কি? সর্বদেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের সংহতি এবং ধনিকপ্রধান সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে বর্তমানের বিশিষ্ট পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা কি হবে না? একদিকে সোভিয়েট এবং অপরদিকে কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্স্‌বাদ ও বিপ্লব সম্বন্ধে যে চিন্তা ও কর্মধারার কথা জোর গলায় প্রচার করছে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের পূর্বাভ্যস্ত ঐক্যবোধকে কিছু পরিমাণে খণ্ডিত করেই যে প্রচার চলছে, তা থেকে কি সূচিত হয় না যে ভারতবর্ষের মতো দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা এবং জন-আন্দোলনের কার্যক্রম সম্বন্ধে নূতন শিক্ষণীয় বিষয় উত্থাপিত হওয়ার পরিস্থিতি প্রস্তুত হচ্ছে? পোল্যান্ডের মতো ক্যাথলিক দেশে ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে মার্ক্স্‌পন্থীদের মধ্যে বস্তুবাদ ও অন্যান্য মৌল বিষয়ে অকাট্য মতভেদ সত্ত্বেও সোশালিস্ট সমাজ গঠন ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য চিন্তার ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যকে সন্ধান করে তার প্রসার সাধনের কথা যখন হচ্ছে, তখন ঐতিহ্যপূত ভারতবর্ষে অনুরূপ চেষ্টা অচিন্তনীয়? "কিছুতে কিছু হবে না"—এ ধরনের মনোভাব আমাদের দেশে তো বটেই, যেখানে সোশ্যালিস্ট সমাজ স্থাপিত হয়েছে সেখানেও এর লক্ষণ দেখা গেছে। বিপ্লবের কয়েকটা স্তর পার হবার পর সেখানে এ-বস্তুর উদ্ভব হয়েছে আর আমরা হয়তো বহুযুগসঞ্জাত অবসাদের চাপে এই আশাহত নিশ্চলতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছি। সুস্থ চিন্তা ও কর্মের পরম শত্রু এই আত্মিক নিরুদ্যম সম্বন্ধে আমরা অবহিত হব না?

আমাদেরই দেশের পরম্পরা আলোচনা করে মহামহোপাধ্যায় পি-ভি কাণে সম্প্রতি তাঁর ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক মহাগ্রন্থে লিখেছেন যে বেদকে সনাতন, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলে মানতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন একদল 'ঐতিহাসিক, যাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় 'নিরুক্তে'। মুণ্ডকোপনিষদে কথিত আছে যে গৃহস্থ শৌনক ঋষি আঙ্গিরসকে প্রশ্ন করেন : 'কোন্ বিদ্যা জানা থাকলে সকল বিষয় জানা যায়?' ঋষি উত্তর দিয়েছিলেন যে চতুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদি হল 'অপরা বিদ্যা', যাঁরা ব্রহ্মবিদ্ তাঁরাই 'পরা' বিদ্যার সন্ধান রাখেন। যে বেদকে অবশ্যমান্য শ্রুতি বলে হিন্দু মনকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বোঝানো হয়েছে, সেই বেদজ্ঞানকে নিম্নস্তরের বস্তু বলতে প্রাচীন মনীষীরা তো সর্বদা কুণ্ঠিত হন নি। লোকায়ত জীবনদর্শনের প্রতিভূ ও প্রবক্তাদের কথা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য তো বহুযুগ ধরে ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু যাকে ভারতচিন্তার অন্তঃসার বলা হয় সেই উপনিষদেই রয়েছে মনের মুক্তির এই অকুণ্ঠ ঘোষণা।

আঙ্গিরস ঋষি আরো বলেছিলেন যে পুরোহিতেরা যজ্ঞকারদের কত স্তোক দেয়, 'অষ্টাদশ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করো, চতুর্বর্গ লাভ হবে' ইত্যাদি আশ্বাস দেয়, কিন্তু এ-আশ্বাসে যারা ভোলে তারা 'মূঢ়', তারা হল 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ', ঠিক যেন অনেকগুলি অন্ধকে একজন অন্ধ নিয়ে চলেছে! মুণ্ডকোপনিষদে রয়েছে : 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ', মুক্তি আসে না শুধু শাস্ত্র অধ্যয়নে, আসে প্রকৃত জ্ঞানের প্রসাদে, যে-জ্ঞান সত্তাকে বিশুদ্ধ করে আর এনে দেয় নির্ভয় নিশ্চিতি—'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'। এই মূল কথার পুনরাবৃত্তি আছে স্কন্দপুরাণ ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে—'তীর্থস্নানে কিংবা বহু দান ফলে কিংবা উগ্র তপস্যাবলে শুদ্ধি আসে না; বাগ্‌জাল মথিত করে যা নির্ণীত হয় তা এই—"নোপকারাৎ পরো ধর্মো নাপকারাদঘং পরম্" (উপকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং অপকারের চেয়ে পরম পাপ আর নেই)।' মনে পড়ছে মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দিরে নাস্তিকের উপস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে একজন পুরোহিতই

বলেছিলেন যে জগতের হিত হল সর্বধর্মের মর্মবস্তু, 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' হল ভারতবর্ষের সনাতন অভীপ্সা।

ভারতবর্ষে জন্মেছি বলে আমার অভিমান বড়ো বেশি—মাঝে মাঝে ভয় হয় যে বুঝি এ-অহংকার সমুচিত নয়, কিন্তু একে পরিহার করতে আমি পারি না। হয়তো সেইজন্যই বার বার মনে ঘুরতে থাকে : 'ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই'। রাজনীতির আবর্তে ক্ষুদ্রতা লক্ষ করি প্রায়ই—শুধু সেখানে কেন, অপর বহু ক্ষেত্রেও, যাঁরা বিদ্বান্‌ ও নমস্য বলে খ্যাত তাঁদের মধ্যেও দেখি, আর দেখি নিজের দৌর্বল্য, ভ্রান্তি, ধ্রুবনীতিপথ অনুসরণে অপারগতা। এই সব প্রত্যবায় নিয়েই অবশ্য জীবন; কিন্তু শুধু তুরীয় তুঙ্গে লক্ষ স্থাপন নয়, লক্ষ সাধনের দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে লক্ষের পবিত্রতা ও সততাকে সঞ্চারিত না করতে পারলে তো স্বস্তি নেই।

প্রায়ই মনে পড়ে বহু বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন—আর সম্প্রতি যার পুনরাবৃত্তি আমেরিকায় করেছিলেন জওহরলাল নেহরু : "ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ মাত্র।"

হয়তো রুষ্ট মন্তব্য শুনব যে আমাদের কর্মবিমুখ স্বদেশবাসীকে এ-ধরনের কথা শোনান অমার্জনীয় স্তোকবাক্য। সমালোচনায় সমীচীনতা অস্বীকার করি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেই বলতে চাই : "ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।"

এমন কথা বলার সাহস আছে বলেই ভারতবর্ষ শুধু সাফল্যের প্রশস্তি বাদনে অস্বীকৃত। আধুনিকতার জগৎকে নস্যাৎ সে করে না, কিন্তু তার কাছে সর্বথা মস্তক অবনত করতে সে অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ তাই সমসাময়িক পাশ্চাত্যে মানবমুক্তির অজুহাতে শক্তির প্রতিষ্ঠাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন—বলেছিলেন তা মুক্তি নয়, তা হল "চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু; তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর; তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না, এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিভেদ প্রাকার তুলে ধরার দুর্বুদ্ধি কারো যেন না ঘটে। এই বিভক্তির বিলোপসাধনে রবীন্দ্রনাথের তুল্য অবদান আছে কার? কর্মই সর্বগরিষ্ঠ যজ্ঞ, পাশ্চাত্যের এই দিব্যানুভূতির অপার মূল্য কি কেউ অস্বীকার করতে পারি? শুধু চাই যে কর্মের সঙ্গে ধর্মের মিলন হোক, বুদ্ধির সঙ্গে কল্যাণ সংযুক্ত হোক, দিনযাপনের ব্যস্ততা শান্তির ধ্যানাসনকে যেন অপসৃত না করে, জীবনের অনিবার্য সংঘর্ষ ও ঈর্ষাকালিমা থেকে একেবারে মুক্ত হওয়া সম্ভব না হলেও আপন অবিচলিত মর্যাদায় যেন মানুষ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ শুধু ভারতবর্ষের নয়, সর্বদেশের মানুষের মনের কথা।

মুখবন্ধের পক্ষে বাক্‌বিস্তারের এই আতিশয্য অমার্জনীয় বলে আমারই আশঙ্কা হচ্ছে। তাই এখানেই ক্ষান্ত হব। পাঠকের কাছে সানুনয় নিবেদন শুধু এই যে আমার বক্তব্যে স্পষ্টতা ও প্রসাদগুণের অভাবকে যেন আন্তরিকতার অভাব বলে তাঁরা ভুল না করে বসেন। যাঁরা

অধিকারী, তাঁরা যদি আমার অক্ষম ভঙ্গিতে উত্থাপিত প্রসঙ্গ নিয়ে বিচার-বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন তো আমার লক্ষ সিদ্ধ হবে।

মুক্তমতি, মহদাশয় আচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাতে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ অর্পিত হল।

ভারতের সংহতি

সম্প্রতি কিছুকাল ধরে প্রায় স্থান-কাল নির্বিশেষে ভারতীয় সংহতির কথা শোনা যাচ্ছে। আমাদের দেশে অসংখ্য ভেদাভেদ, কিন্তু তাকেই অতিক্রম করে যে দেশবাসীকে মিলতে হবে, একজোট হয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টায় নামতে হবে, এ-কথার অবশ্য মূল্য অল্প নয়। অতিকথন সত্ত্বেও তাই ভারতীয় সংহতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের যে যোগসূত্র আমাদের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় তার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যত গভীর ও ব্যাপক হবে ততই দেশের মঙ্গল।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতেই হয় যে বৈচিত্র্য ও সর্ববিধ বিভেদকে বিলীন করে সংহতি সাধন ঘটে না। শিল্পবস্তুর মধ্যে সমাহৃত বিভিন্ন উপাদানকে কঠোরভাবে একীকৃত করলে যেমন তার সার্থকতা ব্যাহত হয়, আলেখ্য প্রাণবন্ত না হয়ে যন্ত্রবৎ আকার পরিগ্রহ করে, তেমনই সমাজ ও মানুষের ক্ষেত্রেও বলা চলে যে প্রভেদ ও বৈচিত্র্য যেখানে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছে, ইতিহাসগত কারণে বিভেদ রয়েছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের যোগসূত্রেরও সন্ধান নিয়ত পাওয়া গিয়েছে, সেখানে বিভেদকে অস্বীকার করে বা বিলুপ্ত করে দিয়ে ঐক্য সাধনের চেষ্টা অসঙ্গত, অস্বাভাবিক ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতের সংহতি একস্তম্ভ ঐক্য নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভারতীয় ঐক্যের বিকাশ, বিভেদের মধ্যেই মিলন, ভারত-ভূভাগের বহুবিস্তৃত অঞ্চলবাসী জনপুঞ্জের মধ্যে তাই দূরত্ব সত্ত্বেও নৈকট্য ইতিহাসে বহুদিন হতে লক্ষ করা যায়। ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রেই বৈচিত্রের মধ্যে এই ঐক্যের উপস্থিতি নানা দুর্দৈব ও স্খলন সত্ত্বেও জাজ্জ্বল্যমান হয়ে রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ যখন প্রভুত্ব এখানে করত, তখন তার অজুহাত হিসাবে বলা হত যে ভারতবর্ষ একটা 'ভৌগোলিক আখ্যা' মাত্র। এখানে ভাষা, ধর্ম, প্রথা এমন কি মানুষের গাত্রচর্মের বর্ণের দিক থেকেও প্রভেদের অন্ত নেই, সংহত জাতীয় রাষ্ট্ররূপে তাই এদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বিদেশি শাসনের দণ্ড ভারতের ঐক্যকে বিধৃত করে রেখেছে, দণ্ড অপসৃত হলে ঐক্যও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ এদেশে ছাড়ার আগে শেষ যে আঘাত আমাদের দিয়েছে, তারই ফলে দেশ আজ বিভক্ত এবং বিভক্তির যে গ্লানি তা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুভব করতে হচ্ছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামে দুর্বলতা ছিল বলেই যে সাম্রাজ্যবাদ এই চক্রান্তে ব্যর্থ হয় নি, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহুকালের পরাধীনতার পর স্বায়ত্ত ভারত যেভাবে আজকের জগতে মর্যাদার আসন দখল করেছে, চল্লিশ কোটিরও বেশি লোক নিয়ে বিপুল এক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে, ইংরাজ শাসন দেশের যে দুই-পঞ্চমাংশ ভাগকে নৃপতিশাসিত অঞ্চল বলে অপর রাজ্যগুলিকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তাকে সর্বভারতীয় সংহতির মধ্যে বিন্যস্ত করতে পেরেছে। তা নিয়ে একটু অহংকার বোধ হয় অসমীচীন নয়। এই কৃতিত্ব যে সম্ভব হয়েছে, তা থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারার মধ্যেই এই সম্ভাবনা সর্বদা ছিল, সাম্রাজ্যবাদই তার বিকাশে ক্রমাগত বাধা দিয়েছে।

ইতিহাসে জাতীয়তার পুষ্পটি আবির্ভূত হয়েছে সম্প্রতিকালে। একটা গোটা দেশ নিয়ে রাষ্ট্র গড়ে উঠতে দেরি হয়েছে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্বার্থের মধ্যে ভেদাভেদের ধারণাও এসেছে বিলম্বে—প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। নিজের দেশের মাটির প্রতি মানুষের স্বভাবজ মমতাকে তখন আরো জটিল, আরো ব্যাপক একটা চেহারায় দেখা গিয়েছে। ফ্রান্সের মতো সমুন্নত দেশে ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৪) পূর্বে প্রকৃত ফরাসি জাতীয়তার কথা বলা চলে না। ১৭৭২-৯৫ সালে তিনবার যখন প্রাশিয়া, রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া পোল্যান্ড দেশটাকে ভাগাভাগি করে নেয় তখন থেকে জাতীয়তার আবেগ ইয়োরোপের ইতিহাসে একটা মস্ত জায়গা নিতে শুরু করে। এ-কথা ঐতিহাসিকেরা বলেছেন। উনিশশতকে ইয়োরোপের দেশে দেশে জাতীয়তার জোয়ার বইতে থাকে, তারই জের দেখা যায় এশিয়াতে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। এ বিষয়ে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু বলার দরকার আছে যে জাতীয়তার আধুনিক রাষ্ট্রগত রূপ ভারতবর্ষে স্বভাবতই বিলম্বে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার মর্মবস্তু, তার মূল উপাদান বহুকাল থেকেই এদেশে উপস্থিত থেকেছে—বিদেশি শাসনের হাওয়া লেগে যে আমরা মানুষ হয়ে উঠেছি, ভারতবর্ষকে এক দেশ ভাবতে শিখেছি, তা একেবারেই নয়। যুগ যুগ ধরে এক ধরনের ঐক্যবোধ আমাদের এই দেশের জীবনকে জড়তা ও বিনাশের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বহু বিপর্যয়ে প্রপীড়িত হয়েও ভারতের আত্মা নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে নি।

আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে অধ্যায়ের কথা আমরা জানি তা হল তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতা, যার দুই প্রধান কেন্দ্র ছিল মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা। একে সিন্ধুসভ্যতা বলা যে অচল, তা আজ প্রমাণ হয়েছে, কারণ গুজরাটের দক্ষিণ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত, এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশেই এই সভ্যতার বহু তর্কাতীত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এর সঙ্গে পরবর্তী ভারতীয় জীবনের সম্পর্ক যে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে, তা মনে রাখার মতো জিনিস। আর মনে রাখা দরকার যে বিপুল এক ভূখণ্ড জুড়ে বাস্তব জীবনের ব্যবস্থা ও প্রকরণ সম্বন্ধে ঐক্য যে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ রয়েছে।

সম্ভবত প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে যাকে আর্যসভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়েছে তারই উদ্যোগে সমগ্র দেশকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রচেষ্টার কথা জানতে পারা যায়। 'হিমবৎ-সেতুপর্যন্তম্' বলে এ দেশের বর্ণনা রয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে। তখন অবশ্যই বহু সংঘাত ঘটেছিল, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ হয়েছিল, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এবং তা থেকে অস্পৃশ্যতার মতো জঘন্য পরিণতির প্রাদুর্ভাব এদেশে হলেও সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় যে, এখানে অন্তত বহু দেশের মতো আদিম, তুলনায় পশ্চাৎপদ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে নিধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় নি—এবং ঠিক সেজন্যই যাদের আদিবাসী বলা হয় তাদের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয়ের পার্থক্য সত্ত্বেও যে এক প্রকার আত্মীয়তা থেকে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৭০০ সনে পাণিনির ব্যাকরণে ভারতকে এক জনপদ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তার ব্যাপ্তি হল উত্তরে কম্বোজ থেকে মগধ পর্যন্ত। এবং প্রায় সাড়ে পাঁচশো বৎসর পরে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে উল্লেখ করেছেন আর্যাবর্তের কথা, যার বিস্তৃতি হল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বতমালা পর্যন্ত। প্রায় একই সময়ে কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল-এর হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে 'ভারতধবস' (অর্থাৎ ভারতবর্ষ) শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

খ্রীস্টাব্দ চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে, গুপ্তরাজ্যকালে বিষ্ণুপুরাণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাতে আছে—"সমুদ্রের উত্তরে ও হিমাদ্রির দক্ষিণে ভারতবর্ষ অবস্থিত। সেখানে ভারতের সন্ততিরা বাস করে।" বিষ্ণুপুরাণেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য, ভারতবর্ষের এই পাঁচটি অঞ্চলের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। কালিদাসের রচনাতেই শুধু এই দেশের সৌন্দর্য কবি-কল্পনার মায়ারশ্মিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি, মনুসংহিতাতে পর্যন্ত একে বলা হয়েছে 'দেবনির্মিতম্ দেশম্'। লঙ্কাদ্বীপ থেকে সীতাকে উদ্ধার করে পুষ্পক রথে অযোধ্যা যাবার সময় রামের মুখে দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত এই দেশের যে বর্ণনা কালিদাস রঘুবংশকাব্যে দিয়েছেন, তাতে এই দেশের বিচিত্র মাধুর্য সম্বন্ধে মমতার সিঞ্চন পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে থাকে। দেশ সম্বন্ধে অনুভূতি কত দূর প্রকট হয়েছিল, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে রামায়ণের পংক্তি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

বৈদিক যুগে সমগ্র ভারতকে এক রাষ্ট্ররূপে বিন্যস্ত করার বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু একরাট, সম্রাট, প্রভৃতি উপাধি ব্যবহারেই এবং অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তা নিশ্চয়ই নিছক কল্পনা ছিল না, সুস্পষ্ট প্রতিচিত্র মার্ক্স্‌বাদে নেই। কাল্পনিক স্তর হল 'কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম ধাপ' তার বাস্তব ভিত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চয়ই ছিল। দক্ষিণ ভারত যে সমগ্র দেশেরই অঙ্গীভূত, তা মোহনীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে অগস্ত্যযাত্রার কাহিনীতে। ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বত পার হয়ে গেলেন, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সংস্কৃতিকে মিলিত করলেন। বিন্ধ্য তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি বললেন যে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন বিন্ধ্য মাথা না তোলে, এবং তিনি ফিরলেন না বলে বিন্ধ্য নতমস্তক হয়েই রইল, উভয় দিকের যোগাযোগ সহজ হল। অগস্ত্যযাত্রা সম্বন্ধে কথিত আছে যে শিবপার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে কৈলাস পর্বতে দেবতা ও ঋষিদের বিপুল সমাগম হওয়ায় পৃথিবীর ভারসাম্য লঙ্ঘিত হতে পারে আশঙ্কায় অগস্ত্য দক্ষিণে গেলেন, দক্ষিণ ভারতের তিনিই হলেন অধিষ্ঠাতা ঋষি। আজো যখন দক্ষিণ ভারত কোনো কারণে বিচলিত হয়ে উত্তরের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, তখন অনুরূপ ও যুগসম্মত কোনো ব্যবস্থা তো হতে দেখা যায় না! যাই হোক, প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতির দিক থেকেও প্রভেদ সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা অল্প থাকত, এমন কথাও প্রায় বলা হত যে হর্ষবর্ধনের পর তেমন উল্লেখযোগ্য রাজা এ দেশে হয় নি, অথচ পাল, গুর্জরপ্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশকে বাদ দিলেও হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগে দক্ষিণ ভারতে বিপুল শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চোল সাম্রাজ্যের মতো বিরাট রাষ্ট্র ইতিহাসে অল্পই দেখা গিয়েছে। এখন অবশ্য ইতিহাস রচনায় এই গলদ অনেকাংশে দূর হয়েছে কিন্তু এরই জের টেনে দক্ষিণ ভারতীয়দের মনে ক্ষোভও জমে এসেছে। সুন্দরম পিল্লাই-এর মতো বিদ্বান যখন বলেন যে গঙ্গা-যমুনার অববাহিকার চেয়ে হয়ত কৃষ্ণা ও কাবেরীবিধৌত অঞ্চলের ইতিহাস থেকে আমাদের পাঠ আরম্ভ হলে ভুল হয় না, সে-কথা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বহুর মধ্যে একের সন্ধান ভারতবর্ষের মনীষার বৈশিষ্ট্য বলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্বাস ও নিত্যকর্ম পদ্ধতির দিক থেকে হিন্দু ভারতে অগণিত পার্থক্য সত্ত্বেও ভাবগত একটা ঐক্য যে গড়ে উঠেছিল, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। বেদ, উপনিষদ, সংহিতাবলী, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি এদেশের মানসকে প্রকাশ করে এসেছে, অঞ্চল

নির্বিশেষে, বহু যুগ ধরে। বৌদ্ধ ও জৈন ধারা কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মণ্যচিন্তাকে খণ্ডিত করলেও এ দেশের মানসিকতার যে পরম্পরা তাকে খণ্ডিত করে নি। ষড়দর্শনের যে বিচিত্র ঐশ্বর্য, কিংবা যে লোকায়তবাদ নিরবচ্ছিন্ন দমন-প্রচেষ্টার কাছেও পরাজয় মানে নি, তা ভারতীয় চিন্তার ভিত্তিস্থলে কোনো অকাট্য অসামঞ্জস্যের আবির্ভাব ঘটায় নি। বৈদান্তিক ও পৌত্তলিক, ভক্ত ও নাস্তিক এ দেশে যেভাবে সহ-অবস্থান করতে পেরেছে, চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে, তা বিভেদের মধ্যে ঐক্যের মূলগত সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে স্থিরতা বিনা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোক আফগানিস্তান থেকে মহীশূর ও আন্ধ্র পর্যন্ত সুবিস্তৃত তাঁর সাম্রাজ্যে একই লিপিতে, একই প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে 'ধম্ম' প্রচার করেছিলেন। এর কিছু পরে তক্ষশিলা থেকে সুদুর দক্ষিণ পর্যন্ত এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করতে থাকেন। আজো সংস্কৃতের অবদান নিঃশেষ হয় নি; শব্দ ও অর্থের দিক থেকে প্রায় এদেশের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার উপর সংস্কৃতের বিপুল প্রভাব অনস্বীকার্য। দেবভাষা বলে ঘোষিত সংস্কৃতের নানা গুণ সত্ত্বেও এক প্রকার কৃত্রিমতা দোষ থেকে তা মুক্ত হয় নি। সাধক কবি (চতুর্দশ শতক) চমৎকারভাবে বলেছিলেন যে সংস্কৃত হল যেন কূপের জল আর জনগণের ভাষা হল প্রাণচঞ্চল প্রবাহিনীর মতো। তবুও দেশের ভাবগত ঐক্য সাধন ও রক্ষণে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক ভূমিকা সত্যই শ্রদ্ধেয়। এ-কথা বিস্মৃত হলে অন্যায় হবে, আমাদের কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি ঘটবে। মাইকেল মধুসূদন একবার বলেছিলেন যে সংস্কৃতের দুহিতা বলে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ ক্ষমতায় অন্ত থাকতে পারে না—একথা বিশেষ করে আমাদের মনে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের সেতু বহু ভারতীয় ভাষার মধ্যে যে যোগসংসাধনে লাগে তা অবজ্ঞা করতে কেউ পারব না।

গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী—হিন্দুদের এই সপ্ত পুণ্য নদী সমগ্র দেশকেই যেন ঘিরে রেখেছে। তীর্থ স্থানের মধ্যে সপ্তপ্রধান হল অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) ও দ্বারাবতী (দ্বারকা)—এ যেন ভারতবর্ষের ভূগোল পাঠের মতো ব্যাপার! হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যারা, তাদেরও মনে সমগ্র দেশ সম্বন্ধে অনুভূতি সঞ্চারে সহায়ক বহু ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। পূর্বপ্রান্তে কামাখ্যা থেকে সুদূর পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মরুতীর্থ হিংলাজ (হিঙ্গুল-এর বর্তমান নাম) হল শাক্তদের পীঠস্থান। দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে উত্তরে কেদারনাথ পর্যন্ত শৈবদের তীর্থ ছড়িয়ে রয়েছে। যে বৈষ্ণব সে ধর্মের ডাকে যাবে পুরী থেকে দ্বারকা, কাঞ্চী থেকে বদরিনারায়ণ। ভক্ত হিন্দুর মনস্কামনা পূর্ণ হয় যদি দেহান্তে শবদাহ ঘটে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে। আর উত্তরপুরুষ পিণ্ড দেয় হরিদ্বার বা ধনুষ্কোটিতে, গয়া কিংবা প্রয়াগ বা পুষ্করে, পুরী বা প্রভাসে, কুরুক্ষেত্র বা অমরকণ্টকে—এখানেও আবার যেন ভূগোলের পাঠ নেওয়া হচ্ছে! সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রথম কর্তব্য ছিল পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমায় নিযুক্ত হওয়া, শুধু ধর্মচিন্তা যথেষ্ট ছিল না। একথা সকলেরই জানা যে খ্রীস্টাব্দ অষ্টম শতকে সুদূর দক্ষিণাস্থিত কেরালা প্রদেশ থেকে শঙ্করাচার্য ভারত পরিক্রমা করে চারটি মঠ স্থাপনা করেন—হিমালয়ে, শৃঙ্গেরিতে, দ্বারকায় এবং পুরীতে।

তামিলনাদের প্রখ্যাত চোলরাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি রাজেন্দ্র চোল তাঞ্জোরে তাঁর পিতা রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত বৃহদীশ্বর মন্দিরের অবিকল অনুরূপ মন্দির গড়েন নিজের

প্রতিষ্ঠা করা নতুন শহরে, যার নাম গঙ্গাইকোণ্ডা চোলপুরম্। যার ধ্বংসাবশেষ আজো দেখবার বস্তু। এই শহর স্থাপনের একটু ইতিহাস আছে। রাজেন্দ্র চোল সৈন্য পাঠিয়ে বাংলা দেশ আক্রমণ করেছিলেন। আর আক্রমণের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে সপ্ত নদীর মধ্যে যার জল সবচেয়ে পবিত্র বলে খ্যাত সেই গঙ্গা নদীর জল মস্ত বড়ো অনেক ঘড়াতে ভরে দক্ষিণ ভারতে চোলরাজ নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এজন্যই শহরের নামকরণ হল গঙ্গাবিধৌত-অঞ্চল-বিজয়ী রাজের নগর। গঙ্গার মাহাত্ম্য অন্তত বিজয়দৃপ্ত দক্ষিণ ভারতীয় সম্রাটকে সর্বভারতের আত্মিক সম্পর্কের কথা ভুলতে দেয় নি।

এত বড়ো দেশে মনের দিক থেকে এতটা ঐক্য কখনো সম্ভব হত না যদি তার বাস্তব পরিবেশ কিছু একটা না থাকত। তাই মৌর্য গুপ্ত বা চোল সাম্রাজ্যের কালে বহুবিস্তৃত আয়তন নিয়ে সার্বভৌম সুসংগঠিত শক্তির কথা মনে করতে হয়। সে-যুগে যাতায়াত ব্যবস্থার অজস্র বাধাবিপত্তি ছিল, কিন্তু তবুও যোগাযোগ যেভাবে ঘটত, তা প্রায় বিস্ময়কর। সুসংহত রাজ্যশাসনের যে বিবরণ আমরা মৌর্য বা চোল যুগে পেয়ে থাকি, তাও এখানে অনেকের মনে পড়বে। হিন্দু রাষ্ট্রব্যবস্থার যখন অধঃপতনের যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে, মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে পর্যুদস্ত হওয়ার মতো অবনতির চিহ্ন যখন হিন্দু সমাজ ও জীবনে দেখা দিয়েছে, তখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরস্পর সম্পর্ক প্রকৃতই লক্ষ করার ব্যাপার। তাই কাশ্মীরে রুগ্ন দেহ, তর্কপ্রবণ, কলহপরায়ণ বাঙালি ছাত্রদের নিয়ে ক্ষেমেন্দ্র বহু কৌতুক করেছেন; তাই দেখা গেছে যে বাংলায় সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করছে কর্ণাটক থেকে আগত সেনবংশ।

হিন্দু ভারত সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা যায় কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ভারতবর্ষ তো শুধু হিন্দুরই দেশ নয়। হিন্দু বলে সংজ্ঞা যাদের ঠিক মানায় না, সেই আদিবাসীদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে হিন্দু সমাজসৌধে অবহেলিত হলেও তাদের কিছুটা জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান আক্রমণ যখন সংঘটিত হল, তখন এদেশে এল এমন এক ধারা যা পূর্বতন বিদেশাগত আক্রমণকারী থেকে মূলগতভাবে পৃথক। পারসীক, গ্রীক, শক, সীদিয়ান্, হুন্ প্রভৃতি যারাই আগে এদেশে এসেছে তারা এ দেশের অভ্যন্তরে আর বিদেশি হয়ে থাকে নি, অতিথিপরায়ণ ভারতবর্ষের মায়া তাদের আত্মীয় করে নিয়েছে। মধ্য এশিয়া থেকে এসে তারা রাজস্থানের ক্ষত্রিয় বংশাবতংসে পরিণত হয়েছে। এদেশে ইসলামের আবির্ভাব হল অন্য এক পর্যায়ের ঘটনা। প্রখর শাণিত বিশ্বাস ও কায়মনোবাক্যে একাগ্রতা নিয়ে ইসলাম এদেশে হাজির হয়ে হিন্দু মানসের বহুধাবিখণ্ডিত, সহনশীল, বিরোধবিমুখ অথচ একান্ত অনাত্মীয় সত্তার সম্মুখীন হল—এর পরিণতি কি ভাবে ঘটেছে তা ইতিহাসের এক মুখ্য অধ্যায় বললে ভুল হবে না। কিছুকাল ধরে উভয় পক্ষের যে-সংগ্রাম তা চলল নিষ্করুণভাবে; কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে নি ইসলামের মতো তীক্ষ্ণ, তেজোদীপ্ত জীবনবোধ এই সুপ্রাচীন দেশের সর্বংসহা মূর্তিরই অঙ্গীভূত হয়ে যেতে। হিন্দু ও মুসলিম ধারার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থেকেও এমনভাবে উভয় ধারার সম্মিলন ঘটল এবং জীবনের সর্ববিধ বিভাগে তার প্রকাশ দেখা গেল যে তা প্রকৃতই ইতিহাসে অভূতপূর্ব। অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরকূল পর্যন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল, নানা দেশে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারত গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সেই সমস্ত দেশের তুলনায় দেখা গেল যে একমাত্র ভারতবর্ষে ইসলাম প্রাথমিক বিরোধের অভিজ্ঞতা সাঙ্গ হওয়ার পর

যেন একেবারে এই আজব দেশের আত্মীয় হয়ে গেছে। ঠিক এমন ঘটনা বোধ হয় অন্য কোথাও ঘটে নি—ভারতে সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শাসনব্যবস্থা, ভোজনপ্রথা, পরিচ্ছদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে মুসলমান ও অমুসলমান ধারার সংমিশ্রণ যেমন হয়েছে, তেমন অন্য কোথাও হয় নি। এজন্যই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর হিন্দুস্তানী ধারার স্বকীয়তায় কথা বলেছিলেন। আর তারও পূর্বে ভারত আক্রমণের অজুহাত হিসাবে দিগ্বিজয়ী তৈমুরলং ঘোষণা করেন যে এদেশে মুসলমান তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলছে বলেই তিনি ধর্ম-যুদ্ধে নামছেন! আজ এই দেশকে ভাগ করে ভারত এবং পাকিস্তানকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গঠিত করা হয়েছে—কিন্তু এই দুর্দৈব সত্ত্বেও ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃতই এদেশে মুসলমান এবং অমুসলমান স্বকীয়তা অটুট রেখেই একত্রিত হতে পেরেছিল। যে কোনো জনসমষ্টিতেই মধ্যে মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ বেধে থাকে, ভারতবর্ষেও তা ঘটেছে, কখনো বা বিশেষ প্ররোচনা বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে তা বিকট আকার পর্যন্ত নিয়েছে। কিন্তু বিসংবাদ সত্ত্বেও যে মূলাধৃত ঐক্য এদেশে লক্ষিত হয়েছিল তার মূল্য যেন আমরা কখনো হ্রাস করে না দেখি।

ধর্মাবেগ নিয়ে মুসলিম ও হিন্দুর মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের অধ্যায় শেষ হতে এত বড়ো দেশে সময় লেগেছিল নিশ্চয়ই, এবং সেজন্যই দুই সম্প্রদায়ের মনে এখনো পর্যন্ত তার স্মৃতি একেবারে মিলিয়ে যায় নি, দুর্দিনে তারই বিষময় কিছু ফল তাই মাঝে মাঝে দেখা গেছে। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড়ো কথা হল যে ধর্মবিশ্বাস ও আচারের দিক থেকে প্রচণ্ড প্রভেদ সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র বন্ধুভাবেই বসবাস করে এসেছে—ধর্মান্তরণ ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ যে কখনো হয় নি তা নয়, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে উত্তর প্রদেশের ন্যায় অঞ্চলে মুসলিম শাসন নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু শতাব্দী ধরে চলা সত্ত্বেও সেখানে হিন্দুর চেয়ে মুসলিমের সংখ্যা অনেক কম অথচ বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্ব কখনো সেরূপ সুদৃঢ় ও ব্যাপক না হলেও মুসলমানের সংখ্যা বেশি। ভারতে মুসলমান শক্তির অভ্যুদয় বাস্তবিকই এমন একটি ঘটনা যা এদেশের ইতিহাসকে বিকৃত না করে তারই স্বকীয় চরিত্র নিয়ে আরো বিকশিত হতে সহায়তা করেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নতুন প্রকৃতির এক বীর্য ও বিশ্বাসের প্রবলতা এল। আরবি এবং ফারসির মতো সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, আর কালাতিপাতের ফলে মুসলমান ও হিন্দু প্রতিভার সমন্বয়রূপে উর্দুভাষার জন্ম হল। মুসলমান আইন এদেশে সমাজজীবনে নতুন এক ধারা আনল, নতুন এক শাসকশ্রেণীকেও ভারতবাসী দেখল। কিন্তু এই শাসকশ্রেণীর অনেকে প্রথমে বিদেশাগত হলেও ক্রমশ তাদের বৈদেশিকতা আর এদেশবাসীর চোখে কটু লাগল না। অনতিকালের মধ্যেই দেখা গেল যে ভারতীয় মুসলমান যারা, তাদের জন্মভূমি ও কর্মভূমি হল ভারতবর্ষ। পরবর্তী যুগে ইংরেজ বিজেতারা মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে এদেশে জীবন অতিবাহন করেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, এবং সমুদ্রযাত্রার দুরূহতা ও বিপদ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এদেশকে একেবারেই বাসভূমিরূপে দেখে নি—শিকারী পাখির মতো যেন তারা এদেশে উড়ে এসে কিছুকাল বসেছে, মনোমত শিকার করেছে আর স্বদেশে ফিরে গিয়ে উপভোগ করেছে। মুসলমান তাই এদেশে কখনো পরদেশী হয়ে থাকে নি; জীবনের সর্বক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান যুগ্ম-প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় যা ভারতে হয়েছে তার অনুরূপ ঘটনা ইতিহাসে অন্যত্র নেই। আজো তাই হিন্দু যদি পর্যটনে বেরোয় তো অম্বর আর চিতোরে হিন্দু শিল্পের মনোহর নিদর্শন দেখার চেয়ে

দিল্লী-আগ্রাতে যাওয়াই সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রেয় মনে করে—কোনো দ্বিধা আসে না, মুসলিম সংস্কৃতিকে বিদেশের ব্যাপার বলে চিন্তা ঢোকে না। এই উপলক্ষে মনে পড়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত একজন মুসলিম নেতার কথা; তিনি এক সভায় বলেছিলেন যে মৃত্যুর পর হিন্দুর শবদেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সে-ছাই নদী থেকে সমুদ্রে মিশে কোথায় মিলিয়ে যায় কে জানে। কিন্তু এদেশ জীবনে-মরণে মুসলমানের কাছে আপন দেশ, মৃত্যুকালে কবরের মাটিটুকু এদেশেই তার চাই।

ফারসি আর হিন্দির মিলন ফলে উর্দু ভাষার জন্ম ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সমুজ্জল এক ঘটনা। একাদশ শতকে মুসলিম মনীষী অল্‌বেরুণি লিখেছিলেন যে হিন্দুরা তখন বিদেশিদের সঙ্গে সংস্পর্শে অনিচ্ছুক ছিল, কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পর থেকে অবস্থা পরিবর্তনেরই লক্ষণ দেখা যায়। আমীর খস্‌রু থেকে আবুল ফজল্‌-এর সময় পর্যন্ত এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস এমনভাবে অগ্রসর হল যে হিন্দু-মুসলিম এই দ্বি-ধারা একেবারে ভিন্ন হয়ে থাকতে পারল না। মুসলমান ও হিন্দু মিলে যে কেবল উর্দু ভাষাকে বিকশিত করে তুলল তা নয়; বাংলা কিংবা মারাঠী ভাষার অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদান অসামান্য। ইয়োরোপের মতো এদেশে যে কখনো ব্যাপক, নির্মম ধর্মযুদ্ধ হয় নি, এ-ঘটনার তাৎপর্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে বার বার সেকথা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য।

নাম না করে বলব যে আমাদের কোনো কোনো খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ্‌ বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে এদেশে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান থেকে গেছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে তারা স্বতন্ত্র, এমন কি শত্রুভাবাপন্নই থেকে এসেছে। সবিনয়ে অথচ সুদৃঢ়ভাবে এ-মতের বিরোধিতা করতে হবে। সেজন্য যে শুধুমাত্র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আকবর, কাশ্মীর জৈনুল আবেদিন, বাংলায় হুসেন শাহ, বিজাপুরে য়ুসুফ্‌ আদিলশাহ্‌ প্রভৃতির উল্লেখ প্রয়োজন, তা নয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে সংঘর্ষ তো সর্বদেশে সর্বকালে সর্ববিধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হয়ে এসেছে, কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম রাজশক্তির মধ্যে রক্তারক্তি যতই চলে থাকুক না কেন, উভয় ধর্মের সাধুসন্তদের দল এমন পরিবেশের সৃষ্টি মুসলিম যুগে করেছিলেন যে অনৈক্যের চাপে মনকে ভারাক্রান্ত রাখতে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয় নি। দৈনন্দিন জীবনযাপনের কাজে উভয় সম্প্রদায়ের লোকে পরস্পর নৈকট্য ও সৌহার্দ্য স্থাপন করেছে, আর ভাবের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে মিলনের সূত্রই তারা খুঁজে পেয়েছিল। বহুকাল থেকে এদেশে এই সাধুসন্তদের বিপুল প্রভাব ছিল; তামিল ভাষায় সুপ্রাচীন 'কুরাল' গ্রন্থের প্রাতঃস্মরণীয় রচয়িতা তিরুভল্লুভার-প্রমুখ বহু গুণী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সহজ, সরল, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় শাস্ত্রনিরপেক্ষ ধর্মের সারবস্তু প্রচারের কাজে লেগেছিলেন। মুসলিম যুগে সুফী-সন্তদের সংস্পর্শে এসে এই যে প্রাচীন ধারা তার পুষ্টি অনবদ্য রূপ নিয়ে দেখা দিল। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর (ত্রয়োদশ শতাব্দী) থেকে তুকারাম (সপ্তদশ শতাব্দী) পর্যন্ত যে সাধু-সন্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা মহারাষ্ট্রের ভাষা ও মানসিকতায় যেন বিপ্লব এনে দিতে পেরেছিলেন। উত্তর ভারতে রামানন্দের ন্যায় মনীষী শুষ্ক দর্শন চর্চা ছেড়ে হিন্দুধর্মের সর্ববিধ সংকীর্ণতা দূর করার কাজে নামেন; তাঁর প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, একজন নাপিত, একজন মুসলমান জোলা আর একজন ছিলেন মুচি। তাঁর দুই শ্রেষ্ঠ শিষ্য হলেন রামচরিত-মানসের রচয়িতা, উত্তর ভারতের মর্মগুরু তুলসীদাস, এবং হিন্দু ও মুসলমানের কাছে সমান শ্রদ্ধেয়, অপরূপ কবিত্বরসসিক্ত দোহার স্রষ্টা কবির। চৈতন্য, নানক, রবিদাস, মীরাবাঈ

প্রভৃতির মাহাত্ম্য এরই সঙ্গে পরম কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণীয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রণতি জানাতে হবে নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ্ জালাল, মৈনুদ্দীন চিস্তি প্রভৃতি মুসলিম সন্তকে। আজো হিন্দুমানসে তাঁরা পরম মর্যাদার আসনে সমাসীন। আমাদের বাংলাদেশে যে সত্যপীরের কথা আমরা জানি, মুসলিম ফকিরের দরগায় হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয় জানি। এই যে পরস্পর-সম্মিলনের ধারা সুলতানী আমলেই তার সূচনা ঘটে, আর মুঘল সাম্রাজ্যের যুগে তা আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

মনীষার ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলিম ধারা একত্রিত হওয়ার বহু উদাহরণ রয়েছে, যা থেকে বাছাই করা কঠিন। ''কাশ্মীরের আকবর'' বলে খ্যাত সুলতান জৈনুল আবেদিন (১৪২৭) বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি তরজমা করিয়েছিলেন। আকবরের রাজ্যকালে হিন্দু ও মুসলিম বিদ্বানেরা অনুরূপ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দারা শিকোহ্ যদি দিল্লীর মস্‌নদে বসতে পারতেন তো এদেশের ইতিহাস অনেকটা বদলাতে পারত। তিনি হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, ফারসি ভাষায় উপনিষদ্, ভগবদ্‌গীতা এবং যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থগুলির অনুবাদ করিয়েছিলেন, এবং হিন্দু ও মুসলিম ভক্তিবাদের বিষয় ''মজ্‌মাউল-বাহ্‌রাইন্'' (''উভয় মহাসমুদ্রের সঙ্গম'') নামে এক মহাগ্রন্থ-রচনা করেছিলেন।

মহামতি আকবর এদেশে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে, কারণ তখনো ঠিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবের মধ্যে আসে নি। কিন্তু সন্দেহ নেই যে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্ম ও অঞ্চলের প্রজাপুঞ্জকে একত্রিত করার নতুন এক রাস্তায় নামতে চেয়েছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডে শুধু যে রাষ্ট্রচালনাগত কৌশল দেখা যায় তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে জাজ্জ্বল্যমান হয়ে রয়েছে সর্ববিভেদকে অতিক্রম করে নতুন এক সংহত, সুসম্বদ্ধ ভারতের কল্পনা।

'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'। জাতির মর্মবাণী প্রকাশে সংগীতের স্থান যে কত গভীর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হিন্দু যুগ থেকে বিবর্তিত ধ্রুপদ সংগীতের সৃষ্টিশীল বিকাশ ঘটল মিঞা তানসেন (যিনি ছিলেন হরিদাস-স্বামীর শিষ্য) এবং অন্যান্য বহু প্রতিভাধরের হাতে—এঁদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ও মর্যাদা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কথিত আছে যে জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শারকি খেয়াল সংগীতের প্রবর্তন করেন—হিন্দু ও মুসলিম যাকে আপন করে নিয়ে তার দ্যুতি প্রকাশ করে এসেছে হাজার ভঙ্গিতে। শিল্পের কথা তো বলার প্রয়োজন নেই। শুধু মনে রাখা দরকার যে মার্শাল-প্রমুখ পণ্ডিত বিস্মিত হয়েছেন লক্ষ করে যে, এদেশে মুসলিম শিল্পধারা হিন্দু পদ্ধতি ও আদর্শের সঙ্গে কি অনবদ্য গভীর ও মনোহারীরূপে মিশতে পেরেছে। অশনে-বসনে, আদবকায়দায়, শাসন পদ্ধতিতে, ধর্ম-চিন্তায়, শিল্পকর্মে, সাহিত্য সৃষ্টিতে, একত্র জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে এদেশের হিন্দু-মুসলমান যে সংহতির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, তার অনুপযুক্ত আমরা যদি অধুনা হয়ে থাকি তো তা হল আমাদেরই বিপথগামিতার ফল।

ইংরেজ শাসন আমাদের বিক্ষিপ্ত জীবনে সংহতি শিক্ষা দিয়েছে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা একটা মস্ত ভুল করে থাকেন। অবশ্যই এ কথা ঠিক যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইংরেজ এদেশে ইতিহাসের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে, তার এদেশ জয় এবং শাসনের ফলে ইতিহাসের চাকা এগিয়ে চলে নতুন যুগের সম্ভাবনাকে কাছে এনে দিয়েছে; ইংরেজকে এদেশ কব্জা করে রাখার জন্য সৈন্যসামন্ত রাখতে হয়েছে, তাড়াতাড়ি উপদ্রুত অঞ্চলে সৈন্য পাঠাবার জন্যই

প্রধানত রেল রাস্তা বানাতে হয়েছে (উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইংরেজদের সৈন্যবাহিনী চালু রাখার দরকার বেশি ছিল বলে উত্তর-পশ্চিম রেলপথ নির্মাণে সবচেয়ে বেশি খরচ ইংরেজ করেছিল, সেখানে যাত্রী ও মালগাড়ির সংখ্যা নগণ্য হলেও), এবং রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণে শিল্প বিকাশও এদেশে ঘটতে দিতে হয়েছে। দেশ শাসনের জন্য লোক দরকার, তাই এদেশ-বাসীকে চাকর বানাবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—সে-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এত সংকীর্ণ হলেও তারই সুযোগ নিয়ে আমাদের দেশবাসী এগিয়ে চলার রাস্তা কিছু পরিমাণে খুঁজে পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ক্রমাগত বাধিয়ে রেখে, কিংবা বিরোধের সম্ভাবনাকে নিজের হাতে মজুদ অস্ত্র হিসাবে ইংরেজ শাসন ব্যবহার করেছে। দেশীয় নৃপতিদের খাড়া করে এদেশ যাতে কিছুতেই সংহত হতে না পারে, তার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস সাম্রাজ্যবাদ করেছে। যেতে বাধ্য হয়েও মরণ-কামড় দিয়ে দেশ বিভাগের দণ্ড সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দিয়েছে। পারতপক্ষে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ স্থাপন করতে ইংরেজ দেয় নি, সর্বদাই নারাজ ভাব দেখিয়েছে—ভারতবাসীকেই সেজন্য লড়তে হয়েছে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা কেউ কেউ আমাদের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজে লেগে নমস্য নিশ্চয়, কিন্তু শুধু নিজেদের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমরা দেশের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সংগ্রাম, দেশের মুক্তির জন্য সর্ববিধ উপায়ে যুদ্ধ—যা আমাদের সাধ্য, সঙ্গতি ও সুযোগ অনুযায়ী আমরা করেছি এবং করেছি বলেই খণ্ডিত হলেও দেশ আজ স্বাধীন। ইংরেজ শাসনের মূল্যায়ন যেভাবে হোক্ না কেন, ভারতের সংহতি, ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের অগ্রগতি যে ভারতবাসীরই কীর্তি, এ-কথা নিয়ত মনে মনে রাখা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে উচিত মনে রাখা যে আমাদের ইতিহাসে কালিমার সাহচর্য সত্ত্বেও যে-গরিমা বারংবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তা আজো আমাদের শক্তি দেবে, প্রেরণা দেবে, এগিয়ে চলার সঙ্গতি এনে দেবে।

যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব

সম্প্রতি কলিকাতায় বিজ্ঞানাচার্য জোলিও-ক্যুরির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এক সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে সব চেয়ে বেশি মনে পড়েছিল তাঁর কম্যুনিস্ট সত্তার কথা। জোলিও-ক্যুরি ছিলেন ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য; পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর অবদান অসামান্য, কিন্তু সে কৃতিত্বের জোরে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেন নি, করেছিলেন এইজন্য যে ফ্যাশিস্ট দুঃশাসনের আঘাতে যখন ফ্রান্সের মর্মস্থল পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, তখন ফ্যাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অসম সাহস সংগ্রামে যাঁরা সচেতন ও সদাসক্রিয় নেতৃত্ব দেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

আমরা যে-জগতে বাস করি, সেখানে অবিরাম শুনতে হয় যে কম্যুনিজ্‌ম্ বস্তুটিই এমন যে তা ব্যক্তিসত্তাকে গ্রাস করে বা বিকৃত করে দেয়, আর যে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী, মনীষার লেশমাত্র যার মধ্যে আছে, তার তো কম্যুনিজ্‌মের জাঁতাকলে পিষে মরা ছাড়া অন্য রাস্তা

খোলা থাকে না। জোলিও-ক্যুরি ছিলেন প্রতিভাধর; কম্যুনিজ্‌মের অতি বড়ো শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারে না, দ্য গোল্‌-এর ফ্রান্স পর্যন্ত তাঁর অন্ত্যেষ্টিকালে সারা জাতির পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশের অনুষ্ঠান না করে পারে নি, যদিও তাঁকেই জীবদ্দশায় আণবিক গবেষণা-সংস্থার পরিচালক পদ থেকে অপসৃত করা হয়েছিল তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে। সে যাই হোক, যে অণু-পরমাণুর মধ্যে মানুষ আজ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের শক্তি খুঁজে পেয়েছে, তার অনুশীলনে জোলিও-ক্যুরি ছিলেন পুরোধা। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্ভূত হয়ে থাকতে অস্বস্তিবোধ তাঁর ঘটে নি, বরং চিত্তের যে-প্রশান্তি তাঁর ছিল, অচিরে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও শান্তি-আন্দোলনে তাঁর যে অক্লান্ত কর্মব্যস্ততা সহযোগীরা লক্ষ করে বিস্মিত হতেন, জ্ঞান ও কর্মের যে সুসমঞ্জস অখণ্ডতা তাঁর মধ্যে দেখা যেত, সেজন্য কম্যুনিস্ট আন্দোলনে লিপ্ত হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে যেন একান্ত অপরিহার্য ছিল। পার্টিজীবনে বহু প্রশ্ন আসে, বহু সমস্যার উদ্ভব হয়, বহু মতভেদ দেখা যায়, বহুবার বিচলিত হয়ে ওঠার অবকাশ ঘটে, কিন্তু এ-সমস্ত ব্যাপার হল মূলগতভাবে গৌণ। মুখ্য বস্তু হল এই যে তত্ত্ব ও কর্ম, আদর্শ ও দৈনন্দিন কার্যক্রম, প্রেরণা ও ব্যবহারের মধ্যে যে-সঙ্গতি বিনা চেতনা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও অবৈকল্য অসম্ভব, সেই সঙ্গতিকে আয়ত্ত করার পক্ষে সাম্যবাদী চিন্তা ও সংগঠনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো প্রচেষ্টা এ-যাবত মানুষ করে নি বলে জোলিও-ক্যুরির মতো মনীষী নিজেকে কম্যুনিস্ট ভাবতে ও বলতে কখনো অপ্রতিভ বোধ করেন নি।

পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকে কম্যুনিস্টদের মধ্যে, বিশেষ করে যাঁরা বুদ্ধিজীবী, তাঁদের কারো কারো মনে নিজেদের মতবাদ, কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট, অকাট্য সন্দেহ না এলেও যেন একপ্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধা এসে উপস্থিত হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে নিবিষ্ট চিন্তার বালাই যাঁরা রাখেন না, তাঁদেরই কেউ হয়তো বলে বসলেন, সম্ভবত সাময়িক একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলে বসলেন যে, মার্ক্‌স্‌বাদ আজকের দিনে বিলকুল বাতিল হয়ে গিয়েছে, আর অনেকে ভাবলেন যে কথাটা হয়তো ভুল নয়, কারণ মার্ক্‌স্‌বাদীদের পক্ষ থেকে কুণ্ঠাবর্জিত প্রতিবাদ উপস্থাপিত হল না। হয়তো আবার কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির উপযোগিতার কথা বলা হল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ উল্লসিত হয়ে বলল যে, কম্যুনিস্টরা "ভালোমানুষ" ব'নে গিয়ে বিপ্লব ছেড়ে পার্লামেন্টকে আঁকড়েছে, কিংবা তারা যখন মতলববাজ আর নীতির ধার ধারে না তখন হয়তো শুধু ভোল বদলেছে, কেবল মুখে পার্লামেন্টের কথা বলে জনসাধারণকে ধোঁকা দিচ্ছে—অথচ কম্যুনিস্টদের পক্ষ থেকে জিনিসটা পরিষ্কার করা হল না, "যে যেমন বোঝে বুঝুক' মনে করে বিষয়টাকেই ছেড়ে দেওয়া হল, দিনের পর দিন যে-সব খুঁটিনাটি কাজ ভিড় করে আসে, সেদিকেই নজর রাখা হল। বুদ্ধিজীবী মহলে যে এ-অবস্থায় বিভ্রান্তি দেখা দেবে, তা একেবারেই বিস্ময়কর নয়। আমাদের দেশে এখনো ফ্রান্সের মতো এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে উদ্দীপ্ত আলোচনার রেওয়াজ হয় নি—আমাদের সাধ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সম্ভবত সাধ্য নেই। তাই আজ দেখা দিয়েছে এক ধরনের সংকোচবিহ্বল, দ্বিধাজর্জর অপ্রতিভতা, যার চেয়ে হয়তো সোজাসুজি অবিশ্বাসও ভালো। জোলিও-ক্যুরির মনে যে-অপ্রতিভতা আসে নি, তা ভারতীয় মার্ক্‌স্‌বাদীদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল বলে পরিচিত, তাদের অনেককে বিচলিত করেছে।

কিছুকাল পূর্বে, পত্রিকান্তরে, আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা থেকে উদ্ধৃতি একাধিক রচনায় দেখেছি। কিন্তু সে-উদ্ধৃতি ছিল প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে একদেশদর্শী। যেখানে আমি

বলেছিলাম যে "সোভিয়েট এবং তার কীর্তির মধ্যে কলঙ্কের রটনা এল—দুর্মুখ, দুরাশয় বৈরীর মুখ থেকে নয়, সোভিয়েট দেশ থেকেই তা উৎসারিত হল; মানস-সরোবরে যেখানে জলের স্থিরতা হল একান্ত অপরিহার্য, সেখানেই তরঙ্গ-ভঙ্গের আঘাত পড়ল", সেদিকেই আমার পাঠকদের লক্ষ যেন একাগ্র হয়ে পড়ল। যেখানে আমি বিলাপ করেছিলাম যে "পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত যেন সরে গিয়েছে, সৎ ও অসৎ এই দুই বর্গের ভেদ করতে গিয়ে যেন খেই হারিয়ে গিয়েছে, মনের মধ্যে যে-সব পাহাড় আছে সেগুলো যে এত এবড়ো-খেবড়ো তা যেন আগে জানতাম না", সে-বিলাপের উল্লেখও একাধিক প্রবন্ধে দেখেছি। কিন্তু ঐ একই রচনায় যেখানে বলেছিলাম যে "বিলাপও বাঁচার একটা অঙ্গ, কিন্তু তা সব চেয়ে বড়ো কথা নয়," যেখানে উচ্চৈঃস্বরে জানিয়েছিলাম যে "irony', এমন কি 'tragic irony'-র অকাট্য অস্তিত্ব সত্ত্বেও মানুষের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না", যেখানে স্মরণ করিয়েছি যে "যুগযুগান্তের ক্লেদ অপসৃত করার দুস্তর প্রয়াস যেখানে হবে বা হয়েছে, সেখানে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা মানুষের মন যে এক উঁচু তারে বাঁধা থাকবে তা অসম্ভব"। সেদিকে নজর অনেকেই যেন দিতে চান নি। আমার ধারণা এই একদেশদর্শিতার কারণ হল যে, বহু বুদ্ধিজীবীর মনে মার্ক্স্‌বাদ এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহের সঞ্চার হয়েছে। আলোচনা এবং দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্য নিয়ে আন্দোলন বিনা এ-সন্দেহের নিরাকরণ ঘটবে না।

বর্তমান প্রবন্ধে ঐ সন্দেহ নিরসনের প্রচেষ্টা আমার উদ্দেশ্য নয়। সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত মন নিয়ে সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে অবস্থান করছি বলার মতো অবিবেকী ধৃষ্টতা আশা করি আমার নেই। কিন্তু কয়েকটি কথা নিবেদন করে রাখতে চাই। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে যা বলা হয়েছিল এবং যে ধরনে বলা হয়েছিল, তাতে বিচলিত হওয়ার কারণ ছিল এবং এখনো কিছু পরিমাণে আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে প্রথম শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও বহুগুণ শক্তিমান, শত্রুপক্ষের অবিরাম আক্রমণ ও চক্রান্তকে ক্রমাগত পরাজিত করে সেই সমাজের সংরক্ষণ ও অগ্রগতি সোভিয়েট দেশে যে মহানাটকের রূপ নিয়েছে, তার কাছে পূর্বোক্ত বিচলিতি যে একান্ত তুচ্ছ, তা নিঃসন্দেহ। সাময়িক এবং তদনুপাতে সঙ্গত বিচলিতি স্থায়ী নৈরাশ্যে পরিণত হয়ে মনকে নিস্তেজ ও কর্মশক্তিকে লীন করে দিতে থাকলে সেই চিত্তবিলাস অপরাধেই পর্যবসিত হতে পারে। মার্ক্স্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে যে বুদ্ধিজীবীরা একদা নিজেদের চক্ষু উন্মীলিত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা যেন আজ একথা ভুলতে না বসেন।

নিজের কথা বলতে সংকুচিত হই, কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে, হিটলারী আক্রমণে সোভিয়েট দেশের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, কলকাতায় সোভিয়েট-সুহৃদ-সমিতির এক সভায় বসে আমার মনে কয়েকটা কথা জমে উঠেছিল যা পরে লিখে ফেলার চেষ্টা করি। ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ তখন আমি লিখেছিলাম, "আমি কায়মনোবাক্যে ভারতীয়। ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘাসের ডগাকে পর্যন্ত আমি ভালোবাসি। দেশভক্তিতে কারো কাছে আমি হার মানি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি সত্যের অপলাপ না করে বলতে পারি যে সোভিয়েটও আমার দেশ।"

এ-কথা বলেছিলাম স্মরণ-করে আমি লজ্জিত নই। একথা বলার সময় যুদ্ধের বিকট তাণ্ডব চলছিল, সোভিয়েটের আসন্ন ধ্বংসে নিয়ে জল্পনাকল্পনা তখন চারদিকে; তাই আমার কথায় অনুভূতির দিক থেকে আতিশয্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু সর্বদেশে বহুজনের মতোই আমি

জনতাম যে যুদ্ধে সোভিয়েটের পরাজয় ও বিলোপ ঘটলে বহুকাল ধরে মানবসভ্যতার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়ে থাকবে। ১৯৩২-৩৩ সাল থেকে যখন বারবার সোভিয়েটকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধের আওয়াজ উঠছিল, তখন মনীষী রম্যাঁ-রলাঁ বলেছিলেন যে তাঁর অতিবৃদ্ধ চক্ষুতে শঙ্কার অশ্রু আসে না, আর তাই সবাইকে ডেকে জানিয়েছিলেন যে সোভিয়েটকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই, নতুবা সভ্যতার মৃত্যু ঘটবে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে সিড্‌নী আর বীট্রিস্ ওয়েব পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পর সোভিয়েট দেশে ''নতুন সভ্যতা''-র সন্ধান পেয়েছিলেন এবং একদা সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরোধী হয়েও বলেছিলেন যে সেখানকার সমাজ হল ''জগতের সবচেয়ে সর্বব্যাপী ও সমানাধিকারমূলক গণতন্ত্র।'' বারবার স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার পর ক্যান্টারবরির ''ডীন্'' হিউলেট জন্‌সন্ সোভিয়েট দেশে ধর্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত দেখেছিলেন। ফ্যাশিস্ট আক্রমণের নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েট সমাজের খাঁটি সোনা দেখা দিয়ে সারা দুনিয়াকে চমৎকৃত করেছিল। ভুলভ্রান্তি যাই হোক না কেন, যত অপরাধই ঘটে থাকুক না কেন, মানুষের চরিত্রে যে-গলদ কখনো কোনো অবস্থায় শুধু মন্ত্রবলে দূর হতে পারে না বলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সোভিয়েটেও সে গলদ যতই যখন দেখা দিয়ে থাকুক না কেন, এ-কথা ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড়ো অন্যায় ও অপরাধ আর নেই যে, সর্বস্তরের দুর্গত, পিষ্ট ও আপাতদৃষ্টিতে অসহায় মানুষের অন্তর্নিহিত, অপরাজেয় শক্তিকে আবাহন করে তারই সমবেত ভিত্তিতে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার প্রথম, বিপুল, নির্ভয় ও নিরলস অভিযানের ক্ষেত্ররূপে সোভিয়েট দেশকে শুধু প্রশংসা করা নয়, তার ঐতিহাসিক মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং তাকে ভালোবাসাও আমাদের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বৃথা লিখে যান নি যে সোভিয়েটভূমিতে না গেলে তাঁর জীবনের তীর্থদর্শনই অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

সোভিয়েটের প্রতি অনুরাগ আমাদের অনেককে অন্ধ করে রেখেছে, শ্লেষের সঙ্গে এ-কথা প্রায়ই শোনা যায়। অনুরাগ যে কিছুটা অন্ধ হবে, এ তো স্বয়ংসিদ্ধ; সুতরাং অভিযোগে বিস্মিত বা বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আর আমি অন্তত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই স্বীকার করতে যে শত্রুপক্ষের অবিরাম আক্রমণ ও অপবাদ যখন চলছে, আর চরিত্রবল সাহস ও অমিত প্রয়াসের পরিচয় যখন বার বার অকাট্যভাবে সোভিয়েট সমাজ দিয়েছে, তখন বিতণ্ডায় সোভিয়েটের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আমার মন পূর্ব হতেই যেন প্রস্তুত হয়েছে; একান্ত নির্বিকার ও নিরাসক্ত বিচারক-মন নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। তাই আমরা সোভিয়েটে ও অন্যান্য সোশালিস্ট দেশের পক্ষাবলম্বী শুনলে আমি লেশমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করি না। আমরা নিশ্চয়ই জানতাম এবং জানি যে, মানুষের জীবনে ও সমাজে একেবারে পুরোপুরি নিখুঁত কিছু নেই, একটু অন্তত খাদ না মেশালে বোধ হয় সোনার বাহারও ঠিক খোলে না। আমরা নিশ্চয়ই জানতাম এবং জানি যে, চাঁদেও যখন কলঙ্ক, সূর্যমণ্ডলেও যখন ব্রণ, নবজাতকেও যখন ক্লেদ, তখন সোভিয়েটের সর্বনিম্ন কর্ম ও ব্যঞ্জনাই যে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ, তা মনে করা অসঙ্গত ও অবৈধ। আমরা নিশ্চয়ই জানতাম এবং জানি যে, সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন ও গঠনে যারা অগ্রণী, সেই মেহনতী জনতার দেহে-মনে আছে অযুতবর্ষের লাঞ্ছনার ছাপ, আর তাদের কাজে কিছু পরিমাণে সে-ছাপের প্রতিফলন অনিবার্য। কিন্তু সোভিয়েট দেশ এবং সেখানকার মানুষের নামে যখনই জঘন্য কুৎসা রটনা হয়েছে কিংবা কুৎসার চেয়ে কুৎসিত যুদ্ধের যন্ত্রণায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের ডুবিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে, তখনই সর্ব শক্তি নিয়ে প্রতিরোধে আমরা কুণ্ঠিত হই নি। আমরা কেমন

করে ভুলি যে এই সেদিনও বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতো মনীষী চেয়েছিলেন যে যুদ্ধ চালিয়ে সোভিয়েটকে চূর্ণ করা হোক, বিশ্বের সমাজদেহ থেকে দুষ্ট ক্ষতকে নির্মম অস্ত্রোপচারে নির্মূল করা হোক? আমরা কেমন করে ভুলি যে বহু সাহিত্যরসিকের চোখে শক্তিমান লেখক আর্থর কোয়েস্‌লার-এর মতো লোক আমেরিকার ধনপতিদের কাগজে নিঃসংকোচে লিখেছেন যে পুঁজিবাদের গলদ আছে বটে, কিন্তু তা হল যেন হামের মতো তুচ্ছ ব্যারাম, আর সোভিয়েট সোশালিজ্‌ম্‌ হল একেবারে মারাত্মক কর্কট রোগের সামিল? প্রায় চল্লিশ বছর আগে যখন চার্চিল সাহেব প্রকাশ্যে বড়াই করেছিলেন যে, তাঁর ব্রত হল সোভিয়েট সমাজকে গলা টিপে মেরে ফেলা, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু ব্যক্তির মুখে অনুরূপ প্রতিজ্ঞার কথা শোনা গিয়েছে, কিন্তু তার তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই অবস্থায় আমরা যদি কিছুটা সোভিয়েটের ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকি, কিংবা কোনো বিশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ না পেয়েও সোভিয়েটের পক্ষাবলম্বনই কর্তব্য মনে করে থাকি তো সেজন্য অপ্রতিভ হওয়ার কোনো হেতু নেই। আমাদের কথায় সোভিয়েটপ্রীতির আবেগ যদি থেকে থাকে তো তাও অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক নয়। কোনো ঘটনার সকল দিক জানা না থাকায় আমাদের বক্তব্যে হয়তো কখনো কখনো তথ্যগত ভ্রান্তি থেকে থাকতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রকৃত সত্য থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি। আজকের চলমান যুগে সোশালিস্ট জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থাকে মনে-প্রাণে সমর্থন করেছি বলে আমরা কুণ্ঠিত নই; যাই ঘটে থাকুক না কেন, সোভিয়েটের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে যেতে আমরা গর্বিত।

আর যা কিছু ঘটেছে, যে-সব কথা স্মরণ করে দুঃখ ও লজ্জা বোধ না করে আমরা পারি নি। ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তারও তাৎপর্য বোঝা যাবে, কেমন করে সোভিয়েট দেশের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে ভয়, দ্বেষ, সন্দেহ এবং যুগযুগান্তের যে-গ্লানি মানুষের মনের অতলে জমে আছে তা প্রকাশ পেল, তা মোটামুটি বোঝা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভুললে চলবে না যে একমাত্র সোশালিস্ট সমাজ এমন নির্মমভাবে আত্মসমালোচনা করতে পারে, সাময়িক লাভক্ষতির হিসাব না করেই যে-বিশ্লেষণ প্রকৃত পথের নির্দেশ দিতে পারে সেই বিশ্লেষণের প্রয়াসে নামতে পারে। সোশালিস্ট দুনিয়ার বাইরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিনিয়ত যে অপকর্ম ও অন্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার অসংকোচ বিশ্লেষণ মার্ক্‌স্‌-এর মতো বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ করতে চেয়েছেন, কিন্তু ধনতান্ত্রিক জগতের আত্মাভিমানী বুদ্ধিজীবীরা তা করেন নি—মনের মুক্তি সম্বন্ধে তাদের অহংকারের শেষ নেই। কিন্তু প্রকৃত মূলগত সমালোচনার সৎসাহস তাঁদের নেই। কম্যুনিস্ট আত্মসমালোচনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েট পার্টির বিংশকংগ্রেস। মানুষ নিখুঁত নয়; লক্ষ নির্দোষ হলেও পরিস্থিতির চাপে এবং মানুষের চরিত্রগত দৈন্যের ফলে ভুলভ্রান্তি এবং অপরাধ পর্যন্ত ঘটতে পারে। যে-ভুল এড়ানো অসম্ভব ছিল না এবং যে-অপরাধ ক্ষালনের যথেষ্ট যুক্তি নেই, তাকে নিশ্চয়ই নিন্দা করতে হবে, আর ঐ নিন্দনীয় ঘটনা থেকেই শিক্ষালাভ করতে হবে, ভবিষ্যতে যাতে ভুল আর অপরাধের বোঝা বইতে না হয়। কমরেড স্টালিনের মতো একজন মহারথী, যুগ যুগ ধরে যাঁর কীর্তিকথা ধ্বনিত হবে, যদি কোনো এক ব্যক্তির কথা বলা যায় তো লেনিন যেমন ছিলেন রুশ বিপ্লবের স্রষ্টা, তেমনই যিনি ইতিহাসে প্রথম সোশালিস্ট দেশ ও সমাজ নির্মাণের কৃতিত্বের অধিকারী, তাঁর দোষত্রুটি সম্বন্ধেও অবারিত আলোচনা তাই হয়েছে। আলোচনার ধারা হয়তো কখনো কখনো সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু আলোচনা যে হয়েছে এটাই বড়ো কথা। আর ভুলভ্রান্তিই

বড়ো কথা নয়—মার্ক্‌স্‌বাদ এবং সোশালিস্ট ব্যবস্থায় ভুলভ্রান্তি এড়াবার প্রকরণ যে উপস্থিত, তারই প্রকৃত গুরুত্ব রয়েছে।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে এক প্রবন্ধে জোলিও-ক্যুরি প্রসঙ্গক্রমে বলেন : ''বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে সম্প্রতি যা কিছু ঘটেছে, তার ধাক্কায় অনেক বুদ্ধিজীবী এমন সব কথা বলছেন আর আমাদের এমন সব আহ্বান জানাচ্ছেন যা এক এক সময় অপমানকর মনে হয়। কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের ডেকে বলা হচ্ছে : 'নিজেদের মুক্ত করুন; অন্তত মুখের কথায় নিজেদের মুক্ত করুন।'

''কিন্তু এঁরা আমাদের কি থেকে মুক্তি পেতে বলছেন? আমি তো কখনো আজ যত নিজেকে স্বাধীন বোধ করছি, তেমন করি নি। যাঁরা এভাবে আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দারুণ সুখী হয়ে উঠবেন, তাঁদের অনুরোধ মেনে নিয়ে কোন মুক্তি মিলবে?

''যে-সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা আমরা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই আলোচনা করব— যথাযোগ্য গুরুত্ব এবং মর্যাদা সহকারেই আলোচনা করব। যে-সব প্রশ্ন হল জটিল আর জরুরি, তা নিয়ে হালকাভাবে কিছু বলা যায় না নিশ্চয়ই। আর আমি বিশ্বাস করি যে, এই আলোচনা যথাযোগ্যভাবে করতে হলে আমরা যারা কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী, তাদের সর্বদাই সেই বিরাট লক্ষের অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে, যে-লক্ষ সিদ্ধির জন্য যারা সব চেয়ে বেশি অবিচার ও শোষণ সহ্য করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েই আমরা লড়াই করি।

''একটা উদাহরণ দেব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক। আমার সব আলোচনায় আমি কখনো নিজেকে ভুলতে দিই না যে ছাত্রদের মধ্যে শতকরা দুজনেরও কম আসে শ্রমিকশ্রেণী থেকে। আলোচনার গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু এই সব অবিচারের ছবি, জন্মগত কারণে অসাম্যের এই ছবি, আমার পক্ষে আলোচনাকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ফেলতে সাহায্য করে, আর তা ছাড়া প্রকৃত ভিত্তিতে আলোচনা সম্ভব হয়।

''সবাইয়ের চেয়ে আমরাই স্বাধীনতাকে ভালোবাসি, কিন্তু সে-স্বাধীনতা অপরকে শোষণ করার স্বাধীনতা নয়। পুঁজিবাদের শক্তি বাড়াবার স্বাধীনতা তা নয়; সে-স্বাধীনতা হল সকল ভণ্ডতার কলুষ থেকে মুক্ত। সকল মিথ্যাচারের পূতি থেকে পরিষ্কৃত।

''স্বাধীনতা কথাটির মর্যাদা বেশি দিই বলেই আমরা লঘুভাবে তা ব্যবহার করি না। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টার স্বাধীনতা অর্জিত হবে। সামাজিক অবিচার, দারিদ্র্য, অসত্য, ধনতন্ত্রে অনিবার্য মালিন্য ও নৈতিক বঞ্চনার অবসানের জন্যই আমরা আগ্রহান্বিত। অবিচারের ফলে যারা সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে ক্লিষ্ট, তাদেরই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা লড়ি, আজ সেজন্যই আমরা ঐ অবিচারের বিলোপ ঘটাবার শক্তি রাখি। কর্মের সাধনা ও প্রেরণার অনুভূতি থেকেই আমরা মুক্তির আস্বাদ পেয়ে থাকি।

''মানুষ নিশ্চয়ই নিখুঁত নয়। ভুলভ্রান্তি হয়েছে, তার মধ্যে গুরুতর ভুলভ্রান্তিও আছে।

''ভুলের অজুহাত দিতে বসি নি—একেবারেই নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে-সব দেশ আজ 'স্বাধীনতা' চাইছে সেখানে প্রতিদিন কত না অপরাধই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর গণ্ডগোল শান্ত করার অছিলায় কত হাজার হাজার মানুষকে তারা না মারছে?''

সোভিয়েট এবং অন্যান্য সোশালিস্ট দেশ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষপাত ও অনুরাগ একেবারেই অস্বীকার না করে কিন্তু কয়েকটা কথা আজ বলা প্রয়োজন মনে করি। স্টালিনের জীবদ্দশায় যে ভুল ঘটেছিল, সে-সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে যখন সোশালিস্ট সমাজ সুপ্রতিষ্ঠ

হয়েছে, তখনো ঘরে এবং বাইরে শত্রুর কথা ভেবে স্টালিনের মন অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠায় বহু নির্দোষ ব্যক্তির কারাবাস ও প্রাণদণ্ড ও নির্যাতন হয়েছিল। তখনই যথার্থ আত্মসমালোচনার ফলে ভুল সংশোধন করা উচিত ছিল। কিন্তু তা তখনকার পরিস্থিতিতে হয়ে ওঠে নি। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আজো আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলছে। কিন্তু স্টালিনের জীবদ্দশার তুলনায় সোভিয়েট এখন অনেক বেশি শক্তিমান এবং তদনুপাতে নিরাপদ। সেজন্য স্টালিনের শেষজীবনে যে-সমালোচনা হয় নি বলে খেদ করা হয়েছে, তেমনই তুলনীয় সমালোচনা আজ হলে নিশ্চয়ই ক্ষতি নেই।

একনায়কত্ব সম্বন্ধে খ্রুশ্চেভের যে বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে, সোভিয়েট থেকে তার যাথার্থ্য স্বীকৃত হয় নি, কিন্তু বক্তৃতার অপর কোনো সংস্করণও সোভিয়েট থেকে প্রচার করা হয় নি। সুতরাং মোটামুটিভাবে ঐ বিবরণকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। তা যদি করা হয় তো খ্রুশ্চেভের সমালোচনার ধারায় কয়েকটি আশ্চর্য অপরিণতি ও উদ্ভট অসারত্বের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। ইজাক্ ডয়েচ্যর স্টালিনের জীবনী লিখেছেন; ঈভ্ দেল্‌বার "আসল স্টালিন" বলে বই লিখেছেন—এগুলো তথ্যে ভরা, কিন্তু লেখক দুজনই হলেন একেবারে প্রচণ্ড কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষী। আরো এ-ধরনের লেখার কথা সহজে মনে পড়বে; বিশেষ করে, মানবেন্দ্রনাথ রায় স্টালিন এবং রুশবিপ্লব সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু প্রতিপক্ষীয়দের রচনায় শ্লেষ এবং একদেশদর্শিতা বহুল পরিমাণে থাকলেও খ্রুশ্চেভের যে বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে যে অহেতুক ও বিস্ময়কর ক্ষুদ্রতা লক্ষ করা যায় তা যেন স্টালিনের পরম শত্রুদের রচনাতেও নেই। তাই সন্দেহ আসে যে সোভিয়েট সমাজে হয়তো কোনো কোনো ব্যাপারে মনের একরকম নাবালকত্ব এখনো কেটে যায় নি; সন্দেহ আসে যে কোনো কথা বলতে গেলে হয়তো সেখানে অতিরিক্ত জোর দেওয়া দরকার মনে হয় আর ফলে বক্তব্য মূলগতভাবে ভ্রান্ত না হলেও তার প্রকাশভঙ্গিতে অপরিণতি ধরা পড়ে। হয়তো এই সমালোচনা একটু তীব্র এবং কটুভাবেই করা হচ্ছে; কিন্তু খ্রুশ্চেভের তথাকথিত রিপোর্ট পড়ে উষ্মা বোধ না করে বোধহয় উপায় নেই। সুখের বিষয় এই যে তারপরে কয়েকবার খ্রুশ্চেভেরই মুখ থেকে স্টালিনের বিরাট বিপ্লবী প্রতিভার কথা শোনা গিয়েছে, সোভিয়েট বিশ্বকোষে সম্প্রতি স্টালিন সম্বন্ধে যে নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছে, তাতেও পূর্বেকার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনই তাঁকে হেয় না করে তাঁর নিঃসন্দিগ্ধ প্রতিভা ও অবিস্মরণীয় অবদানের বাস্তব বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে।

অপরিণতির লক্ষণ অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রেও যে লক্ষ না করা যায়, তা নয়। ব্যক্তিপূজা পরিহার করতে গিয়ে স্টালিন সম্বন্ধে হয়তো বিচারের ভারসাম্যে পৌঁছবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু লেনিন সম্বন্ধে এখনো সোভিয়েট রচনায় প্রতিটি উল্লেখে আছে অতিরিক্ত অভিভূতি। লেনিনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন মুহূর্তের জন্যও কেউ তুলবে না; স্টালিনের চেয়েও মর্যাদার আসন ইতিহাসে অবিসংবাদিভাবে তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু যে কোনো রচনায় বারবার লেনিনের প্রায় অকারণ উল্লেখ, সোভিয়েট জনতার কাছে কোনো প্রস্তাব তুলেই লেনিনের নাম উচ্চারণ করা, এ হল নিশ্চয়ই এক এক ধরনের মানসিক অপরিণতির লক্ষণ। চীনেও এর সঙ্গে তুলনীয় ধারা লক্ষ করা গিয়েছে; সম্প্রতি সমস্ত পার্টি-রচনায় ক্রমাগত মাওৎসে-তুংয়ের নামোল্লেখ অনেকটা কমে গেলেও সহজে মনে করা যাবে লিউশাও-চির প্রসিদ্ধ পুস্তিকাগুলি যেখানে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বারংবার মাওৎসে-তুংয়ের নামোল্লেখ পীড়াদায়ক হয়ে

ওঠে। মাও পরম শ্রদ্ধেয় নেতা সন্দেহ নেই; কিন্তু নামাবলী পরিধান যেমন ধর্ম ব্যাপারে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না, তেমনই অকারণ নেতৃনামোচ্চারণেও কোনো সুকৃতি নেই, অনুপাতবোধও নেই।

সোভিয়েটের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় আজ জগৎ শতমুখ না হয়ে পারে না; বিশুদ্ধ গাণিতিক পদ্ধতিকে বায়ুমণ্ডলের রহস্য উদ্‌ঘাটনের যে বিপুল প্রচেষ্টা আজ সেদেশে হচ্ছে, তার তুলনা কোথাও নেই, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য—সর্বক্ষেত্রে সোভিয়েটের অগ্রগতি বিস্ময়কর। কিন্তু কোথায় কি যেন গলদ সেখানে থেকে যাচ্ছে যার ফলে মনে হয় যে শিল্পবিষয়ে সে দেশের রুচি হয়তো সবক্ষেত্রে ঠিক পথে যাচ্ছে না। ভালো দিক সেদেশে যা আছে, তার বর্ণনার প্রয়োজন নেই, বর্ণনা করতে গেলে জায়গাও লাগবে অনেক। কিন্তু এক-একটা দিক আছে যার সমালোচনা, বন্ধুভাবে সমালোচনা—আজ দরকার। কেমন করে এ-ঘটনা ঘটে যে আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন্, ডন্‌স্কয় প্রভৃতি যেখানে অবিস্মরণীয় ফিল্‌ম্ করে গিয়েছেন, সেখানে আজ যে ফিল্‌ম্ তৈরি হচ্ছে তা তুলনীয় নয়—আঙ্গিকের দিক থেকে উন্নত হলেও আঙ্গিক, বিষয়, পরিচালনাগুণের সমন্বয়ে যে শিল্পবস্তুর সৃষ্টি হয় তা সেদেশে আজ দুর্লভ? কেমন করে এ-ঘটনা ঘটে যে ভারতবর্ষের যে-ছবি হল নিরেস, শিল্পদৃষ্টিতে যার সত্যতা নেই, তাই সেদেশে বাহবা পায়, আর "পথের পাঁচালী" বা "অপরাজিত"-এর মতো ছবির আদর সেখানে মেলে না? কেন এমন হয় যে সেদেশে একদা গান্ধীজী সম্পর্কে উগ্র বিপ্লবী সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর ভুল সংশোধন না করে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত প্রচার করে, বোধকরি সাময়িক কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য? কেন এমন হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হঠাৎ সেদেশে উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যানুভূতির প্রচেষ্টা হয় না—যেমন হঠাৎ বালগঙ্গাধর তিলক সম্বন্ধে নিছক প্রশস্তি প্রকাশিত হয়, প্রকৃত সত্যসন্ধান ঘটে না—একি শুধু সাময়িক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য? তা যদি হয় তো গোড়ায় গলদ জমে যাবে, সোশালিজ্‌মেরই দুর্নাম ও দৈন্য ঘটবে। আমার মনে আছে ১৯৫২ সালে সোভিয়েট চিত্রকলার পরিচয় পেয়ে আমি তুষ্ট হতে পারি না, একথা বলে অনেকের নিন্দাভাজন হয়েছিলাম। সম্প্রতি সোভিয়েটে পিকাসোর চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে, চিত্রকলা সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ও চেষ্টা সম্ভবত হচ্ছে—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই কেমন যেন অপরিণতি রয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরো অনেক কিছু বলা যেত, কিন্তু প্রয়োজন নেই। আর এ-ধরনের সমালোচনা করছি বলে শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে সোভিয়েটের যে অবদান অনস্বীকার্য, তাকে একটুও হীন করে দেখার চেষ্টা আমি করছি না। বরঞ্চ আমি জানি যে যখন কোটি কোটি মানুষ অশিক্ষার গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা পেতে থাকে, তখন শিক্ষা ও শিল্পবোধের মানকে যেমন ইচ্ছা তেমনই সূক্ষ্ম ও উন্নত রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষকে পিষে রেখে সভ্যতা এতদিন গড়ে উঠেছে; সভ্যতার পিলসুজ জ্বলতে থেকেছে, উপরে কিছুটা আলো, নীচে এবং বাকি সর্বত্র অন্ধকার। সোভিয়েট সমাজে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ যে স্বপ্ন নয় তা প্রমাণ হয়েছে, কিন্তু বিশ্বমানবের সজাগ বোধিপ্রাপ্তির দিন সমাসন্ন হয়ে এলেও এখনো তা এসে পৌঁছয় নি। তাই বহুগুণসন্নিপাতে সোভিয়েট ব্যবস্থার মুষ্টিমেয় দোষ যে অচিরে নিমজ্জিত হয়ে যাবে, আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক সেজন্যই এ-সমস্ত বিষয় বন্ধুভাবে আলোচনা কর্তব্য হয়ে উঠেছে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

যে-আলোচনার কথা বলেছি, তার মুখ্য দায়িত্ব নিতে হবে মার্ক্‌স্‌বাদী বুদ্ধিজীবীদের। আত্মীয়, আন্তরিক ও অবারিত এ-সমালোচনার ভার তাঁরাই নিতে পারেন। অন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভুলে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে যে কম্যুনিস্ট প্রচেষ্টায় বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। স্বভাবতই বুদ্ধিজীবীদের বৈশিষ্ট্য হল বিনয়—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—এবং পার্টির মধ্যে যাঁরা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন নিয়ে ব্যাপৃত, তাঁদেরই হাতে কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব ছেড়ে রাখতে বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত সম্মত। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের যে স্বকীয় অবদান আছে তা আজ ক্রমেই সোশালিস্ট সমাজে স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা, চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা, তথ্য সম্পর্কে অভিনিবেশ, অনুভূতি ও বাস্তব অগ্রগতির নব উন্মেষের অনুশীলন—এই হল বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কর্ম। সমাজের প্রগতি সাধনে এবং প্রগতির ধারা আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা ব্যাপারে এই কর্মের তাৎপর্য অপরিসীম। নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণে বর্তমানে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সমাজের যে-শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, সে শ্রেণী শোষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধিকারী নয় বলে তাদের হেয় মনে করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বরং নিজস্ব শ্রেণীর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার সৎসাহস দেখিয়ে তাঁরা কিছুটা প্রশংসারও হয়তো দাবি রাখতে পারেন। সে যাই হোক বিবেকবান্ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা মার্ক্‌স্‌বাদী কিংবা মার্ক্‌স্‌বাদের জীবনদর্শন ও কর্মাদর্শ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল, তাঁদের কাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনস্বীকার্য। তাঁদের আজ বিশেষ করে মার্কস্‌বাদের সৃজনশীল প্রয়োগপ্রচেষ্টায় সহায়তা দিতে হবে, কম্যুনিজ্‌মের শক্তিবৃদ্ধি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের উৎকর্ষ, চিন্তার অবৈকল্য, মনের শাশ্বত জিজ্ঞাসা এবং অনুভূতির গভীরতা ও সূক্ষ্মতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মনে মুহূর্তের জন্যও এ-ধারণা যেন না আসে যে তাঁরা হলেন সমাজের 'ইতর জন'' থেকে স্বতন্ত্র। একক প্রচেষ্টায়, কিংবা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সমবায়ে, বুদ্ধিজীবীরা সমাজের রূপান্তরে কোনো উল্লেখযোগ্য অবদানে অসমর্থ। "বুদ্ধিজীবী" বলে কোনো এক স্বতন্ত্র শ্রেণী নেই। আধুনিক যুগে হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে থাকা কিংবা মেহনতী জনতার বন্ধু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর তাঁদের নেই। পক্ষ নির্বাচন যে তাঁরা সকলে সচেতনভাবে করে থাকেন, তা নয়। কিন্তু মোটের উপর তাঁদের কাজ এবং কাজের ধারা সমাজে শোষক কিংবা শোষিত-শ্রেণীর অনুকূলে যাওয়া প্রায় অনিবার্য। হয়ত কোনো জ্ঞানতপস্বী গ্রন্থাগারে কিংবা গবেষণালয়ে নিবিষ্ট হয়ে শ্রেণীস্বার্থনির্বিশেষে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু শ্রেণীসংঘাত যখন প্রবল, কোন্ অর্থব্যবস্থা আজ মানুষ মেনে নেবে এই প্রশ্ন যখন প্রধান, জগতে যুদ্ধ ও শান্তির সম্ভাবনার মধ্যে যখন প্রতিযোগিতা, তখন বৈজ্ঞানিক ও কোবিদ্, নির্বিকার থাকতে পারেন না, চিত্তের মূলগত প্রবণতা তখন প্রকাশ পাবে-ই। প্রখর, মতবাদগত নিশ্চিতি বহুক্ষেত্রে আসবে না। তার প্রয়োজনও হয়তো ঘটবে না। কিন্তু এক পক্ষ কি অপর পক্ষকে সাধারণভাবে সমর্থন করা সম্বন্ধে মনস্থির করতেই হবে। নিছক নিরপেক্ষতা সম্ভব হবে না।

এই মনস্থির করা সম্বন্ধে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ পিগু (Pigou) একবার বলেছিলেন : "The fact that we are without the data and the instruments of thought necessary for assured judgement does not entitle us to sit back with folded hands. For to sit so itself is to take a decision ; to make the great refusal, to declare ourselves in advance opponents of any change...We

must use the imperfect data as best we may, and take the plunge, and *judge*. There is no otherway."

১৯৩৭ সালে পিগু একথা লেখেন; এর মর্মার্থ হল : "নিশ্চিতভাবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপযোগী তথ্য এবং চিন্তার প্রকরণ আয়ত্ত হয় নি বলে আমরা হাত গুটিয়ে আয়াস করে বসে থাকতে পারি না। ঐভাবে বসার অর্থই হল যে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরিবর্তনকে অস্বীকার করেছি। আগে থেকেই পরিবর্তন-বিরোধী বলে নিজেদের মত প্রচার করেছি। তথ্য অসম্পূর্ণ হলেও তারই ভিত্তিতে যথাসম্ভব চিন্তা করে আমাদের জলে নামতে হবে, বিচার করতে হবে; অন্য কোনো পথ নেই।

আজকের পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্ধজগৎ আজ সোশালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে কিংবা তার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছে। শোষণ যে-সমাজে শাসনের ভিত্তি, বহুজনের দুঃখের উপর যেখানকার সভ্যতাসৌধ স্থাপিত, আজ যুদ্ধ ও যুদ্ধের আতঙ্ক হল তাদের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। মোহমুক্ত মানুষ যে খুব বেশিদিন তাদের সহ্য করবে না, এ-লক্ষণ আজ নানাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। সুখী, আত্মবশ, সবল সমাজ আজ শুধু মানুষের স্বপ্নবিলাস নয়। সেই নবসমাজের আবাহনে "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে" মঙ্গলঘট পূর্ণ করার কাজে বুদ্ধিজীবীদের বিপুল অবদান রয়েছে। জোলিও-ক্যুরির ভাষায় তাদের লড়তে হবে যারা প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করে আসছে তাদেরই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা সংবেদনশীল, পরদুঃখে যাঁরা দুঃখী, জ্ঞান ও কর্মের অবিরাম যজ্ঞে যাঁরা হোতা, আজকের অশান্ত জগতে সত্য পথের সন্ধানে যেন তাঁরা ব্যর্থ না হন।

সাহিত্যে শাসন

কিছুকাল আগে শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "চলমান জীবন" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি পড়তে গিয়ে একদা বিখ্যাত "সাহিত্য" পত্রিকার দুর্ধর্ষ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উল্লেখ দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। তিনপুরুষ ধরে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পবিত্রবাবু অবাধে আনাগোনা করে এসেছেন। সাহিত্যে শুধু মহারথী নয়, পদাতিকদের সঙ্গেও তিনি প্রথম জীবন থেকে আজ পর্যন্ত অন্তরঙ্গতা স্থাপন করার কালজয়ী রহস্য আয়ত্ত করেছেন। সুরেশ সমাজপতি মহাশয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাই পবিত্রবাবু চমৎকারভাবে দেখাতে পেরেছেন যে তাঁর চরিত্রে যে-সমস্ত উপাদান ছিল তা শুধু "বজ্রাদপি কঠোরাণি" নয়, "মৃদুনি কুসুমাদপি" উপাদানেরও কোনো অভাব ছিল না।

অত্যন্ত অল্প বয়সে সুরেশ সমাজপতি মহাশয়কে একেবারে কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। "বসুমতী-সাহিত্য মন্দিরে" আমার পিতামহের সঙ্গে প্রায় প্রত্যহ আমি যেতাম; "ব্যূঢ়োরস্কোঃ বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুমহাভুজঃ"এ বর্ণনা সুরেশবাবুকে দেখলেই স্বতই মনে আসত, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারতাম না, আমাকে তিনি প্রায়ই ডেকে

নিতেন; নিজে ভোজনপ্রিয় ছিলেন, আর আমাকে তাঁর বৈকালিক ভোজনে ভাগ বসাতে ডাকতেন। আসল "তালতলার চটি" কোথায় পাওয়া যায়, তা আমার পিতামহ জানতেন বলে ঐ দুর্লভ বস্তুর প্রয়োজন ঘটলে আমাকে ডেকে জানিয়ে দিতেন, তা হলেই আমার পিতামহ ব্যবস্থা করে দেবেন বলে। আমার বেশ মনে আছে, বর্তমানে যেখানে দৈনিক "স্বাধীনতা" পত্রিকার অফিস, তার খুবই কাছে আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে রিপন স্কোয়ারের সামনে এক বস্তিতে এক শীর্ণ বৃদ্ধ বাস করত, "তালতলার চটি"-র শেষ শিল্পী তাকে বললে ভুল হয় না। আজ ঐ-নামে যে বস্তু বাজারে চলে, তা থেকে আসল জিনিসের তফাত এত স্পষ্ট যে মেকির চলনে আজ দুঃখ হয়। কমলালেবুর রঙের সঙ্গে গোলাপী আভা মিশিয়ে সেই চটির ছটা ফুটে উঠত; ছোট্ট একটু শুঁড়ের মতো রেশম (বুড়ো মুচি বলত "এশম") চটির শোভা বাড়াত। আমার মনে আছে, সুরেশবাবুর চটির ফরমায়েশ দিতে গিয়ে আমার পিতামহ মুচিকে বলেছিলেন যে, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের নাতির পায়ের এই হল মাপ। বুড়ো মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের গল্প করত, তাই এ-কথা শুনে উল্লসিত হয়েছিল, কিন্তু আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে সমাজপতি মহাশয়ের পায়ের বহর দেখে বুড়ো মন্তব্য করেছিল, "বাবু, এ যে বে-অন্যেয়ে পা!" নানা গল্পই সে করে যেত, কিন্তু তার সবচেয়ে খেদ ছিল এই যে তার বংশে বাতি দেবার একমাত্র নাতি তালতলার চটি ছেড়ে "ইংরাজি" জুতোর কাজে মন দিচ্ছিল, তালতলার চটির সমঝদার খরিদ্দারেরও তখন বিশেষ অভাব। খরিদ্দার যখন পরে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দিল, তখন কিন্তু আসল জিনিস তৈরি করার লোক আর ছিল না, নকল মালেই আজ পর্যন্ত বাজার চলছে।

যাই হোক এ-সব কথা লিখে "পরিচয়"-এর পাতাকে ভারাক্রান্ত করে তোলা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এই যে "সাহিত্য" পত্রিকার "মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা" প্রসঙ্গে সুরেশ সমাজপতি মহাশয় যে-ভাবে নির্ভীক সমালোচনার ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছিলেন, তার আজ চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে আমি রীতিমত ক্লিষ্ট বোধ করি। ছেলেবেলায় আমাদের যাঁরা জ্যেষ্ঠ তাঁদের কাছে শুনতাম সুরেশবাবুর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের কথা—"বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু [বহুমানভাজন এক মহামহোপাধ্যায় লিখিত ক্রমশ প্রকাশ্য প্রবন্ধ] 'জগৎ ও ব্রহ্ম' চলিতেছে; 'য়ুরোপে তিন মাস' দুই বৎসরাধিক কাল 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইতেছে; লেখক [নাইট-পদবীখ্যাত মহাজন] সম্ভবত গরুর গাড়ি করিয়া ইয়োরোপ-পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।" শুধু এইরূপ মন্তব্য নয়, প্রখর রসবোধ ও সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। ভ্রান্ত মত যে তিনি পোষণ করতেন না তা নয়; কিন্তু নিজ মতে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, এবং ঐকান্তিক সততায় তাকে প্রকাশ করার যে পদ্ধতি তাঁর ছিল, তা আজ অনেকেরই কাছে অজ্ঞাত হলেও স্মরণ করে রাখা কর্তব্য। যখন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু প্রবর্তিত প্রাচ্য শিল্পের পুনরুদ্ধারকল্পনা দেশের বিদগ্ধ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তখনই প্রচণ্ড স্বাদেশিকতা সত্ত্বেও তাঁর বিরোধিতা তিনি করেছিলেন; এর জন্য যে মনোবল প্রয়োজন ছিল, তা বর্তমানে অনেকের কাছেই অবোধ্য থেকে যাবে। বিদেশি সাহিত্য থেকে অধুনা-বিস্মৃত সরোজনাথ ঘোষ প্রভৃতি কৃতী লেখককে দিয়ে গল্প অনুবাদ করানোয় "সাহিত্য" পত্রিকার যে অবদান ছিল, তাও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ।

বাংলা ভাষার সমালোচনা-সাহিত্যে অবশ্য সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চ স্থান করে রেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ; "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা যে পরম্পরা এই ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিল, তার মূল্য তখনকার পরিস্থিতির কথা মনে রাখলে প্রায় অপরিমেয় বলা চলে। খুব বেশি দিনের কথা

নয়, "কল্লোল" যুগের দীপ্তি নিভে গিয়ে যখন বিকৃতির পরিবেশনে বাংলা সাহিত্যের দিক্‌ভ্রম ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধে সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর সকল যুক্তি অকাট্য না হলেও আমাদের জ্যেষ্ঠ ও সর্বগরিষ্ঠ লেখকের ঐ বিবৃতির এমন এক নিজস্ব মহিমা ও গুরুত্ব ছিল যা আজো স্মরণীয়। বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু নিজের মৌলিক প্রতিভাসৃষ্ট অবদান দিয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যবোধের প্রয়োজনেই রুচি ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সর্ববিধ প্রয়াসে নেমেছিলেন, প্রকৃত সমালোচনা তাঁরই লেখনী হতে বাংলার প্রথম নিঃসৃত হয়েছিল, মননশীলতা ও রসবোধের সংমিশ্রণ তখন প্রথম দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী যুগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো মহাজনের রচনায় এই ধারার বিকাশ লক্ষ করা যায়। মাঝে মাঝে অনধিকারী ব্যক্তি "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার" অজুহাতে রসবিমুখিতার পরিচয় দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে পরম্পরার জনক, তা কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি।

সৌভাগ্যক্রমে আজো যাঁরা জীবিত তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহুমানভাজন ব্যক্তির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। নবাগত প্রতিভাকে সাদর, অথচ সতর্ক, অভ্যর্থনা দিতে এঁরা কখনো কুণ্ঠিত হন নি; নতুন কোনো ধারা যাতে শুধু অচলায়তনের জড়তার চাপে পিষ্ট হয়ে না পড়ে, সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল। আজ অনিবার্য কারণেই সেই দৃষ্টি পূর্বের মতো প্রখর নয়, স্বচ্ছ নয়—তাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা প্রকৃতির বিধানেই সর্বদা তুষ্ট হতে পারে না। কিন্তু সাহিত্য-বিষয়ে মননের ক্ষেত্রে তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতির অভাব আজ খুবই অনুভূত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বাংলা ভাষার লেখকদের সম্পর্কে খোঁজ নেবার অবসর করে নিয়ে তাদের উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন, তেমন কাউকে পাওয়া অবশ্য অসম্ভব—রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হল অবতারেরই মতো, তা যুগে যুগে সম্ভব হয়, নিয়ত তার সাক্ষাৎ মেলে না। কিন্তু যাঁরা আমাদের সাহিত্যে প্রমুখ, যাঁদের কল্পনা নয়, মনন সম্পর্কেও দেশবাসীর শ্রদ্ধা, তাঁদেরই কাছ থেকে যথার্থ সাহিত্য-আলোচনার দিগ্‌দর্শনের প্রত্যাশা বোধ করি অসঙ্গত নয়। কিন্তু তা তুষ্ট হওয়ার কোনো লক্ষণ কিছুকাল থেকেই যেন প্রায় অনুপস্থিত। মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে কিংবা শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এদিকে লক্ষ নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু এখনো যেন তাঁদের কণ্ঠে বলিষ্ঠতার কিঞ্চিৎ অভাব রয়েছে; তা ছাড়া বিষ্ণু দে-র মতো শুদ্ধ ও মিতাচারী কবির স্বভাবের সঙ্গে যে বলিষ্ঠতার কথা বলছি তা যেন খাপ খায় না।

"পরিচয়" পত্রিকার 'অভিজাত' যুগে সমালোচনা তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের এই দীন বঙ্গসাহিত্যের চেয়ে ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ দেখা যেত বেশি। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, হয়তো ক্ষুব্ধ হওয়াও অনুচিত। আজো দেখি "যুগান্তর" দৈনিকপত্রে সপ্তাহে একদিন বিদেশি বইয়ের সযত্নলিখিত আলোচনা থাকে, কিন্তু রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে বাংলা বইয়ের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপাঠ্য, একান্ত অবহেলা-সহকারে লিখিত হয় বলে। জানি, এর জবাবে শুনব, বাংলা বই হল অধিকাংশই অপাঠ্য; কিন্তু আমার মনে হয়—এটা ভুল হলেই সুখী হব—যে আমাদেরই মনের কোণে নিজের ভাষা সম্পর্কে যথার্থ মমতার অভাব আছে, তাই অতি ক্ষিপ্র বেগে আমাদের মন এই অবহেলাদুষ্ট হয়ে পড়ে। যাই হোক, "পরিচয়" বাংলা বই সম্পর্কে যে অচেতন

থেকেছে, তা একেবারেই বলছি না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" যখন প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তখন সে-বিষয়ে শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি সুলেখকের সযত্নচিন্তিত বক্তব্য (সম্প্রতি বর্তমান "পরিচয়ে" তা উদ্ধৃত হয়েছে) অনেকেরই স্মরণ হবে। 'অভিজাত' যুগের "পরিচয়ে"র কাছে আমাদের ঋণভার অল্প নয়।

একেবারে হতাশার ছবি আঁকতে বসি নি। মাঝে মাঝে এখানকার "পরিচয়" "সাহিত্যপত্র" প্রভৃতিতে আলোচনামূলক প্রবন্ধ পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। শ্রীযুক্ত অচ্যুত গোস্বামী, শ্রীমান্ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কনিষ্ঠ লেখক প্রকৃত নিষ্ঠা ও তথ্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে লিখেছেন; তাঁদের অকুণ্ঠে সাধুবাদ দিতে চাই। কিন্তু মন ভরে না বলেই অনুযোগ; আর যাঁরা জ্যেষ্ঠ, তাঁদের কাছে আশানুরূপ সহায়তা আজকের সাহিত্যে পাচ্ছে না বলেই আমার নালিশ।

পত্রিকাব্যবসায়ী এবং পুস্তক প্রকাশকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি আজ বাংলাদেশে সুবিস্তীর্ণ। পরিকল্পনার নামে, 'আকাদেমি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, বহুবিধ পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে দেশের শাসকগোষ্ঠী আজ সাহিত্যক্ষেত্রে সদর্পে বিরাজ করায় সোরগোল বেড়েছে, সমারোহ ঘটছে, কিন্তু স্রষ্টার সমাহিতি ও সম্মান ব্যাহত হচ্ছে বলেই আশঙ্কা করি। বহুজনের গুঞ্জন শুনছি, কিন্তু দেখছি যেন বাংলা সাহিত্যে আজ শাসন নেই, উপদেশ নেই, উৎসাহ নেই, মমতা নেই, আর প্রকৃত আবেগও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে, শক্তির প্রতিশ্রুতিও যেন খর্বতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। রাজশেখর বসু বা অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে আবেদন জানাতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হবে বলেই জানি। সভয়ে বলে রাখছি যে তাঁদের সম্পর্কে কোনো কটাক্ষ করছি বলে যেন আমার এই কথার কদর্থ না করা হয়।

বিভিন্ন বিভাগে বাংলা রচনা আজ পূর্বের চেয়ে সমৃদ্ধ, পরিমাণে আমাদের সাহিত্যের কলেবর আজ ক্ষীণ নয়। কিন্তু গুণের বিচারে মোটামুটি উত্তীর্ণ হলেও স্মরণীয় সৃষ্টির অভাব ঘটছে। এ-বিষয়ে আলোচনা এখন করতে চাই না, কিন্তু কৃতী ও শ্রদ্ধেয় লেখকদের ক্ষেত্রেও যে শৈথিল্য ও শ্লথভাবের সাক্ষাৎ প্রায়ই মেলে, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না, সাহিত্যে শাসনের প্রয়োজন এখানেই যেন আজ অনুভব করছি। জানি হয়তো কারো কারো মনে এ-কথার কদর্থই জেগে উঠবে, কিন্তু আশঙ্কা সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

কিছুকাল আগে একটি ছোটোগল্প পাঠকমহলে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছিল, গল্পটি এবং তার লেখক সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ জন্মেছিল। বাস্তবিকই গল্পটি ভালো এবং লেখক রীতিমতো গুণী। কিন্তু আমার এক বিজ্ঞানোৎসাহী বন্ধু (যিনি আজ সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ) তখনই মন্তব্য করেছিলেন যে আট বর্গমাইল জুড়ে একটা এলাকার মধ্যে লেখক যে কেমন করে কয়েকটা পাহাড়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, শহর বাজার ইত্যাদি ঢোকালেন তা বোঝা দায়। কথাটা হয়তো তুচ্ছ, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। চোখ কান খুলে না রাখার রেওয়াজ আমাদের চিন্তাধারা ও সাহিত্যে যথেষ্ট আছে বহুদিন ধরে। অন্ধ বাউলের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে থাকে; যে চোখ মেলে মানুষ আর পৃথিবীকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে তারই কাছে অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান আমরা করেছি। এতে সততার হানি হয়, শিল্পের ক্ষতি ঘটে।

নাম করেই বলা যেতে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি আজ আমাদের গল্পলেখকদের শীর্ষস্থানীয় এ-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। বহু ব্যাপারে মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অন্তরঙ্গ; ভিন্ন পথে বিচরণ করলেও তাঁর অবিচল প্রীতি সম্বন্ধে আমি

একান্ত নিশ্চিন্ত, আর ঠিক সেজন্যই নাম করে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে পারছি। কিছুদিন পূর্বে "জবানবন্দী" বলে তাঁর এক উপন্যাস পড়লাম; সম্ভবত এটিকে তাঁর প্রধান রচনার মধ্যে অন্যতম বলে ধরা ভুল হবে না। ভালো জিনিস অনেক পেলাম, কিন্তু সে-আলোচনা করছি না। খটকা লাগল যখন দেখি যে এক জায়গায় গভীর কথা বলতে গিয়ে স্কুলপাঠ্য ইংরেজি কবিতার একটা নিরেস লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উপসংহার করলেন। তারাশঙ্করবাবু নিষ্ঠাবান লেখক; বারবার নিজের লেখা সংশোধন করা তাঁর অভ্যাস; হয়তো পরে তিনি এর 'খোল নলচে' বদলে দেবেন। কিন্তু মনের কোথায় একটা দুরপনেয় শৈথিল্য থাকলে এরূপ স্খলন সম্ভব হয়, এটা ভাববার বিষয়। আমি শুধু এই দৃষ্টান্তের উপর জোর দিচ্ছি না; আমাদের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারের ক্ষেত্রেও মানসিক আলস্যের চিহ্ন যে প্রায়ই পরিস্ফুট, তাই স্মরণ করে বিব্রত বোধ করি।

আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত সাংবাদিক সম্প্রতি একটি ফিল্‌ম্ দেখে এসে প্রশংসাপত্রে লিখলেন, কাগজে ধূম করে ছাপা হল, বিজ্ঞাপনের বাহার বাড়ল। তিনি শুধু কৃতী লেখক বলে নয়, চিন্তাশীল বলেও পরিচিত, দেশে তাঁর প্রভাব প্রভূত। কিন্তু ফিল্‌মের যিনি 'স্টার', তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে ভোরের ভেজা শিউলিফুল প্রভৃতির উল্লেখ করে বলা হল যে এক কথায় অভিনয় একেবারে "মিষ্টি"! আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এভাবে লিখতে লেখক সংকুচিত হলেন না, অভিনেত্রীর শিল্পশক্তিরই যে অপমান করা হয় এরূপ বাক্য ব্যবহারে তা কারো চোখে পড়ল মনে হল না। বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য একটুও কমল না। এ-ধরনের লেখা অসতর্ক মুহূর্তের ভুল নয়, বরং একে একরকম বিকার বলেই আমি আশঙ্কা করি। বিনা প্রতিবাদে এ-জিনিস যে বাংলার বাজারে চলল, এটা অত্যন্ত অস্বস্তির কথা।

কথার বানান নিয়ে গণ্ডগোল আজ যেভাবে চলছে, হয়তো সেদিকেও একটু নজর দেওয়া দরকার। লেখকদের মধ্যে এবং ছাপাখানার কর্মচারীদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয়দের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে থাকলে তা আনন্দেরই কথা, কিন্তু মাঝে মাঝে এই কারণে বানান-বিভ্রাটও বাড়তে থাকছে। সংস্কৃতে কথা আছে—"র-লয়োরভেদঃ ('র' আর 'ল'-এর মধ্যে ভেদ নেই)—কিন্তু সে-ভেদ থাকুক বা না থাকুক, বাংলা 'র' এবং 'ড়' -এর যে ভেদ আছে, তাকে আজ প্রায় তুলে দেওয়ার উপক্রম ঘটছে, চন্দ্রবিন্দুর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি নিয়েও মুশকিল দেখা দিচ্ছে। হয়তো পশ্চিম বাংলার মানুষ বলে আমার এ-বিষয়ে পক্ষপাত আছে, কিন্তু বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এই অরাজকতা অচিরে অপনোদন করার প্রয়োজন আছে।

'রম্য রচনা'র নামে যে সাহিত্যিক দক্ষতার বাজারদর এখনো একেবারে কমে নি, সে-বিষয়ে সৌভাগ্যক্রমে কিছুটা সমালোচনা হয়েছে। ভাবের ঘরে চুরি করার অভ্যাস যখন মজ্জাগত হয়ে যায়, তখনই ক্ষমতাবান লেখকদের পক্ষে এরকম লেখা সম্ভব হয়; এ-কথা বলছি এজন্য যে সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো লেখকের চিত্তবৃত্তির চাকচিক্য নিঃসন্দিগ্ধ। এরই সঙ্গে বলা যায় বিদেশি কথার উচ্চারণ ঠিক না জেনেও জানার ভান করতে গিয়ে বাংলায় বানানবিভ্রাটের কথা। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এত বেশি মেলে যে তার উল্লেখ করতে চাইছি না। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যাল যাকে "স্নবতত্ত্ব" বলেছেন, তারই সূত্র থেকে এ ব্যাপারের অর্থোদ্‌গম্ ঘটতে পারে।

অপ্রিয় সত্য বলতে যাওয়া হয়তো নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু অপ্রিয় হলেও যা সত্য বলে মনে করি—যদি ভুল হয় তো নিশ্চয়ই সেজন্য মার্জনা চাইব—তা চেপে রাখা সম্ভব নয় বলেই এত কথার

অবতারণা করা গেল। অনেকের কাছে এগুলো অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা যে, আমাদের চরিত্রে যে শৈথিল্য থেকে গেছে, তারই প্রকাশ লেখার ক্ষেত্রে মিলছে, আর এ-বিষয়ে সচেতন না হলে তার নিরাকরণ ঘটবে না। ঠিক এজন্যই আমি চাই সাহিত্যে চিন্তারহিত অরাজকতার স্থলে যথোপযুক্ত শাসন—জবরদস্ত পাহারাওয়ালার কথা ভাবছি না, কিন্তু যে সমালোচনা মনের ঔদার্যে, শিল্পকর্মের প্রতি শ্রদ্ধায়, সাহিত্যিকের প্রতি মমতায় এবং বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতায় সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে, তারই প্রতীক্ষায় আছি।

গল্প-উপন্যাস প্রসঙ্গে

প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে রাখি। আমি লেখক হিসেবে কেউকেটা নই; সাহিত্য সমালোচক তো নয়ই। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা যখন আমায় এখানে উপন্যাসের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করতে বলে সম্মান দিলেন তখন আমি অস্বীকার করতে পারি নি।

আরো একটা কারণে একটু কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে আমার যা কিছু জানা-শোনা তা প্রায় পুরোপুরি বাংলা ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে দামি কাজ হচ্ছে জানি, কিন্তু সে-বিষয়ে মতামত দেবার শক্তি আমার নেই। আর বাংলা লেখা সম্বন্ধেও আমি যা বলব, তার একেবারে চূড়ান্ত মূল্য আছে বলেও দাবি করছি না।

একজন বাঙালি হয়তো সঙ্গত ভাবেই তার সাহিত্য নিয়ে গর্ব করতে পারে। গত প্রায় দেড়শো বছর ধরে আমাদের পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব ততটা সৃজনীশক্তি নিয়েই বাংলা সাহিত্য প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রভাবকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পেরেছে। ফলে আজ বাংলা পৃথিবীর একেবারে সেরা সাহিত্যের সারিতে গণ্য না হলেও দ্বিতীয় পংক্তিতে বেশ ভালো একটা জায়গা নিয়ে আছে। আর বাংলা সাহিত্যের গুণ ফুটেছে সব চেয়ে বেশি কবিতা আর ছোটো গল্পের ক্ষেত্রে।

আজ যদি বিদেশিদের কাছে আমরা সগর্বে বাংলা লেখার কোনো সঞ্চয়ন তুলে ধরার চেষ্টা করি তো ছোটো গল্পের মধ্য থেকে বাছাই করা হবে সব চেয়ে যুক্তিযুক্ত। আমাদের কবিতায় যে জাদু আছে তা যেন অনুবাদের চাপে উবে যায়। বোধ হয় বলা চলে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ লেখা হল তাঁর বড়ো 'ছোটো গল্প'। তাঁর উপন্যাস কেমন যেন খাপছাড়া—আর তাঁর সৃষ্টিতে খুব কদাচ দেখা যায় এমন মানুষ যার একদিকে আছে তার সমাজগত অস্তিত্বের ইতিহাস যেখানে সে একটি 'টাইপ', এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিস্বরূপ, আর একদিকে আছে তার নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস, যেখানে সে একা একজন রক্তমাংসের মানুষ। আর এই দুই দিক মিলিয়ে একটা জীবন্ত সামঞ্জস্য ঘটেছে। কিন্তু ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, তারাশঙ্কর বিভূতি ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আজ যাঁরা এঁদের উত্তরাধিকারী হয়ে লিখছেন আর যাঁদের নাম আলাদা বলার দরকার নেই—সবাই মিলে একটা শক্তিশালী আর বিচিত্র সাহিত্যপরম্পরা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা মানুষের বাঁচামরার সুখদুঃখ নিয়ে নানাভাবে লিখছেন।

তাঁরা মনের মুক্তি আর বিষাদ আর কমনীয়তা আর প্রসাদগুণের পরিসর বৃদ্ধি করেছেন। দুর্লভ মুহূর্তে তাঁরা কেউ কেউ লেখনীর দীপ্তমায়ায় জীবনের অগোচরত্বকেও উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। অবশ্য প্রায়ই তাঁরা যা লিখেছেন তা স্বল্পমূল্য; যার গুরুত্ব গৌণ, যা অগভীর; যার রচনারীতিতে অযত্নবিন্যাসের চিহ্ন। প্রায়ই তাঁদের লেখায় দেখা দিয়েছে সেই সব দোষ যাকে বলা চলে বাঙালি মনের দুরারোগ্য ব্যাধিরই প্রকাশ—অর্থাৎ অব্যবস্থিতচিত্ততা, মানসিক প্রগল্‌ভতা, আর ভাবালুতার মধ্যে অনুভূতিরই বিকৃতি। সম্প্রতি 'রম্য রচনা' নামে পরিচিত কতকগুলি লেখায় এই সব দোষ জুড়ে সাহিত্যক্ষেত্রকে কণ্টকিত করে তুলেছে। কিন্তু সে যাই হোক, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে বাংলা ছোটোগল্পে শিল্পকৃতিত্বের সুষ্ঠ পরিচয় মিলেছে।

দুঃখের বিষয় উপন্যাস সম্পর্কে আমি বলতে পারি না যে বাংলায় আমরা প্রকৃত সার্থক কাজ দেখাতে পেরেছি। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে শিল্পগত দায়িত্ব হল তুলনায় লঘু; যথার্থ ভালো ছোটোগল্প অবশ্য আকাশপ্রদীপের মতোই প্রোজ্জ্বল, কিন্তু তার পরিসর সংক্ষিপ্ত। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে বাঙালি লেখকের কৃতিত্ব উপন্যাসে মোটামুটিভাবে তার অসার্থকতাকেই যেন আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। আমি অবশ্য একেবারেই বলতে চাই না যে ব্যতিক্রমের সন্ধানই মেলে না—তা নয়, কিন্তু ব্যতিক্রম বলতে যা বুঝি, তেমন উপন্যাসও একটি নেই যাকে জগতের সেরা উপন্যাসের সারিতে ফেলা যায়। আধুনিক লেখার কথা থাক। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা-সৃষ্ট কোনো উপন্যাসকেই আন্তর্জাতিক বিচারে প্রথম শ্রেণীতে রাখা যায় না। আপনারা সবাই জানেন যে একজন বিখ্যাত ফরাসি লেখককে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জবাব দেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে বলতে হবে, ভিক্‌তর হ্যুগো।" আজ এই ১৯৫৭ সালে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি, তা হলে আমায় জবাব দিতে হবে, "দুর্ভাগ্যক্রমে, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'!"

আধুনিক যুগে, গত কয়েক শতাব্দীতে, উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে, আর বালজাক্ কিংবা টলস্টয়-এর মতো স্রষ্টার হাতে উপন্যাস এমন এক স্তরে উঠেছে যা এখনো নাগালের বাইরে। বালজাক্-এর 'দি হিউমান্ কমেডি' কিংবা টলস্টয়-এর 'ওয়ার অ্যান্ড পীস্' পড়তে গেলে মনে হয় যে উপন্যাসকার যেন কীট্‌স্-এর ভাষায় বলতে পারেন, 'Knowledge enormous makes a god of me!' সর্বোচ্চ স্তরের উপন্যাস হল গদ্যে মানুষজীবনের অন্তর্নিহিত কাহিনী। উপন্যাসই হল প্রথম শিল্পরূপ যা গোটা মানুষকে নিয়ে তার কথা বলেছে। যা পাঠককে শুধু জীবন সম্বন্ধে নতুন খবর দেয় নি, তাকে যেন নতুন একটা দৃষ্টিশক্তি এনে দিয়েছে, যা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষুধা আর প্রেম আর হিংসা-দ্বেষের ছবি এঁকে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পশ্চাৎপটকেও জীবন্ত করে তুলেছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি সম্বন্ধে উপন্যাসের এই ভূমিকার গুরুত্ব প্রভূত। কারণ লেখক যতই নিরাসক্ত হোন্ না কেন, সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন তিনি হতেন না—যুগ যুগ ধরে মানবতাই যাঁদের গরিমা হয়ে এসেছে, সেই শিল্পীরা কখনো মানুষের ভবিতব্য সম্বন্ধে অনীহা পোষণ করতে পারেন?

সম্প্রতি কিছুকাল ধরে প্রধান লেখকেরা উপন্যাসের আয়তনকে সংক্ষিপ্ত করে গভীরতার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছেন। এতে সম্ভবত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থঘনত্বের বৃদ্ধি ঘটেছে, রচনাশৈলীর চর্চাও নিষ্ফল হয় নি। কিন্তু রচনার সামগ্রিক একাত্মতায় যেন হানি হয়েছে। ইতিহাসের বুর্জোয়া যুগে উপন্যাসই হল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট

সাহিত্য—উপন্যাসই হল বর্তমানের মহাকাব্য। সমাজ এবং প্রকৃতির অন্তরায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তির যে সংগ্রাম একদা বিপুল উদ্দীপনায় সত্তাকে সঞ্জীবিত করেছিল সেই সংগ্রামের মহাকাব্য। কিন্তু বুর্জোয়া যুগের অভ্যুদয়ের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ খণ্ডনের বীজ নিহিত ছিল বলে ক্রমশ এল সংকট, যার ঘনায়মান পরিবেশে লেখকেরও পশ্চাদপসরণ করতে হল। তাই ভিক্টোরীয় যুগে সে-সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে এল, 'Wuthering Heights' কিংবা 'The way of All Flesh'-এর মতো উপন্যাসে শিল্পের অপরাজেয়ত্ব ঘোষিত হলেও সাধারণ ভাবে বিরূপ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পীও যেন বোঝাপড়ায় নামলেন। তখন থেকে ক্রমশ যে স্থাণুভাব শিল্পীর মানসে প্রবেশ করেছে, তার জের আজো মেটেনি। আজো বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিংশ শতাব্দীর রূপায়ণ উপন্যাসে সম্ভব হয় নি। বিংশ শতাব্দীর উপর দিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে চলেছে। অর্ধজগৎ জুড়ে সমাজে আর মানুষের জীবনে ভূমিকম্পের চেয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে, বিংশ শতাব্দীর জনতার কামনা আর অভ্যুত্থান আর অপরাধ আর অশান্ত আকুলতার সীমা পরিসীমা নেই, এশিয়া মহাদেশে বিশেষত বহুযুগের সুষুপ্তি ভঙ্গের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এখনো প্রকৃত সার্থক উপন্যাসে এর প্রতিচ্ছবি নেই। কিন্তু একমাত্র উপন্যাসই পারে আজকের সামূহিক জাগৃতির শিল্পরূপ দিতে, উপন্যাসই পারে গোটা জীবনের ছবি আঁকতে, উপন্যাসই পারে মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার মধ্যে কলুষ আর গরিমার সহ-অবস্থানকে রসোত্তীর্ণ করতে, উপন্যাসই পারে বর্ষণের মধ্যে রামধনু চিত্রণ করতে।

সভাস্থ শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে ভাবতে পারেন যে এ-সমস্ত কথা অবান্তর, কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমি এক মুহূর্তের জন্যও বলতে চাই না যে ইয়োরোপে যে-ভাবে ইতিহাসের বিকাশ ঘটেছে তা একেবারে আমাদের ইতিহাসেরই অনুরূপ। কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের শিল্পীরা যখন পশ্চিমের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা সংগ্রহ করতে কুণ্ঠিত হন নি, তখন হয়তো আমরা স্বীকার করব যে ইয়োরোপ থেকে আরো শিক্ষা আমরা পেতে পারি।

আমাদের দেশে উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটা সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে—এ সংকটের চরিত্র পশ্চিমের সংকট থেকে অবশ্য ভিন্ন। আমাদেরই ঢঙে এ সংকটের সমাধান করতে হবে, নইলে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সিদ্ধির স্বল্পতাতেই আমাদের তুষ্ট থাকতে হবে।

এ-কথা হয়তো বলা যায় যে বুর্জোয়া সভ্যতার ধাক্কা আমাদের দেশে লেগে থাকলেও পশ্চিমের মতো আমাদের দেশে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও প্রকৃতির বিরোধ অত্যন্ত প্রকট নয়। জাতি হিসেবে আমাদের বয়স বড়ো বেশি, আর প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার পাওয়ার মধ্যে লাভ আর লোকসান দুই-ই যেন মিলে আছে। আশা করি আমায় আপনারা মার্জনা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে সম্ভবত অধ্যাত্মক্ষেত্রে বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করা যেন আমাদের মজ্জাগত—জাতিভেদ আর বহুযুগব্যাপী সামাজিক নির্দেশের জালে জড়িয়ে থাকার একটা ফল আছে নিশ্চয়ই। আমাদের উত্তরাধিকারের মধ্যে আছে এক প্রকারের সুমহান্ শুচিতা ও পরমত-সহিষ্ণুতা, কিন্তু মানুষে মানুষে পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড়ো বেশি দিন ধরে আমরা সামাজিক নিয়মের নিগড়ে নিজেদের বেঁধে রাখতে অভ্যস্থ থেকেছি। তাই আমাদের ইতিহাসে এক ধরনের সামাজিক সামঞ্জস্যে আমরা হাজির হতে পেরেছি, কিন্তু সেই সামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে ব্যক্তিমানসের ক্ষতি হয়েছে। ইয়োরোপে মধ্যযুগে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল, কিন্তু সেখানকার চেয়ে আমাদের এখানে ঘটনাটার ব্যাপ্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল আরো গভীর। এমনকি, কবীর, চৈতন্য, নানক, তুকারাম প্রভৃতি সাধুসন্ত, যাঁরা প্রচলিত ধর্মধারার

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক বিস্ময়কর মানবতার প্রতীক হয়েছিলেন, তাদেরও যেন এ দেশের সর্বব্যাপী সমাজশৃংখল কবলিত করেছিল।

আর তাই যে-প্রেম হল উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য, পৃথিবীর নিত্য বিঘূর্ণন যে-অনুভূতির উপর যেন নির্ভর করছে, তা পর্যন্ত ভারতবর্ষের জীবনে নির্মম নিগড়ে বাঁধা পড়েছে। ছোটো গল্পের এলাকা সীমাবদ্ধ বলে সেখানে প্রেমের মুক্ত কাহিনী সহজে স্থান পেতে পারে, কিন্তু লেখক যদি অনেক দূর পর্যন্ত জাল পাতেন তো মুশকিল। সুতরাং আশ্চর্য হলে চলবে না যে প্রেমের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে নীতিবাগীশতার মধ্যে মুখ গুঁজতে হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পালাবার পথ খুঁজেছেন, শরৎচন্দ্র প্রায় অবাস্তবতার আশ্রয় চেয়েছেন; আর তারাশঙ্কর-প্রমুখ আধুনিকেরা যে-জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তাকে ছেড়ে সমাজের অন্তেবাসীদের কাছে ছুটেছেন, যারা স্বগোত্রের বাইরে তাদের কথা বলেছেন, দূর থেকে সমাজসীমান্তের খোঁজ চেয়েছেন—নতুবা মনখোলা লেখা সম্ভব হয় নি।

সম্ভবত এই জন্যই উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাঁরা আমাদের স্বল্পসংখ্যক কালজয়ী লেখকই হোন কিংবা 'কল্লোল' গোষ্ঠীর মতো স্মরণীয় পথিকৃৎ হোন, তাঁরা আমাদের অদৃষ্টপূর্ব জিনিস দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু মনকে এমন ধাক্কা দিতে পারেন নি যার ফলে আমাদের অনুভূতি প্রখর ও উদ্যত হয়ে জীবনদর্শনের নতুন রাজ্যে রওনা হতে পারে।

ভারতের সুপ্রাচীন চিন্তার যে অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার রয়েছে, তাও যেন আমাদের একটা সুলভ আশ্রয় দিয়েছে। গ্রীকদের কাছ থেকে ইয়োরোপ যে মর্মবেদনা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, আমরা ঠিক তা পাই নি। জীবনে বা শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমরা সহজে সেই আশ্রয়ে প্রবেশ করে অঙ্গ জুড়িয়েছি—এ অবশ্য মনের শান্তির দিক থেকে মস্ত জিনিস, কিন্তু এতে পার্থিব সাধনায় বাধা পড়ে থাকে। ভূমার যে আস্বাদ, তার চেয়ে বড়ো কিছু নেই নিশ্চয়ই কিন্তু আমরা বোধ হয় দুস্তর প্রয়াসে লিপ্ত না হয়েই সেই আস্বাদের অনুভূতি কল্পনা করি। আর ফলে এই ক্লিষ্টগ্রহবাসী মানুষ হিসাবে সার্থকতা আমাদের ফাঁকি দিয়ে যায়।

এ-সব কথা ভেবেই মনে হয় যে আমাদের আধুনিক মহারথীরা যে প্রায়ই ব্যর্থ তার কারণ হয়তো এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। আজ দেখি রাজশেখর বসুর মনোহারী প্রতিভা সিদ্ধির কোনো স্তরে উঠতে পেয়েও উঠল না—হয়তো আনাতোল ফ্রাঁসের মতো বুদ্ধিদীপ্ত, হাস্যোজ্জ্বল, যুক্তিস্নিগ্ধ রচনা তিনি আমাদের দিতেন, কিন্তু প্রথম বিস্ময় ও আনন্দ উদ্রেক করার পর থেকে তিনি খেয়ালমাফিক যা লিখছেন তাতে সৌষ্ঠব আছে কিন্তু রত্ন নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তো স্রেফ্ লড়াই ছেড়ে দূরে চলে গেছেন। 'বনফুল', মনোজ বসু আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অগভীর জলে সাঁতারের কয়েকটা সুদৃশ্য কায়দা দেখিয়েই যেন তুষ্ট। অচিন্ত্যকুমার আর অন্নদাশঙ্কর চিন্তায় নেমে মনকে চোখ ঠেরেই অভিভূত হয়ে রয়েছেন। মুজতবা আলি কিছুটা চমক জাগাতে পারতেন, কিন্তু গভীর কথা এড়িয়ে চলে তিনি ক্রমাগত ধরেই নিচ্ছেন যে পাঠকগুলো অল্পে খুশি হাবাগোবা-জাতীয় মানুষ।

চারিদিকে যখন অন্ধকার তখন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মাণিক, এই তিন বাঁড়ুজ্জের লেখা থেকে যে আলো বেরোচ্ছে তার দাম দিতে হবে। এঁদের মধ্যে সব চেয়ে অনুধাবনযোগ্য হলেন তারাশঙ্কর। যদিও মাণিক, যাঁর মৃত্যু গত বৎসরে আমাদের মন ভেঙে দিয়েছিল, সম্ভবত আরো দামি লেখা রেখে যেতে পারতেন, যদি তিনি নিজে এবং বাঙালি সমাজ তাঁর শিল্পীসম্ভাবনা সম্বন্ধে একটু প্রকৃত আগ্রহ দেখাতেন।

বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এই তিনজন জীবন সম্বন্ধে অভিনিবেশ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেছেন। জীবন সম্বন্ধে চিন্তা না করলে শিল্পী কখনো জীবন সৃষ্টি করতে পারেন না; কিছু লোকের অকিঞ্চিৎকর ছবি তিনি আঁকতে পারেন, কিংবা কোনো মৃদু, তোলপাড়-না-করা অনুভূতির নিপুণ বিশ্লেষণও দেখাতে পারেন, কিন্তু চিন্তা বিনা মানুষ গড়তে পারেন না।

এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ একটু শীঘ্র আর অল্পায়াসে মন স্থির করেছিলেন—সম্ভবত গভীরতর চিন্তার প্রয়াস তাঁর সহ্য হয় নি। তাঁর বড়ো প্রশ্নের জবাব তাই তিনি পেয়েছিলেন একপ্রকার কাব্যধারায়; চোখ তিনি খুলে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতি ও সমাজের পরিবেশে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার মতো ব্যস্ততা নিয়ে তুষ্ট থাকবে, এই ছিল তাঁর কাছে অবধারিত। এর ফলে দু-একটা উপন্যাস আর দু-তিনটে ছোটো গল্প ছাড়া তাঁর অন্য লেখা এখনই বইয়ের তাকে তুলে রাখার অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, সৃষ্টির মায়া অন্তর্ধান করেছে। যে-সব ছবি বহু স্নেহে তিনি ফুটিয়েছিলেন, হয়তো সিনেমা তাকে কিছুকাল জীবন দিতে পারবে, কিন্তু অনুভূতি জাগ্রত করার শক্তি তাঁর রচনা প্রায় হারিয়ে বসেছে।

সম্ভবত মাণিক-ই প্রথম ভালো করে ভাবতে বসেছিলেন মানুষের নিজের সঙ্গে আর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক আর সংঘাতের কথা। কারো কারো কাছে মনে হয়েছে যে যৌনপ্রবৃত্তি আর চিত্তবিকারের প্রকারভেদ নিয়ে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন বেশি। কিন্তু কখনো তিনি ঐ-ধরনের ব্যাপারকে সামাজিক পরিবেশ থেকে আলাদা করে দেখেন নি। সন্ধানীর আগ্রহ নিয়ে তাই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-আগ্রহ যথেষ্ট ছিল না। শিল্পী হিসেবেই তিনি মার্ক্‌স্‌বাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, কারণ তিনি সবচেয়ে বেশী চেয়েছিলেন যাতে অখণ্ড জীবন-বোধ তাঁর আয়ত্ত হয়, আর তা আয়ত্ত হলে প্রতিফলনে তাঁর রচনা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর ইন্দ্রিয় ছিল জাগ্রত, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব ছিল। আর তা ছাড়া লেখাই যাঁর জীবিকা, তাঁকে যে হাজার যন্ত্রণার শর প্রতিদিন সইতে হয়, তা তাঁর দেহ-মনকে পিষে ফেলল। বাঙালির লজ্জার কথা, যখন আমরা এ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হলাম তখন অতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে গেছে। তাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহাবসান হল, জীবনযাপনের যে যন্ত্রণা আমাদের দেশে শিল্পীর সৃষ্টিশক্তিকেও বিকৃত ও শীর্ণ করে ফেলে তারই যূপকাষ্ঠে তিনি হলেন বলি।

আজকের লেখকদের মনোজগতে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তার প্রতিভূ হলেন তারাশঙ্কর, যদিও সচেতন চিন্তার চেয়ে সহজ উপলব্ধির উপরই তিনি নির্ভর করে থাকেন। বর্তমানের মতো যা প্রাচীন তারও গুরুত্ব রয়েছে এ-কথা তিনি জানেন, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য তিনি আয়ত্ত করতে পারেন নি—অতীতের বোঝা যাতে অতিরিক্ত চাপ না দেয়, সেদিকে নজর তাঁর যথেষ্ট প্রখর নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা এমন চেতনার স্তরে উপনীত হওয়া, যেখানে সকল ধারা ও সকল প্রকরণ সার্থক হতে পারে। কিন্তু এই যে-চেতনা, যা একেবারে চূড়ান্ত সিদ্ধির পরিচায়ক, তা শুধু সর্ব বস্তুতে কল্যাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অক্লেশে আয়ত্ত ধারণাতে মেলে না। তার জন্য প্রখর, শাণিত অনুশীলন প্রয়োজন। তারাশঙ্কর-মানসে সামন্ততান্ত্রিক জীবনের বিশিষ্ট মোহনীয়তা এবং সামাজিক ক্রান্তির আন্তরিক কামনা যেন একটু অপ্রতিভভাবে সহ-অবস্থান করছে—সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য তাঁর পর্যবেক্ষণকে প্রাণের প্রসাদ দিতে পারে নি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যাদের তিনি সব চেয়ে কাছে থেকে জানেন, তারাই যেন একটা উদ্দেশ্য

পাঠকের মনে স্থাপিত করার জন্য চিত্রিত হয়েছে—ফলে তারা প্রায়ই নিষ্প্রভ এবং কখনো কখনো অবাস্তব। কিন্তু নিজের শিল্পীমানসকে তুষ্ট করতে তাঁকে সমাজের প্রত্যন্তে যেতে হয়েছে, যেখানে বাস করে বেদেনী আর কাহার আর সাপুড়ে—এদের বিষয় তিনি এমন প্রাণভরা মমতা নিয়ে লিখেছেন যে শিল্পগত দোষও প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মানুষের নবরূপের জন্য তাঁর হৃদয়-বেদনার অন্ত নেই। কিন্তু সেরূপ আবিষ্কার তিনি করতে পারেন নি। আর সম্ভবত তাই তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় তিনি স্বচ্ছভাবে লিখে চলেছেন এমন বিষয়ে যার গোড়ায় গলদ হল যে তা অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু লক্ষ করার বস্তু হল তাঁর সততা, আর নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর অসন্তুষ্টি—আর কোনো লেখক ছাপা রচনা নিয়ে এত অদল-বদল করেন না, মেজে-ঘষে ক্রমাগত সার্থকতার সন্ধানে লিপ্ত থাকেন না। যেদিক থেকেই দেখি না কেন, তিনিই আজ আমাদের সর্বাগ্রগণ্য ঔপন্যাসিক।

১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রগতিশীল নাম নিয়ে রচনার যে-ধারা দেখা দিয়েছিল, আজ তা খুব জাহির হতে না থাকলেও বাংলা লেখার সর্বত্র তার একটা প্রভাব মিশিয়ে রয়েছে। গোপাল হালদারকে এই ধারার প্রতিনিধি বলে ধরা চলে। তাঁর মন অস্থির, জিজ্ঞাসা অনন্ত। তাই লেখা কিছুটা নীরস হলেও নতুন পথের ইঙ্গিত তিনি দিতে পারেন। মানুষকে জানার নতুন দৃষ্টিকোণ খুঁজে থাকেন। কিন্তু দু-একটা ছাড়া তাঁর চরিত্রগুলির যেন ঠিক প্রাণ নেই—কেবল লক্ষ প্রধান লেখার অভিশাপই হল এই। সে যাই হোক, লক্ষ স্থির করার প্রচেষ্টার মধ্যেই মূল্যবান অনেক কিছু আছে। আর এরই প্রভাব আজ অনেক গল্প উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়েছে। সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, এমন কি বিমল মিত্রের নাম করে বলা যায় যে এঁদের কেউ কেউ প্রগতিবাদের প্রভাব অস্বীকার করতে চাইলেও তাঁদের লেখায় সে-প্রভাবের ছাপ কম-বেশি পড়েছে।

বাংলায় যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, রমেশচন্দ্র দত্ত আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর বর্তমানের কয়েকজন যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের কথা আলোচনার সময় হল না। আর সময় নেই আমাদের মহিলা ঔপন্যাসিকদের কথা বলবার—তাঁদের কেউ কেউ মোটামুটি ভালো লিখেছেন বটে, কিন্তু আমার আশঙ্কা যে প্রকৃত উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টি তাঁদের কাছ থেকে পাই নি।

আমি স্বীকার করছি যে তাড়াহুড়ো করে আমাদের গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে বিচার করতে বসে হয়তো স্পর্ধা দেখিয়ে ফেলেছি। আর সেজন্য আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমি লেখকদের কাছে অনুনয় করে বলব যে তাঁরা গভীরভাবে আলোচনায় নামুন—সে-আলোচনা এ ধরনের সম্মেলনের বাহ্যাড়ম্বর থেকে দূরে বেশ সময় নিয়ে চালাতে হবে, সে-আলোচনায় যোগ দেবেন স্বয়ং লেখকেরা। তাঁরা চেষ্টা যেন করেন জানতে (যদি জানা সত্যিই সম্ভব হয়) যে কেন আমাদের উপন্যাসের ক্ষেত্রে গর্ব করতে পারি এমন ফসল ফলছে না। আর এই দুরবস্থা দূর করার কোনো শিল্পসঙ্গত রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় কি না। আমি হয়তো কঠোর সুরে কয়েকটা কথা বলেছি, কিন্তু আমার স্বপক্ষে বলব যে নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে ভালোবাসি, আর তাই নিয়ে গর্ব করি বলেই কঠোর হয়েছি। আর যদি একথা বলতে দেন তো বলব যে আমি চাই দুনিয়ার দরবারে ভারতীয় সাহিত্য ভারতীয় ভাষায় রচিত শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন প্রকাশ পায়। কাউকে ক্ষুন্ন না করে বলতে চাই যে মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ্‌ প্রভৃতি কয়েকজনের ইংরেজিতে উপন্যাস লিখে বাহবা পাওয়াটা আমি একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে

করি। আমরা যে অবস্থায় বাস করি, তাতে হয়তো তাঁদের নিঃসন্দিগ্ধ কৃতিত্বের এই অপব্যবহার অনিবার্য হয়েছে। ইংরেজি ভাষার সম্পদ এত বেশি যে যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয় তাদের পক্ষেও কিছু পরিমাণে তাকে আয়ত্ত করে কাজ-চালানো লেখা উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয় গল্প-উপন্যাস ভারতবর্ষের জীবনের কতকগুলো ছবি আঁকতে পারলেও তার প্রকৃত প্রকাশ ঘটাতে পারে না।

আমার ভরসা তাই নিছক ভারতীয় রচনার উপর, আর সেই পুণ্য দিনের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি, যখন বলতে পারব যে আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখা সত্য ও সুন্দরের উচ্চ শৃঙ্গে প্রকৃতই আরোহণ করতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ

রবীন্দ্রজন্ম-জয়ন্তী প্রতিপালন উপলক্ষে বাংলাদেশে অসংখ্য অনুষ্ঠান হয়েছে এবং হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহুবিধ যে রচনা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাও সংখ্যাতীত। এমন পরিস্থিতিতে কিছু পরিমাণে অতিকথন অনিবার্য হয়ে পড়ে আর সেজন্য অপ্রতিভ বোধ করার কোনো হেতু নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎসবের পরিকল্পনা আয়োজন ও অনুষ্ঠানে অশোভন কিছু ঘটে থাকাও বিস্ময়কর নয়—যেখানে বহুজনকে একত্র মিলিত করতে হয় সেখানে যে সততই বিদগ্ধোচিত সুরুচি ও অনুপাতবোধ প্রকৃত মর্যাদা পাবে তা আশা করা সমীচীন নয়। তবে একথা বলা যায় যে কোথাও স্খলন হয়ে থাকলে তার কারণ সম্ভবত ছিল অত্যুৎসাহ—কবির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা এবং তাঁকে নিয়ে অপরিমিত গর্বই জয়ন্তী প্রতিপালনে মাঝে মাঝে আমাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। আমাদের মধ্যে যাদের নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে তারা কোথাও কোথাও লক্ষ করেছি যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে সৌম্য অথচ সুস্থ শালীনতা চাইতেন এবং তার পরিবেশ অনায়াসে সৃষ্টি করতেন, তার বেশ অভাব রয়েছে। কিন্তু এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে বিচলিত আমরা আশা করি কেউই হই নি। বাস্তবিকই যে উদার আনন্দ ও আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে বাঙালি এই জয়ন্তী উৎসবে নেমেছে তা অহংকারের বস্তু বললে অত্যুক্তি হবে না।

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ তারিখে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির পক্ষ থেকে 'রবীন্দ্রনাথ' আখ্যা দিয়ে যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমরা কয়েকজন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে অথচ সর্ববিধ অতিকথন থেকে নিবৃত্ত হওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে লিখেছিলাম। এজন্য অন্তত একটি সুবিদিত অঞ্চল থেকে আমাদের কটূক্তি শুনতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির যে অপার মহিমা তাকে মুগ্ধচিত্তে স্বীকার করেও কেবল কাব্যের বিচারে শেক্‌স্‌পিয়র বা সফোক্লিস্-এর সমস্তরে তাঁকে না বসিয়ে অল্প একটু দূরে স্থান দেওয়া উচিত বলেছি বলে কুটিল ভর্ৎসনার ভাগী হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কীর্তি এবং ব্যক্তিত্ব মিলে যে অখণ্ড ও অতুলন ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছে তার বিশ্লেষণ প্রচেষ্টাকে নিন্দুকেরা মূল্য দিতে অপারগ বলেই এমন ঘটেছে। যদি নিছক আবেগের আতিশয্যে কেউ বিচলিত হয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতেন,

তা হলে মতানৈক্যের মধ্যে কটুতা দেখা দিত না। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সব চেয়ে লক্ষ্য করার বস্তু হল দুরভিসন্ধি। বাংলাদেশের মার্ক্‌স্‌বাদীরা রবীন্দ্রনাথকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন বলেই তাঁকে নিয়ে অলস আলোচনা ও মূল্যহীন স্তুতিবাক্য পরিহার করার সচেতন চেষ্টা চলেছে। আমাদের এই চেষ্টায় বহুস্থলে ত্রুটি থেকে গেছে, মাঝে মাঝে মূল্যায়নে নিদারুণ ভ্রান্তিও যে ঘটে নি তা বলা যায় না, কিন্তু যথার্থ শ্রদ্ধার অভাব কখনো হয় নি। কোনো কোনো ব্যক্তি এ-কথা বিশ্বাস করতে একেবারে অস্বীকৃত বলেই দেখা গেল যে অধ্যাপক সুশোভন সরকার এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে 'রবীন্দ্রনাথ' সংকলনগ্রন্থে যা লিখেছেন, তা নিয়ে রুচিবিগর্হিত মন্তব্য করতেও তাঁদের বাধে নি।

ঐ সংকলনের সকল লেখক মোটামুটি নিজেদের মার্ক্‌স্‌বাদী মনে করলেও সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। সুশোভনবাবুর যে-লেখাটি সম্পর্কে শ্লীলতাবর্জিত সমালোচনার উল্লেখ এখনই করেছি, সেই লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়কে আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি নি। যুক্তিনির্ভর, চিন্তাদীপ্ত, প্রাঞ্জল রচনা সত্ত্বেও ঐ প্রবন্ধের বক্তব্যে আমার সায় দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব নয়। এ-বিষয়ে কিছু লিখতে যাওয়ার কথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবি নি; আশা করেছিলাম যে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে যথাসময়ে চিন্তাশীল লেখকরা কিছু বলবেন। কিন্তু যখন শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার কিছু বিবরণ দেখলাম এবং সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় আমেরিকা-ইয়োরোপ সফরের পর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মনোবিকার লক্ষ করলাম, তখন আমার 'প্রাচ্যাভিমানী' চিত্ত বাস্তবিকই চঞ্চল হয়ে উঠল আর ভাবলাম যে আমাদের এই দেশ এবং তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত অনুভূতি বলে যা অনুমান করি তা নিয়ে একটু আলোচনা অসঙ্গত হবে না।

প্রথমেই বলে রাখি যে ইয়োরোপ এবং তার জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যতটুকু জানতে এবং বুঝতে পেরেছি, সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট মমতা আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমার এক প্রধান খেদ এই যে রবীন্দ্রনাথের মতো চরাচরব্যাপ্ত প্রতিভার কাছ থেকেও আমরা ইয়োরোপের প্রকৃত সত্তা এবং তার গরিমা আর মোহনীয়তার সন্ধান তাঁর লেখায় ঠিক পাই নি, "অন্যে পরে কা কথা"। কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্বে ইয়োরোপ-দর্শন করে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু যে বিভ্রমে জড়িত হয়ে স্বদেশের অপকর্ষ সম্বন্ধে একান্ত অল্পার্ঘ মন্তব্য করতে সংকোচ বোধ করেন নি, তা বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। মৃতের নিন্দাবাদ অকর্তব্য, কিন্তু 'Quest' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে-রচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শুধু রুচি নয় সাহিত্যবিচারও যে বিকৃত রূপ নিয়েছে, সেজন্য দায়ী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আংশিক পরিচয়-জনিত উদ্ভট মোহ। 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক অতি স্বল্পায়তন বিবরণ বেরিয়েছে, কিন্তু তাতেই তাঁর বলা আটকায় নি আমাদের এই দেশ সম্বন্ধে—"এ কি জলবায়ুর দোষ?—যে জলবায়ুতে তাড়াতাড়ি খাবার পচে যায়? তেমনি আত্মাও কি পচে যায়?"

এই যদি বুদ্ধদেববাবুর অনুভূতির পরিচয় হয় তো তাই নিয়ে ঝগড়া বাধাবার প্রবৃত্তি আমার নেই—অবশ্যই তাঁর চিন্তাস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে অবাধ অধিকার আছে। কিন্তু বিস্মিত (এবং কিঞ্চিৎ ব্যথিত) না হয়ে পারি না। আর ভাবি যে মানসিকতার এই দৈন্যই কি তাঁকে যথার্থ কবিকীর্তি থেকে বঞ্চিত করেছে; নিজের অজ্ঞাতে যে-চিত্তচাপল্য তাঁর আপাতশোভন কবিতাকেও লঘু আর পঙ্গু করে রেখেছে, গদ্যরীতিতে অসামান্য পটুতা সত্ত্বেও অভিনিবেশ, সংযম ও জিজ্ঞাসার যে-অভাব তাঁর বহু রচনাকেই রিক্ত করে ফেলেছে, তারই কি ক্লেশকর

উদাহরণ এখানে দেখছি? ইচ্ছা করে বলতে যে বুদ্ধদেববাবু একবার ভারতদর্শনে বেরিয়ে পড়ুন, হয়তো এখনো তাঁর চোখ খুলতে পারে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন, "নাল্পে সুখম্"—কিন্তু বুদ্ধদেববাবুর মতো গুণী ব্যক্তি বড়োই অল্পে তুষ্ট হয়ে ওঠেন। কয়েকমাসে পৃথিবী ঘুরে আসা যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বরূপদর্শনের সম্ভাবনা না থাকলেও সেদিকে লক্ষ রেখে একটু সচেতন চেষ্টার তো প্রয়োজন, যে-চেষ্টা স্পষ্টই বুদ্ধদেববাবু করা দূরে থাক মনেও তোলেন নি। পাশাপাশি নাম উল্লেখ করলেই তুলনার কথা ওঠে না, তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহির্দৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এই চেষ্টা আপনা থেকেই এবং অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিকভাবে করেছিলেন। তাই ভারতবর্ষ ও বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর বোধ, তাঁর অন্তরের সাড়া আমাদের কাছে এত মহার্ঘ, আর যেখানে মানসিকতা প্রায় নিঃস্ব, সংবেদনশীলতাও রিক্ত, সেখানে যা শোনা যায় তা ফাঁকা আওয়াজ ভিন্ন কিছু নয়।

বুদ্ধদেববাবুর বাক্যবিলাসকে উপেক্ষা করতে পারি কিন্তু শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধে যে-কথা বলতে চেয়েছেন তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে এবং অগণিত রচনায় ভারতবর্ষের স্বকীয়তার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠা (যাকে একটু আতিশয্য করে 'প্রাচ্যাভিমান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে) আর "ভবিষ্যতের উপযোগী পশ্চিমী আদর্শের প্রতি আন্তরিক প্রীতি" এই দুই বস্তুর পর্যালোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মোটামুটি ১৯০৭ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় চলেছিল প্রাচ্যাভিমানের পর্ব, আর তারপর থেকে, নিদেনপক্ষে ১৯১১-১২ থেকে শেষজীবন পর্যন্ত "পশ্চিমীদৃষ্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত"। তার্কিকের মতো না লিখে জিজ্ঞাসু চিত্ত নিয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে সুশোভনবাবু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে কবির রচনায় "একই সময়ে বিভিন্ন বিরোধী সুর ধ্বনিত হতে পারে"। তাই এক জায়গায় ১৯১১ সালের এক চিঠি উদ্ধৃত করেছেন যুক্তির স্বপক্ষে : "আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই... বাস্‌রে! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি?" কিন্তু তখনই বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে ১৯১২ সালেই 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুত্বেরই সংস্কৃত রূপ বলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রবন্ধেই আছে কবির অবিস্মরণীয় কথা—বাইরে থেকে আমরা যা নিয়ে থাকি সেদিকে মন থাকে সচেতন অথচ ভিতর থেকে পাওয়া জিনিসের কথা মনে থাকে না, ঠিক যেমন মাহিনার চেয়ে 'বোনাস'-কে (bonus) বড়ো করে দেখতে প্রবৃত্তি হয় আর মাথার ভার না বুঝলেও পাগড়ীর ওজন সম্বন্ধে মন সজাগ থাকে!

যাই হোক, গবেষকের সততা নিয়ে অধ্যাপক সরকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে অশীতিপর জীবনের বহু বিচিত্র পর্যায় সত্ত্বেও রবীন্দ্রচিত্তের যে অখণ্ডতা জাজ্বল্যমান সেই অখণ্ডতাকে এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করছে। "পশ্চিমী হাওয়াকে স্বীকার করা" (এমন সময়ে যখন "পশ্চিমী হাওয়া" বাস্তবিকই এদেশে কতকটা বইতে আরম্ভ করেছে) আর "পশ্চিমী দৃষ্টির জয়যাত্রা" সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়ার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রভেদ রয়েছে। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে "সমাজসংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ উনিশ শতকে ইয়োরোপ থেকে সঞ্চারিত হচ্ছিল বলেই এসব কিছু সমর্থনের ঝোঁকটাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার সার্থকতা আছে", সুশোভনবাবুর এই সিদ্ধান্ত ইতিহাস কিংবা

সাধারণ বুদ্ধি কোনো সূত্র থেকেই গ্রহণ করা যায় না। আর আমি কোনোক্রমেই স্বীকার করতে পারি না—সুশোভনবাবু কিছুদিন আমাদের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু আর্ষবাক্য বলেও মানতে পারি না তাঁর কথা : "আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে-ভারতবর্ষ বিরাজ করছে, তার বাহ্যিক আকার যে রূপই নিক্ না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই। সে সমাজবাদ আমাদের কাম্য, ন্যায্যত তার সঙ্গতি পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে-পশ্চিমী দৃষ্টি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।" আমার আশঙ্কা যে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়'-এ (১৯১২) যে ধরনের মনোভাবের শিকড়হীন অস্তিত্ব লক্ষ করেছিলেন, সুশোভনবাবুর মতো মনে যেন এখনো তার ছাপ লেগে থেকে চিন্তাকেও নিষ্প্রাণ করে ফেলেছে।

সম্প্রতি যে-একটি বই দেখেছি তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। J. P. Corbett. 'Europe and the Social Order' (Leyden, 1959) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : 'ইয়োরোপের লোক আমরা ছিলাম দুনিয়ার অবিসম্বাদী অধিপতি, অথচ আজ আমাদেরই জায়গা নিয়ে ঝগড়া চলছে। এতে আমরা কুপিত। আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিল্পক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হল আমাদের সৃষ্টি, অথচ আজ দেখছি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ধনসম্পদে আমাদের ছাপিয়ে গেছে আর শীঘ্রই রাশিয়া পর্যন্ত আমাদের হারিয়ে দেবে। এতে আমরা ঈর্ষান্বিত। উনিশ শতকে আমরাই ধনতন্ত্র আর সাম্যবাদের জন্ম দিলাম, কিন্তু আজ দেখছি ঐ দুই বস্তু আমাদের এলাকার বাইরে জাঁকিয়ে বসেছে আর এমন অভূতপূর্ব শক্তির অধিকারী হয়েছে যে আমাদের সমেত সারা দুনিয়াকে তারা চেপে মারার ভয় দেখাচ্ছে তাদের পরস্পরবিরোধী দাবি নিয়ে। এতে আমরা অত্যন্ত শঙ্কিত। ইতিমধ্যে পৃথিবীর দশদিক জুড়ে যারা আগে ছিল আমাদের অনুগত, তারা আজ আমাদের তারিফ না করে কেবলই সন্দেহ করছে, আমাদের শাসন না মেনে শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমরা অনেকে খুবই ক্রুদ্ধ।" এই ইংরাজ অধ্যাপক কিন্তু গ্রন্থটিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে ইয়োরোপ যা নিয়ে এখনো গর্বান্ধ, তা এমন জিনিস যে কারো মৌরসী পাট্টা সেখানে অচল।

ইতিহাস অবশ্যই বলে যে অন্তত গত চার পাঁচশো বৎসর ধরে ইয়োরোপের গতি ছিল বেগবান আর ভারতবর্ষের মতো দেশে আমরা স্থবিরতার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলাম—এর শাস্তি যখন আমরা দিয়েছি ও দিচ্ছি, তখন একথা হাড়ে হাড়ে বুঝি বলাও ভুল হবে না। এই পার্থক্যের কারণ বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে, অন্যত্র নয়। কিন্তু "সমাজ সংস্কার যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ"-কে পশ্চিম ইয়োরোপের বদান্যতায় পাওয়া জিনিস বলে সুশোভনবাবু নিশ্চয়ই মনে করেন না। ভারতবর্ষের সমাজ যে এতকাল টিকে থেকেছে, সেটা কি এই কারণে যে আমরা কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা দিতেই অভ্যস্ত, সময়ের দাবির সঙ্গে সমাজের গঠন ও রীতিনীতির সামঞ্জস্য সাধন অর্থাৎ সংস্কার সম্বন্ধে একেবারে অচেতন? এদেশের ইতিহাস তো শুধু মানুষের কোনো ক্রমে বেঁচে থাকার ইতিহাস নয়। আমাদের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা কি বহু গ্লানি বহু অপরাধ সত্ত্বেও দেদীপ্যমান্ নয়? যুক্তিবাদের আধুনিক মূর্তি যাই হোক না কেন, জ্ঞানের সন্ধানে যুক্তির অকাট্যতা সম্বন্ধে অচেতন থেকেই কি ভারতবর্ষের সভ্যতা বেঁচে থাকতে পেরেছে? 'মানবত্তাবোধ' কি এদেশের অভিজ্ঞতায় অপরিচিত অনুভূতি, শুধু উনিশ শতকের "পশ্চিমী হাওয়া" কি তাকে জাগিয়ে তুলেছে, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাওয়ার মতো? ভারতভূমিতে প্রতীচ্যের সদাশয় আবির্ভাব বিনা কি সমাজবাদ আমাদের কাছে অগম্য আর অবোধ্য থেকে যেত? মনে পড়ছে রজনী পাম দত্তের কথা যে পরিবর্তমান

সমাজব্যবস্থার মধ্য থেকেই যখন সমাজবাদের বাস্তব উদ্ভব, তখন ইয়োরোপের চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে স্পর্শ না করলেও দেখতাম যে বেদ, উপনিষদ ও অনুরূপ ভাবাদর্শ থেকেই সমাজবাদের অভ্যুদয় ঘটত। সুশোভনবাবু এ সমস্ত কথা খুবই ভালোভাবে জানেন বলে আমার অনুযোগ যে অত্যন্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তিনি বিষয়টির অবতারণা করেছেন, আলোচনায় বহু চিন্তনীয় বস্তু এনে ফেলা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তকে একদেশদর্শী করে ফেলেছেন। আর যার সম্পর্কেই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত শুধু অমূলক নয়, তাকে অসঙ্গত বললেও ভুল হবে না। ১৩৩৬ সালে লেখা "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত" প্রবন্ধে কবি অতি সহজ ভাষায় অত্যন্ত গভীর কথাই বলেছিলেন : "গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না। যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই।"

রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আর কর্মে তাঁর দেশের মাটির এই মূলগত প্রাধান্য সর্বদা ছিল বলেই তা এত খাঁটি, এত সঙ্গত, এত সার্থক। ১৩১৫ সালে লেখা 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তাই তিনি লিখেছিলেন : "রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই, তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এই জন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অঞ্জলি পূরণ করেন নাই।" আরো লিখেছিলেন : "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মাহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।" পশ্চিমী দৃষ্টি ও প্রাচ্যাভিমানের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব খাড়া করে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষার্ধে পূর্বোক্তের জয় আবিষ্কার করার প্রকৃত কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে তো মনে হয় না। উভয় ধারার মধ্যে সমন্বয় প্রয়াস এক তৃতীয় ধারায় উত্তরণে সাফল্য লাভ করল কি না এই আলোচনা চলে চলুক। কেবল একথা অকাট্য যে নিজের ঘর ছেড়ে কিংবা তাকে হারিয়ে ফেলে বহির্বিশ্বকে কখনো আতিথ্য গ্রহণে আহ্বান জানানো সম্ভব হয় না। যে মাটির সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক তাকে অস্বীকার করে দুনিয়ার সঙ্গে মিতালি ঘটে না। 'বিশ্বদেব' দেখা দিয়েছিলেন কবিকে 'পূর্বগগনে', তাঁরই একান্ত 'স্বদেশে'।

১৩৪৭ সালের ১লা বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" তাই প্রাচ্যাভিমান যাকে বলা হয়েছে, সে বস্তু কখনো তাঁর সত্তা ও সৃষ্টিকে সীমিত ও সংকীর্ণ করতে পারে নি। আর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা উঠেছে তা মানসিকতার সমুচ্চ শিখরে যে প্রকৃতই অপ্রাসঙ্গিক তা বোঝা হয়তো কঠিন নয়। কবি স্বয়ং মুগ্ধমনে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন : "প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।" পাশ্চাত্য সভ্যতার সমুজ্জ্বল গ্রীক প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মনের আকুতি ও আত্মশ্লাঘা এর চেয়ে অর্থঘন প্রকাশ কি কখনো পেয়েছে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একান্ত স্বদেশজ নির্লিপ্তি নিয়ত তাঁকে আকর্ষণ করেছে—এর ফলে

কবি হিসাবে তাঁর বহির্দৃষ্টি মাঝে মাঝে হ্রস্ব হয়ে গেছে, অনুভূতির বিশুদ্ধ মানবীয় অন্তঃসার কিঞ্চিৎ শীর্ণ হয়ে পড়েছে, অথচ মানসিকতার প্রসার ও মুক্তির অনন্য মহিমা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'ঘরে-বাইরে'-তে যে সন্দীপের 'মাংসবহুল আসক্তির' কথা শুনি তাকেও বলতে হয়েছে যে আমাদের গর্ভধারিণী এই মহাদেশ নিরাসক্তির যে মোহে আমাদের টেনে রেখেছে তা থেকে নিষ্কৃতি বুঝি সম্ভব নয়।

'গোরা' উপন্যাসকে প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমী আদর্শের প্রতি অনুরাগে উত্তরণের উদাহরণ মনে করার চেয়ে সংকীর্ণ নিষ্প্রাণ অবাস্তব সিদ্ধান্ত কিছু হতে পারে ভাবা কঠিন। বস্তুত গোরার প্রচণ্ড প্রাচ্যাভিমান তার অজানিত পাশ্চাত্য উত্তরাধিকারেরই এক নিদর্শন; বিশ্বাস ও ব্যবহারের মধ্যে প্রখর সামঞ্জস্য সাধন প্রচেষ্টায় অবিরাম লিপ্ত হয়ে সংসারে জাতিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার যে সুস্পষ্ট মনোবৃত্তি গোরার মধ্যে দেখা যায়, তা ভারতবর্ষীয় হিন্দুর সর্বত্রচারী অথচ কথঞ্চিৎ শিথিল ধ্যানপ্রবণতার বিপরীত বললে খুব বেশি ভুল হয় না। সুশোভনবাবু তাঁর প্রবন্ধে উপন্যাসের শেষে গোরার অবিস্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করেছেন : "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।... সমস্ত কারুকার্য বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি বেঁচে গেছি।" এই উক্তি যে প্রকৃত প্রাচ্যাভিমানী উক্তি, পশ্চিমী দৃষ্টির কাছে প্রাচ্যাভিমানের পরাজয় যে এতে সূচিত হচ্ছে না, তা কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে? আর "গোরা"-য় যে চরিত্রকে মূল প্রতীক বলা যেতে পারে, তা হল আনন্দময়ী, যিনি ঐকান্তিকরূপে ভারতীয়, যাঁর সংযম, ঔদার্য, বাৎসল্য, করুণা ভারতবর্ষের মতোই তাঁকে মহীয়সী করে রেখেছে। মনে পড়ে যায় ১৩০৯ সালে লেখা "নববর্ষ" প্রবন্ধের কথা—"কর্ণ যেরূপ সহজ কবচ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি সেইরূপ একটি সহজ বেষ্টনের দ্বারা আবৃত। সর্বপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও একটি দুর্ভেদ্য শান্তি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অচলা হইয়া ফিরে; তাই সে ভাঙিয়া পড়ে না, মিশিয়া যায় না, কেহ তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, সে উন্মত্ত ভিড়ের মধ্যে একাকী বিরাজ করে।"

যদি 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ' প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হত এই যে "খাঁটি প্রাচ্যাভিমানের পরিবর্তন-বিমুখিতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরেছিলেন," তাহলে বিতর্কের কারণ ঘটত না। কিন্তু যখন পড়ি যে প্রাচ্যাভিমান থেকে মুখ ফিরিয়ে কবি "নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন" দেখলেন, "যাকে আমাদের বিশ্লেষণে পশ্চিমী দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই", তখনই মুশকিল বাধে। ঐ-একই সংকলনে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা পাশাপাশি পড়লে সুশোভনবাবুর বহু ভ্রান্তি ধরা পড়বে। আর শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবিশ রীতিমতো গবেষণা করে 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা' বলে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও বোঝা যাবে যে সুশোভনবাবুর সিদ্ধান্ত একদেশদর্শিতাদুষ্ট। "পশ্চিমী সভ্যতা" কথাটার স্পষ্ট সংজ্ঞা কোথাও ঠিক নেই বলেও আবার অসুবিধা ঘটে, বিশেষত যখন তিনি আজকের ভারত সম্বন্ধে অপ্রসন্ন হয়ে বলেন : "প্রাচ্যাভিমান আজো সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ দেশের গতি পশ্চিমী সভ্যতার দিকে।" অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্পের বিকাশ, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা ইত্যাদিকে শুধুমাত্র "পশ্চিমী সভ্যতা" বলে একই বস্তুর আনুষঙ্গিক ব্যাপার মনে করার মধ্যে বাস্তবিকই বড়োদরের গলদ আছে।

ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যে অপকর্ম বহুদিন ধরে চলে এসেছে কিংবা জাতের যে বিড়ম্বনায় এদেশ ধিকৃত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ এবং লেখনী কখনো নিরস্ত হয় নি। কিন্তু মানবতাবোধ উনিশ শতকের ইয়োরোপ থেকেই "সঞ্চারিত" হচ্ছিল এমন কথা মেনে নিতে তিনি কখনো প্রস্তুত ছিলেন না। ১৮৯৩ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্র থেকে চিন্মোহনবাবু যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা এখানে স্মরণীয়। Sacredness of life সম্বন্ধে ভারতীয়দের কোনো ধারণা নেই"—জনৈক ইংরেজ প্রিন্সিপালের এই কথায় জ্বলে উঠে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "যারা আমেরিকায় Red Indian-দের উচ্ছন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ানদের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু শিকারের মতো বিনা-দোষে বিনা-কারণে গুলি করে মারত, যারা আমাদের দেশি লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকদের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে Sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে?" কবির জীবনদীপ যখন নির্বাপিতপ্রায় তখনই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা মিস্ এলিয়ানর র‍্যাথ্‌বোন-এর পত্রোত্তরে কিছুতেই ভারতে ইংরেজ শাসনের গুণ গাইতে রাজি হন নি, বলেছিলেন ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব তো আছেই, আরো বেশি অভাব হল পিপাসার জলের, আর তিনি ভুলতে পারবেন না কখনো যে আমাদের দেশের মেয়েদের কাদা ঘেঁটে একটু তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে হয়ে থাকে। হয়তো শুনব যে এসব কথা বলে কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন কিভাবে সাড়া দিত জানতে হলেও এগুলো স্মরণ করার দরকার আছে। আর একথা হয়তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" যে-দেশের মুখে-মুখে প্রচলিত প্রবাদের মতো জীবনসত্যকে ধারণ করেছে, যে-দেশে আদিম জাতির স্বাতন্ত্র্য এবং দূরত্ব স্বীকার করার মধ্যে যে অনাত্মীয় ভাব আছে তা সত্ত্বেও কখনো সেই আদিম জাতিকে একেবারে বিলোপ করার চেষ্টা দেখা যায় নি, যে-দেশের সাধুসন্তের মধ্যে দেখা গেছে এমন মনের মুক্তি যার তুলনা জগতে দুর্লভ, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" একথা যে-দেশে সহজ ও স্বাভাবিক সুরে উচ্চারিত হয়েছে, সে-দেশকে মানবতাবোধ "পশ্চিমী দৃষ্টির" কল্যাণে ধার করে আনতে হয়েছে বলা চলে না। ১৩৩৪ সালে 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "আমাদের দেশেও দিগ্‌বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সেকালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাদের নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান্ দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি।" ইয়োরোপের ইতিহাস স্বল্প পরিমাণে তো জানতে হয়েছে, কিন্তু কেমন করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মানতে পারি অধ্যাপক সরকারের কথা : "আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যে ভারতবর্ষ বিরাজ করছে তার বাহ্যিক আকার যে রূপই নিক্ না কেন, অন্তর্বস্তুটিকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই?"

গণ্ডগোল হয়েছে সব চেয়ে বেশি যখন অধ্যাপক সরকার একেবারে দ্বিধাহীন ভাষায় বলেন যে আমাদের কাম্য সমাজবাদের সঙ্গতি পাওয়া যায় "প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃষ্টিরই মধ্যে, যে পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পরিণতি।" এই বিষয় নিয়ে মস্ত বড়ো একটা কেতাব লিখলেও সব কথা বলা যায় না; তাই সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের একটা ধারণা ছিল যে সমাজবাদ দুনিয়ার সব দেশেই খাপ খেয়ে যাওয়ার মতো বস্তু, আর স্থানকালপাত্র ভেদে তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর

পরিবর্তন মূলগতভাবে নির্ভরশীল বলে। তবে একথা শুনি নি যে "পশ্চিমী দৃষ্টি" আর "পশ্চিমী সংস্কৃতি" এই দুই জিনিসকে আয়ত্ত না করতে পারলে সমাজবাদের ধারে কাছে পৌঁছনো যায় না। পশ্চিম-ইয়োরোপ কিংবা উত্তর-আমেরিকায় বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রকৃষ্ট বিকাশ সত্ত্বেও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল যে সমাজবাদ পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হল তুলনায় পশ্চাৎপদ রুশ দেশে এবং ইয়োরোপ ও এশিয়ার এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে, যেখানে পশ্চিমের তুলনায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে ছিল। জার্মানির বার্লিন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে সমাজবাদ আজ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এশিয়া আর আফ্রিকার "অনগ্রসর" দেশগুলি ক্ষিপ্রবেগে সমাজবাদ স্থাপনের প্রয়াসে আজ উন্মুখ। "পশ্চিমী দৃষ্টি"-বিনা এই বিরাট প্রযত্ন যদি বিফল হওয়া অনিবার্য তো বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কথা!

সমাজবাদের উদ্ভব, বিবর্তন ও প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সমাজ-পরিস্থিতির বিপুল অবদান অস্বীকার করার মতো দুর্বুদ্ধি আশা করি কারো হবে না। কিন্তু যান্ত্রিক আলোচনার দোষই হল এই যে চিন্তা এবং সিদ্ধান্তকে বসানো হয় স্বকপোলকল্পিত এক কৃত্রিম পরিবেশে, যেখানে জীবনের জটিল পরস্পরসম্পর্কের অস্তিত্ব নস্যাৎ হয়ে গেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লযোদ্ধার মতো দুই চিন্তাধারার মধ্যে সংঘর্ষ চলছে! অধ্যাপক সরকার যদি দয়া করে আমাদের মতো ভাগ্যহত দেশে সমাজবাদের অভ্যুদয় এবং আমাদেরই পরিবেশে তার প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর তথ্যানুগ বিচারবুদ্ধি পরিচালনার চেষ্টা করেন তো বাধিত থাকব।

"পশ্চিমী দৃষ্টি" এবং "পশ্চিমী সংস্কৃতি"-কে ন্যূন করে দেখার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমার নেই; পূর্বেই বলেছি ইয়োরোপ সম্বন্ধে আমার বাস্তবিকই যে-মনোভাব তাকে মমতা বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু একথা আমার মনে হয় যে গ্রীক সভ্যতার যুগ থেকে পশ্চিমী সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ জাতকে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখার একটা প্রবণতা যেন আছে, পূর্বদেশাগত খ্রীস্টধর্মও তাকে পুরোপুরি বদলাতে পারে নি। অন্ধকার আফ্রিকায় ইসলাম যে-ভাবে প্রবেশ করেছে, তা থেকে খ্রীস্টধর্মের প্রবেশে বড়ো দরের একটা প্রভেদ আছে। "The lesser breed without the law" বলে কিপ্‌লিং যাদের উল্লেখ করেছেন, তারা চিরকালই "lesser breed" থেকে যাবে, এ রকম ধারণা "পশ্চিমী দৃষ্টিতে" প্রায় চিরস্থায়ী হয়েছে। আমাদের মতো যারা "অন্ধকারাচ্ছন্ন" বলে পশ্চিমীদের সদয় দৃষ্টি পেয়েছে, তাদের সেবায় পশ্চিমী সদাশয়েরা অগ্রসর হয়েছেন, শ্বেতাঙ্গ মিশনারীরা যে-কাজ করেছেন ও করছেন তা নমস্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের উপকারকদের মনে তাঁদের অনপনেয় ও শাশ্বত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধেও কোনো প্রশ্ন ওঠে নি। আমাদের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে "পশ্চিমী" পণ্ডিতেরা যে বিপুল জ্ঞানানুসন্ধিৎসা দেখিয়েছেন, তা পরম শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে তাঁরা সকলেই আমাদের বর্তমান সম্বন্ধে স্থির করে রেখেছেন যে আমরা নাবালক, মনুষ্যত্বের বিচারে চিরপঙ্গু, কিঞ্চিৎ করুণার পাত্র বটে কিন্তু তাঁদের সমকক্ষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই আমরা রাখি না। সমাজবাদের অভ্যুদয় ও কর্মকাণ্ড "পশ্চিমী" এই দৃষ্টিকে আজ একেবারে বদলে দিয়েছে, আর তার কারণ হল এই যে শুধু পশ্চিম নয়, জগতের সর্বদেশের চিন্তা ও কর্মধারায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু বরণীয়, যা কিছু মানুষের সংসারকে মহিমময় করতে পারে, তাই হল সমাজবাদের প্রেরণা। ঠিক এই জন্য রবীন্দ্রনাথের চোখে সমাজবাদী রাশিয়া এত ভালো লেগেছিল, তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন : "নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ

তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলাম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখি নি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব।... সর্বমানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তুলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ। এ প্রার্থনা মনে জাগে যে তাদের এই সাধনা সফল হোক।"

১৩২৮ সালে লেখা 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বললেন : সামনে এই প্রশ্নটা দেখা যায়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছো?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছিনে, ইংরাজিতে বললে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত।" [অনেকটা এই ধরনের কথা ১৯৩০ সালেও কবি বলেছিলেন।] তাই তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল : "পূর্ব পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে।" "এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব, আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।" তাই তাঁর প্রার্থনা ছিল এই যে "ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূ-ভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।" এই সাধনসম্পদ মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দেখেছিলেন বলে 'সত্যের আহ্বান' (১৩২৮) প্রবন্ধে তিনি লেখেন : "কন্‌গ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের সুপ্ত চিত্ত জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্যাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যাঁর হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।"

১৩৩২ সালের একটি লেখায় বড়ো দুঃখেই কবি বলেন : "আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'!" 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' (১৩৩৬) আলোচনা উপলক্ষে তিনি লেখেন : "সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্মসংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল। বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষভাবে দীক্ষিত করেছে।" আরো বলেন : "রাজসাহী সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন। ... পরবৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি।" অধ্যাপক সরকারের প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কথা

নেই, কিন্তু তাঁরই প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করে সেপ্টেম্বর মাসের 'Seminar' পত্রিকায় শ্রীমান মোহিত সেন বিদ্যাসাগর চরিত্রের উল্লেখ করে পশ্চিমী ভাবাদর্শকে জীবনে আয়ত্ত করার গৌরবময় উদাহরণ দেখিয়েছেন। অবশ্যই বিদ্যাসাগরের মহানুভবতায় পশ্চিমের বহু সদ্‌গুণ একান্ত সৌষ্ঠবের সঙ্গেই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, কিন্তু "পশ্চিমী দৃষ্টি", "পশ্চিমী সংস্কৃতির জয়যাত্রা' যদি তাঁর জীবনে "অব্যাহত" হত তো তাঁর যে মূর্তি আমরা দেখতাম তা নিশ্চয়ই হত একেবারে ভিন্ন। অগ্রজ রামমোহন এবং অনুজ রবীন্দ্রনাথের মতোই বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য এই ভারতবর্ষের ভূমি থেকে তেজ ও জ্যোতিকে আত্মস্থ করতে পেরেছিল; আর ঠিক সেইজন্য তাঁদের আসন "দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর মহলে।"

১৩০৯ সালে লেখা 'নববর্ষ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে হয়তো সামান্য আতিশয়োক্তি আছে, কিন্তু শুধু ধ্বনিমাধুর্যে নয়, চিন্তাগৌরবেও তা আজ আমাদের শিরোধার্য :

"... বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, একথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, চরিত্র ভগ্ন বিকীর্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে।... দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, এই মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিতশক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্ম রক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিবে; ইংরাজি কোর্তা, ইংরাজের দোকানের আসবাব, ইংরাজি মাস্টারের বাক্‌ভঙ্গিমার অবিকল নকল, কোথাও থাকিবে না, কোনো কাজেই লাগিবে না।... আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর আস্ফালন করতালি মিথ্যাবাক্য যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্‌বেলিত, পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্‌গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে; তখন দেখিব এই অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জুটাজুট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে।..."

"জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে।..."

এরই সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ 'সভ্যতার সংকট' আখ্যায় যে অতুলন ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন। "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণীকে সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।" একে বাক্‌বিলাস মনে করার মতো ক্ষুদ্রতা আশা করি কারো নেই, আর ক্ষুব্ধ মনের জ্বালা এখানে সত্যকে বিকৃত করেছে বলে যদি কেউ স্থির করে বসেন তো সেটা ভ্রান্তি বলেই মনে করি। নিজের দেশ ও তার

ঐতিহ্য সম্বন্ধে অপরিমেয় আস্থা ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমকে নন্দিত করতে পেরেছিলেন, বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের সমাবেশ প্রয়াসী হয়েছিলেন, বিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন শান্তিনিকেতনের নীড়ে। ১৯৩০ সালে ভারতবর্ষে যখন বিপুল জন-অভ্যুত্থান তখন বিদেশ থেকে তিনি লিখেছিলেন : "আমার চিত্ত আমার দেশের সত্তার সঙ্গে প্রবল বেদনায় সম্মিলিত হয়েছে।" দেশের সত্তার সঙ্গে এই যে সম্মিলন শক্তি তারই অভাবে আমাদের বহু কর্ম আজো নির্জীব ও নিষ্ফল হয়ে থাকে, কারণ "তাহার পশ্চাতে সুচিরকালের ইতিহাস নাই, তাহা অসংলগ্ন, অসংগত, তাহার শিকড় ছিন্ন।" পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই স্মরণ করি যে ছিন্নমূলবৃত্তির প্রতিরোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর ভাস্বর জীবন ও কর্মযোগ দিয়ে।

কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লেখবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহস্রশীর্ষ প্রতিভার কোনো বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা নিয়ে আলোচনায় নামতে সংকোচ আসছে—শক্তির অভাব তো রয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে বলবার মতো কথা গুছিয়ে লেখা তো সম্ভব হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথকে একটু-আধটু কাছে দেখা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা সাজাবার চেষ্টা করছি।

আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি, তখন রবীন্দ্রপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যারা পাণ্ডা, তাদের মধ্যে একজন না হলেও পরিষদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশ ছিল। সেই সুবাদে ছোটোখাটো দল বেঁধে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কয়েকবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। একবার যখন জন চার-পাঁচ মাত্র ছিলাম, তখন কবি কিছুক্ষণ গল্প করার পর কয়েকটা গান শুনিয়েছিলেন—সেই গানের মধ্যে ছিল তখনকার সদ্যরচিত "একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।" পরে অনেকবার এ-গান শুনেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গলায় যা শুনেছিলাম, তা আজো ভুলতে পারি নি। অবশ্য পূর্বের তুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বরে তখন মাধুর্য ও তেজের সমাবেশ কিঞ্চিৎ লঘু হয়ে পড়েছিল। যুবা রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা তো সে অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমরা যা শুনেছিলাম, যা পেয়েছিলাম, তারও তুলনা নেই।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে লিখতে বসি নি; তবে গানের কথা এসে গেল সেই সব দিনের কথা ভেবে, যখন একেবারে কাছে থেকে দেখেছিলাম মহাপুরুষের সহজ, সরল মহানুভবতা। যাঁর সান্নিধ্যে বাক্‌স্ফুট হবে না বলেই আমরা শঙ্কিত ছিলাম, সেখানে একান্ত সদাশয় একটি মানুষকে আমরা দেখলাম।

এই সদাশয়তারই সংবাদ পেয়েছিলাম এর কিছুকাল পূর্বে, আর তার উল্লেখ না করে পারছি না। আমার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন 'অটোগ্রাফ'-শিকারী। একখানি বাঁধানো খাতা সংগ্রহ করে তিনি স্থির করেছিলেন প্রথম পত্রেই নেবেন রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর। রবীন্দ্রশিষ্য বলে খ্যাত তাঁর এক অধ্যাপক (প্রেসিডেন্সি কলেজের নয়) বারবার চেষ্টা করেছিলেন ছাত্রটিকে

বিরত করতে, বুঝিয়েছিলেন যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সে কিছুতেই পাত্তা পাবে না। আমার বন্ধু কিন্তু ছাড়বার পাত্র ছিলেন না, তিনি ঠাকুরবাড়ি গেলেন, কবি খাতাটি রেখে দিয়ে বিকেলে আবার আসতে বললেন, এবং যথাসময়ে শুধু যে স্বহস্তে পুরো একপাতা একটি গান লিখে খাতাটি ফেরত দিলেন তা নয়, একেবারে অপরিচিত বালককে সঙ্গে সঙ্গে জলযোগ পর্যন্ত করিয়ে দিলেন। যাঁর নামে অহংকারি অভিজাত বলে অপবাদ তখন অনেকে রটাত, তাঁর হাতে এই ব্যবহার বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল।

একেবারে খুব আবছা মনে আছে—আমাদের বাড়ির কাছেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে,—ভিড়ে দাঁড়িয়েছি যাঁরা আসছেন তাঁদের দেখার জন্যে। হঠাৎ শোনা গেল—"রবি ঠাকুর! রবি ঠাকুর!" আর লম্বা জোব্বা আর উঁচু টুপি-পরা এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি যেন মণ্ডপে ঢুকলেন দেখলাম। বহু পরে দেখেছি সেই কংগ্রেসে ভাষণ-রত কবির প্রতিকৃতি, গগনেন্দ্রনাথের আঁকা। কিন্তু কবিকে প্রথম দেখা সেই ভাবে। অথচ পিতৃবন্ধুদের আলাপ-আলোচনায় শুনতাম দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি নাম আর এমনও কথা যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা দেখেছেন একেবারে সাদাসিধে পোশাকে গল্পগুজব করতে। ঠিক যেন বিশ্বাস হত না, কিন্তু বাস্তবিকই যখন তাঁকে দেখলাম তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের সারল্য ও দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আর রইল না।

আমার এক গুরুস্থানীয় বন্ধুর কাছে একবার বিদেশে যা শুনেছিলাম, তা না বলে পারছি না। সালটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু চীন থেকে ফেরার পর কবিগৃহে একটা মজলিস বসে। আমার বন্ধু তখন সদ্য বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছেন, বিদগ্ধমহলে তাই একটু জায়গা পেতে মুশকিল হয় নি। আর এক সহকর্মীর সঙ্গে তিনিও জোড়াসাঁকোয় হাজির হয়েছিলেন। তাঁরই কাছে শোনা যে গুরুবন্দনায় ব্যস্ত শিষ্যেরা হয় কথা বলছিলেন না, নয় কবির মুখে শুধু শুনতে চাইছিলেন কেমন করে কেবল গানের পর গান তখন তাঁর মনে এসে জড়ো হচ্ছিল। সেই শিষ্যদের সচকিত করে আমার বন্ধু যখন প্রায় মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা, আপনি তো ঘুরে এলেন, চীনেরা নাকি ইঁদুর আর আরসোলা খায়, আপনি কিছু দেখলেন?" তখন শিষ্যবৃন্দ ক্রোধে হতবাক্ হলেও তিনি হেসে উঠে চীনাদের খাদ্য সম্বন্ধে অতি প্রসন্ন ভঙ্গিতে কথা বলেছিলেন; আধ্যাত্মিক আলোচনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন।

আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এ-বিষয়ে অনেক কিছু বলতে পারবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি তখন তাঁকে আগলে রাখার লোকের অকারণ ভিড় একটু বেশিই ছিল। তিনি যখন 'হিবর্ট লেক্‌চার্স" দিতে অক্সফোর্ডে গেছেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। দেখেছি, বাইবেলের যুগের ঋষির আকৃতি নিয়ে সবাইকে তিনি অভিভূত করছেন, তবু ভিতরকার মানুষটিকে তিনি চেপে রাখতে পারছেন না, চাইছেন না—কিন্তু ভক্তের দল তাঁকে ঘিরে গণ্ডী নির্মাণ করল, তিনি হাঁপিয়ে পড়লেন, নিজের মধ্যে আশ্রয় না নিয়ে পারলেন না। ভক্তবৃন্দ যখন অনুপস্থিত, তখন তাঁর অন্য মূর্তি—সেই সহজ, সরস মূর্তি দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য তো কম নয়!

১৯৩০ সালে, সোভিয়েট যাত্রার প্রাক্কালে, কবি যখন অক্সফোর্ডে ছিলেন, তখন ভারতীয় ছাত্রদের 'মজলিস' তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। মহাত্মা গান্ধী তখন এদেশে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছেন, 'ডাণ্ডি'-অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চণ্ডনীতিও চলেছে। মজলিসের তখনকার সভাপতি, উত্তর প্রদেশের একজন মুসলমান ছাত্র, কবিকে

সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—"তোমাকে পেয়ে আমরা কত সুখী, কিন্তু তুমি আজ এখানে কেন? কেন আজ গান্ধীজীর পাশে তোমাকে দেখছি না? আমাদের মন যে বড়ো বেশি ভারাক্রান্ত। আমাদের প্রশ্নের ধৃষ্টতা মার্জনা করো।" তারুণ্যের এই অসৌজন্যকে কবি কিন্তু ভুল বুঝলেন না। ধীর স্থির ভাষায় উত্তর দিলেন—'আমার অস্ত্র হল ভিন্ন, কিন্তু দেখো, দেশের মুক্তির কাজে আমার বীণার শক্তি কম নয়।" আর আমাদের কাছ থেকে একখণ্ড 'চয়নিকা' চেয়ে নিয়ে পড়লেন "দুঃসময়" কবিতাটি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,

মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

প্রতিভার সেই উদাত্ত বিক্ষোভ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়; আবৃত্তি যে কত অর্থঘন হতে পারে, তা যেন পূর্বে জানা ছিল না। কবির সেই দৃপ্ত দেশাভিমানী মূর্তি যারা দেখেছে, তারা কখনো ভুলবে না।

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাধনার এমন এক স্তরে বিচরণের অধিকার পেয়েছিলেন, তাতে কস্তুরী মৃগের মতো নিজেরই সৌরভে মুগ্ধ হয়ে থাকলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলত না। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দুনিয়ার খবর তিনি রাখতেন, আর খ্যাত-অখ্যাত বাঙালি লেখকদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখতেন, তাদের উৎসাহ দিতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। ১৯৩৭ সালে স্বর্গীয় অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সহযোগিতায় "প্রগতি" অভিহিত সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদনা করার সময় তাঁর মনের এই অপরিমেয় ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

১৯৩৬ সালে প্রগতি লেখকসংঘের পক্ষ থেকে এক ইস্তাহার লিখে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের স্বাক্ষর সংগ্রহের প্রস্তাব হয়েছিল। ফ্যাশিস্ট বর্বরতাকে ধিক্কৃত করাই ছিল ইস্তাহারে মূল কথা। মুসাবিদা নিয়ে আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র বলে পরিচিত অন্তত একজন খুব জোর করে বললেন, "সুরটা নরম করে দাও একটু, নইলে কবি অপ্রসন্ন হবেন।" একান্ত অনিচ্ছায় কয়েকটা অদলবদল করা হল, কিন্তু কবির কাছে যাওয়ার পর তিনি যেভাবে কথা বললেন তাতে বেশ বোঝা গেল পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের ধারণা একেবারে ভুল। যাঁরা মহৎ ব্যক্তি, তাঁদের ওপর ইতরজনের চাপ অতিরিক্ত যাতে না পড়ে, সেজন্য কিছু দেহরক্ষী-জাতীয় লোকের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা আগলে রাখার চেষ্টা করতেন, তাঁরা হয়তো দেশের কিছু অপকারই করেছেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে তা সত্ত্বেও আমরা রবীন্দ্রনাথের চরাচরব্যাপ্ত মূর্তি দেখেছি, তাঁর অখণ্ডমণ্ডলাকার প্রতিভার সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছি। আমরা ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

সার্বভৌম কবি

'Tis sufficient to say, according to the proverb; that here is God's plenty.—Dryden on Chaucer.

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখতে গেলে সর্ববিধ অতিকথন হতে নিবৃত্ত থাকার সংকল্প গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু বাংলা যাদের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাদের ঋণের বোঝা এত বেশি যে একেবারে মেপে কথা বলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতিকথন হয়তো কিছু ঘটবে; তাকে যথাসাধ্য বর্জনের প্রয়াস ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিশ্রুতি বানচাল হয়ে পড়ারই সম্ভাবনা।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল, সেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে মানপত্র অর্পণ করতে গিয়ে "সার্বভৌম কবি" বলে সম্বোধন করেছিলেন। যদি কোনো বিশেষণে কবি রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত দেখতে ইচ্ছা করে তো বোধ হয় সব চেয়ে শোভন এই "সার্বভৌম" শব্দটি। সর্ব ভূমিতে তাঁর বিচরণ, সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপ্তি, সর্ব দেশে তাঁর অধিষ্ঠান, সর্ব মানবীয় আস্বাদে ও আকুলতায় তাঁর শিল্পীসত্তার পুষ্টি, সর্বজনের অন্তরে তাঁর অধিকার। প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্বে এক ভাষণে (পৌষ ১৩৩৮) তিনি যা বলেছিলেন, তা অনলস রূপস্রষ্টার অমিত শ্লাঘা বিনা কারো মুখ থেকে নিঃসৃত হতে পারে না :

"আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে। যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

বহুধা কীর্তির যে ভাতি রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষব্যাপী সাধনায় বিকীর্ণ হয়েছে, তাকে ধরে রাখার মতো ব্যাপ্তি বাঙালি মানের আকাশে এখনো নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও চরিত্রে এমন এক কুহক ছিল, লোকোত্তর শিল্পকর্ম আর মানবিক মহানুভবতার এমন আশ্চর্য সংমিশ্রণ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল যে বাঙালি তাঁকে শুধু শুষ্ক শ্রদ্ধা দিয়ে তুষ্ট হতে পারে নি। ধর্মগুরু বা জননেতা না হয়ে যদি কেউ বাঙালির হৃদয়ের পূজা পেয়ে থাকেন তো তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ।

বাঙালি মনে রবীন্দ্রনাথ যে স্থান নিয়ে আছেন, তাঁর কিছু পরিচয় মেলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথায়। তিনি বুঝি একবার বলেছিলেন যে ভারতবর্ষীয় লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন ব্যাস এবং তাঁর অব্যবহিত পরেই উল্লেখ করতে হয় রবীন্দ্রনাথের নাম। কবিকৃতি নিরূপণে এরূপ তুলনাব্যঞ্জক মন্তব্য সর্বদা সহায়ক না হলেও এর যে এক

বিশেষ মূল্য ও ইতিহাসগত গুরুত্ব আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহাভারতকার বলে কীর্তিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ব্যতীত অপর সকল মহাত্মার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখের চেয়ে সম্মান দেখানো কোনো ভারতবর্ষীয়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। এডোয়ার্ড টম্সন্ বলেছিলেন যে কালিদাসের পর যে হাজার দেড়েক বৎসর কেটেছে তখনকার সব চেয়ে বড়ো ভারতবর্ষীয় কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের মন্তব্যের তাৎপর্য এর চেয়েও অনেক বেশি।

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ॥
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

এই শ্লোকেরই লোকায়ত অনুবাদ হল—'যা নেই ভারতে' তা নেই ভারতে। মহাভারতে যা নেই ভারতবর্ষেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই হিমবান্ গিরি আর ভারত মহাসাগরের মতো মহাভারত হল ভারতবর্ষের তৃতীয় রত্ননিধি। যে সম্ভার আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছি, তাকে মহাভারত ভিন্ন অপর সকল রচনা দ্বারা অনতিক্রান্ত বলার চেয়ে বিপুল প্রশস্তি আমাদের পক্ষে কল্পনীয় নয়।

এতে বিস্মিত হওয়ার যে কিছু নেই তা আমাদেরই কবিকুলের কাছ থেকে জেনেছি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সরল আবেগে বলেছিলেন ১৯১৩ সালে :

যে ভাবই ওঠে প্রাণের মাঝে,
তোমার গানে সকলই আছে—

বাস্তবিকই অনুভূতির সর্ববিধ অন্বয় তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিতে এমন সৌষ্ঠব ও শক্তিতে সমুজ্জ্বল যে বাঙালি মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই ১৯৫৭ সালে "রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল" প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু দে বলেন :

এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন্ ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে।
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কি গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য-উদ্যের
মধ্যাহ্নে ঊষার স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ।

তাই রবীন্দ্র-চিন্তায় নিবিষ্ট হতে গেলে মনে হয় যেন প্রকৃতই সৌরাকাশে ভাসছি। "হে সূর্য, হে মোর বন্ধু" বলে সম্বোধন করার আর্য অধিকার যে রবীন্দ্রনাথের ছিল, তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

সমগ্রভাবে এবং সংক্ষেপে রবীন্দ্রকাব্যের বিচার শুধু যে দুরূহ তা নয়, বোধ হয় অতি কৃতী লেখকের পক্ষেও অসাধ্য। এ-কথা মনে রেখেই কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা এখানে করা যাবে।

১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে

ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।" বাংলা ভাষায় এই "কলাবতী রাগিণী আলাপ" প্রথম করলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর অগ্রজ কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২০) তাই উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন যে যেখানে "বাজিত গো ঢোল আর কাঁশি" সেখানে "কাব্যের বংশীধর" এসে কবিতা-কালিন্দীকে লীলারঙ্গে উজান বইয়ে দিলেন। মধুর নবছন্দে যখন রবীন্দ্রনাথের "আলোকবীণা" বেজে উঠল, তখন যেন বাংলার আকাশে অকস্মাৎ এমন এক জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল যা দূরাবস্থিত হয়েও আনন্দের অজানা তুফান প্রবাহিত করে দিল। বাংলা কবিতার অপরিসর ঐতিহ্য সেই অসামান্য প্রতিভার মায়াস্পর্শে বুঝি দিক্-দিগন্তে সম্প্রসারিত হয়ে গেল। বাংলার প্রাণকে শুধু পূর্ণ করে নয়, তাকে আপ্লুত করে যে গান বাজতে থাকবে, তার সুর দীর্ঘজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ রচনা ও সাধনা করলেন।

ব্যাপ্তি আর বিস্তারের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রতিভা বিস্ময়কর; যদি বলা যায় অতুলনীয় আর ভাবতে হয় লিয়োনার্দো আর গ্যেটের মতো মহারথীদের কথা তো অন্যায় হবে না। টম্‌সন্ হিসাব করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ কবিতার পংক্তি লিখেছেন দেড় লক্ষেরও বেশি। (মিল্‌টনের কাব্য আঠারো হাজার পংক্তিরও কম)। আর গদ্য রচনার পরিমাণ তার দ্বিগুণেরও বেশি—অপ্রকাশিত লেখা তো এ-হিসাবে একেবারেই ধরা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই আশ্চর্য কর্মযোগীর অবদান স্মরণ করলে বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের গঠনের ইস্পাত আর কংক্রীট-এর ভাগ ছিল কত বেশি, বোঝা যাবে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা ও সাধনা বিনা কখনো শুধু সহজাত প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটে না। বাংলা সাহিত্যের প্রাদেশিকতাদুষ্ট পরিবেশে যিনি সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের সন্ধান এনে হৃদয়বৃত্তির বহু রুদ্ধ দ্বার খুলে দিলেন, তিনি যে পেলব বলতে যা মনে হয় তা ছিলেন না, বজ্রমাণিক দিয়ে মালা গাঁথার মতো চিত্ত আর বাহু যে তাঁর ছিল, প্রাণের হর্ষকে যে দীপক তানে ধ্বনিত করার মতো দীপ্তি ছিল, তা বোঝা সহজ হবে যখন কবির আজীবন ক্লান্তিহীন অন্বেষার কথা আমরা স্মরণে রাখি।

দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর লিখে গেলে কোনো কোনো রচনায় কিছু দোষ আর দুর্বলতা ঢুকে পড়া স্বাভাবিক; রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে স্বীকার করতে সংকোচ থাকা উচিত নয়। বীণার তার সামান্য একটু আলগা হলেই ধ্বনি-মাধুর্যে হানি ঘটে। কিন্তু বলতেই হবে যে মাঝে মাঝে সেদিকে রবীন্দ্রনাথেরও বিচ্যুতি দেখা গেছে, সুর ঠিক বাজে নি। ধূপ না পোড়ালে যে গন্ধ ঢালে না আর দীপ না জ্বালালে যে আলো দেয় না, এ-কথা তিনিই আমাদের বলেছেন, কিন্তু হয়তো মাঝে মাঝে তিনি লক্ষ করেন নি যে ধূপ ঠিক পুড়ছে না আর প্রদীপের শলতে ভালো করে জ্বলছে না। বিশেষ করে তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদে এই দোষ কটু হয়ে উঠেছে বলে বিদেশি ছিদ্রান্বেষীরা নিন্দার ভাষা সহজে খুঁজে পেয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এমনও দেখা যায় যে অনুবাদে কবিতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি (হয়তো বা "Thou art the sky and thou art the nest as well"-এর মতো লাইনে তার রূপ আরো উজ্জ্বল হয়েছে), কিন্তু প্রায়ই যেন বাংলা কাব্যলক্ষ্মী ইংরেজি পরিচ্ছদে অস্বস্তি বোধ করেছে, আর কিছুতেই তার অবগুণ্ঠন খুলতে রাজি হয় নি। বাছাইয়ের দোষে বিষয়ের একঘেয়েমিও অনুবাদে একটু বেশি ধরা পড়েছে যে-ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র,

তাই ইংরেজি "গীতাঞ্জলি"-তে ক্রমাগত প্রকাশ পেয়েছে, বিদেশি মনকে একদা তার অপরিচিত সৌন্দর্য মুগ্ধ করলেও সেই মোহভঙ্গ হতেও বিলম্ব ঘটে নি। আবার এমনও দেখা গেছে যে বাংল'র কাব্যভাণ্ডার ইংরেজির তুলনায় শীর্ণ বলে সুর আর ছন্দ মিলে আমাদের কাছে যা মনোরম ঠেকে যাকে, তারই রস ইংরেজিতে লেগেছে যেন নিরেস। অনুবাদের কথা বাদ দিলেও বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ যে-স্তরের কবি তা মনে রাখলে তাঁর রচনাবলীর কিয়দংশকে বাতিল না করলেও খানিকটা আড়ালে সরিয়ে রাখতে হবে। তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিবৃত্তে অবশ্যই তাঁর লেখা প্রতি অক্ষরটি আমাদের কাছে মূল্যবান। কিন্তু তাঁর অজস্র ও অপর্যাপ্ত সৃষ্টিধারায় ত্রুটি আর অপূর্ণতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে প্রত্যবায় ঘটে না।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আমাদের দেশে নিন্দুকের অভাব সাধারণত হয় না, এবং রবীন্দ্রনাথ তাদের কটুবাক্যে একদা বড়ো কম ক্লিষ্ট হন নি। আমাদের সৌভাগ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্তর্দৃষ্টিবলে তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে অভিবাদন করেছিলেন, আর প্রিয়নাথ সেনের মতো "সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক" রসবিচারের রশ্মি দেখিয়ে কবিকে পুলকিত করতে পেরেছিলেন। কবি "জীবনস্মৃতি"- তে (পৃ: ১৪৫) লিখেছেন : "ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা সংগীতে তাঁর মন জিতিয়া লইলাম।... তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।"

নিজের লেখা সম্বন্ধে মমতা স্বাভাবিক, কিন্তু "সঞ্চয়িতা"-র জন্য কবিতা সংকলন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটুও ইতস্তত না করে বলেছেন যে অতি অল্প কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়া "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী", "সন্ধ্যাসংগীত", "প্রভাত সংগীত" আর "ছবি ও গান" গ্রন্থগুলিকে তিনি স্বীকার করতে পারেন না, কারণ তাদের "কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলি কবিতায় রূপ পায় নি।" "কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।" ভুললে চলবে না যে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"-তে আছে "মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান"; "কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়"-এর মতো মনোহর রচনা, আর ঐ পদাবলী ছিল বৈষ্ণব কাব্যরীতির এমন নিপুণ প্রতিধ্বনি যে তা আপাতচতুর এক বঙ্গসন্তানকে ইয়োরোপের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে "ডক্টর" খেতাব পাওয়ার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল। আবার "প্রভাত সংগীতে"-এ আছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আর প্রভাত-উৎসবের মতো কবিতা যার মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রকাব্যপ্রভার পুণ্য সূচনা। "ছবি ও গান"-এরই অন্তর্ভুক্ত হল 'রাহুর প্রেম'—হৃদয়ের তীব্র দহন যাতে রূপ পেয়েছে, কবির হাতের কাছে সহজে জড়ো-করা ফুলের গন্ধ আর বাঁশীর আওয়াজকে একেবারে ছাপিয়ে উঠেছে। যখন এমন লেখা তাঁর কলম থেকে বার হচ্ছিল তখনকার কাজ সম্পর্কেই কবি নিজে কত কঠোর, তা মনে রাখা আমাদেরও দরকার।

"জীবনস্মৃতি" প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। যখন "সন্ধ্যাসংগীত" প্রকাশ হয় (১২৮৮) তখনকার সম্বন্ধে কবি লেখেন (পৃ: ১৪২); "এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সম্বন্ধে এই একটা রব উঠিতেছিল যে আমি ভাঙা-ভাঙা ছন্দ ও আধো-আধো ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-ধোঁয়া, ছায়া-ছায়া। কথাটা তখন আমার পক্ষে যতই অপ্রিয় হউক

না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিতাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্ব কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়?"

দুঃশীল নিন্দুকেরা "পায়রা কবি", 'রবিয়ানা" ইত্যাদি কথা ব্যবহার করে তাঁকে উপহাস করলে সেই কটূক্তিতে কিঞ্চিৎ পীড়িত হলেও তাকে গায়ে মাখার মতো ক্ষুদ্রতা রবীন্দ্রনাথের কখনো ছিল না, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করার দরকার। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কিভাবে কেমন করে লেখা হয়েছিল, তার যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা খুবই সুবিদিত। সদর স্ট্রীটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফ্রী-স্কুলের বাগানের দিকে চেয়ে তাঁর "চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।" তিনি দেখেছিলেন "একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।" জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে তাঁর মন্তব্য আছে : "সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।" আরো উদ্ধৃতি দিতে লোভ হয় : "বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে। শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে। ইহাদের মধ্যে যে একটি অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।" (পৃ: ১৪৭-৪৮)

এই সময়কে কবি তাঁর হৃদয়-অরণ্য নিষ্ক্রমণের কাল বলেছেন, কিন্তু "কড়ি ও কোমল"-প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেন : "আমার কবিতা এখানে মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে," কিংবা "যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি কেবল প্রান্তে দাঁড়াইলাম।"—তখন তাঁর বহু কবিতা পাঠে যে ধারণা জন্মে, তারই যেন সমর্থন মেলে। মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁকে সর্বদা প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু তার একান্ত অন্তঃপুরে তাঁর প্রবেশে যেন কী এক বাধা প্রায় নিয়তই এসে দাঁড়াত। তাই "সবুজপত্র"-এ লেখা এক প্রবন্ধে (১৩২৪, পৃ: ২৩৭-৩৯) তিনি বলেন : "আমি সত্যি বুঝতে পারিনে সুখদুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল", আর উল্লেখ করেন দোটানার কথা, যাতে "কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।" এই উভয় সংকটের চাপে রবীন্দ্র কাব্য কথঞ্চিৎ লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে বললে অমর্যাদা করা হয় না, কবির বহু অনবদ্য সৃষ্টিকে অনাদর করা হয় না।

"মানসী" (রচনাকাল ১২৯৪-৯৭) প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির যেন বয়ঃসন্ধি কাটল আর শক্তির সতেজ পরিণতি যে দীপ্তি নিয়ে দেখা দিল তার তুলনা আমাদের সাহিত্যে নেই। কিন্তু তার পূর্বেই বাংলা কাব্যের রাজ্যে নতুন জিনিসের ভিড় তিনি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কর্তৃত্ব বিস্তারের যে ভাস্বর পরিচয় তিনি জীবনের প্রায় সর্বশেষ দিন পর্যন্ত দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন, তারই আভাস আছে অল্প বয়সের অপরিণত রচনায়, আছে তাঁর অনুবাদে, আছে বৈজ্ঞানিক বিষয় প্রবর্তনে, আছে শালীনতা ও সাহসের সংমিশ্রণে। "কড়ি ও কোমল" (১২৯৩) তাঁকে কবি-যশঃ প্রার্থিত্ব থেকে যশস্বিতায় উত্তীর্ণ করেছিল। তাঁর

কণ্ঠে দেশ শুনল—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

আর একটু চকিত অস্বস্তি নিয়ে তাঁকে চতুর্দশপদীর বাঁধন থেকে খসে-পড়া প্রেমের ছবি দেখল। এর মধ্যে ফাঁক আর ফাঁকি কিছু ছিল বলতেই হবে—হয়তো সে-ফাঁক কখনো একেবারে ভরাট হয় নি, কিন্তু "মানসী" হল যেন প্রকৃতই এক গুণগত উত্তরণ, চিত্রকল্প আর সৃষ্টি সেখানে রয়েছে 'মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি', 'বধূ' প্রভৃতির মতো কবিতায়, আর আছে প্রেমের বিবিধ ব্যঞ্জনা। তবে যে খটকার কথা বলা হয়েছে, শিল্পোৎকর্ষের স্পর্শেও তা মিলিয়ে যায় নি। কবি নিজে একবার বলেছিলেন : "আমি ভালোবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে," আর খেদ করেছিলেন সত্য আর কল্পনাকে এক করতে পারবেন কিনা ভেবে। "আত্মপরিচয়"-এ ১৩৪৭ সালের ১লা বৈশাখে তাঁর এক ভাষণে আছে : "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য নির্মাণে সহায় হলেও হয়তো তাঁর কবিসত্তাকে এই সহজলব্ধ বিশ্বাস কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করেছিল। ঐ একই বক্তৃতায় তিনি ঋগ্বেদের এক আশ্চর্য বচন উদ্ধৃত করেছিলেন—

অসুনী তে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি।

"প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, আবার দিয়ো ভোগ, উচ্চরন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিয়ো।"

কিন্তু অত বড়ো চক্ষুষ্মান্ হওয়া সত্ত্বেও কবিকে এদেশের নির্লিপ্তি সতত আকর্ষণ করেছে, বহির্দৃষ্টিকে হ্রস্ব করে দিয়েছে, অনুভূতির নিছক মানবীয় অন্তঃসারকে শীর্ণ করেছে। সৌভাগ্য আমাদের এই যে কবির মানসক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব চলেছে এমন ভাবে যে খর্বতা সর্বদা বিলীন হয়ে থেকেছে আর এক বিশিষ্ট মহিমারই সৃষ্টি হয়েছে, যার দেদীপ্যমান সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যের গৌরব।

"মানসী" যে পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে, তাকেই দেখা গেল "সোনার তরী"-র (রচনাকাল ১২৯৮-১৩০০) ছন্দের ছটায়, সুরের সিদ্ধিতে, ভাবের বৈভবে। মনের গহন থেকে যে মোহের স্পর্শ বিনা কাব্যশতদল উন্মীলিত হয় না, তারই নিভৃত নিলয়ের সীমাহীন অন্বেষণে কবিকে প্রবৃত্ত হতে দেখি—

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বর তল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি অশ্রুজলে,
হেথায় কি আছে আলয় তোমার

ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে?

রবীন্দ্রকাব্যের এই গূঢ়ার্থবাদিতা "ক্ষণিকা", "নৈবেদ্য", "খেয়া", "গীতাঞ্জলি" প্রভৃতি গ্রন্থে বহুরূপে দেখা দিয়েছে—তাঁর কাব্য ও জীবনে এর যে বিশিষ্ট তাৎপর্য ও মর্যাদা আছে, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যখন পৃথিবীর সঙ্গে কবির সংস্রব স্বল্পতর মনে হয় কিংবা কাব্যশিখরের কিয়দংশে বায়ু লঘুতর বলে অনুভূত হয়, তখনো বারংবার তিনি স্মরণ করেন ভূতলের কথা, বস্তু আর কালকে অস্বীকার যে করছেন না তার পরিচয় দিতে থাকেন। 'সোনার তরী' অভিহিত বহুখ্যাত কবিতাটিতে তত্ত্বের দিক অবশ্য একটা আছে, কিন্তু ছন্দের মধুরিমা আর "ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা"র চিত্ররসকেই পর্যাপ্ত বলে মনে হয়। আর সতত-সঞ্চরমাণ তাঁর কাব্যজীবনে অচঞ্চল উপাদানরূপে যে ছিল জগৎ বিষয়ে আসক্তি, আর বাংলাদেশের আলো হাওয়ার বিশিষ্ট মাধুর্য ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যেই যেন সন্নিবিষ্ট বিপুল অনাসক্তির সুর সম্বন্ধে আগ্রহ, তার শিল্পসিদ্ধ উদাহরণে "সোনার তরী" ভরপুর।

অনন্তপার হল রবীন্দ্র-কাব্যের মহিমা। ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে বিস্ময়কর পরিণতি ও বৈচিত্র্য দেখা গেছে কবির রচনায়, তা থেকে দীর্ঘ জীবনব্যাপী কী বিপুল, বিরাট পরিক্রমা—কবিতায়, কাব্যনাট্যে, গানে (যা সর্বদাই মনোরম আর বিশেষ করে শেষের চল্লিশ বৎসর স্বচ্ছ অথচ গভীর কবিতাও বটে)। "চিত্রা", "কল্পনা," "নৈবেদ্য", "খেয়া", "সংকল্প ও স্বদেশ", "ক্ষণিকা", "বলাকা", "পলাতকা", "পূরবী", জীবনের শেষ দশকের আট দশটি বই—এদের বিষয় ও রূপায়ণের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হতে হয়। তুলনার কথা উঠছে না, কিন্তু মনে পড়ে যায় শেক্‌স্‌পিয়র সম্বন্ধে কোল্‌রিজের কথা : 'সহস্রমনা', 'মহাসমুদ্রের মতো তাঁর চিত্ত'। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের সকল প্রত্যাশা অবশ্য তুষ্ট নয়, কিন্তু সকল প্রত্যাশা যে শুধু তাঁরই কাছে আমরা নিবেদন করে এসেছি এতেই স্বীকৃত হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য। যেখানে আমাদের অভাব পূরণ তিনি করছেন না, সে-কথা ভাবতে আর বলতে তাই কোনো বাধা নেই; তাকে ছিদ্রান্বেষিতা যারা বলে তারা ক্ষুদ্রচেতা বই কিছু নয়।

অল্পবয়সে বন্ধুমহলে বোধ হয় অনেকেই তর্ক করেছেন রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সব চেয়ে ভালো দুটোর নাম করা নিয়ে। এ-রকম বাছাই সত্যই সম্ভব নয়। কাব্যের বিবিধ সম্ভার এমনই গরিমায় চিহ্নিত যে কাকে ছেড়ে কাকে রাখা যায় এ-প্রশ্নের কোনো জবাব মেলে না। কিন্তু "চিত্রা" (রচনাকাল ১২৯৯-১৩০২) আর "কণিকা" আর "বলাকা"-র নাম হয়তো প্রথমেই মনে এসে ভিড় করেছে, আর মনে পড়েছে 'উর্বশী' কবিতাটির কথা—

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর 'পুলকে উল্লসি,
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী।
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—

উদ্ধৃতি দিতে গেলে তো তার অন্ত নেই, কিন্তু ভাবের গাম্ভীর্য, রূপের দাক্ষিণ্য আর ভঙ্গিতে গভীর ব্যঞ্জনা এবং সুঠাম সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে 'উর্বশী' হল নিরুপমা। আর "চিত্রা"-য় কি শুধু আছে 'উর্বশী', একই মলাটের মধ্যে রয়েছে 'এবার ফিরাও মোরে' আর 'স্বর্গ হইতে

বিদায়', রয়েছে সত্যকামকথা, 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি', তালিকা তো বেড়েই যাবে, সম্পূর্ণ করার স্থান নেই। ''সোনার তরী'' আর ''চিত্রা''-য় দেখা গেল জীবনদেবতা নামে এক মর্ত্যছাড়া সত্তার সন্ধানে কবির একক আকুলতা। এই নিয়ে অবশ্য অনেক আলোচনা চলেছে। ক্রমান্বয়ে এর আবির্ভাব হয়তো বা একটু কটু যদি লাগে তো আশা করি সেজন্য অপরাধবোধের প্রয়োজন নেই; কবির কাছে এত বেশি পাওয়া গেছে যে লীলাসঙ্গিনী বলে যদি নিরবয়ব কাউকে নিয়ে একটু ক্লান্তিকর ও পৌনঃপুনিক অভিসার চলে থাকে তো সেটা তাঁরই নিজস্ব ব্যাপার মনে করা উচিত এবং তাতে কারো আপত্তি পেশ করার কথা ওঠে না। কবি নিজেই ১৩১১ সনে আমাদের যা বলেছিলেন, তাই এখানে স্মরণ করা যাক্ :

''জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে, জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে; যাহা সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী।''

আশ্চর্য এই কবি, যাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা যেন একটা প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই দেখা দিয়ে চলেছিল। যখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ হতে পঁয়ত্রিশ তখনকার লেখা ''চৈতালি''-তে (১৩০২-০৩) লক্ষ করা যায় নূতন সৌন্দর্য—ভাবের নভোচারিতা, ভাষার উদ্বেলতা তখন যেন শান্ত সংহতির পরিচ্ছদে জীবলোকের মধ্যস্থলে প্রবেশ করেছে। এর প্রথম কবিতা—'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল'—ভাবোচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ স্থাপত্যের দীপ্তি দিয়েছে। কয়েকটি চতুর্দশপদী দেখে মনে হয় যে তখন ''কবীন্দ্র কালিদাস''-এর প্রভাব তাঁর ওপর সব চেয়ে বেশি। ''প্রাচীন সাহিত্য''-এ কবি লিখেছেন : ''সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী, গিরি, নগরীর নামগুলিই বা কি সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।... মনে হয় ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।'' পলায়নপ্রবৃত্তি অবশ্য কবির কখনো ছিল না; ''চৈতালি''-তেই রয়েছে 'বঙ্গমাতা' কবিতা : ''সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করো নি।'' নদীর ধারে ইঁটের পাঁজা সাজাবার জন্য মাটি কাটতে যে পশ্চিমা মজুররা এসেছিল, তাদের মেয়েদের দেখে লিখছেন ''কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি''-র কথা।

১৩০৭ সনে প্রকাশিত ''কল্পনা''-য় কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল কবির ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁর প্রতিভা তখন প্রায় যেন মধ্যগগনে, শ্লথতা কোথাও নেই, গতিবিধি সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত। প্রাচীন ভারতের মোহময়, সৌন্দর্যখচিত জীবনাকাশের কথা সেখানে রয়েছে, আর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের শিল্পসুশৃংখল সমাবেশে প্রায় নিখুঁত এবং নিছক কয়েকটি কবিতা। লিখতে গিয়ে মনে আসছে প্রায় একত্রিশ বৎসর আগেকার কথা—অক্সফোর্ডের ভারতীয় ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথ গেছেন, সম্বর্ধনা করতে গিয়ে তারুণ্যের ধৃষ্টতায় সভাপতি বললেন কবিকে—তুমি এখানে কেন, গান্ধীজী যে সংগ্রাম (১৯৩০) শুরু করেছেন, সেখানে তাঁর পাশেই তো তোমার স্থান—আর ক্লান্ত, মৃদু কণ্ঠে কবি বললেন তাঁর

নিজস্ব আয়ুধের কথা, হঠাৎ একখণ্ড "চয়নিকা" চেয়ে নিয়ে পড়লেন 'দুঃসময়' কবিতাটি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া।
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া।

মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

নিজেরই অন্তরতম কবিপ্রকৃতির প্রতি অপরিমেয় আস্থার সেই উদাত্ত নির্ঘোষ আজো ভুলতে পারি নি।

ভাষার কারুকার্য আর ভাবের প্রসাধন-কলা "কল্পনা"-য় এমন ভাবে দেখা গেছে যাতে মহাকবির স্বাক্ষর যেন স্পষ্ট। 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' তিনি চলেছেন 'মোর পূর্বজনমের প্রথমাপ্রিয়ারে' খুঁজতে। 'বর্ষামঙ্গল'-এ তিনি শুনিয়েছেন বহু যুগের কবিকণ্ঠের মূর্ছনা—'শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে, ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে, শতেক যুগের গীতিকা'। মদনভস্মের পূর্বে এবং পরে কবিতাদ্বয়ে তিনি মদনকে প্রথমে মানুষেরই মোহন সঙ্গীরূপে চিত্রিত করেছেন। আর তার ভস্মাবশেষ আত্মার বিশ্বময় পরিব্যাপ্তির বর্ণনা দিয়েছেন অপূর্ব সুন্দর আলুলায়িত ছন্দে। 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে, বাধাবন্ধহারা'—এই উদাত্ত শব্দৈশ্বর্য দিয়ে আরব্ধ বহুখ্যাত 'বর্ষশেষ' কবিতা শেলির 'Ode to the west wind' যদিও স্মরণ করিয়ে দেয় আর স্থানে স্থানে যদিও চাঁদের কলঙ্কের মতো অতিকথন দোষে আক্রান্ত হয়ে কিঞ্চিৎ শিথিল, তবু এর ধ্বনিস্পন্দন, চিত্ররূপ আর অর্থগৌরব একে কালজয়ী করে রাখবে। আবার "কল্পনা"-তে রয়েছে 'বিদায়'-এর মতো নিথর সুন্দর কবিতা—

শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

আমাদের এই সহস্রমনা কবিকে ভারতবর্ষের প্রাচীন, বিশাল পটভূমি যে কত সংখ্যাহীন আহ্বানে আকর্ষণ করেছিল, তারই সরল, গম্ভীর, প্রাণবন্ত পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে ১৩০৪ থেকে ১৩০৬ সনে লেখা 'কথা ও কাহিনী'র পাতায়। দেশের ঐতিহ্যের ধ্যানগম্ভীর ধারায় অবগাহন করে যেন তিনি সাজিয়ে ছিলেন "নৈবেদ্য"-এর (প্রথম প্রকাশিত ১৩০৮) ডালা, পতিত ভারতবর্ষের জন্য তিনি চেয়েছিলেন 'পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত, নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন'।

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্ব সিন্ধু তীরে।

তিনি বললেন সেই 'স্বর্গের' কথা—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত'; আমরা শুনলাম তাঁর গদ্য রচনায় : "এককে বিশ্বের মধ্যে ও আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" অখণ্ড সত্যের জন্য কবির আকুলতা প্রকাশ পেল পরিপূর্ণ অস্তিত্বের সাধনায়—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

তাই কবির কাছে সংসার ভয় আর পাপ আর বাধার আকার নয়—'বিচিত্র ভাষায়, তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়,' কবিকে টানে মানুষ 'বেদনার ডোরে, বাসনার টানে'।

১৩০৮ সনে "নৈবেদ্য" প্রকাশিত হয়েছিল; এই বৎসরই কবি 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন, বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর 'স্বাদেশিক জীবন' পূর্বের চেয়ে প্রকট হয়ে উঠে। কিন্তু তাঁর কবিসত্তার অখণ্ডতারই এক প্রমাণ দেখা যায় যখন "নৈবেদ্য" প্রকাশের ঠিক এক বৎসর পূর্বে (১৩০৭) ছাপা হয় "ক্ষণিকা", যেখানে নরীনৃত্যমান্ গীতিকাব্যের যেন চূড়ান্ত ঘটেছে। 'নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে,' তাকে কবি কথার চিকণ জালে, বেঁধে ফেলেছেন। 'জীবনদেবতা'-কে নিয়ে ভাবনা প্রায় কোথাও নেই, কল্পলোকের সন্ধানেও কবি ব্যস্ত নন—'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ' বলে তিনি লোকালয়ে ঢুকে পড়েছেন, একেবারে বাঙলার মাটি-ছোঁয়া আর সংস্কৃতের বাধন-ছিঁড়ে-পালিয়ে যাওয়া ভাষায় তিনি লিখেছেন। 'কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান, কোন্‌খানে তোর স্থান?' প্রশ্নের জবাবে যখন শোনেন :

ভাণ্ডারেতে লক্ষ্মী বধূ যেথায় আছে কাজে,
ঘরে ধায় সে ছুটি পায় সে যখন মাঝে মাঝে,
বালিশতলে বইটি চাপা, টানিয়া লয় তারে,
পাতাগুলিন ছেঁড়াখোঁড়া শিশুর অত্যাচারে—
কাজল-আঁকা সিঁদুর-মাখা চুলের-গন্ধে-ভরা
শয্যাপ্রান্তে ছিন্ন বেশে চাস কি যেতে ত্বরা?

এখন 'বুকের পরে নিঃশ্বসিয়া স্তব্ধ রবে গান—লোভে কম্পমান'। আলো, হাসি আর মাটির সৌরভে "ক্ষণিকা" শুধু রবীন্দ্র-রচনায় কেন, বোধ হয় কবিতার সুবিস্তীর্ণ জগতেই অনন্য হয়ে রয়েছে। ভালোমন্দ ছোটোবড়ো, সত্যমিথ্যা নিয়ে অবিকৃত জীবন, তারই সহজ টানে কবির 'অকারণ পুলক' জেগেছে আর তাঁর গান সংসারকে কাটিয়ে যেতে নারাজ—'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে' ভাবতে গিয়ে স্থির করেছেন :

আপাতত এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে—
কালিদাস তো নামেই আছেন, আমি আছি বেঁচে।

কেবল কালানুক্রমিক ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের পরিচয় দিয়ে যাওয়া এই প্রবন্ধের লক্ষ নয়, কিন্তু কালানুক্রমের দিকে থেকে দেখা যায় যে "নৈবেদ্য" প্রকাশ হওয়ার পর বেশ কয়েক বৎসর ধরে কবিমানসে যেন কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। প্রমথনাথ বিশী তাঁর "রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ" গ্রন্থে মোটামুটি ১৯০২ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সময়কে রবীন্দ্র-প্রতিভার বনবাস আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে তখন যেন কবি স্বধর্মচ্যুত, কবিতার চেয়ে গদ্যরচনায় তখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন বেশি, রাজনীতি নিয়ে কিছুকাল খুব মেতেছেন, গান লিখেছেন অজস্র কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই উপজীব্য হল ভগবৎপ্রেম, যা মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথকে যেন কক্ষভ্রষ্ট করেছিল। এই অধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে "শিশু" (১৩১০), "উৎসর্গ (১৩১০), "খেয়া" (১৩১২-১৩), "গীতাঞ্জলি" (১৩১৩-১৭), "গীতিমাল্য" (১৩১৮-২১), "গীতালি" (১৩২৩)। এই যুগেই তিনি বাংলায় স্বদেশি আন্দোলন সৃষ্টি এবং আস্বাদের উন্মাদনা পেয়েছিলেন, আশাভঙ্গের তীব্র অভিজ্ঞতাও তাঁর হয়েছিল। তখনই তাঁর জীবনে উপর্যুপরি এসেছিল মৃত্যুশোক আর শরীর-মনের উপর আঘাত। আবার তখনই প্রায় যেন অবসর বিনোদনের জন্য অন্যমনস্কভাবে কিছু অনুবাদের ফল হল ইংরেজি "গীতাঞ্জলি"-র প্রকাশ, বিদেশে বিপুল খ্যাতি আর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক বহু ঘটনা। বিশী মহাশয়ের মন্তব্যে চিন্তা করার খোরাক আছে খুব, কিন্তু তিনি যে বনবাসের কথা বলেছেন, সে বনের সমারোহ আর ফুলফলের বিচিত্র গম্ভীর সম্ভার তো অল্প নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তি হল এমন প্রকৃতির যে তার কোনো পরিচ্ছেদকেই বোধ হয় কক্ষচ্যুতি বলা চলে না। ক্রমান্বিত উত্তরণ মহিমা তাঁর বৈশিষ্ট্য—মহত্ত্বের অবিচল ভিত্তির উপর তিনি অবিরাম ইমারত বানিয়ে চলেছেন, তাদের শ্রী আর ছন্দে স্তরভেদ আছে, তারতম্য আছে, কোথাও বা বাঁধুনি ভেঙেছে তাল কেটে গেছে, কিন্তু মুহূর্তের নিষ্কৃতি তাঁর সহ্য হয় নি, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়া আসা না করে তাঁর স্বস্তি ছিল না—একদিকে একক অন্যদিকে বহুমুখী তাঁর মন এবং প্রতিভা। 'একধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়' যিনি "নৈবেদ্য"-এ লিখেছেন, তিনিই লেখেন "উৎসর্গ"-এ সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। সীমার মধ্যে যিনি অসীমের সুর বাজতে শুনলেন, তিনি কিন্তু "শিশু" লিখতে গিয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো intimations of immortality না শুনে খোকার গায়ের কচি কোমলতাতে খুঁজে পেলেন—

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তার পরাণ চেয়ে
মাধুরী রূপে মূরছি ছিল...

আর কক্ষচ্যুতি না বলে কক্ষান্তর যাত্রাই কি বলা ঠিক নয়, যখন দেখি যে তখন কবি লিখছেন গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য-এর অপূর্ব বিত্তশালী গান—

"আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষায় বিশ্বব্যাপী বিরহ বেদনা ও নববসন্তের বনান্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা" এই যে গান তাকে ভাবের অলঙ্কারে তো শুধু রবীন্দ্রনাথই ভূষিত করতে পেরেছেন? কক্ষচ্যুতির কথা চিন্তনীয় নয় সে যুগের বিষয়ে যখন তিনি লিখছিলেন গদ্যে পদ্যে স্বদেশিযুগের মর্মকথা; আর এমন গান যা শুধু চোখের কোণ ভিজিয়ে আনে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভরিয়ে দেয়, ভাবনাকে নাড়া দেয়, অন্তরের

অন্তস্তল স্পর্শ করে। অবশ্যই একথা সত্য যে খেয়া-তে ছড়িয়ে রয়েছে বিদায় আর শ্রান্তি আর বিরতির সুর—যার বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় কবির সমসাময়িক গদ্যরচনায়—কিন্তু বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সূত্র করে দেশসেবার আজন্মলালিত কামনা পূরণের জন্য কর্মক্ষেত্রে নেমে কথঞ্চিৎ আশাভঙ্গ তো একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। হয়তো ক্ষমার্হ নয় এমন ক্ষুদ্রতা তাঁকে আঘাত করেছিল বহুজনের সমবায়ে কর্মে লিপ্ত হতে গিয়ে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা তাঁর কবিসত্তার কোনো প্রকৃত হানি তো ঘটাতে পারে নি। বরঞ্চ স্বদেশে বিদেশে জীবনের ক্রূর বাস্তবতাই হয়তো তাঁর সহজ সৌকুমার্যকে বলিষ্ঠ মানববোধে রূপায়িত করতে সহায় হল। তাই পঞ্চাশোর্ধে আমাদের কবি 'বনং ব্রজেৎ' উপদেশ উপেক্ষা করে নিজেকে যেন সত্যই চরাচর ব্যাপ্ত করে দিতে পারলেন—"বলাকা" পর্ব (১৩২১-২২) থেকে আরম্ভ হল কবিপ্রতিভার নূতন জয়যাত্রা, যার অজর সাক্ষ্য রয়েছে একেবারে তাঁর মৃত্যুপথবাহী রচনাতেও (১৩ই মে, ১৯৪১)—

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়।
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

১৯২৪ সনের একটি লেখায় কবি বলেছিলেন "যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি, তারা পারে যাবে কী করে? সেই জন্যই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়।' 'গময়' এই কথার মানে এই যে পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগেই পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে কবির মনে কেবলই আসতে থাকে ভাবীকালের সংকেত 'যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে।' 'বলাকা'-র প্রথম কয়েকটি কবিতা যুদ্ধের আগে লেখা, সেই চাঞ্চল্যের সাক্ষ্যে ভরা। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে লেখা—দূর হতে শুনিস্ কি মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন—প্রলয়ের করালী মূর্তিই শুধু আঁকে নি :

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি অভিমান...

তবে অন্ধকারই কি চরম—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রু-ধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?....

'বলাকা' পড়তে গিয়ে কেবল মনে হয় যে কবির হাতে শুধু বীণা তো নেই রয়েছে অস্ত্র যা পর্বতবাসী যোদ্ধার বর্শাফলকের মতো সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রে ঝলমল করে জীবনের সঙ্গে মিলে রয়েছে।

যাত্রা কর, যাত্রা কর, যাত্রিদল
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ!

'তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে দিতে হবে পাড়ি,' নবযুগের সাক্ষাৎ মেলে নি, কিন্তু ভরসার অভাব নেই—

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি;—
জ্বলিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বীণা।

'আমার মনের বাসাছাড়া পাখী আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রান্ত চলেছে—যা কিছু গতিশীল, যা কিছু উড়ে চলেছে তাদের সহযাত্রী হয়ে, অসংখ্য পাখীদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন্ দিকে চলেছে জানি না, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি।'

মনে হল এ পাখির বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

আবার কবিপ্রতিভার সহস্রধার ঐশ্বর্যের কথা মনে পড়ে যখন 'চঞ্চলা'-য় তিনি বলেছেন :

ওরে কবি তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার মুখরা এই ভুবন মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।

আর শা-জাহানের সকল বৈভব বিলুপ্তিকে অগ্রাহ্য করে বলছেন যেন ঋষির মতো সূত্রাকারে :

শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

গতি ও বিরতি, মুখরতা ও মৌন, সংগ্রাম ও শান্তিকে যেন কবিতার মায়াজালে বাঁধা হয়ে গেছে। মহাকবিত্বের যদি কোনো পরীক্ষা থাকে তো "বলাকা"র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে বহুদূর চলে গেলেন। তারপর নিছক মহাকবিরই আস্থা নিয়ে ছন্দ আর বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে লিখলেন "পলাতকা" (১৩২৫)। আর কিছু পরে যখন লিখলেন "পূরবী" (১৩২৯-৩১), তখন তাঁর পরিণত কাব্যধারার প্রায় প্রতি ব্যঞ্জনারই সার্থক ও সুশোভন পুনরুক্তি পাঠককে হৃষ্ট করল, পুরাতন মোহ নবরূপে এসে উপস্থিত হল—'কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়, সারা হয়ে এল দিন'।

'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ' লিখেছিলেন কবি। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বিশ্বজনকে মুগ্ধ করে সে বীণা আরো বহুদিন বেজেছিল। "বলাকা", "পলাতকা", "লিপিকা" গতানুগতিক ছন্দ থেকে যে মুক্তি আনছিল, তাকেই কবি আরো বিকশিত করে তুললেন কাব্যে তাঁর গদ্যরীতিতে; "সে সহজে চলে বলে তার গতি সর্বত্র।" "প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি সচ্ছতা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। ছন্দোবন্ধে যিনি পারংগম, অবাক হতে হয় যে সেই কবি প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে গদ্যছন্দকে বলছেন "যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাটাসাজানো নয়, অসমতার স্তবগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য।" ছন্দকে অবশ্য ছাড়ার কোনো প্রশ্ন উঠল না, কিন্তু পূর্বের সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে অনুক্ত ছিল এমন বহু কাব্যবস্তু তিনি গদ্যছন্দে অবতারণা করে প্রতিভার নূতন শৃঙ্গকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করলেন।

"পরিশেষ" (১৩৩৭-৩৯) থেকে "শেষ লেখা" (১৩৪৮) পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের যে অধ্যায় তা শুধু সংযোজন নয়—

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

এ-কথা যিনি অশীতিবর্ষ বয়সে দীপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, তাঁরই কাছ থেকে জায়মান নূতন জীবন তখন বুঝি নবসৃষ্টির শুভক্ষণে শিল্পের বরাভয় চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় নি। আপাতবিরূপতাও তাঁকে অনুভূতির অপরিচিত আস্বাদ ও রূপায়ণ থেকে বিরত করে নি। ১৩৪০ সনে "সাহিত্যের মাত্রা" প্রবন্ধে লিখেছেন : "আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করছি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে। তার কঠোরতা আমার কাছে অনুদার বলে ঠেকে; বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে তার উৎপত্তি; তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্ত দেখা যাচ্ছে না, ঘরের বাইরে যার অকৃপণ আহ্বান। এ-সাহিত্য বিশ্ব থেকে আপন হৃদয় প্রত্যাহরণ করে নিয়েছে।" কিন্তু শুধু যে এর ব্যতিক্রম লক্ষ করেছিলেন তা নয়, মহৎ কবি বলেই এলিয়টের রচনা নিজে অনুবাদ করেছিলেন। আবার রাশিয়াতে গিয়ে (১৯৩০ সাল) পূর্বার্জিত সুদৃঢ় সংস্কারকে পরিহার করতে লেশমাত্র সংকোচ তার ঘটে নি। একদা তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সভ্যতায় অবসরের স্থান দরকার আর সেজন্য দুঃখের হলেও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদেরও প্রয়োজন। কিন্তু সোভিয়েট দেশে গিয়ে সে ধারণা একেবারে বদলে গেল। "পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান" সেখানে তিনি দেখলেন, বললেন যে, না দেখলে তাঁর

আজীবন তীর্থ পরিক্রমা অসমাপ্ত থাকত, লিখলেন বন্ধুজনকে : কতবার মনে হয়েছে আর কোথাও নয়, রাশিয়ায় এসে তোমাদের সব দেখে যাওয়া উচিত।" সব চেয়ে তাঁর চোখে ভালো লেগেছিল "ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।" আর রাশিয়ার পর আমেরিকায় গিয়ে কটু লাগল—"ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটু ভালো লাগল না।" রাশিয়ার বিপ্লবকে দেখে বললেন, "এ-বিপ্লব মানুষের সব চেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব—এ-বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে যেটাকে বলে লোভ।" সত্তর বৎসর বয়সে, খ্যাতি আর স্তুতির পসরা বহু পূর্বে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, এমন আবিষ্কার যিনি করতে পারেন, তাঁর অনির্বাণ মানববোধকে বার বার প্রণতি জানাতে হয়।

১৩০০ সনে 'এবার ফিরাও মোরে' বলে কবি বৃহৎ জগতের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন : "এ দৈন্য মাঝারে কবি, একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।" ১৩৩৮ সনে ইংরাজ শাসনের ক্লৈব্য পরিহারের জন্য যখন ভারতবর্ষ ব্যাকুল তখন দেখি তাঁর ঋষিনেত্র থেকে বহ্নি ঠিকরে পড়ছে—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছে ভালো?

বজ্রাঘাত মাথায় পেতে নিয়ে তখন তাঁর মুখ দিয়ে (১৩৩৯) দেশ যেন বলেছিল—

এইমাত্র? আর কিছু নয়?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।

"পুনশ্চ"-এ (১৩৩৯) দেখা দিল 'ছেলেটা, যে বেড়ে উঠেছে 'ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা'র মতো, যার 'নিজের জগতের কবি' হতে না পেরে কবির খেদ; দেখা দিল "অন্তপুরের মেয়ে, চিনবে না আমাকে—তোমার শেষের গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু", আর অম্‌লি "যাকে দেবতাই নিয়েছে"—"আখোলা চিঠি খুলে দেখি, তাতে লেখা—তোমাকে দেখতে বড়্ডো ইচ্ছে করছে—আর কিছুই নেই।" আশ্চর্য সহজ অথচ গভীর এ সব কবিতা। "পত্রপুট"-এ (১৩৪২-৪৩) "আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী" বলে আরব্ধ বিখ্যাত কবিতায় চেয়েছিলেন "তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে"। মনে হয় একটি তিলক কেন, মাটির চন্দনে তাঁর বিস্তৃত কপালকে চর্চিত করেও বসুমতী তুষ্ট হতে পারে নি।

১৩৪৩ সনে লেখা "শ্যামলী"-তে রয়েছে 'অমৃত'-এর মতো কবিতা যেখানে ভালোবাসার অধিকারে উত্তীর্ণ হল যে ছেলে সে এমন যে

লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে
ঠোকর দিয়েছে
রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা।

আর 'হঠাৎ-দেখা'-য় রয়েছে

তার পর বললেম,
'রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।'
খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম নাকি।

ছেলেবেলা থেকে কবিকল্পনার সঙ্গে যাঁর 'মালাবদল' হয়ে গিয়েছিল, তাঁরই নিরন্তর সত্যসন্ধিৎসা এক প্রোজ্জ্বল ঘটনা। মনে পড়ে যায় বহুদিন পূর্বের এক চিঠিতে লিখেছেন : "জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয় স্থান।" (ছিন্নপত্র, ৮ই মে, ১৮৯৩)।

জীবনের শেষ বর্ষে লেখা 'ঐক্যতান' (২১শে জানুয়ারি ১৯৪১) কবিতায় কবি বলেছিলেন : "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।" কিন্তু এটা খেদের, বিলাপের সুর নয়—মর্তের অমরাবতীতে নিমন্ত্রিত হয়ে কবি দেখেছেন বার বার যে শান্ত, নিরাসক্ত মন নিয়ে না গেলে দ্বার মুক্ত হয় না, "বুভুক্ষুর লালসাকে করে সে বঞ্চিত"। কিন্তু সত্যকথনে পরাঙ্মুখ হতে তিনি পারেন নি—

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

তাই তিনি বলতে ইতস্তত করেন নি— .

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

একমাস পরে লেখা 'ওরা কাজ করে' কবিতায় ধ্বনিত হয়ে রয়েছে তাদের কথা যারা

চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

কী দশদিক-প্রসারিত মন এই কবির, যে-মনের প্রান্তে আর মুক্তাঙ্গনে সর্ববিশ্বের কর্ম আর স্বপ্ন তার গুঞ্জরণ নিয়ে বার বার এসে উপস্থিত হয়। "রোগশয্যায়" (১৩৪৭) গ্রন্থের সূচনায় অমূলক সংকোচ নিয়ে তিনি বলেছিলেন :

মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে—
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপ তালে।

শৈথিল্য দূরে থাক, সিদ্ধির শিখরেই জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত তার অধিষ্ঠান।

ব্যাপ্তি আর বিস্তারের এই মহীরুহ কীর্তি শিল্পের ইতিহাসে অতুলন বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের বিচরণ তো শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু যদি তিনি কবিতা ছাড়া আর

কিছুই না লিখে যেতেন, তবুও সে-কৃতিত্বের পরিমাণ তো সহজ হত না। সংক্ষেপেও সব কথা বলতে গেলে গোটা গ্রন্থ ভরিয়েও তুষ্টি নেই—তাই শুধু ভাবতে হয় তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট ধারার কবিতার কথা। ছড়া আর গান (যা প্রায়ই হয়েছে নক্ষত্রচুম্বী কবিতা), 'হিং টিং ছট্,' 'বঙ্গবীর', 'জুতা-আবিষ্কার' ইত্যাদি অসংখ্য ব্যঙ্গ কাব্য, স্বদেশবিষয়ক অপূর্ব কবিতাবলী, বিশ্বমানব, সম্পর্কে পরম আত্মীয়তাবোধের যে বহু শক্তিপুঞ্জ কবিতা তিনি লিখেছিলেন 'আফ্রিকা'-র মতো—

এল ওরা লোহার হাতকড়া নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপনার নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল তোমার ধূলি তোমার রক্তেতে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমায় অপমানিত ইতিহাসে...

'যুগান্তের কবি'-কে তিনি ডেকেছিলেন : 'এসো—

আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

মানুষের চিরন্তন মহিমা এমন সৌকর্য নিয়ে আর কোনো কবির কর্মে কি দেখা দিয়েছে আধুনিক কালে? আর কবিতার ক্ষেত্র ভিন্ন শিল্পের অপরাপর রাজ্যে তাঁর দৃপ্ত অথচ প্রসন্ন পদক্ষেপের কথা ভাবলে তো মনে হয় তিনি যেন অখণ্ড মণ্ডলাকার, সর্বচরাচরে তাঁর ব্যাপ্তি, এমন বিশ্বরূপদর্শনের শক্তি কোথায় আমাদের মিলবে?

বারবার ব্যাপ্তির কথা বলতে গিয়ে একটু থমকে ভাবতে হচ্ছে যে কাব্যবাজ্যে পরিসর তো মহত্তম বস্তু নয়, মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরতা বিনা তো কাব্যের কৈলাসে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। মহাকাশে সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র বিলীন হয়ে গেলেও প্রকৃতির হানি হয় না, কিন্তু পূর্বের দিকে তাকিয়ে ঘাসের যে প্রতিটি ডগা রোজ হেসে ওঠে সেখানে প্রকৃতির অসীম হৃদয়ের সকল যত্ন এবং কৌশল অবস্থিত না থাকলে তো চলে না। এই তীব্রতা আর গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে না বসিয়ে তাদেরই কাছে, কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই হয়তো সমীচীন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শেক্সপিয়রের মতো যিনি প্রায় প্রশ্নাতীত তাঁর লেখাতেও গলদের অভাব নেই—এ বিষয়ে ড্রাইডন্, ভল্‌তেয়র,

জন্‌সন্‌-প্রমুখ গুণীর বক্তব্য স্মরণীয়। আর যদি রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে যে-দেশ যে-পরিবেশে জন্মেছিলেন সে-কথা ভাবা যায় তো নিশ্চয়ই মনে হবে যে তদনুপাতে তাঁর কবিতার তীব্রতা ও গভীরতা সত্যই বিস্ময়কর। "জীবনস্মৃতি"-তে (পৃ: ১৪৩-৪৪) কবি লিখেছিলেন : "যেখানে অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক অথবা সামঞ্জস্য যেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্য লেখা বোধ হয় চলে না। যেখানে অসামঞ্জস্যের বেদনাই প্রবলভাবে সামঞ্জস্যকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে, সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো রাগিণীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।" ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার পুনর্জন্ম (renaissance) বিষয়ে বাক্‌বিস্তার যতই হোক না কেন, একথা অকাট্য যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবজ শোষণ ও অনিবার্য অপশাসনের কালে যে নববাবু সমাজের ভুঁইফোড় আবির্ভাব ঘটেছিল, তার পারিপার্শ্বিকে মহৎ শিল্পের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না। হয় "অসামঞ্জস্য অতিরিক্ত অধিক" ছিল, নয় উপনিষদ্‌ আর ভারত ইতিহাসের কল্যাণে "সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ" রূপ নেবার চেষ্টা করছিল, আর সেই দোটানায় অবিরাম ভুগছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি—দেবতার দীপ হস্তে" এসেছিলেন বলে তৎকালের বন্ধনশৃংখল তাঁকে নমস্কার অবশ্য করেছিল, কিন্তু নিস্তার দেয় নি।

ইয়োরোপে মধ্যযুগের শেষভাগে মহাকবি দান্তে-র অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাঁর কাব্যগরিমা সম্বন্ধে আমাদের নির্ভর করতে হয় সজ্জনশ্রুতির উপর, কিন্তু একথা তো অজানা নয় যে খ্রীস্টধর্মে ও চিন্তায় পাপপুণ্য নিয়ে যে মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে, তা আমাদের মনে সত্য নয়, আর তাই এদেশে, আর বিশেষত এ যুগে, দান্তের অপেক্ষায় থাকা হাস্যকর বই কি। বহুঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ইয়োরোপে মৌলিক সামাজিক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া মানসের অসম বিকাশ যখন ঘটছে, তখন আবির্ভূত হলেন শেক্‌স্‌পিয়র, আর সেই বুর্জোয়া মানসেরই শতদলস্ফুরণের শিল্পসাক্ষ্য রইলেন তাঁর পরবর্তী কবিকুল। আমাদের দেশের জীবনে যে স্থবির পঙ্গুতা এসে ভারতবর্ষের মজ্জাগত পূর্বগরিমাকেও মালিন্যে আবৃত করে দিয়েছিল তা সচল সমাজের সাবলীল সঞ্চরণে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক হয়েছিল, এখনো তার পূর্ণ পরাজয় ঘটে নি। আমাদের এই পরিস্থিতিতে একদিকে দান্তে এবং অপরদিকে শেক্‌স্‌পিয়রের প্রত্যাশা কখনই সঙ্গত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে যে এই স্তরের মহাকবিকে স্মরণ করতে হয়, এটাই তাঁর অবিসংবাদী মহত্ত্বের এক প্রমাণ, কিন্তু তাঁদের মহিমা রবীন্দ্রপ্রতিভায় আবৃত হয়েছে কল্পনা করা অসমীচীন।

"আত্মপরিচয়" (প্রথম প্রকাশ, ১৩৫০) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের (১৩১৮ সনে) একটি বক্তৃতা আছে : "আমি জানি, আমার রচনার মধ্যে সেই নিরতিশয় প্রাচুর্য আছে যাহা বহু পরিমাণে ব্যর্থতা বহন করে।... যিনি অমরত্ব-রথের রথী তিনি সোনার মুকুট হীরার কণ্ঠি মানিকের অঙ্গদ ধারণ করেন, তিনি বস্তা মাথায় করিয়া লন না। কিন্তু আমি কারুকরের মতো সংহত অথচ মূল্যবান গহনা গড়িয়া দিতে পারি নাই। আমি, যখন যাহা জুটিয়াছে তাহা লইয়া, কেবল মোট বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহার দামের চেয়ে তাহার ভার বেশি। অপব্যয় বলিয়া যেমন একটা ব্যাপার আছে, অপসঞ্চয়ও তেমনি একটি উৎপাত। সাহিত্যে এই অপরাধ আমার ঘটিয়াছে... কিন্তু সেই লোকসানের আশঙ্কা লইয়া ক্ষোভ করিতে চাই না।... অন্তত প্রাচুর্যের দ্বারাতেও বর্তমান কালের হৃদয়টিকে আমার কবিত্ব চেষ্টা কিছু পরিমাণে জুড়িয়া বসিয়াছে এবং আমার পাঠকদের হৃদয়ের তরফ হইতে আজ যাহা পাইলাম তাহা যে অনেকটা পরিমাণে সেই দানের প্রতিদান তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এই কথাটিতে ভাষণসুলভ আতিশয্য কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় কবি নিজে তাঁর অতিকথন সম্বন্ধে একটুও অচেতন ছিলেন না। আমরা শুধু বলব যে তাঁর সার্থক সৃষ্টি বহুল পরিমাণে পেয়ে আমরা পরম পরিতুষ্টির সন্ধান পেয়েছি, কোথাও তাঁকে ব্যর্থ বলতে আমাদের মন ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যর্থতা কিছু যদি থাকে তো থাকুক, চাঁদের কলঙ্কের মতোই তা গুণসন্নিপাতে ডুবে থাকবে।

সমালোচকরূপেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভাবান, তাই জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায় কাব্যসমস্যা তাঁকে কেমন ভাবিয়ে তুলেছিল সে বিষয়ে। তিনি বলছেন (পৃঃ ১২৩):—'ইংরেজী সাহিত্য হইতে আমরা যে-পরিমাণে মাদক পাইয়াছি, সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই।... আমাদের সমাজ, আমাদের ছোটো ছোটো কর্মক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না, মস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এইজন্যই ইংরেজী সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ ও রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্যকলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে-সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ, তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।" তিনি লক্ষ করেছিলেন যে "য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার [Renaissance-এর ফল] মাতামাতির সুর আমাদের এর অত্যন্ত শিষ্টসমাজে প্রবেশ করিয়া" হঠাৎ যেন "চমক" লাগিয়ে দিয়েছিল তাই ইয়োরোপের যা ছিল স্বাভাবিক, তা এখানে "জবরদস্তি" আর "অতিশয়োক্তির" চেহারায় দেখা দিল। তিনি আরো বলেছেন "যে হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণমাত্র, তাহা যে লক্ষ নহে—সাহিত্যের লক্ষই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য সুতরাং সংযম ও সরলতা এ কথাটা এখনো ইংরেজী সাহিত্যে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকৃত হয় নাই" আর "শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরাজী সাহিত্যেই আমাদের মন গড়িয়া উঠিতেছে" বলে বিপদ ঘটল। আরো বলেছেন চূড়ান্ত কথা (পৃঃ ১৮৬-৮৭) "যে সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই!'

রবীন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ, তাঁরই কৃপায় আমরা ধনীর দুয়ারে কাঙালিনী মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকি নি। যে সাজ করে আমরা আজ আসতে পারি তা তাঁরই দেওয়া। কনিষ্ঠ কবি সুকান্তের ভাষায়—

> এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
> তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।

মানুষের কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই মানুষকে ফেলে রেখে দূরে গিয়ে তাঁর স্বস্তি হত না—হিমালয় পাহাড়ের ওপর তাই সদর স্ট্রীটের "তুচ্ছ বাড়িটার জিত" হয়েছিল; নদীকে তাই তিনি এত ভালোবাসতেন, যে-নদী উথলে এসে পড়ে মানুষের দরজায়, যার ওপর একখণ্ড পাল তুলে যাওয়া নৌকো না দেখতে পেলে তাঁর অস্বস্তি। তাই গানে তাঁর অন্তরের কথা এমন মধুর হয়ে উঠেছে—জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টনকে অতিক্রম করেও যা একান্তভাবে মানবহৃদয়ের আত্মীয়।

এ দুর্ভাগা দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে কত বড়ো আশীর্বাদ তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের সাহিত্যে তিনিই আনলেন রূপ, আনলেন শালীনতা—ভিন্নপ্রকৃতির হলেও মনে পড়ে যায় ইংরেজ কবিগুরু চসর্-এর কথা। তাঁর বিস্তৃত জীবনের অবিরাম সাধনা ও সিদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় জার্মান মহারথী গ্যেটের কীর্তিকে। বাংলা সাহিত্যে তিনি আনলেন অজস্র বিন্যাস, আনলেন মার্জিত রুচি আর শিল্পবোধের মানদণ্ড, আনলেন রোমান্টিকের আকুলতা আর অভীপ্সা, সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ সততা আর একান্ত সৌন্দর্যচেতনা, আর নিজের রচনাতে মধ্যে মধ্যে স্খলন ঘটলেও শেখালেন "হৃদয়ের মিতব্যয়িতা"-র কথা। তা ছাড়া বিষ্ণু দে-র ভাষায়, তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ—যে-দায়িত্ব সযত্নে ও সশ্রমে পালন না করলে মহৎ সৃষ্টিকে কলম বা তুলির পাশে বন্দী করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে না হয়ে পারে না যে যুধিষ্ঠিরের রথের মতো তাঁর বিচরণ পৃথিবী থেকে একটু যেন ঊর্ধ্বে হচ্ছে, অন্তত বাংলার ভিজে মাটি তাঁকে ধরে রাখতে পারছে না। তাঁরই ভাষায় কিন্তু তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে মন যায় : "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়"।

বারবার বলতে হয় যে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশার অন্ত·নেই বলেই যেখানে যে কবির কোনো বিশিষ্ট উৎকর্ষের দিব্য জ্যোতি দেখি, তখনই মন সন্ধান করে রবীন্দ্রকাব্যে কোনো অনুরূপ সিদ্ধির আশায়। কিন্তু মহামহীরুহের মহিমারও তো সীমা আছে। অ্যালন্ ল্যুইস্ নামে যে তরুণ ইংরেজ কবি গত যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে এসে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন : "সূর্য প্রতিদিন যা শেখাচ্ছে, সেই ঘামঝরা, ডাকছাড়া বাস্তবতা এদেশে কবিতায় আনা এত শক্ত কেন?" তাঁরই জবাব ছিল—"এদেশে পরিণতি অর্জন করা বড়ো কঠিন; মানুষের পরিবেশ দেখে ক্রুদ্ধ হওয়ার মতো এত বস্তু রয়েছে, সমাজের চেহারায় দিশাহারা হওয়ার মতো এত ব্যাপার রয়েছে; আর বিশ্বজনীন যে ক্ষেত্র এখানে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে তো অহংকারকে লুপ্ত না করে উপায় নেই! কোথায় যেন সবকিছু অভিশাপগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, নইলে সাহিত্যিকের পক্ষে কত অজস্র দৌলত যে এদেশে ছড়ানো!" ভাবতে ভালো লাগে যে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনিষদের ধারায় লালিত বর্ধিত মন নিয়ে এইরকম প্রশ্নই নিজেকে বহুবার করেছেন—হয়তো ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সূর্যের প্রতি চেয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, আর যে উত্তরের সন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে তাঁর উপায় ছিল না, তারই আভাস পেয়েছিলেন তাঁর পরিণত বয়সের ছবিতে—একেবারে শিল্পের এক স্বতন্ত্র মাধ্যমে বোধহয় তাঁর কবিমন স্বস্তি পেয়েছিল।

ব্যাপ্তির উত্তরণ পর্বের এমন বিপুল ঐশ্বর্য জগতের আর কোনো কবিতে মেলে না, গ্যেটে বা হ্যুগোতেও না। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও তুলনা দেখি না—নিঃসঙ্গ কবির অবিরাম অভিযান ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। একত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছিল অসামান্য লিখনশক্তি, চারিত্র্যের অপূর্ব সাধনা, আর দীর্ঘ আয়ু—সমসাময়িক জীবনের হলাহল পান করে তিনি বলতে পেরেছিলেন :

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।

একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

জীবনের যে সমগ্রতা তাঁর ক্ষেত্রে দেখা যায়—"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—তা প্রকৃতই অতুলন। "সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়"—একথা তিনি বলেছিলেন খণ্ডিত সমাজকে দেখে, পরবশ ক্ষুদ্রাশয় গৌণ-জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম। আমাদের দেশের ও যুগের পরিবেশে তাঁকে নিজেরই ব্যক্তিস্বরূপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল; তাতে হয়তো কোথাও কোনো ক্ষতি হয়েছে, হয়তো একেবারে স্পষ্ট, অকাট্য একটা ধারা তিনি খাড়া করেন নি, করতে চানও নি। কিন্তু তাঁর মন বেঁচেছিল বয়সের অভ্যাসিকতা থেকে, সেখানকার বাতায়ন ছিল চির-উন্মুক্ত, সচেতনে নববস্তুকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর কথা ভেবে তাই আজকের কবি বলেন :

কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা,
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ,
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ,

আর সেই "উদ্‌ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন" স্মরণ করে আহ্বান জানান :

তোমার আকাশ দাও, কবি দাও
দীর্ঘ আশি বছরের,
আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শতশিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ।...

("তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ"—বিষ্ণু দে)

ইন্দ্রপাত

বাংলার বড়ো দুর্দিন বলে চারিদিকে আজ এত আক্ষেপ, যে ইচ্ছা করে নানা ক্ষেত্রে দুর্গত বাংলারও যে গরিমা রয়েছে, তার কথা শুনি। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যজীবনেও অন্ধকার নেমে এসেছে; অতি দ্রুত পরম্পরায় এমন দুজন ব্যক্তির তিরোধান ঘটেছে যাঁরা ছিলেন স্বকীয় ক্ষেত্রে ইন্দ্রতুল্য। ইন্দ্রপাত বললে যে-দুর্বিপাক বোঝায়, তা ঘটেছে আমাদের সাহিত্যে।

রাজশেখর বসুর মৃত্যু হয়েছে পরিণত বয়সে; প্রায় অশীতিবর্ষ তিনি অতিক্রম করেছিলেন। আয়ুর দিক থেকে এ-বিষয়ে অনুযোগের কোনো কারণ নেই, কিন্তু "পরশুরাম" ছদ্মনামে অকস্মাৎ আবির্ভাবের সময় থেকে বাংলাসাহিত্যে ত্রিংশবৎসরাধিক কাল যে অনন্য আসন তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার শূন্যতা কেবলই পীড়া দিতে থাকবে।

"গড্ডলিকা" আর "কজ্জলী" যখন প্রকাশ হয়েছিল, তখনকার কথা অনেকেরই মনে পড়বে। কোথা থেকে সোনার কলম হাতে নিয়ে এ যুগের পরশুরাম দেখা দিলেন, চারিদিক যেন ঝলমল করে উঠেছিল। বাংলা ভাষায় হাস্যরস যে এত স্বচ্ছ, এত সুস্থ, এত তীক্ষ্ণ অথচ অত অনাবিল হতে পারে তা তো পূর্বে জানা ছিল না! যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের তুলি যে ভাবে সেই কলমের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে পরশুরামের আশ্চর্য রচনাকে বিচিত্রিত করেছিল, তাও এখানে স্মরণের অপেক্ষা রাখবে।

"শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" থেকে আরম্ভ করে তাঁর শেষ গল্প পর্যন্ত পরশুরামের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি ও একান্ত সত্যনিষ্ঠার যে পরিচয় মেলে, তার তুলনা যে-কোনো সাহিত্যেই বিরল। সর্বত্র যে সমান শিল্পোৎকর্ষ দেখা গেছে তা নয়; হয়তো "গড্ডলিকা" আর "কজ্জলী" সম্বন্ধে বলা যায় যে পরশুরাম প্রতিভার সবচেয়ে প্রসন্ন প্রকাশ সেখানে আমরা দেখি। কিন্তু এই শিল্পীর দৃষ্টি ও বাক্যে কোথাও শৈথিল্য ঘটে নি। অল্প কথায় গোটা মানুষের ছবি পাঠকের মনের পর্দায় এঁকে দেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন।

মানুষের জীবনের যে হাজার অসঙ্গতি ও আতিশয্যের সাক্ষাৎ মেলে, তাই নিয়ে হাস্যরসের অবতারণা আমাদের সাহিত্যে পরশুরামের পূর্বে যে খুব কম দেখা গেছে, তা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কৌতুকরস পরিবেশনে পরাঙ্মুখ হন নি। কিন্তু পরশুরামের স্বকীয়তা বাংলা রচনার প্রতিভায় যেন একান্ত নব উন্মেষের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। কৃতী লেখক শুধু পাঠককে হাসিয়ে ক্ষান্ত হন না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়েও তোলেন। পরশুরামের জীবনবোধে যে সততা ও বস্তুনিষ্ঠা ছিল, তারই জোরে তাঁর কৌতুকবাণের লক্ষ ছিল অব্যর্থ। এমন অন্তর্দৃষ্টি, এমন মানবিকতা, বুদ্ধি ও বিবেকের এমন প্রখরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন ঔদার্য, একত্র সন্নিবিষ্ট দেখতে পাওয়া আমাদেরই সৌভাগ্য।

ছদ্মনাম ছেড়ে রাজশেখর বসু যখন "চলন্তিকা" সংকলন করলেন, রামায়ণ-মহাভারত এবং মেঘদূত মূল সংস্কৃত থেকে সরল বাংলা গদ্যে অনুবাদ করলেন, লঘুগুরু ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখলেন, তখন যে তিনি ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছিলেন, তা নয়। উভয় ক্ষেত্রে একই জীবনবোধের প্রকাশ যে আমরা দেখি, তাতে সন্দেহ নেই। 'জাবালি' কাহিনী যিনি গল্পচ্ছলে লিখেছেন, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত মহাভারতের সারানুবাদ এবং তার অনবদ্য ভূমিকাতে তাঁকেই স্বনামে দেখা গেছে।

রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন : "এই দুই গ্রন্থের রচয়িতারা নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসক্তভাবে সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ প্রভৃতি জীবনদ্বন্দ্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনে অনাসক্তি সঞ্চার করা। তাঁরা শ্মশান-বৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেন নি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্তচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন—

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥ (স্ত্রীপর্ব)

—সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়।''

কোনো ভারতবাসীর পক্ষে এই অনাসক্তি সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যবোধ সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই যে অনাসক্তি চিত্তবৃত্তিকে সংযমিত করে মানুষের মহিমাকেই প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু হয়তো বলা চলে যে জীবন ও চিন্তার সর্বোচ্চ স্তরে এই অনাসক্তি মানুষকে একটু বেশি আত্মকেন্দ্রিক করে ফেলে, সমাজের কলুষমোচনের কাজে শুধু ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনেরই গুরুত্ব অনুভব করায়। রাজশেখর বসুর মতো যুক্তিবাদী মনস্বী তাই সমাজচিন্তায় লিপ্ত হয়ে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই সমষ্টিগত দিক থেকে সমাজের বাস্তব পরিবেশ তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে নি। তাই শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেও তিনি কখনো শ্রমিকের ভূমিকা সম্বন্ধে যথার্থ অবহিত হতে পারেন নি। নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেও ইতিহাসে বিপ্লবের স্থাননির্ণয়ে তিনি অসমর্থ ছিলেন, মানবিকতার পথে যে শ্রেণীগত বাধা আছে তা তিনি বোঝেন নি। 'ধর্মশিক্ষা' নামে তাঁর যে শেষ নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল, তাতে পরম সততার সঙ্গে বিপ্লবোত্তর চীনে নৈতিক উন্নতির কথা স্বীকার করেও সমাজে শোষণব্যবস্থাকে নির্মূল করার যে সমস্যা এবং আনুষঙ্গিক জটিলতার সমাধান-চেষ্টায় সাম্যবাদের অবদান তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি; সংস্কারমুক্তি বিষয়ে যাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম, তিনিও শ্রেণীচিন্তার নিগড় থেকে পরিপূর্ণ নিস্তার পান নি, চিন্তার গতানুগতিকতার লক্ষণ তাঁর ন্যায় প্রাজ্ঞজনের মধ্যেও সংক্রামিত হতে দেখা গেছে।

এ-বিচার অল্পপরিসরে সম্ভব নয়, এখানে তার প্রয়োজনও নেই। অমিত প্রতিভা নিয়ে রাজশেখর বসু আমাদের মধ্যে এসেছিলেন। বাংলাভাষা যতদিন থাকবে,, ততদিন তাঁর স্মৃতি অক্ষয়। সততা, সুবুদ্ধি, সৌজন্যে মণ্ডিত তাঁর মনীষার কথা ভেবে আমাদের অহংকারের অন্ত নেই। কিন্তু এ হল ভবিষ্যতের কথা; বর্তমানে তাঁর তিরোভাব প্রকৃতই যেন বাংলা সাহিত্যকে নিঃস্ব করে দিয়েছে।

*   *   *

দ্বিতীয় যে দিক্‌পালের মৃত্যু হয়েছে, তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর ক্ষেত্রে ষষ্ঠিবর্ষপূর্তি হতেও বিলম্ব ছিল; তাই অকালবিয়োগব্যথা দেশের অভাববো[illegible]কে সুতীব্র করেছে। আমরা অনেকেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বৈদগ্ধ্যে আকৃষ্ট হয়েছি, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আস্বাদ পেয়েছি, কেউ কেউ হয়তো অন্তরঙ্গতার সুযোগ পেয়েছি। তাই এক অন্ধকার প্রত্যূষে সুধীন্দ্রনাথের একান্ত আকস্মিক তিরোধান সংবাদ যখন এসেছিল, তখন প্রকৃতই স্বজনপ্রয়াণের বেদনা অনুভব করেছি।

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা যথাযথ অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রয়োজন। আমাদের কবিকুল ইতিমধ্যে নিজেদের তাগিদেই তা কিছু পরিমাণে করেছেন, সমসাময়িক কবিতাতে তার স্বাক্ষর রয়েছে। ভাব ও ভাষার সংযম, শব্দ চয়ন ও গঠনে ঋজুতা, আবেগের সহজ লাস্যকে বর্জন, সমগ্র কবিতার অবয়ব সম্বন্ধে লক্ষ, তাঁকে যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তা বাংলা রচনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মহার্ঘ, বহুদিন তার দীপ্তি পরিলক্ষিত হবে। পরিমাণে সুধীন্দ্রনাথের রচনা প্রাচুর্যের দাবি রাখে না; "তন্বী", "অর্কেস্ট্রা" থেকে "দশমী" কাব্যগ্রন্থ এবং "স্বগত" এবং "কুলায় ও কালপুরুষ" প্রবন্ধ সংকলন ছাড়া হয়তো কয়েকটি মাত্র লেখা বিভিন্ন

পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ সাহিত্যপ্রতিভার দীপ্ত রশ্মি সেই পরিমিত রচনাকেই স্মরণীয় করে রাখবে।

অনায়াস প্রেরণার প্রসাদে কাব্য রচনার বহুলপ্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের অসীম ভাণ্ডার থেকে হয়তো বা অজ্ঞাতে অল্প কিছু আহরণ করে এনে তাকেই এক সহজ সম্ভারে পরিণত করার প্রলোভন অনেকে সংবরণ করতে পারেন নি। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা গেল তিনি বৈদগ্ধ্যের ভক্ত, প্রেরণা আজ যে মানসিক পরিশ্রম বিনা লভ্য নয়, এ-ধারণা তাঁর প্রতি মজ্জায়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে তিনি তাই লিখলেন : ''বিশ্বের যে আদিম উর্বরতার কল্যাণে গাছ একদিন বাড়ার আনন্দেই আকাশের দিকে হাত বাড়াত, সে উর্বরতা আজ আর নেই, সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু আর জন্মায় না।''

সুধীন্দ্রনাথ ''পরিচয়'' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একাদশ বৎসর কাল তিনি শুধু এর সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃতই প্রাণস্বরূপ। স্বল্পশক্তিতে যতদূর সম্ভব, আমাদের লেখকরা ''পরিচয়''-এর নির্বন্ধাতিশয্যেই ''সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে'' মনের খোরাক আর অনুভূতিকে গভীর ও প্রখর করার উপকরণ সংগ্রহের উদ্যোগে নেমেছিলেন। সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষা ব্যাপারে ''পরিচয়'' অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও বিদেশের কর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করে বর্তমানের খরস্রোত ও জটিল জীবনের মূল ব্যঞ্জনার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এজন্য যদি কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হয় তো তিনি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বহু মৌল ব্যাপার নিয়ে আমাদের মতান্তর হয়েছে, কিন্তু মনান্তর কখনো ঘটে নি। বেশ কিছুকাল থেকে আমাদের মতের পার্থক্য খুবই বেড়েছিল, উভয়ের সমাজচিন্তার মধ্যে যোগসূত্র প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, নানা অনিবার্য কারণে যোগাযোগও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরস্পরকে আমরা ভ্রান্ত মনে করেছি, বিপথগামী বলে হয়তো ধিক্কার পর্যন্ত অনুভব করেছি, কিন্তু চিন্তা ও কর্মে কূট অভিসন্ধি সন্দেহ করে কটূক্তির প্রবৃত্তি আমাদের কখনো হয় নি।

প্রায় বিশ বৎসর আগে সাম্যবাদ সম্বন্ধে আস্থা তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য কখনো তিনি সাম্যবাদকে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ত্রিশের যুগে সেদিকে যে তিনি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মার্ক্সের দর্শন সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল, সাম্যবাদে ব্যক্তিসত্তা বিপন্ন হবে, এই আশঙ্কা তাঁর কখনো দূর হয় নি। তাঁর মনোবৃত্তিতে ইয়োরোপের অষ্টাদশ শতকের প্রভাব অল্প ছিল না; তাই মার্ক্সীয় সিদ্ধান্তের মাহাত্ম্য অস্বীকার না করেও তিনি সমসাময়িক জীবনের জটিলতা থেকে নিস্তার চেয়েছিলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক যুক্তিবাদের অস্বস্তিকর আশ্রয়ে। সেখানেও অবশ্য শান্তি মেলে নি; ''অগ্রজের অটল বিশ্বাস'' ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, অথচ সেই বিশ্বাস বিনা জীবনের খেই তখন হারিয়ে গেছে। তাই সৌজন্য তাঁর সহজাত হলেও সর্বজন থেকে অনপনেয় পার্থক্যবোধের বিড়ম্বনা থেকে তিনি কখনো মুক্তি পান নি। তাই তিনি দেখলেন যে কবি যেন একা, দুঃসাহসী এবং সংসার-বিচ্ছিন্ন থেকে সৌন্দর্যের দরজা আগলে রয়েছে। ''তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হলেও সে আমাদের নমস্য।'' (স্বগত)

এই উক্তিতে শক্তির অভাব নেই, কিন্তু রোদন যেন এর প্রতি রন্ধ্রে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা যে প্রায়ই মৃত্যুর সুরে অনুরণিত, তাতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই;

> মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
> সংক্রমিত মড়কের কীট;
> শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।

অনেককে হয়তো মনে পড়িয়ে দিতে হবে যে ১৯৩৮ সালের শেষে কলকাতায় যখন প্রগতি লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় অধিবেশন হয়, তখন সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সভাপতিমণ্ডলীতে। উনিশ শতকের ভারতীয় ভাবধারা সম্বন্ধে এক উপাদেয় প্রবন্ধ সেখানে তিনি পাঠ করেন, প্রগতি লেখক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। খুব স্বচ্ছ মনে গ্রহণ না করতে পারলেও প্রগতি লেখক আন্দোলনকে তিনি অবজ্ঞা করেন নি, করলে সভাপতিমণ্ডলীতে যোগ দিতেন না, উর্দু কবি মজাজ্ এবং আলি সর্দার জাফ্‌রিকে (তখন একেবারে তরুণ) নিজগৃহে সাদর আতিথ্য দিতেন না। সাম্যবাদের প্রভাবে সাহিত্যিকদের চিন্তা ও বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হতে দেখে তিনি হয়তো তখন আশান্বিতই হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে যখন প্রায় অনিবার্যভাবে সেই আশাভঙ্গের উপক্রম ঘটল, তখন তিনি স্রেফ হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো মনের মালিন্য তাঁর ছিল না। কিন্তু সাম্যবাদীদের সঙ্গে যে আদর্শগত নৈকট্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা আর রইল না।

মহাভারতের কর্ণ কবচ ও কুণ্ডল ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জন্ম হতেই প্রকৃতি ও পরিবেশ তাঁকে সাহায্য করেছিল; রূপ, গুণ, আর্থিক সঙ্গতি, বন্ধুভাগ্য, কবিকৃতি, কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর ছন্দস্বচ্ছন্দ সংস্কৃতিসমৃদ্ধ আবির্ভাব তাই এক স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু দুগ্ধভাণ্ডে বিন্দুমাত্র গোমূত্র পতনের মতো তাঁর প্রতিভাকে খণ্ডিত ও বিকৃত করল চলমান জীবনকে শিল্পী হিসাবে হৃদয়ঙ্গম করার অসামর্থ্য। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবাস্তব মোহ উপস্থিত হয়ে তাঁকে ভারতবর্ষের মর্মবাণীর গরিমাবোধ থেকেও যেন বঞ্চিত করল। এই বহুগুণান্বিত ব্যক্তিকে তাই কক্ষচ্যুত হয়ে দেখা গেছে সরকারি দফতরে, বিদেশি কর্তৃত্বে বিদেশি ভাষায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে। হয়তো কিছু স্বস্তি পেয়েছিলেন শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প কয়েকজন ছাত্রকে সাহিত্য পড়াতে গিয়ে। কিন্তু আশঙ্কা হয় যে জীবনবোধে যে সৌম্য-শান্তির প্রয়াস তিনি করেছিলেন, তার প্রকৃত সন্ধান তিনি পান নি।

এ কথায় হয়তো অনেকে আশ্চর্য হবেন, কারণ সুধীন্দ্রনাথ একা বিমর্ষ হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতেন না, তাঁর এদেশি ও বিদেশি বন্ধুসংখ্যা ছিল প্রচুর, তাঁর প্রফুল্ল, অসংকোচ কথোপকথন সকলেরই ভালো লাগত। কিন্তু আমার জানা মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশি মনে হত যে তিনি বাস করতেন Bernard Shaw-কথিত Heartbreak House-এ। ("This agonising house, this strangely happy house, this house without foundations, I call it Heartbreak House.")

একটু অসংলগ্ন আর আবছা ভাবে লিখতে হল, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুবিন্যস্তভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে আজ সম্ভব নয়। শুধু শেষ করব এই বলে যে এই অসামান্য বান্ধবের মৃত্যুতে মনে হয় যেন আমাদেরও জীবনের একাংশ সমাপ্ত হয়ে গেছে'

ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল

আজকের পরিস্থিতি-কণ্টকিত আর বিবৃতি-বিড়ম্বিত এই যুগে ক্রিকেট সম্বন্ধে লিখতে বেশ একটু যেন স্বস্তি বোধ হচ্ছে। লিখতে যে মন চাইছে, তার প্রধান কারণ হল দুটো। এই কদিন আগে কানপুরে অস্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্টে আমাদের খেলোয়াড়রা জয়ী হয়ে ভারতের মলিন মুখচন্দ্রমাকে উদ্ভাসিত করেছে, ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সম্প্রতি ক্রমাগত যে লাঞ্ছনা আমাদের সহ্য করতে হয়েছে তাকে দূর করার সম্ভাবনা দেখিয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে দলীপসিংজীর মৃত্যু উপলক্ষে লেখা নেভিল কার্ডস্-এর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল : বাংলাভাষায় এমন লেখা আমরা কবে দেখব!

ক্রিকেট-লেখক হিসাবে নেভিল কার্ডস্ হলেন একেবারে অনন্য; আর কারো লেখায় ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল এমন শোভা নিয়ে দেখা দিয়েছে বলে জানি না। দুটি বিষয়ে তাঁর লেখার খ্যাতি; এক হল ক্রিকেট, আর দ্বিতীয় হল সংগীত। তাল, মান লয়ের কারবার যা শোনা যায় শুধু তাই নিয়ে নয়, যা শোনা যায় না, তা নিয়েও। সংগীত আর ক্রিকেটের যে নৈকট্য, তা হয়তো একটু মন দিয়ে ভাবলে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

জবরদস্ত বন্ধুবান্ধব এসব কথায় পলায়নী মনোবৃত্তি লক্ষ করে রুষ্ট হবেন। কিন্তু লৌকিক শাস্ত্রেই তো বলে যে অনেক সময় পালিয়ে বাঁচা যায়। সংগীতেরই মতো ক্রিকেটের মধ্যে হয়তো এই পলায়নী ভাব কতকটা আছে; প্রচুর অবসর নিয়ে সেই অবসরের চর্চা উভয় ব্যাপারেই একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে ক্রিকেটের উপর আমাদের অনেকে খড়্গহস্ত ছিলেন। 'ছিলেন' বলছি এ জন্য যে রাজনীতিকেরা কানপুরে ভারতীয় দলের জয় নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন—আশ্বাস হচ্ছে যে ক্রিকেটের নামে যাঁরা নাসিকাকুঞ্চন করতেন, তাঁরা হয়তো একটু ভোল বদলানো দরকার মনে করছেন।

নিজেই যখন রাজনীতি ব্যাপারে লিপ্ত রয়েছি, তখন আমার পক্ষে রাজনীতিকদের সম্বন্ধে এই কটাক্ষ অবান্তর ও অসঙ্গত মনে হতে পারে।

কিন্তু বড়ো দুঃখেই এভাবে লিখতে হয়েছে। হয়তো অনেকেরই স্মরণ হবে যে বছর চারেক আগে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান রায় কয়েকজন পার্শ্বচরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন যে কলকাতার ইড়ন্ গার্ডন্সে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি সর্বৈব খেলার জন্য একটা স্টেডিয়াম বানানো হবে। যে অকর্মণ্যেরা রঞ্জি স্টেডিয়ামকে অসম্পূর্ণ করে রেখেছে, তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া এবং কলকাতার মানুষের বহুদিনের কামনা স্টেডিয়াম তৈরি করে সুখ্যাতি পাওয়া, এই দুই পাখি এক ঢিলে মারার মতলব তখন বেশ এগিয়েছিল। আমার বেশ মনে আছে যে ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের বড়ো কর্তা শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ ফতোয়া দিলেন যে শীঘ্রই ইড়ন্ গার্ডন্সে হরেক রকম খেলাধুলার জন্য "composite stadium" তৈরি করা হচ্ছে। কলকাতার লোক ফুটবল-পাগল, সুতরাং স্টেডিয়ামের দরকার যখন খুবই বেশি, তখন যেখানে হোক যেমন করে হোক, স্টেডিয়াম বানানো হোক, এই হিসাব করে, এবং কংগ্রেসদল একাই যাতে স্টেডিয়াম তৈরির জন্য বাহবা

না পায়, সেজন্য তখন ডাইনে এবং বাঁয়ে যত পার্টি আছে, তারা কেউই "composite" স্টেডিয়মের বিরোধিতা করল না। তারা সবাই ভুলে গেল যে আমাদের এই নরম মাটির দেশে একই 'পিচ'-এ ছয়মাস ফুটবল খেলার পর ক্রিকেটের দফা রফা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ভুলে গেল যে কলকাতায় ভালো জিনিস যখন প্রায়ই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তখন ক্রিকেটের পক্ষে সব চেয়ে সরেস যে 'পিচ' এখানে রয়েছে তাকে নষ্ট করা একটা রীতিমতো অপরাধ। যাই হোক, সুযোগ বুঝে বিধানবাবু এগিয়ে চললেন, ইড্‌ন্ গার্ডন্‌স্ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি বলে দিল্লীতে তদ্বির করলেন, দুনিয়ার মধ্যে সেরা এই ক্রিকেট 'পিচ'-এর দিন ফুরিয়ে এসেছে বুঝে ক্রিকেটের প্রতি যাঁদের প্রকৃত দরদ তাঁরা অসহায় বোধ করলেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে তখনকার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, কেন্দ্রের একজন ডেপুটি মন্ত্রী (যিনি পূর্বে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেটে নেমেছিলেন) আমায় বললেন যে কংগ্রেস দলে বিধানবাবু এমনই হোমরাচোমড়া ব্যক্তি যে তাঁর জেদকে ঠেকানো বিশেষ মুশকিল আর প্রধানমন্ত্রীর কানে কথাটা ভালো করে না তুললে উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েই হস্তক্ষেপ করানো হয়েছিল। ইড্‌ন্ গার্ডন্‌সের 'পিচ্' বাঁচল এইভাবে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য মেলে নি, বরং সে তরফ থেকে এসেছিল বাধা।

যাই হোক, এসব কথা লিখতে বসি নি, একটু অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এসে গেল। কানপুর টেস্ট ম্যাচে জাসু পাটেলের বোলিং আর আমাদের ভারতীয় দলের জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সুলক্ষণ দেখে এমন কথাই লিখতে মন যায়, যাতে অপ্রসন্নতা কেটে গিয়ে ক্রিকেটের জাদুকরীর ছোঁওয়া একটু মেলে।

ছেলেবেলায় আমাদের বইয়ে-ঠাসা বাড়িতে একখণ্ড "The Jubilee Book of Cricket" খুঁজে পেয়েছিলাম; লেখক স্বয়ং রঞ্জিৎসিংজী। বাড়ির উঠোনে এবং সামনের গলিতে জায়গা সংকুলান হলেও শীতকালে পরিত্যক্ত টেনিস বল নিয়ে ক্রিকেট চলত; তাকে 'বেলে-খেলা' বলাই উচিত, কিন্তু নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাতেই প্রায় মেতে থাকা যেত। আর মাঝে মাঝে শনি-রবিবার বাবার সঙ্গে ইড্‌ন্ গার্ডন্‌সেও যাওয়া হত; খেলা বিশেষ না বুঝলেও ক্রিকেট মাঠের তখনকার আবহাওয়ার সঙ্গে ছেলেবেলাতেই পরিচয় হয়েছিল।

ফুটবলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনই ক্রিকেটের বেলায় বলা চলে যে আমাদের স্বাদেশিকতাকে স্ফুরণ ও বর্ধন করতে এ-সব খেলার অবদান কম ছিল না। ইংরেজদের নিছক নিজস্ব খেলাতে আমাদের দেশের লোকের কৃতিত্ব দেখে বা তার গল্প শুনে তখন বুক দশ-হাত হত। এখনো মনে আছে, ইড্‌ন্ গার্ডন্‌সে খেলা দেখতে দেখতে কিংবা অবসরের সময় চারদিকে গল্প হচ্ছে বোম্বাইয়ের Quadrangular সম্বন্ধে—তখন হিন্দু, মুসলিম, পার্শী আর ইয়োরোপীয় এই চার 'জিম্‌খানায়' খেলা হত, দেশের সেরা খেলোয়াড়রা চারদিক থেকে বোম্বাইয়ে জড়ো হতেন। কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কিংবা ঝাল-চানা চিবোবার ফাঁকে গল্প হচ্ছে—ভিঠল আর নাইডুর ব্যাটিং কিংবা ওয়ার্ডেন আর বালুর বোলিং বিষয়ে। পুরানো কালের সমঝদাররা হয়তো বলছেন সে-সব দিনের কথা যখন বোম্বাইয়ের গভর্নর লর্ড হ্যারিস কলকাতায় ক্রিকেট টিম নিয়ে এসেছেন, কিংবা স্বয়ং রঞ্জি কলকাতায় খেলেছেন, কিংবা নাটোর আর কুচবিহারের মহারাজা, ফ্র্যান্ট টারান্ট আর বিধু মুখার্জি আর মণি দাস প্রভৃতি মহারথীদের ক্রিকেট মাঠে নামবার সুবিধা করে দিচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ান টারান্ট (Tarrant) বিলাতে মিড্‌ল্‌সেক্সের হয়ে খেলেছিলেন; সেকালে তিনি ক্রিকেটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চৌকস্ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন ছিলেন। আবছা মনে হচ্ছে যেন টারান্টকে বল দিতে

দেখেছি; বিধু মুখার্জির ব্যাটিং সম্বন্ধে গল্পই শুনেছি, চোখে কিছু দেখা যায় নি; আর মণি দাস তো সেদিন পর্যন্ত ছিলেন, ক্রিকেট এবং ফুটবলে তাঁকে অনেকবারই দেখেছি—বেশ মনে পড়ে ১৯২৭ সালে এম. সি. সি. দল যখন প্রথম এদেশে আসে, তখন বিশ্ববিখ্যাত বোলার মরিস টেট্ এক বলে মণি দাসের উইকেট উপড়ে ফেলায় আমাদের কত কষ্ট হয়েছিল।

আজকাল দেশবিদেশের টিম এখানে আসে, টেস্ট ম্যাচের পুরো রেওয়াজ চলেছে। কিন্তু তখন আমাদের অল্পে তুষ্ট থাকতে হত; 'বেঙ্গলি স্কুল্‌স্', 'ব্রিটিশ স্কুল্‌স্', 'অ্যাংলোইণ্ডিয়ান স্কুল্‌স্', এদের খেলা ছিল তখনকার সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার—রঞ্জি ট্রোফির মারফত প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা তো সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে। বোম্বাইয়ের 'কোয়াড্রাঙ্গুলার' ছিল ক্রিকেটের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা—তবে আমরা যখন স্কুলের উপরকার ক্লাসে পড়ি তখন বুঝি নাগপুরে হয়েছিল 'ট্রায়াঙ্গুলার' খেলা, সেখানে নাম করেন বাংলার হেমাঙ্গ বসু, বোধ হয় বিধু মুখার্জির পর সবচেয়ে খ্যাতিমান বাঙালি ক্রিকেটার ইনি। হেমাঙ্গবাবুকে খেলতে আমরা দেখেছি (ফুটবলেও ইনি রীতিমতো কৃতী), ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্‌ডিং-এ এঁর সমকক্ষ ছিল খুব কম। মনে পড়ে একদিন হেমাঙ্গবাবুকে ইডন্ গার্ডন্‌সে দেখি তাঁর পুরানো কলেজ বিদ্যাসাগরের হয়ে খেলতে। সে খেলায় নেমেছিলেন বিদ্যাসাগর কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, যিনি একদিকে ছিলেন রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের টিকাকার, আর অন্যদিকে বাংলাদেশে ক্রিকেটের প্রসারে সর্বাগ্রগণ্য। শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘকায় এই বৃদ্ধ উইকেটে দাঁড়াতেন ব্যাট কাঁধে নিয়ে, দেখে মনে হত যেন ডব্‌লু. জি. গ্রেস্ আবার এদেশে জন্ম নিয়েছেন। বাংলার ক্রিকেটে এই রায় বংশের অবদান অবিস্মরণীয়—বোলিং কুশলী অধ্যাপক শৈলজা রায়, ব্যাটিং এবং উইকেট-কীপিং-এ পারদর্শী নীরজা রায় প্রভৃতি গুণধরের নাম মনে পড়ছে।

খেলাধূলা যে শুধু একটা খেয়াল বা সাময়িক প্রমোদের ব্যাপার নয়, খেলা নিয়ে যে অভিনিবেশ দরকার, নিষ্ঠা, সাধনা পর্যন্ত প্রয়োজন, একথা বাঙালিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন একজন, যাঁকে সবাই আজ ভুলে যাচ্ছে, অথচ ময়দানে যাঁর প্রস্তরমূর্তি গড়া আমাদের কর্তব্য। তিনি হলেন দুখীরামবাবু; O. Mazumdar তাঁর এই পোশাকী নামটা বড়ো কারো জানার দরকার ছিল না। এরিয়ান্‌স্ ক্লাবের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা এই সরল, নিরহঙ্কার মানুষটির প্রায় তুলনা মেলে না। বাইসাইক্‌লে হেলান দিয়ে ছোটোখাটো মানুষটি ময়দানে আর ইডন্ গার্ডন্‌সে নিজের হাতে গড়া ছেলেদের খেলা দেখতেন, আর ক্রিকেটে তিনি জোর দিতেন ঠিক সেই গুণের উপর, যে গুণগুলোকে আমরা প্রায়ই অবহেলা করে থাকি। আজো পর্যন্ত আমাদের খেলায় একটা মারাত্মক দোষ হল আলসেমি—ব্যাট করতে গিয়ে বলের গতি লক্ষ করার ধৈর্য না থাকায় আমাদের আঙুল কামড়াতে হয়, বল দিতে গিয়ে যাতে তার দৈর্ঘ্যে (length) ঘাট্‌তি না পড়ে অথচ বলের উপর আঙুলের কাজ পুরোপুরি থাকে সেদিকে নজর আমরা প্রায়ই হারিয়ে বসি, ফিল্‌ডিং-এর সময় আমরা সাধারণত তৈরি থাকি না, হয়তো বা আশা করি যে বলটা যেন মাঠের অন্য কোনো দিকে ছুটে যায়। ভাবের ঘরে চুরি করলে যেমন তার ফল ভোগ করতে হয়, তেমনই মনের কোণে হয়তো অজ্ঞাতে এই আলসেমি থাকলে ক্রিকেটে তার দাম দিতে হয়—এর দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অনেক রয়েছে। এরই বিরুদ্ধে দুখীরামবাবু রুখে দাঁড়িয়েছিলেন; সঙ্গতি স্বল্প হলেও তাঁর চেষ্টার দাম তাই খুব বেশি।

কলকাতায় তখন মুশকিল এই যে খেলার মেয়াদ একদিন কিংবা আধদিন মাত্র। তারই মধ্যে ধৈর্য ধরে খেলার তেমন প্রয়োজন ছিল না বলে ক্রিকেটের কতকগুলো বড়ো গুণ আমরা অনেকেই আয়ত্ত করতে পারি নি। ভালো খেলোয়াড়রা আমাদের অনেকেই তাই রীতিমতো

মেজাজী লোক; হাত খুলে গেলে কয়েকটা খাসা 'মার' তাঁরা দেখাবেন বটে, কিন্তু টিকে থাকবেন কতক্ষণ তা নিয়ে সর্বদাই সংশয় থাকবে—চমৎকার মারের সঙ্গে সঙ্গেই দু-একটা আনাড়ী খোঁচা কিংবা অধৈর্য হয়ে ক্যাচ তুলে দিয়ে তাঁরা পালা শেষ করবেন। এই রোগ শুধু বাঙালির নয়, আমাদের দেশের প্রায় সব এলাকায় ক্রিকেটারদের বেলায় দেখা গিয়েছে—গণেশ বসু থেকে নির্মল চ্যাটার্জিকে (আজকের খেলোয়াড়দের নাম ইচ্ছা করেই বাদ রাখছি) আমরা দেখেছি। কিন্তু এঁদের চেয়ে অনেক সরেস খেলোয়াড় মুস্তাক আলীর মতো গুণী এই রোগ থেকে মুক্ত ছিলেন না। আজকাল তবু দু-একজন ব্যাট্‌স্‌ম্যান আছেন যাঁরা ভরসা হয় শুরুতেই নেমে কিছুক্ষণ টিকবেন এবং কিছু রান করবেন। কিন্তু প্রায় অর্জুনের মতো মনঃসংযোগ নিয়ে বল লক্ষ করার যে দৃষ্টান্ত ইংল্যান্ডের হবস্ আর সাট্‌ক্লিফ, কিংবা অস্ট্রেলিয়ার উড্‌ফুল আর পন্সফোর্ড রেখে গেছেন, তার ধারে কাছেও আমরা ঘেঁষার চেষ্টা পারতপক্ষে করতাম না। সাম্প্রতিক যুগে আমাদের বিজয় মার্চেন্ট (এবং কিছু পরিমাণে বিজয় হাজারে) এই গুণ আয়ত্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই নেভিল কার্ডস্ একবার বলেছিলেন (যদিও অন্য কয়েকটা কারণও ছিল), যে মার্চেন্ট হলেন আমাদের একমাত্র 'সাহেব' খেলোয়াড় (''India's only European'')।

দুখীরামবাবুর শিক্ষকতায় তদানীন্তন এরিয়ান্স ক্লাব জরুরি খেলায় প্রথম ব্যাটস্‌ম্যানদের কিভাবে সাবধানে খেলতে হয় তার পরিচয় দিত। ছনে মজুমদার, এম. মুখার্জি, আর (ফকির). মুখার্জি প্রভৃতি দর্শকদের খুশি হয়তো করতে পারতেন না, কিন্তু রান্ অতি স্তিমিত হারে করলেও উইকেট থেকে তাঁদের হটানো ছিল বেজায় শক্ত। মনে আছে একবার ক্যালকাটার উদ্ধত ক্যাপটেন, তখনকার একজন প্রকৃত ভালো খেলোয়াড় ল্যাগডেন ধৈর্য হারিয়ে একেবারে চটে উঠে 'আন্ডার হ্যান্ড' বল দিতে লাগলেন—ক্রিকেটের আইনে নাকি তাতে বাধে না, কিন্তু নীতিতে আর সৌজন্যে বাধে। যাই হোক, এরিয়ান্সের খেলায় আত্মরক্ষার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা যদি আমাদের তেজী ব্যাট্‌স্‌মানরা একটু আয়ত্ত করতেন তা সুফল ঘটত, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে খুব বেশি ফল আশা করাই অসঙ্গত হত।

ল্যাগডেন কিন্তু খেলতেন ভালো, ব্যাট্‌স্‌ম্যান হিসাবে হাত ছিল একেবারে দরাজ। ইংলন্ডে তিনি সারে কাউন্টির ক্যাপটেন ছিলেন, এদেশে টাকা করতে না এলে হয়তো কালে ইংল্যান্ডেরও টেস্ট ক্যাপটেন হতে পারতেন। সাহেবদের মধ্যে ভালো খেলোয়াড় তখন বেশ দেখা যেত; এ. এল. হোজি (Hosie) আগে খেলেছিলেন হ্যাম্পশায়ারে; আই. পি. এফ. ক্যাম্পবেল সারে-তে; সি. পি. জনস্টন্ কেন্টে। এদের খেলা সত্যই দর্শনীয় ছিল, যেমন ছিল এদেরই কিছু পরে কেন্টের টি. সি. লংফিলড্ কিংবা এফ. এম. গার্নেটের খেলা। বোম্বাইয়ে এরা যেতেন কোয়াড্রাঙ্গুলারে খেলতে; সেখানেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ক্রিকেটের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত।

কলকাতার ফিরিঙ্গীদের মধ্যে আগে হকি এবং ক্রিকেটেও চমৎকার খেলোয়াড় দেখা দিত; এখন কেমন যেন তাদের খেলা ম্রিয়মান হয়ে এসেছে। কাবেরী, গাই ফোর্ড, গল্‌ব্রেথ প্রভৃতির নাম অনেকের মনে পড়বে। মুসলমান ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে আসাদ আলীর কথা; কলকাতা কাস্টম্‌সের হয়ে হকিতে তো ইনি ছিলেন একেবারে অদ্বিতীয় ফরোয়ার্ড। ক্লাবগুলোর মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল এরিয়ান্স, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মোহামেডান, পার্শী, মোহনবাগান, কিছু পরে ইস্টবেঙ্গল, ভবানীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি এগিয়ে

চলল। রায় এবং বসু পরিবার ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের শিরদাঁড়া; কার্তিক বসু, গণেশ বসু প্রভৃতির খেলা ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়। এখনকার কজন জানে যে মোহনবাগানের হাবুল সরকার, গোষ্ঠ পাল ক্রিকেটেও কৃতী? সর্বভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বাঙালিদের মধ্যে প্রকৃত নাম করেছেন শুঁটে ব্যানার্জি, প্রবীর সেন আর পঙ্কজ রায়। কিন্তু অবস্থা অনুকূল থাকলে আরো অনেকে যে ক্রিকেটের খাতায় সোনায় না হলেও রূপোর অক্ষরে নাম লিখে যেতে পারতেন, তাতে সন্দেহ নেই।

কথা বলতে গেলে ফুরোয় না, আর আজকের যাঁরা পাঠক, তাঁদের এসব কথা শুনতে বিশেষ আগ্রহ না থাকতে পারে। কিন্তু একটু ক্লান্তিকর হলেও আগের দিনের কথার হয়তো কিছু দাম আছে। তিন-চার-পাঁচদিনের খেলা এখন প্রায়ই হচ্ছে, সেঞ্চুরিরও ছড়াছড়ি। কিন্তু ভাবতে মজা লাগছে যে একসময় আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম ইড়ন্ গার্ডন্‌সে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাট্‌স্‌ম্যান যেন সেঞ্চুরি করতে পারে। পূর্বেই বলেছি যে খেলার আগ্রহের সঙ্গে আমাদের স্বাদেশিকতা তখন একেবারে মিশে ছিল। যাই হোক, একদিনে দুই ইনিংস খেলা যখন নিয়ম, তখন সেঞ্চুরি সহজ ছিল না। অবশ্য সাহেবরা প্রায়ই করত; তাদের ধন্যবাদ যে অনেক ভালো মার তারা আমাদের দেখিয়েছে। ক্যাম্পবেলের অতি দ্রুত দৌড়, হোজির আত্মবিশ্বাস, ল্যাগডেনের বলের উপর প্রহার, 'এক্‌সট্রা-কভার' দিয়ে ন্যাটা জন্‌স্টনের একেবারে বিদ্যুৎগতি 'ড্রাইভ', সহজে ভুলে যাওয়ার জিনিস নয়। ইড়ন্ গার্ডন্‌সে দিশী হাতের সেঞ্চুরি না দেখে আমরা যখন ক্ষুব্ধ, তখন মনে আছে (বৎসরটা মনে নেই) একদিন মাদ্রাজ থেকে এক দল এল, ক্যালকাটার সঙ্গে খেলতে, আর তাদের মধ্যে পি. এ. কনিকম্ বলে একজন বেশ অবলীলাক্রমে সেঞ্চুরি করলেন—তখন এঁর খুব খ্যাতি, তারপর যেন নিভে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে সেই টিম কিংবা অন্য টিম (ঠিক মনে নেই) ক্যালকাটাকে ৫৯ রানে খতম করে দিল। বোধ হয় গোপালন্ নামে রীতিমতো মাথায় ঝুঁটি বাঁধা এক বোলার এই কাজে সব চেয়ে আগুয়ান হয়েছিলেন।

প্রথম যখন এদেশে এম.সি.সি-র আগমন ঘটল তখন তা নিয়ে সর্বত্র চাঞ্চল্য হয়েছিল খুব (১৯২৭)। ইড়ন্ গার্ডন্‌সে কদিন ধরে খেলা—বাঙালি আর ফিরিঙ্গিদের মিলিত টিমের সঙ্গে একদিন, ব্রিটিশ টিমের সঙ্গে একদিন, আর সারা ভারত টিমের সঙ্গে তিনদিন। এম. সি. সি. টিমের ক্যাপটেন ছিলেন গিলিগান, আর দলে নামজাদা খেলোয়াড় ছিলেন মরিস টেট, স্যান্ডহাম, ব্রাউন, গেয়ারি, অ্যাস্টিল, পার্সন্‌স্ প্রভৃতি। বাঙালি আর ফিরিঙ্গিদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ আশা ছিল না। তবুও অতটা ব্যর্থতার জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না। একা ব্রাউন আউট হতে এম. সি. সি. খেলা শেষ করল, স্যান্ডহাম করেছিলেন সেঞ্চুরি—'লেট্ কাট' ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, বেঁটে মানুষটি অব্যর্থ চোখের ভরসায় পিছু হটে এসে বলকে একটু এগুতে দিয়ে একেবারে তলোয়ারের ঘায়ে বাউন্ডারিতে পাঠালেন বহুবার। সারে কাউন্টিতে হব্‌সের জুড়ি যে তিনি, তা প্রমাণ করলেন। আমাদের নামকরা ব্যাটসম্যান প্রায় সবাই ব্যর্থ হলেন, কেবল নীরজা রায় এবং 'তাড়ু' মারের জন্য বিখ্যাত হাবুল মিত্র নির্ভীকভাবে ব্যাট চালিয়ে কিছুটা মান রাখলেন। হারলাম যে আমরা, তাতে আশ্চর্য হওয়া ঠিক নয়, কারণ, হারলাম আমরা সকলে—সর্ব-ভারতীয় টিমও বেশ বিস্তৃত ব্যবধানে পরাজিত হল।

যে সি. কে. নাইডুর খ্যাতিতে তখন দেশ ভরপুর, তাঁর খেলা দেখবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। বোম্বাইয়ে হিন্দু জিমখানা মাঠে (তখনো ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম তৈরি হয় নি) নাইডু এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে করেছিলেন ১১৬ রান—তার মধ্যে ছিল এগারোটা ওভার বাউন্ডারি আর চৌদ্দটা বাউন্ডারি! কলকাতার ইড্‌ন্ গার্ডনস্ হল ক্রিকেটের পীঠস্থান। এর মসৃণ, সুন্দর পিচের তুলনা নেই—কিন্তু এ-মাঠ যেন নাইডুর পক্ষে 'পয়া' নয়। যাই হোক, তিনি আউট হলেন মাত্র ন'টি রান করে (ন'য়ের গাঁট পার হওয়া সম্বন্ধে দর্শকের মধ্যে কত জল্পনা চলে)। কিন্তু তারই মধ্যে 'লেগ্‌-এর দিকে এমন একটি 'গ্লান্‌স্' দিয়েছিলেন, এমন অতর্কিতে তড়িৎস্পর্শে বল বাউন্ডারি পার হয়ে গেল, যে তা এখনো চোখের সামনে ভাসছে। এ এমন ধরনের একটি মার যা হল প্রকৃতই শিল্পগুণাক্রান্ত—নিখুঁত ঝল্‌সানির এ-ছবি যার হাত থেকে বেরোয়, তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা—যে কুহক রঞ্জির কব্জি থেকে বেরিয়ে ইংল্যান্ডকে চমৎকৃত করেছিল, তার মন্ত্র যেন এঁরও একেবারে অজানা নয়।

উচ্ছ্বাস হয়ে পড়ছে বলে একটু সংযত হতে চাইছি, কিন্তু এই উচ্ছ্বাস উদ্রেক করতে পারে বলেই তো ক্রিকেটের সার্থকতা। একেবারে পুরানো যুগের কথা জানি—কিন্তু ম্যাকার্টনে, উলে, ব্র্যাডমান থেকে হ্যামন্ড, হটন্, পিটার মে, উঈক্‌স্ ওয়ারেল, নীল হার্ভে প্রভৃতির খেলায় মাঝে মাঝে যে আলো ঝলসে উঠেছে, মুহূর্তের এক ভগ্নাংশকে যা সোনায় মুড়িয়ে দিয়েছে আর মানুষের মনকে ক্ষণেকের জন্যই পরম পরিতৃপ্তি দিয়েছে, তা নিয়ে উচ্ছ্বাস তো অসঙ্গত হতে পারে না।

এই সেদিন নেভিল কার্ডস্ লিখেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলন্ডের হয়ে টেস্ট ম্যাচে নেমে দলীপ সিংজীর খেলার কথা—"ত্রিশ বছর হয়ে গেল, কিন্তু বেশ মনে পড়ছে সেদিন বিকেলের রোদের মতোই দলীপের ব্যাটিং চারদিক আলো করেছিল।" সব চেয়ে উঁচু স্তরে উঠে আমাদের ভারতীয় ব্যাটিং একটা যেন নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে তাঁর মনকে বারবার নাড়া দিয়েছে। বোলার বলে যাঁর খ্যাতি সেই অমর সিং যখন ১৯৩২ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ব্যাট করেন তখন কার্ডস্ দেখেছিলেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ইন্দ্রজাল। ১৯৩৬ সালে বিজয় মার্চেন্ট এবং মুস্তাক আলী যখন একত্র রেকর্ড সৃষ্টি করেন, তখন আবার অপরূপ ভাষায় তার বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন—মার্চেন্ট তোমাদের মধ্যে 'সাহেব', তার গুণের অন্ত নেই, কিন্তু তোমাদের একান্ত নিজস্ব একটা ধারা আছে সেটা হঠাৎ দেখা যায় মুস্তাকের ভঙ্গিতে, তাকে হেলায় হারিও না, এ-কথাই তিনি বারবার বলেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত শুধু নিষ্ঠা আর অনুশীলনের জোরে নাইডু যে গুণকে অনেকটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, বোম্বাইয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট ম্যাচে একেবারে মনোহারী সেঞ্চুরি করে এবং বারবার প্রতিভার প্রস্ফুরণ দেখিয়েও অমরনাথের মতো খেলোয়াড় সে গুণ বজায় রাখতে পারেন নি। দুঃখ হয় এই দেখে যে যাঁদের তূণে ছিল অনেকগুলো অস্ত্র, যাঁরা নানান ঢঙে মার দেখিয়ে মাঠকে আলো করে রাখতে পারার ইঙ্গিত দেখিয়েছেন, সেই উমরিগর বা মঞ্জরেকর-এর মতো কৃতী, হয়তো সুযোগ কিংবা অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের আশা পূরণ করতে পারছেন না।

উইস্‌ডেন-এর খাতায় ক্রিকেটের শিরোপা-পাওয়া বলে যাঁদের সম্মান করা হয়েছে তার মধ্যে আছেন নাইডু, মার্চেন্ট আর মানকড়। ক্রিকেটের কীর্তিকথায় রঞ্জিৎ সিংজীর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবাসীর স্থান অল্প হলেও নগণ্য একেবারে নয়। ইংল্যান্ডের খেলায় আছে

এক ধরনের গাম্ভীর্য—অনুষ্ঠানে যাতে ত্রুটি না ঘটে, মন্ত্রোচ্চারণ যাতে বিকৃত না হয়, ব্যবস্থাপনা যেন নিখুঁত হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি আর এতে তাদের কৃতিত্বও বিপুল। অস্ট্রেলিয়ার খেলা আরো স্বচ্ছ, আরো শাণিত, কিন্তু ইংল্যান্ডের মতো নিয়মিত নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় লক্ষ করা যাবে সরল প্রাণের উচ্ছলতা, মনের সহজ একাগ্রতা, আর দুঃখ সুখের তড়িৎ প্রতিফলন। পাকিস্তানের তরুণ দলে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ধারা কতকটা পরিমাণে যেন আজ মিশেছে মনে হয়। ভারত সম্বন্ধে কিছু বলতে সংকোচ হয়; একদা আমরা ছিলাম মেজাজী, উত্তুঙ্গ প্রতিভার সঙ্গে আমাদের খেলায় মিশে থাকত অমার্জনীয় শৈথিল্য, তাই পরাজিত হয়েও আমরা কখনো অপমানিত হই নি—কিন্তু আজ যেন আমরা সদা সংকুচিত, অনিশ্চিত, ত্রস্ত, আত্মশক্তি বিষয়ে একান্ত অচেতন। কানপুর টেস্টে বিজয় যদি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে তো তার চেয়ে আনন্দের বস্তু অল্পই থাকবে।

১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডে যখন ভারতীয় ক্রিকেটাররা যান তখনকার কথা বেশ মনে পড়ছে। লর্ডস্ মাঠে প্রথম খেলায় নেমে নাইডু সেঞ্চুরি করলেন; কাগজে লিখল যে তাড়াতাড়ি রান দরকার হলে সারা দুনিয়ার টিমে নাইডুকে চাই-ই চাই। অলিতে-গলিতে ছোটো ছেলেরা ইটের উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলছে—কেউ বলছে আমি হ্যামন্ড-আর কেউ কেউ বলছে আমি না-যু-ডু (Nayudo)। আমাদের টিমে নাইডু একক নন একেবারে; সঙ্গে ছিলেন ওয়াজির আলী, নাজির আলী, মহম্মদ নিসার, নাওমল, জাহাঙ্গীর খান, অমর সিং, লাল সিং প্রভৃতি। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, ক্ষিপ্রতায়, কৌশলে এই টিম সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছিল। ধীর, সুস্থির, নির্ভুল পদ্ধতিতে ব্যাট করতেন ওয়াজির; তিনি যেন ছিলেন মার্চেন্টের পুরোধা। আজ আমরা দ্রুত বোলিং-এর ভয়ে কাঁপি, একজনও প্রকৃত 'ফাস্ট্' বোলার দেখাতে পারি না। কিন্তু সেদিন ছিলেন নিসার, যাঁর ''ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ'' উপস্থিতি মাঠের চেহারাকে যেন বদলে দিত, বিপুল দেহে অমন ক্ষিপ্রগতিতে এবং সুকৌশলে বল যে কত ভালো দেওয়া যায় তা ছিল দেখবার মতো। তাঁরই সহযোগী অমর সিংয়েরও তুলনা আজ পর্যন্ত এদেশে মিলল না। ফিল্ডিং-এ ১৯৩২ সালের টিম ছিল চমৎকার; বোধ হয় লাল সিং এ-ক্ষেত্রে ছিলেন সব চেয়ে কৃতী। নাজির আলী ব্যাট; বল এবং ফিল্ডিং তিন ব্যাপারেই ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। জাহাঙ্গীর খাঁনের কৃতিত্বও ভুলবার নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে সেই টিমের এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যাতে পরাজয়ও গ্লানি বহন করে আনত না।

ফাস্ট্ বোলিং সম্পর্কে আজকের ভীতি খারাপ লাগে এই জন্য যে এক সময় আমরা ফাস্ট্ বোলিংকেই পছন্দ করতাম, স্লো বোলিংয়েই কতকটা হতভম্ব হতাম। আমাদের বোলাররা অধিকাংশ ছিলেন 'মিডিয়ম্ ফাস্ট্' কিংবা 'ফাস্ট্'। এই সেদিনও শুঁটে ব্যানার্জি তাঁর গুণের পরিচয় দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। মনে আছে ১৯২৭ সালে আমাদের একমাত্র 'স্লো বোলার' (ভারতীয় টিমে) ছিলেন পার্শী জামসেদজী। আজ একেবারে ফাস্ট্ বোলিং ব্যাপারে আমাদের দুর্ভিক্ষ পড়ে গেছে। একটা অজুহাত শুনি যে পাঞ্জাবের মতো উত্তর ভারতীয় অঞ্চলে শীত বেশি বলে সেখানে মেহনতী ফাস্ট্ বোলারের সন্ধান পাওয়া সহজ, কিন্তু পাঞ্জাবের একাংশ আজ পাকিস্তানে বলে আমাদের বিপদ ঘটেছে। এ কথা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত যে বোম্বাইয়ের গরমে যাঁরা ক্রিকেট খেলে এবং চমৎকার খেলেন, তাঁরা চেষ্টা করে জোরে বল দেওয়া আয়ত্ত করতে পারেন না। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্য থেকে অনেক ভালো ক্রিকেটার এসেছেন; তাঁরা পরিশ্রমী নয় তা বিশ্বাস

করি না। পাঞ্জাব ছাড়াও রাজস্থানে, কোনো কোনো তেলুগু ও তামিল এলাকায়, কুর্গের মতো জায়গায় প্রকৃত পরিশ্রমী, দীর্ঘকায় ব্যক্তির অভাব নেই; তাদের মধ্যে বোলার খুঁজে পাওয়া যায় না? বাংলাদেশে আমরা অনেকেই হ্রস্বদেহ হতে পারি, কিন্তু শুঁটে ব্যানার্জিকে তো বাঙালিদের মধ্যে ব্যতিক্রম বলা যায় না। ফাস্ট্ বোলারের অভাবের কারণ আছে অন্যত্র, কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ কোনো চিন্তা কোথাও নেই, যাদের হাতে ক্রিকেট ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার রয়েছে সেই কন্ট্রোল বোর্ডের তো নিশ্চয়ই নেই।

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তা দেখে একটু ঈর্ষা হলেও আনন্দ হয়। পাকিস্তান আর ভারত তো প্রকৃত প্রস্তাবে স্বতন্ত্র নয়। আজ সারা দুনিয়া থেকে বাছাই করা টিমে হানিফ মহম্মদ কিংবা ফজল মাহমুদ জায়গা পাবেন। ভারতের কেউ বোধ হয় পাবেন না (বর্তমানে অস্তমিত সুভাষ গুপ্তে কিংবা জাসু প্যাটেল কি চমক জাগিয়ে চলতে পারবেন?)। তা হলেও পাকিস্তান যদি আগুয়ান্ হতে পারে তো ভারতের পিছিয়ে পড়ে থাকা নিশ্চয়ই অনিবার্য নয়।

খেলার ধারা সম্ভবত সব দেশেই আজ বদলেছে, আর তাই সর্বত্র অভিযোগ শোনা যাবে যে আগেকার মতো "strock play" আর দেখা যায় না—লার্উডের পিস্তল ছোঁড়া বলের সামনে দাঁড়িয়ে চমৎকার মার দেখাতে যারা পিছপাও হত না, তাদের উত্তরাধিকারীর যেন কেউ আজ নেই। হয়তো আজকের জীবন আগের চেয়ে জটিল বলে ক্রিকেটেও তার ছায়া পড়েছে—যে ইংল্যান্ডে পেশাদার খেলোয়াড়রা বহু বৎসর ধরে খেলতেন, তাঁদের মধ্যেও যেন ক্লান্তি এসেছে, হব্‌সের মতো একাদিক্রমে খেলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আর মিলছে না, আর আমাদের নাইডু যে বৃদ্ধ অবস্থাতেও খেলছেন (হয়তো আজো কোথাও খেলছেন) তা যেন একটা রহস্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এককালে যাঁরা ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এখন তাঁরা আর নেই। ইন্দোরের সৈন্যবাহিনীতে নাইডু, মুস্তাক প্রভৃতি কাজ নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলার চর্চা করেছেন। ওয়াজির, নাজির প্রভৃতি ভূপালে কাজ করেছেন অর্থাৎ ক্রিকেট খেলেই অন্নদাতাকে তুষ্ট রেখেছেন। এই রাজা-বাদশার দল আর আগেকার অবস্থায় নেই; বাংলাদেশে নাটোর আর কুচবিহারের কল্যাণে যে ক্রিকেটের উৎকর্ষ বাড়বে, তার সম্ভাবনা নেই। ক্রিকেটের সংবর্ধন উদ্দেশ্যে বিকল্প ব্যবস্থার তাই প্রয়োজন।

এ-ব্যাপারে বহুজনের যে আগ্রহ নেই তা প্রমাণ হয়েছিল যখন ইড্‌ন্ গার্ডন্‌সের অদ্বিতীয় ক্রিকেট পিচ্ বিপন্ন হয়েছিল। কিন্তু আবার যখন টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য রাত জেগে 'কিউ' করে টিকিট কেনার খবর আসে তখন মনে হয় যে আশা হারানো ভুল হবে। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে ভিড় লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে হুজুগপ্রিয়ের দল সেখানে জড়ো হয়েছে, সাজ পোশাক আর চেহারার পারিপাট্য দেখা বা দেখানোই অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য, ক্রিকেট হল গৌণ। ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কারণে যাঁরা খেলার মাঠে ভিড় বাড়ান তাঁদের আটকে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু যাঁদের বাস্তবিকই ক্রিকেট বিষয়ে আগ্রহ আছে তাঁরা যদি একটু সচেতন হন আর তাঁদের সংখ্যা যদি ক্রমশ বাড়ে তো ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়তো নয়।

সোশালিস্ট দুনিয়ার নেতা সোভিয়েট দেশ আজ টেনিসের মতো খেলাকে বুর্জোয়া বিলাস বলে উড়িয়ে না দিয়ে তাকে আয়ত্ত করে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে চলেছে। এক সময় ছিল যখন সত্যিই সোভিয়েটের মতো দেশের পক্ষে টেনিস খেলা ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করে তার ব্যাপক অনুশীলনের ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না। আজ সেদিন আর নেই। হয়তো অনতিবিলম্বে

সোভিয়েট দেশে ক্রিকেটেও প্রসার ও প্রগতি আমরা দেখতে পাব। ক্রিকেটে যদি কোনো একান্ত নিজস্ব সৌন্দর্য থাকে তো অবসর অপ্রতুল হলে সে খেলা কঠিন বলে তাকে বর্জন করা সমীচীন নয়। আমরা তো এমনই সমাজ চাই যেখানে সকলে পরিশ্রম করবেন কিন্তু সকলেরই যথেষ্ট অবসর থাকবে। সেই অবসর-সমৃদ্ধ নবসমাজের ক্রিকেটের মতো খেলার স্থান থাকবে না তো থাকবে কার?

এদেশের কন্ট্রোলবোর্ডের কুকীর্তির পরিচয় দিতে গেলে তো প্রকাণ্ড প্রবন্ধ ফাঁদার দরকার পড়ে। সাধারণের কাছে আজ তা অজানা নয়, কিন্তু পরিতাপ এই যে দুষ্কৃতি নিবারণ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে তেমন চেতনাও নেই, সংবাদপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে সে চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা তেমন হয় নি। কিন্তু বোর্ডের তুচ্ছ ক্ষুদ্রতা নিয়ে আলোচনা আমার লক্ষ নয়। আশা এই যে ক্রিকেট ক্ষেত্রে যে মালিন্য আজ জমে রয়েছে তা যেন অচিরে অপনোদিত হয়। আরো আশা যে ক্রিকেটে ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে আমাদের মন যেন জেগে ওঠে, রৌদ্রোদ্ভাসিত প্রান্তরে বহুজনের একত্রিত প্রচেষ্টায় সামান্য ক্রীড়নকের স্পর্শে নিখুঁত সৌন্দর্যের মায়া যখন রচিত হয় তখন আমাদের আবেগ যেন স্পন্দিত হয়ে উঠতে পারে, মনের প্রমোদ যেন শিল্পাস্বাদের মহিমাকে কথঞ্চিৎ বহন করে আনতে পারে।

অল্পে সুখ নেই

বহুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নববর্ষ ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সকলকে অবহিত করেছিলেন ভারতের মন্ত্র "ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি" এই মহাকাব্যের কথা স্মরণ করিয়ে। "সাধনা" নামে প্রকাশিত তাঁর যে ইংরেজি বক্তৃতামালা দেশে দেশে নন্দিত হয়েছিল, যার অপর আখ্যা ছিল জীবনোপলব্ধি "The realization of life"—তাতে ভারতের চিন্তা ও কর্মে ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করে ভূমার অন্বেষণ সম্বন্ধে শব্দগৌরব ও রসঘনত্বে প্রোজ্জ্বল বহু শিক্ষা তিনি দিয়েছিলেন। কবিচিত্তের প্রসাদগুণ ও মানবমমতা "সাধনা" গ্রন্থে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত অন্তর্নিহিত অথচ বিশ্বাতিক্রান্ত, অবাঙ্‌মনসোগোচর অথচ সত্তাসম্বন্ধীয় আলোচনাকেও প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে, পংক্তিতে পংক্তিতে বিচিত্র ভাবোদ্রেকের উপাদান সজ্জিত করে রেখেছে। কোথাও কবি উপনিষদের ঋষিদের অবিস্মরণীয় উক্তির মহিমা বিশ্লেষণ করেছেন—"যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যু" কিংবা অনুরূপ আপ্তবাক্যের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদ করতে পাঠকের সহায় হয়েছেন। অপর কোথাও বলেছেন পল্লীর সকলের উপহাসের পাত্রী "সর্বক্ষেপী" নামে পরিচিত মেয়েটির কথা, যে কবিকে ঘরের কোণে আটক থেকে লিখতে দেখে তিরস্কার করেছিল আর ফুলদানি সাফ করে বাসি ফুল খানসামা ফেলে দিতে গেলে সেগুলো তাকে বকে ঝকে কেড়ে নিয়ে নিজের বুকে চেপে আদর জানিয়েছিল। সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ সব কিছুরই মর্মস্থলে সতত বিরাজমান, একান্ত নির্বিকার ও নির্লিপ্ত অথচ একান্ত সামীপ্যে আত্মীয়, ব্যাখ্যাতিরিক্ত, সংজ্ঞারহিত অথচ অনুভূতির তুরীয় স্তরে প্রতিভাত এই কল্পনা নিদিধ্যাসনবলে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মজীবনে যুগ যুগ ধরে রূপায়িত হয়ে

এসেছে। সাহিত্য যে পরম মূল্যের অধিকারী, তা এমনই গরীয়ান্ যে তা অনির্বচনীয়, এ-কথাই বোঝানো হয়েছে "ব্রহ্মস্বাদসহোদর" বলে তার বর্ণনায়। এর চেয়ে শ্লাঘনীয় আখ্যা ভারত-মানসে যেন আর নেই।

কিন্তু এই তুরীয় রাজ্যে স্বল্প বিচরণ সম্ভব হলেও সেখানে অবস্থান মানুষের চিন্তা ও কর্মের পক্ষে তো সম্ভব নয়, যদি না জীবনকে পরিপূর্ণ পরিহার করে সাধারণ চেতনালুপ্তির প্রয়াস চলতে থাকে। কথিত আছে যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে সমাগত ভারত বিখ্যাত বৈদান্তিক তোতাপুরীর পরম নিরাসক্তি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিক তেমনই বিচলিত হয়েছিলেন। মানুষের জগতে বাস করে, তার সুখ দুঃখের সাক্ষী হয়েও অমন নির্লিপ্তির কথা ভেবে তাঁর মনপ্রাণ কেঁপে কেঁদে উঠেছিল, নিজেরই ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী একটা পথ তখন তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন, তোতাপুরীর মতো মহাত্মাকেও অনুসরণ করতে পারেন নি। সাহিত্যকে তো মানুষেরই প্রাত্যহিক জগৎ থেকে উপকরণ আহরণ করতে হয়, ভাবলোকে উত্তরণেরও তো সম্ভাবনা থাকে না যদি মায়াজাল বোধে এই মাটির পৃথিবীকে সাহিত্য অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথ তাই অসীমকে খুঁজেছেন সীমারই মধ্যে; তিনি জানতেন যে আকাশে ফুল ফোটান সম্ভব বটে কিন্তু তা শুধু সম্মোহন বলে, যে-সম্মোহনের ইন্দ্রজাল বস্তুজগৎ বিনা সর্বথা ব্যর্থ। যা অসীম, যার আদি-অন্ত নেই, যা স্বয়ম্ভু যা স্বয়ংক্রিয়, গণিতের স্বরলিপিতেও যার সম্যক্ ব্যাখ্যান ঘটে না, তাকে সীমিত না করলে সৃষ্টি সম্ভব নয়। সৃষ্টিকর্তাকে কোনো এক ঈশ্বরের পরিকল্পনায় উপনীত করাতে গিয়ে তাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা থেকে অনেক নিম্নস্তরের চিন্তায় নামতে হয়েছে। এজন্যই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার দেশ ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে দেখা গেছে যে তুরীয় মার্গের সঙ্গে ঈশ্বরচিন্তন, দেবদেবীর উপাসনা, জীব জন্তু বৃক্ষ লতাগুল্মের পূজা ইত্যাদি সহ-অবস্থান করছে। এই সহ-অবস্থানের সমর্থক দার্শনিক সূত্র অনুসারে সংগ্রহ করতে রীতিমতো বেগ পেতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদেশের সামাজিক আবেষ্টনে এই সহ-অবস্থান যেন বিনা অস্বস্তিতেই ঘটেছে। আমাদের আচারে আছে সংকীর্ণতা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তায় আছে নিবাত, নিষ্কম্প নির্লিপ্তির মোহাঞ্জন। এমন পরিস্থিতিতে যে লোকায়ত দর্শনের বহু বিচিত্র ও সাহসিক ইতিবৃত্তকেও এদেশের ভাববাদ বহুলাংশে অথর্ব ও আচ্ছন্ন করে রাখতে পেরেছে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবে আমরা অহংকার করতে পারি যে এদেশের ভাববাদী চিন্তাতেও আছে এমন ব্রহ্মাণ্ডপ্রসারিতা যা হয় তো আমাদের মনকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুদ্রতা থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুর্দিনের দুর্ভোগ সত্ত্বেও ভারতীয় চরিত্র যে কখনো একেবারে তার দ্যুতি হারায় নি, এর কারণ হয় তো এখানে সন্ধান করলে পাওয়া যাবে।

সাংখ্যকার ঋষিরা বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তায় জগৎস্রষ্টা কোনো শক্তিকে আবাহন করে আনার সার্থকতা অনুভূত হয় নি। এদেশের আচারধর্মী সমাজ কর্মফলের উপর জোর দিয়েছে, পুণ্যের সুফল মিলবে পুনর্জন্মে আর পাপেরও যথাযথ দণ্ড ঘটবে একথা বলেছে কিন্তু মুক্তি পেয়ে মানুষ যে স্বর্গসুখেও তুষ্ট থাকবে না, পরমাত্মায় বিলীন হয়ে সর্ববিধ মায়াপ্রপঞ্চ থেকে নিস্তার না পাওয়া পর্যন্ত যে তার শান্তি নাই, একথাই বলেছে। মনে পড়ে বহুদিন পূর্বে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মপরায়ণ ছাত্রদের সভায় আলোচনার কথা—ঈশ্বরকে ব্যক্তিস্বরূপ বোধে উপাসনার মধ্যে ধারণাগত যে অল্পতুষ্টির ভাব আছে তা অ-ভারতীয় চিন্তায় সহজে ধরা পড়ে না বেশ বোঝা গিয়েছিল। হয়ত এ-

ধরনের জিনিস নিয়ে গর্ব না করাই ভালো, কিন্তু একদিকে জগৎকে আয়ত্ত করবার আকুলতা ও অপরদিকে নিরাসক্তি, ভারতবর্ষের বিশ্ববীক্ষার এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে না হয় একটু অহংকার করা গেল।

সম্প্রতি পোল্যান্ডের যশস্বী মার্ক্‌স্‌বাদী দার্শনিক আদম শাফ্‌-এর (Adam Schaff) একটি লেখা থেকে জানা গেল যে ছাত্রেরা একদিন তাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল ছোট্ট একটি প্রশ্ন—"জীবনের অর্থ কি?" তিনি প্রথমে এমনও ভেবেছিলেন যে হয় তো কেউ তাঁকে উপহাস করতে চাইছে, কিন্তু প্রশ্নকর্তাদের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে সন্দেহ রইল না। তিনি বুঝলেন যে সত্যিই তারা জানতে চায়। আর বিশেষ করে চায় এই জন্য যে পোল্যান্ডের মতো দেশ অকল্পনীয় যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে, নিদারুণ নির্মমতার উদাহরণ বহুল সংখ্যায় ও হেতুব্যতিরেকে ঘটতে দেখেছে, অসমসাহস চরিত্রবলের আপাতব্যর্থতা বার বার লক্ষ করেছে, শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে বহু অশুভের প্রায় অনিবার্য প্রাদুর্ভাব দেখেছে। নিছক নৈসর্গিক নিয়ম অনুযায়ী প্রাণিজগতে নিরন্তর যে সংগ্রাম চলে, তার ব্যাখ্যা তবু সম্ভব, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, বিপ্লব প্রতিবিপ্লব প্রভৃতি যুগান্তকারী ঘটনা যখন বহুজনের জীবনে অস্বাভাবিক জর্জরতা এনে দেয়, মানুষের মহত্ত্বও যখন বহুক্ষেত্রে বন্যার তৃণের মতো অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়, বিপ্লবকে মহার্ঘ জেনে এবং ঐকান্তিকভাবে কামনা করেও মানুষ যখন তার মূল্য দিতে গিয়ে নিজেকে আত্মার দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে পড়ার মতো চরম দুর্গতির আশঙ্কা অনুভব করে, তখন যে-প্রশ্ন জাগে তাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। অধ্যাপক শাফ্‌ তাই বলেছেন যে মার্ক্‌স্‌বাদকে যখন একেবারে প্রখর সংগ্রামী ভূমিকায় রত থাকতে হয়েছিল তখন হয়তো এ-ধরনের প্রশ্ন বাস্তব আকার নিয়ে মনের দরজায় ভিড় করতে পারে নি, কিন্তু আজ যখন দেশে দেশে মার্ক্‌স্‌বাদীকে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে লেগে থাকতে হচ্ছে তখন শুধুমাত্র একাগ্র বস্তুতান্ত্রিক মেজাজ বজায় রাখার অজুহাতে যে-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠেছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা অল্প কথায় এবং বক্রভাবে অগ্রাহ্য করা অন্যায় হবে।

পোল্যান্ডের একজন প্রকৃত পণ্ডিতের এই কথা বোধ হয় এদেশে আমাদের অনেকের মনে লাগবে। দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে নস্যাৎ করার চেষ্টায় আমরা যে অনেকে বহুকাল ধরে লেগে এসেছি, তা শুধু এই ভবজীবনের যন্ত্রণার একটা সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে লোক ভুলানো নয়—যন্ত্রণা যখন নিবার্য বলে মনে করার কোনো বাস্তব হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না, তখনো তাকে অস্বীকার এবং অতিক্রম করার এক সাহসিক প্রচেষ্টাও এর মধ্যে রয়েছে, সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের আকুল সন্ধান তাই ঘটেছে। দেশে দেশে যুগ যুগ ধরে মানুষ যে যন্ত্রণার শিকার হয়েছে, নীরো, চেঙ্গিজ খান আর হিটলারের মতো ব্যক্তি যে-ধারার ধারক ও বাহক, তার বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করা চলে না, আর সার্ত্র্‌ প্রভৃতি আজকের চিন্তাশীলেরা কিছুতেই এই রূঢ় বাস্তবতার উপর একটা যুক্তির খোলস-পরানো ভাববাদকে সহ্য করতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার রাজ্যে অনায়াসে নভোচারিতা বলে বিদ্রূপ করেই ভাববাদের ভিত্তিকে টলানো যাবে না। সে-ভিত্তিতে অনেক কিছু আছে যা বেশ কিছুকাল হতেই পতনোন্মুখ, কোনোক্রমে শ্রেণীসমাজের ঠেকা তাকে এখনো খাড়া অবস্থায় রেখেছে, কিন্তু তা বলে তার ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে অচেতন হলেও চলে না, মানুষকে নিদারুণ গ্লানির মধ্যেও নিঃশ্বাস ফেলতে যে তা সহায়তা করেছে ভুললে চলে না, ভুললে বা তাকে

অবজ্ঞা করে গেলে ইতিহাসে যা ঘটেছে ও ঘটছে তার অনেক কিছুকেই স্রেফ অস্বীকার করা হয়, যা কখনো কোনো তথ্যসিদ্ধ চিন্তার পক্ষে সমুচিত হতে পারে না। এখনো হয়তো পরিপূর্ণ সময় আসে নি; এখনো মার্ক্‌স্‌বাদকে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থাকার দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হচ্ছে। কিন্তু সময়ে হয়তো অগ্রগতি আরো নিরঙ্কুশ হবে, আকারে আরো সৌষ্ঠব দেখা দেবে, যখন সুস্থ কর্ম ও চিন্তা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। পোল্যান্ডের ন্যায় দেশ থেকে মাঝে মাঝে যে খবর আসে তাতে মনে হয় যে সেদিন আসতে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো খুব বেশি দেরি ঘটবে না। মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তার ক্ষেত্রে এই পট-পরিবর্তনে ভারতবর্ষের কিছু প্রদেয় রয়েছে মনে করা কি বিভ্রম?

মানুষের মাহাত্ম্যকে এদেশ মূল্য দিয়ে এসেছে সব চেয়ে বেশি—কোনো রাজা-বাদশা ভারতবর্ষের অন্তরে স্থান পাননি, যেমন পেয়েছেন অবলীলাক্রমে আমাদের অগণিত সাধু-সন্ত-মহাপুরুষেরা। ব্রহ্মবলকেই প্রকৃত বল বলতে আমরা চেয়েছি। একটিমাত্র-ব্রহ্মদণ্ডের জোরে সকল অস্ত্রকে পরাস্ত করার কথা আমরা শিখে এসেছি। মনুষ্যত্বের এই মহিমার মূল কোথায় তা নিয়ে অন্তহীন অন্বেষণ চলতে পারে, কিন্তু তার অস্তিত্ব যে অকাট্য, তার সাক্ষ্য জীবনই দিচ্ছে অদ্ভুতভাবে, যুগ যুগ ধরে। ১৯৪০ সালে ইংরেজ লেখক সমরসেট ম'ম লিখেছিলেন : "একরূপ মাহাত্ম্য আছে যা চিন্তা থেকে উদ্ভূত নয়; এ হল আরো অনেক গোড়ার ব্যাপার। সংস্কৃতি বা সুশিক্ষার উপর এ-বস্তু নির্ভর করে নেই। বোধ হয় মানুষের আদিম প্রবৃত্তির মধ্যেই এর শিকড় লুকিয়ে আছে। ঈশ্বর যদি মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন তো মানুষের মধ্যে এ-গুণের সম্মুখীন হলে স্বয়ং ঈশ্বরকেই লজ্জায় মুখ লুকোতে হবে। হয়তো একথাই ঠিক যে তার শত অপরাধ ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে এমন মহিমা দেখাতে পারে যে তার জোরেই আমরা নৈরাশ্যের হাত এড়িয়ে বাঁচতে পারি।" সমরসেট ম'ম সম্ভবত একথা বলেছিলেন যুদ্ধের সময় অতি সাধারণ ও অশিক্ষিত সৈনিকের মধ্যে স্বভাবজ মানবতার পরাকাষ্ঠা এবং কল্পনাতীত অথচ একেবারে সহজ, সরল সাহস দেখে। যে-মানুষজাতের মধ্যে এমন গুণ আছে তার সম্বন্ধে হতাশ হওয়াকে অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া কিছু বলা যায় না। অথচ মহিমার সঙ্গে কদর্যতার সহ-অবদানও তো অনস্বীকার্য তথ্য। জের টেনে তাই কোথাও দাঁড়াবার চেষ্টা মানুষ ইতিহাসে বারবার করে এসেছে। আজকের যুগোপযোগী পদ্ধতিতে আমাদেরও করতে হবে।

* * *

জীবনই যখন মিশ্র বস্তু তখন জীবনেরই প্রকাশ যে-বিপ্লবে, সেখানে গৌরব ও গ্লানি উভয়ই যে দেখা দেবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর-পন্থায় ইতিহাসের রথচক্র চলে, তাই সকল বিপ্লবেই দেখা গেছে মানবচরিত্রের শীর্ষেও অধস্তনের ছায়া। ফরাসি বিপ্লবের গরিমা কখনো ম্লান হবে না, কিন্তু সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নামে অন্যায় ও অপকর্ম তখন বড়ো কম ঘটে নি। বর্তমানে সোভিয়েট দেশ বহুবর্ষের একাগ্র কঠোর ও অবিচল কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মরক্ষা-প্রয়াসের ধনতন্ত্রের অবলোপ ও তৎস্থলে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কাজে প্রভূত অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে। সেখানে বিপ্লবের সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে যে বহুক্ষেত্রে আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঘটেছে, অন্যায় আর অবিচার আর অপরাধ যে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রের নামে, সাধারণ সুস্থ সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যাকে পাপকর্ম বলতেই হয় এমন অনাচার

যে বারবার ঘটেছে, একথা সোভিয়েট দেশ থেকেই অকুণ্ঠে ও উচ্চৈঃস্বরে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে চীনে বিপ্লবের জয় ইতিহাসে পরম স্মরণীয় ঘটনা, কিন্তু শুধু ভ্রান্তি নয়, বহু অপকর্ম যেন প্রায় অনিবার্যরূপে সে-বিপ্লবের অনুষঙ্গ নিয়েছে। সীমান্ত নির্ধারণের নামে ভারতভূমির উপর অমার্জনীয় আক্রমণই তার একমাত্র উদাহরণ নয়। সোভিয়েটের অভিজ্ঞতা থেকে সর্বজন আজ জানে যে সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনের মূল্য ইতিহাস আদায় করেছে অতি নির্মম নির্বিকারভাবে, বিন্দুমাত্র কারুণ্য দেখায় নি। কোথাও-ই কোনো সার্থক বিপ্লব মানুষের কাছ থেকে তার বিশিষ্ট পরম্পরানুযায়ী মূল্য কেড়ে না নিয়ে ছাড়ে নি। আর যে-বিপ্লব যত বড়ো, যত ব্যাপক, যত গভীর, ততই তার মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বিপ্লব ছিল তুলনায় স্বল্পমূল্য; সেখানেও রাজার মুণ্ড ঘাতকের আঘাতে ছিন্ন হয়েছে, ক্রম্‌ওয়েলের মতো মহাভাগের দেহাবশেষ কবর থেকে খুঁড়ে বার করে রাস্তায় টাঙানো হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লব ছিল এর চেয়ে অনেক বড়ো ঘটনা, তাই তার চাহিদাও ছিল বেশি। অর্ধপথে নিরুদ্ধ হলেও আমরা ফরাসি বিপ্লবের সুমহান্ গৌরবের কথা জানি, কিন্তু হয়তো সেজন্যই তার ইতিবৃত্তে আছে বহু আতিশয্য, বহু অন্যায়, বহু ক্রূরতার কথা—শুধু দাঁত্, রব্‌স্‌পিয়ের, এবের, মাদাম রলাঁ প্রভৃতি রাজনীতিক নয়, লাভোয়াজিয়ে-র মতো সর্বাগ্রগণ্য রসায়নবিদ; বেইঈ-র মতো গাণিতিক; কন্দর্সের মতো দার্শনিককেও তার বলি হতে হয়েছিল। যেখানে প্রকৃত বিপ্লব ঘটেনি, অথচ বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, সেখানেও ইতিহাস প্রায়শ তার মূল্য আদায়ে কুণ্ঠিত হয় না। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশে যথার্থ বিপ্লব ঘটেনি, কিন্তু স্বাধীনতা শুধু যে নির্ঝঞ্ঝাট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এল দেশবিভাগ আর তারই অনিবার্য অনুষঙ্গিকরূপে এমন ধ্বংসকাণ্ড ও প্রাণহানি, বিপর্যয়ের দিকে থেকে যার তুলনা বিপ্লবের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সোভিয়েট বিপ্লবের মতো সুদূরপ্রসারী ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি; পরাজিত না হয়ে বিপ্লবের পর চল্লিশ বৎসরাধিক কাল বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর সঙ্গে লড়তে আর কোনো বিপ্লবকে হয় নি এবং প্রধানত সেজন্য (আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চরিত্রে বর্তমান দোষ ও দুর্বলতার ফলে) এমন অনেক কিছু ঘটেছে সোভিয়েট দেশে যা মনকে মুহ্যমান করে ফেলে, ইতিহাসে কোনো ঘটনাই যে অবিমিশ্ররূপে সার্থক তা বিশ্বাস করতে দেয় না। স্টালিন যখন সোভিয়েট দেশের অবিসম্বাদী নায়ক, তখন সেই নেতৃত্বের শেষ পর্যায়ে যে সমস্ত অন্যায় ও অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে দুনিয়াকে জানানো হয়েছে, সে-বিষয়ে নীরব থেকে গেলে হয়তো বাইরের কেউ অভিযোগ করতে পারত না, কিন্তু সাম্যবাদকে সকল ক্লেদ থেকে মুক্ত করাই যখন লক্ষ তখন অসংকোচে সর্ববিধ ত্রুটি স্বীকারের প্রয়োজন শুধু সুনীতির নির্দেশ নয়, একেবারে বাস্তব ও চলমান জীবনেরই চাহিদা। এজন্যই স্টালিনের মতো যুগস্রষ্টাকে এত কটু ও কঠোর বক্তব্য সাম্যবাদীদের মুখ থেকেই শোনা গেছে। এখনো যে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে বিপুল বিকট গ্লানি রয়ে গেছে, এখনো যে সোভিয়েট বিপ্লবের মতো মানুষের জীবনকে নতুন সমুজ্জ্বল অধ্যায়ে উত্তীর্ণ করার ঘটনাতে মাহাত্ম্য ও মালিন্যের সহ-অবস্থান আমরা দেখেছি, একথা জানা এবং ভাবা দরকার—প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার নীতি অনুযায়ী শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিনা সত্যবস্তু আয়ত্ত হবে না।

যদি বলা যায় যে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা—অন্তত মানুষের সচেতন যূথবদ্ধ জীবনের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হল সোভিয়েট বিপ্লব, তা হলে অন্যায় বা অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু

সে বিপ্লবে যেমন গরিমার লক্ষণ বারবার প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে, তেমনই আবার ক্ষুদ্রতা, নিরতিশয় ক্ষুদ্রতার অস্তিত্বও বারবার দেখেছি। এখনো যে দেখি না তা একেবারেই নয়। অবশ্য সিদ্ধান্তের ভারসাম্য রাখার জন্য বলতেই হয়—যে-কথা কিছুকাল আগে জ্যাক্‌লিন্‌সে তাঁর ছোট্ট একটি বইয়ে (A World Ahead) লিখেছেন—যে যাই ঘটুক না কেন, যেখানে যেরূপ স্খলন ও ব্যত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যাক না কেন, সোভিয়েট বিপ্লব যা সৃষ্টি করেছে তা অতুলন, তার মূল গৌরব ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। এ কথাই ছিল ১৯৩০ সালে, সোভিয়েট জীবনের দুর্দিনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যখন তিনি সেদেশে সাংবাদিকদের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে কয়েকটি ত্রুটির কথা জানিয়ে বলেন যে সোভিয়েটের কাছে তিনি চাইছেন এমন বস্তু যা একেবারে নিখুঁত (''Perfection'') আর সেইজন্যই চাঁদের ছায়াচ্ছন্ন দিকটা (''the shadow side of the moon'') একটু তুলে ধরেছেন।

সোভিয়েট দেশে ও অন্যান্য সাম্যবাদী মহলে কিছুকাল ধরে প্রখর আত্মসমালোচনার যে জোয়ার দেখা দিয়েছে, তাতে সাম্যবাদী চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে বহু উৎকর্ষ অর্জনের সম্ভাবনা লক্ষ করা যেতে পারে। কিন্তু না বলে পারা যায় না যে প্রায়ই স্টালিনযুগের শেষার্ধ সম্বন্ধে বক্তব্যের মধ্যে মাত্রাজ্ঞান থাকে না। এককালে যাঁকে ভ্রমক্রমে একেবারে অভ্রান্ত, সদাবিশুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ বলে নন্দিত করে মানবিকতার এলাকা থেকেই বাইরে বসিয়ে মান্য করার রেওয়াজ চলেছিল, তাঁকেই আবার বহুক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও অপরাধী প্রমাণ করতে গিয়ে আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঘটেছে, অনুতাপবোধ বিস্মৃত হয়েছে, তথ্যকে অভিপ্রায়ানুযায়ী বিকৃত করা হয়েছে, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে পর্যন্ত শুধু উপেক্ষা নয়, অস্বীকার করা হয়েছে। স্টালিনের অন্যায় ও অপকর্ম সম্বন্ধে আজ যাঁরা প্রচণ্ড মাত্রায় মুখর, তাঁদের অনেকে স্টালিনের জীবদ্দশায় তাঁর সহকর্মী ছিলেন। ধরে নিতেই হবে যে বিপ্লবী চেতনা ও অভিজ্ঞতায় তাঁদের চরিত্র শাণিত হয়েছিল। স্টালিন বর্তমানে বৎসরের পর বৎসর অন্যায় ও অপকর্ম ঘটার সময়ে তাঁরা যে নীরব ছিলেন তা নয়, প্রায়ই সরবে স্টালিনের নির্দেশ প্রতিপালনে ও প্রশস্তি প্রচারে বিপুল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তা হলে কি তদানীন্তন বিপৎসঙ্কুল ও সমস্যাকণ্টকিত পরিস্থিতিতে উপরোক্ত অপকর্ম অনিবার্য ছিল? বিপ্লবের মূল্য হিসাবেই কি তা সোভিয়েট সমাজকে সহ্য করতে হয়েছিল? যদি তা বাস্তবিকই নিবার্য ছিল তো তখন কি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই অকুতোভয় চরিত্রবলের অধিকারী ছিলেন না? তখনকার অদ্ভুত অবস্থায় স্টালিনের কাজের সমালোচনা করলে বিপ্লবেরই বিরোধিতা করা হবে, সোভিয়েট দেশ শুধু নয় সাম্যবাদী আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এ-কথা ভেবে যদি তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেন তো শুধু স্টালিনকেই অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় কেমন করে? বাস্তবিকই যদি সোভিয়েট সমাজে অকথ্য অনাচার বন্ধ করবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে-সম্ভাবনা বেশ কিছুকাল ধরে বিলুপ্ত হয়ে থাকে তো সাম্যবাদের পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধেই কি সাম্যবাদীদেরই আবার নতুন করে ভাবার দরকার হয় না? এ-ধরনের বহু প্রশ্ন ভিড় করে আসে কিন্তু স্টালিন যুগ সম্বন্ধে কোনো প্রকৃত বুদ্ধিগম্য ব্যাখ্যা এ-পর্যন্ত সোভিয়েট দেশ থেকে পাওয়া যায় নি। আকারে ইঙ্গিতে কিংবা বিকৃত আস্ফালনে একটা কিছু অজুহাত দেবার চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু তা একেবারে সন্তোষজনক নয়।

সোভিয়েটের বর্তমান চমকপ্রদ অগ্রগতির কথা বলতে শ্রীযুক্ত ক্রুশ্চেভ প্রমুখ নেতা স্বভাবত এবং অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই সর্বদা উদ্যোগী, কিন্তু ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে

বহুদিন ধরে রোগশয্যাগত লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অপরিমিত হানি স্বীকার করেও সোভিয়েটের জয় পর্যন্ত যে বিপুল বিচিত্রবীর্য কাহিনী, তার গোড়ায় গলদ থাকলে এ-সমস্ত কিছুই ঘটতে পারত না। ১৯৩৫ সাল থেকেই যদি স্টালিনের সর্ব কর্মে অন্যায় ও অপরাধের বিষ সঞ্চারিত হয়ে থাকে তো সোভিয়েটের অধুনাতন যে মূর্তি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে জগৎ দেখছে তা সম্ভব হত না। সোভিয়েটের গুণাগুণ মিশ্রিত ইতিহাসকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করা এবং স্টালিনের চেয়ে সর্বতোভাবে বহুগুণ প্রতিভা ও চরিত্রবলসম্পন্ন লেনিনকে অহরহ স্মরণ করার প্রয়োজন সোভিয়েট জনসাধারণের হয়তো আছে বলে তাঁরই শিষ্যরূপে নিজেকে বর্ণনা করা যাঁর শ্রেষ্ঠ শ্লাঘা ছিল সেই স্টালিনের স্মৃতিকে পর্যন্ত ধূলাবলুণ্ঠিতপ্রায় করা বাস্তবিকই অদ্ভুত লাগে। কি রকম যেন মনস্তত্ত্বগত একটা গণ্ডগোল কোথাও থেকে গেছে মনে হয়। এ-বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে গেলে গোটা বই লিখতে হবে, কিন্তু এখানে অন্তত বলা দরকার যে বিপ্লবের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্বন্ধে সোভিয়েট নেতাদের মনোভাব ও আলোচনায় মস্ত ঘাটতি থেকে গেছে। এ-ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তুষ্টি নেই। যে অল্প কথা আমরা শুনেছি তাতে স্বস্তি নেই, জ্ঞান নেই, স্থিরতা নেই, শান্তি নেই।

* * *

অধুনা শুধু আমাদের দেশে নয়, বোধ করি জগৎ জুড়েই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যখন বললে অত্যুক্তি হয় না যে ক্রমে যেন কথা কিছু বলা দুরূহ হয়ে উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে নীরব থাকা হচ্ছে তার চেয়েও ক্লেশকর। অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে মানুষের অগ্রগতি আজ ইতিহাসের সমস্ত অতীত অধ্যায়কে অনেক পিছনে ফেলে চলেছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ আজ বাস করে সোশালিস্ট সমাজে, আর সেখানে নানা বাস্তব কারণে দোষত্রুটি যাই থাকুক না কেন, শোষণের কারাগার থেকে যে মানুষ হাজার হাজার বছরের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসেছে, এর মূল্য ও সম্ভাবনা একেবারে অপরিসীম। যে বিজাতীয় শাসন সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিকট আকার নিয়ে আধুনিক ইতিহাসকে বিকৃত ও বিষাক্ত করে রেখেছিল, তার পূর্ণ অবশেষ ঘটতে যে বিলম্ব অল্পই রয়েছে, এর লক্ষণ এখন খুব স্পষ্ট। সীমান্ত নিয়ে বিসম্বাদের অজুহাতে চীনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যখন সমাজতন্ত্র সম্বন্ধেই মনে মনে বিভ্রান্তি ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল, তখনই সারা দুনিয়া বাহবা দিয়েছে সোভিয়েট এবং তার নেতা ক্রুশ্চেভের শুভবুদ্ধিকে, যে-শুভবুদ্ধি বিনা কিউবাকে উপলক্ষ করে বিশ্বব্যাপী সর্বধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। মহাশূন্য পরিক্রমা আর গ্রহক্ষেত্রে অভিযানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে সূচিত হচ্ছে নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য, যখন মানুষ জ্ঞানবলে হবে স্ববশ, প্রকৃত মুক্তির আস্বাদ তখন সে পাবে, সংস্কারের দাসত্ব পরিহার করে তখন তার কল্পনা শুধু মোহময়ী বিস্মৃতির সান্ত্বনা আনবে না। কোনো সন্দেহ নেই যে বিবিধ বিড়ম্বনা এখন মানুষের যাত্রাপথ কণ্টকিত করে রাখলেও সাময়িকভাবে ছাড়া তার গতিরোধ করতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই। তবু বোধ করি আলো ফুটে ওঠার আগে অন্ধকার বাড়ার মতন অবস্থা মাঝে মাঝে আমাদের লক্ষ করতে হয়। তাই বুঝি যে সোশালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে বলতে পারি যে আগামীকাল সূর্যোদয়ের মতো সোশালিজ্‌মের জয় হল নিশ্চিত, বিধিনির্দিষ্ট বলে নয়, যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্তরের একান্ত কামনা পূরণ বলেই তা নিশ্চিত, সেই সোশালিজ্‌মের প্রয়োগ দেশদেশান্তরে দেখে কিঞ্চিৎ বিচলিত না হয়েও পারি

না। এই বিচলিতি যদি তত্ত্বে ও কর্মে হানি ঘটায় তো তা নিপাত যাক, কিন্তু হয়তো সবিনয়ে বলতে পারি যে এর কিছু মূল্যও আছে। অল্পে তুষ্ট হয়ে, আপাতসাফল্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষের ভবিষ্যৎকে যেন জখম করে না ফেলি, সে-বিষয়ে যথাসাধ্য অভিনিবেশের দাম তো অল্প হতে পারে না।

বস্তুনিষ্ঠা ছেড়ে ভাববিলাসের সান্ত্বনাকে অবলম্বন করবার সহজ পথ গ্রহণের অপবাদ শোনবার আশঙ্কা সত্ত্বেও বলতে চাই যে মার্ক্স্‌পন্থা এমন কঠোর ইতিহাসবাদ প্রতিপাদন করে নি, যাকে অনুসরণ করে আমরা সোশালিজ্‌ম্‌কে কেবল সমাজের ইতিহাস কর্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট জেনে গ্রহণ করতে চাই। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের ফলে সোশালিজ্‌ম্‌কে অকাট্য জেনেই কি আমরা সোশালিজ্‌মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি? বহুকাল ধরে নানা দেশে অজস্র সাংসারিক বিড়ম্বনা তুচ্ছ করে যে অগণিত মানুষ শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের জন্য অপরিসীম আবেগ ও চিকীর্ষা নিয়ে আপাতবিফল সংগ্রামে পর্যন্ত লিপ্ত থেকেছে সে কি সোশালিজ্‌ম্‌ ইতিহাসনির্দিষ্ট ব্যবস্থা বলে? অবশ্যই আপাতবিফলতা সত্ত্বেও ভবিষ্যত সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি সমাজের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করতে পারায় সোশালিজ্‌মের প্রেরণা এমন অপরাজেয়রূপে দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঐ প্রেরণার মূল উৎস প্রকৃতপক্ষে রয়েছে অন্যত্র—যেখানে মানুষ পরস্পর মমতার ভিত্তিতে ক্লেদমুক্ত জীবন গঠনের জন্য ব্যগ্র, সরল চেতনার সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণাকে সবচেয়ে দামি জায়গা দিয়েছে, যেখানে ইতিহাসবাদ মানবিকতাবাদের গরীয়সী মহিমায় স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়েছে। সমাজ বিকাশের যে-ধারা তার ঐতিহাসিক পরিণতি হল সোশালিজ্‌ম্‌ কিন্তু আমরা সোশালিজ্‌ম্‌ চেয়েছি ইতিহাসের লক্ষসিদ্ধির জন্য নয়, মানুষেরই মনের একান্ত কামনার পূরণরূপে চেয়েছি। শুধু ইতিহাসের বাস্তব গতি সম্বন্ধে অনুশীলন ও প্রজ্ঞার মূল্যকে তিলমাত্র হ্রাস না করে বলা চলে যে শুধু ইতিহাস কোনো ঘটনা বা ধারাকে কাম্য না হলেও অবশ্যগ্রাহ্য বলে প্রমাণ করে না, ঔচিত্যের নীতিগত মানদণ্ড ঐতিহাসিক সাফল্য কর্তৃক অপসৃত হতে পারে না। একদা সমাজতান্ত্রিক চিন্তা নভোচারী কল্পনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল বলে মার্ক্স্‌ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ অবশ্য সতেজে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, ইতিহাসবোধ বিনা সচেতন সমাজবিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য বলে সমাজ সম্পর্কে সর্ববিধ তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছিলেন, এবং জ্ঞান ও কর্মের সংযোজনে অমোঘ সাম্যবাদী আন্দোলনের পত্তন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন গুরু হেগেল যেভাবে ইতিহাসকে প্রায় স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আসনে বসিয়েছিলেন,তাকে খণ্ডন করে মানবজীবনের নিয়ত পরিবর্তমান পর্যায়ের সঙ্গে ইতিহাসকে সুসংশ্লিষ্ট করে দিয়েছিলেন। স্মরণীয় যে কার্ল মার্ক্সের প্রিয় উদ্ধৃতি ("Man is the measure of everything") ছিল চণ্ডীদাসের মহাবাক্যেরই অনুরূপ—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"।

এরই সূত্র ধরে বলা যায় যে সাম্যবাদীদের কাছে কোনো বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে শুধু ইতিহাসের দোহাই না দিয়ে বরং সুনীতি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং হচ্ছে কি না, নীতিবিগর্হিত কাজ সর্বথা অকর্তব্য কি না ইত্যাদি প্রশ্নেরও উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এজন্যই স্টালিনযুগের যথাযথ সমালোচনা একান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে বলেছি যে সে-যুগের অপকীর্তির উপর একটা আচ্ছাদন টেনে রাখলে সোশালিজ্‌মের যারা শত্রু তাদের মুখ অনেকটা হয়তো বন্ধ থাকত, কিন্তু তবুও সে যুগের অন্যায় ও অপকর্মের প্রখর ও প্রকাশ্য বিচার সোশালিজ্‌মের মূলগত স্বার্থেই দরকার ছিল। তদানীন্তন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য একত্র করে অবশ্য দেখানো যায় যে কেন, কিভাবে, কি-ধরনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে, কোন্‌ আভ্যন্তরীণ

ও বৈদেশিক বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য, এবং বিপুলায়তন সোভিয়েট ভূমিতে বহুকাল ধরে গণতান্ত্রিক পরম্পরা অনুপস্থিত থাকায় সেখানে ব্যক্তিপূজা ও স্বৈরশাসনের প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু শুধু এ-কাজ একেবারেই যথেষ্ট নয়। বাস্তব পরিবেশ কিছু পরিমাণে স্বৈরাচারের অনুকূল ছিল বলেই তো আর স্বৈরাচারকে সমর্থন করা যায় না। প্রকৃতই তখন যে স্বৈরশাসন ঘটেছিল তা যদি অকাট্য হয়ে থাকে তো স্টালিন সমেত সমস্ত সোভিয়েট নেতাকে অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে হবে। কিন্তু কোনো বাস্তব পরিস্থিতি তো মানুষকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে না। স্টালিনযুগে সোভিয়েট দেশের কর্তৃত্ব প্রধানত যাদের হাতে, তাদের মানসিকতা নিশ্চয়ই তৎকালীন বাস্তবতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে একবার বলিয়েছিলেন : "দেব ও দানবে অনুক্ষণ কাঁধ মিলাইয়া মানুষকে যে কোথায় কোন্ ঠিকানায় অবিশ্রাম বহিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কি আমি জানি!" কথাটা সত্য, কিন্তু মানুষ তো অচেতন জীব নয়; তাহার হিতাহিত জ্ঞান শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত তাড়নায় বিদূরিত হতে পারে না। স্টালিনযুগের সমালোচনার মূল বস্তু হল সুনীতি বিষয়ে মার্ক্স্‌বাদের অনিবার্য আগ্রহ। আর সুনীতির কথা উঠলেই বলতে হবে যে এককভাবে স্টালিনকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং স্টালিন ভিন্ন অপর সকল কর্তৃস্থানীয় কমিউনিস্টের দোষ ও দায়িত্ব স্খালন করে বাক্যবিস্তারের যে প্রবৃত্তি সম্প্রতি প্রকট হয়েছে তা সর্বদা নিন্দনীয়।

আবার মনে পড়িয়ে দিতে হয় যে সমাজের অনেকগুলো শক্ত শিকড় টেনে তোলে যে বিপ্লব, তার দাবি হল দুরন্ত ও প্রচণ্ড। সম্প্রতি ডস্টয়েভ্‌স্কির দারুণ ভক্ত একজন পোলিশ লেখক বলেছেন যে যুদ্ধ যখন চলছিল, মনের ভিতরে এবং বাইরে যখন নিরন্তর ঝড় বইছিল, তখন ডস্টয়েভ্‌স্কির লেখা তিনি পড়তে পারতেন না। বিপ্লব যখন চলতে থাকে, তখন দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা নতুন রাস্তা চলার যে লড়াই তা দেহমনপ্রাণকে যেন ছেয়ে রাখে। যে দেশে বিপ্লব চলেছে চল্লিশ বছর ধরে আর হাজার বাধার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে হাজার কায়দায় লড়তে হয়েছে, তখন মানুষের অবস্থা হয় যেন ক্রমাগত চষে ফেলা জমির মতো, কায়মনোবাক্যে তার যে ছাপ পড়ে সে তো অভাবনীয় ব্যাপার। সোভিয়েট সমাজ নির্মাণের যে মহাকাব্য, তার রচনা সহজ কর্ম ছিল না, আর রচয়িতা যারা তাদের পরীক্ষা তো হয়েছিল অমানুষিক পূজার ডালি দিতে গিয়েই কি মানুষ দেখে না যে সকল কালি তখন বেরিয়ে পড়ে।

* * *

সোভিয়েটের বর্তমান নায়কদের কাছ থেকে তাই প্রকৃত আত্মসমালোচনা চাইতে ইচ্ছা করে, আর অর্ধসত্যের ছড়াছড়ি দেখে গভীরভাবে আপত্তি জানাবার প্রয়োজন ঘটে। সম্প্রতি-মৃত আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্‌ট্ গত বৎসর সোভিয়েটে গিয়েছিলেন, অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম সত্ত্বেও গিয়েছিলেন, এবং কয়েকটি কথা বলেছিলেন যা আমেরিকান কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, এদেশে হয় নি। একটা বক্তৃতায় ফ্রস্‌ট্ বলেন যে ক্রুশ্চেভ একাধারে মহৎ ব্যক্তি এবং গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। ("a ruffian and a great man at the same time")। অনেকে ভাবতে পারেন যে একথার বেশি দাম নেই, কিন্তু মনে হয় যে এ-ধরনের একটা ধারণা না করতে পারলে আজকের সোভিয়েট সম্বন্ধে অনেক কিছু বোঝা যাবে না। সোভিয়েট জনসাধারণ যে কথা শুনে ব্যথিত হতে পারে তার অকারণ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই, কিন্তু এখনো সোশালিস্ট সমাজের জীবনে ও চিন্তাধারায় যে অপরিণতি আছে, তা বিস্মৃত হলেও চলবে না। ক্রুশ্চেভের মতো বহুগুণান্বিত ব্যক্তি পৃথিবীতে দুর্লভ; সহজ সুরে গভীর কথাবলার

যে ক্ষমতা তাঁর আছে, তা প্রায় অপূর্ব; বর্তমানে সোভিয়েটের অবিসম্বাদিত নেতারূপে ইতিহাসে তাঁর স্থান স্বীকৃত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে আছে কতগুলি খর্বতা তা মনে না রাখলে তো আবার ব্যক্তিপূজারই একান্ত অহেতুক প্রচলনে সহায়তা করা হবে। ইউনাইটেড নেশন্‌সের সভায় ক্রুদ্ধ হয়ে জুতো খুলে টেবিলে ঠোকার সঙ্গে তুলনীয় হল বিমূর্ত চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতি যে গাধার লেজ দিয়েও তো অমন ছবি আঁকা চলে! স্টালিনের আমলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হত বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে এবং আবার হয়তো আরো অন্যায়ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার যে-ধারা মাঝে মাঝে সোভিয়েট জীবনে আজকাল দেখা দেয়; আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী শৃংখলার নামে তাকে ধামা চাপা দেওয়া যায় কেমন করে? এই প্রবন্ধে বেশি কিছু লেখা চলছে না, কিন্তু দু-একটা কথা বলতে চাই। কেমন করে এ-ঘটনা ঘটে যে সোভিয়েট বিশ্বকোষের সংক্ষিপ্ত এবং আধুনিকতম সংস্করণে লেনিন ও ক্রুশ্চেভের মধ্যবর্তী সোভিয়েট রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চারজনের নাম উল্লেখ করা হয় নি? কেমন করে লালফৌজ সম্বন্ধে পুস্তিকায় যে মার্শাল জুকভ্-এর কল্যাণে স্বয়ং ক্রুশ্চেভ তাঁর বিরোধী নেতাদের ঘায়েল করতে পেরেছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যাঁর অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় নি? কেমন করে ১৯৬৩ সালে লালফৌজের জন্মদিবসে বক্তৃতা করতে গিয়ে মার্শাল মালিনোভস্কি শুধু স্টালিনের নিন্দাবাদ করে ক্ষান্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশ্চেভের অধুনা-আবিষ্কৃত সামরিক প্রতিভার প্রশস্তিতে শতমুখ হয়েছিলেন? সমরনায়করূপে স্টালিন সম্ভবত বহু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন, কিন্তু অন্তত স্টালিনের সামরিক যোগ্যতা সম্বন্ধে চার্চিল প্রমুখ বহু বিচক্ষণ ও বিপক্ষীয় ব্যক্তির সাক্ষ্যকে শুধুমাত্র ক্রুশ্চেভ এবং তাঁর সহকর্মীদের বর্তমান মনোভাব ভস্মীভূত করতে পারে না। কয়েক মাস পূর্বে মস্কোতে দুজন প্রখ্যাত বিদ্বান্‌কে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে রুশ বিপ্লবের বিবরণ যে সংগ্রহাগারে একত্র সজ্জিত আছে সেখানে যেতে আমি অনিচ্ছুক, কারণ পূর্ব ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এই অজুহাতে আবার নতুন করে ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে দেখতে চাই না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায়, কিন্তু মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে কাটানো যায় না।

* * *

নিছক রাজনীতি নিয়ে যাদের কারবার তাদের বাদ দিয়েও আশ্চর্য লাগে ইলিয়া এরেনবুর্গের মতো ভারতে সুপরিচিত ও বহু প্রশংসিত সাহিত্যিকের এ-ব্যাপার সম্পর্কে ভূমিকা দেখে। অবশ্য লঘুপদে সঞ্চরণ তাঁর আজীবন অভ্যাস। হয়তো তাঁর অভিজ্ঞতাই ছিল নানা দেশে এমন যে সতর্কে ও সাবধানে বিচরণকে তিনি শ্রেয় না হলেও অন্তত প্রেয় মনে করে এসেছেন। কিন্তু প্রায় দড়াবাজিকরের কারসাজি যখন সংবেদনশীল সাহিত্যিকের কাজে এবং কথায় দেখা যায় তখন দুঃখ হয়—শুধু এরেনবুর্গের জন্য নয়, সোভিয়েট লেখক গোষ্ঠীর জন্য হয়, সাম্যবাদের উচ্চাবচ ইতিহাস সম্বন্ধেও মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। "কিছুকাল পূর্বে" এবং "কিছুকাল পরে" এরেনবুর্গের মূর্তি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা তাই কঠিন নয়, কিন্তু প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ইতিপূর্বে যখন ভারত সম্বন্ধে তাঁর কোনো কোনো রচনায় অযত্ন বা অপর কোনো কারণ জনিত অনৃত কথনের উদাহরণ দেখছি (বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মহাদেব প্রসাদ সাহা এগুলি নিয়ে একটি তালিকা একবার সোভিয়েট দেশে প্রেরণ করেছিলেন), তখন সেটাকে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু হয়তো তা ঠিক হয় নি; অনৃতবদনের একটা চরিত্রীভূত পরম্পরা হয়তো থাকে।

ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে সিয়েস্ নামে যে ধর্মযাজক জনসমক্ষে সুপরিচিত হয়েছিলেন, তিনি বিপ্লবের কঠোরতর পরিচ্ছেদগুলি যখন চলছে তখন অনুপস্থিত ছিলেন। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর পূর্বতন রাজবংশ যখন প্রত্যাবর্তন করেছে, তখন হঠাৎ পাদরী সিয়েস্-এর আবির্ভাব ঘটায় অনেকে প্রশ্ন করে যে তিনি এতকাল কোথায় ছিলেন। সিয়েস্ যে জবাব দেন তা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে, তিনি বলেন—"J'ai ve'cu" ("আমি প্রাণে বেঁচেছি") অর্থাৎ যখন বহু বিখ্যাত বিপ্লবী বিপ্লবের গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে কিংবা সন্দেহভাজন বলে পরিগণিত হয়ে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলেন, তখন তিনি নিজের গলাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সিয়েস্ আত্মগোপন করে জীবনরক্ষা করেছিলেন এবং তা স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু এরেনবুর্গের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? ফরাসি দেশ থেকে ফিরে তিনি বেশ কিছুকাল এবং বিশেষত হিটলারী আক্রমণের যুগে ছিলেন সোভিয়েটের একজন প্রধান প্রবক্তা। যুদ্ধান্তে ১৯৪৯ সালে স্টালিনের ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম উপলক্ষে সাম্যবাদের প্রতীক রূপে স্টালিন সম্পর্কে সর্বদেশের জনতার প্রীতি সম্বন্ধে এবং তাদের প্রেরিত উপহার বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা সহজে ভোলা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি তিনিই বলতে সংকোচ বোধ করেন নি যে স্টালিনের আমলে কাঁধের ওপর মাথাটা কেমন করে রেখেছিলেন তা ভাবতে গেলে ইচ্ছা করে বলতে ভগবদ্‌বিশ্বাসীদের মতো যে ঈশ্বরের কৃপাতেই তাঁর প্রাণরক্ষা ঘটেছে। একথা নিঃসন্দেহে যে এরেনবুর্গ একজন বহুগুণান্বিত ব্যক্তি কিন্তু তাঁর চরিত্র ও বক্তব্য সম্বন্ধে বহু সন্দেহের উদ্রেক যে তিনিই করেছেন, তা না বলে পারা যায় না।

বাক্‌বিস্তার বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বারবার বলতে চাই যে বিপ্লব সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সোভিয়েট বিপ্লব সম্বন্ধে সত্যের সন্ধানে না নেমে উপায় নেই। সান্ত্বনার বিষয় এই যে সোভিয়েটের শত্রুপক্ষেও ঈ. এচ. কার-এর ন্যায় প্রকৃত সুপণ্ডিত আছেন; হয়তো তথ্য ব্যাখ্যায় বিকৃতি আনতে এবং তথ্যগুপ্তি ঘটাতে একেবারে অক্ষম না হলেও তথ্যের উপরই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত না করে তাঁর মতো ব্যক্তি পারে না। তাই আজ শুধুমাত্র সোভিয়েটে বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান লেখকদের উপরই নির্ভর করে থাকতে হবে না। স্টালিনের জীবন সম্বন্ধে শত্রুপক্ষীয় বহু গ্রন্থকারের তথ্য সমৃদ্ধ রচনা আছে—Deutscher কিংবা Yves Delbas-র নাম সহজেই মনে আসবে—যেগুলি প্রায়ই অধুনাতন সোভিয়েট লেখকদের প্রবন্ধাদির চেয়ে সত্যানুসন্ধানে বেশি বই কম সহায়ক নয়। আশা করব যে ক্রমে সোভিয়েট দেশ থেকেই এই সত্যানুসন্ধিৎসার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। যদি তা দুরাশা হয় তো অন্য উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রকৃত বাস্তব যে কি ছিল, কেন ছিল, কি আছে, কোন দিকে চলেছে, সে-বিষয়ে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ ও সম্বোধি তা হলেই সম্ভব হতে পারবে।

* * *

কিছুকাল আগে গান্ধীজী সম্বন্ধে একটা বই লিখে আবিষ্কার করেছিলাম যে সত্য সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি কথা ব্যবহার করলে বিপ্লবী বলে পরিচিত এবং বহুক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় কোনো কোনো ব্যক্তির মুখেও যেন উপহাসের হাসি ফুটে ওঠে। এটা জেনেও কিন্তু ঐ ধরনের কথা ব্যবহার না করে পারছি না। অন্য কোনো উপায়ে যা বলতে চাই তা প্রকাশ করা যায় না বলেই। সত্য বস্তুটি যে কি, তা পাইলেট-এর প্রশ্ন যখন উঠেছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক উত্তর কেউ বোধ হয় সংগ্রহ করতে পারে নি। কিন্তু এ হল এমন একটি কথা যার ব্যবহার

বিনা এগোবার পথ নেই। তাই বলতে হয় যে অসত্য দিয়ে অসত্যের খণ্ডন ঘটে না, সত্যকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে আশ্রয় রূপে, তারই শরবিদ্ধ হয়ে বুঝি মানুষ জ্ঞানের পিপাসা অনুভব করেছে, নতুন আলোর মহিমার মায়াজালে বাঁধা পড়েছে।

আমাদের এই পঞ্চভূতের জীবনে সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হল মানুষেরই সঙ্গে। আমরা এমন দেশে জন্মেছি যেখানে সূর্যোদয়ের শান্ত মধুরিমা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা— শীতপ্রধান দেশে হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় উঠে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ দেখে ফেলেন বটে যে লন্ডন শহর ভক্তিমুগ্ধ সন্ন্যাসিনীর মতো স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, কিন্তু ঐ সময়ে শয্যা ত্যাগ সেদেশে পারতপক্ষে কেউ করে না। বৃষ্টি হয় অল্পাধিক সর্বত্র, কিন্তু বর্ষার বিস্ময় আমাদের চোখে যেমন পড়ে, তেমনটি পূর্ব-সমুদ্রকূলবর্তী দেশ ছাড়া অন্যত্র কোথাও প্রায় নেই—"শ্যামলশোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা"—আমাদের কবি যেভাবে দেখেন, তা অন্যত্র বোধ হয় দেখা সম্ভব নয়। অরণ্য আশ্রমে আমাদের উপনিষদ রচিত হয়েছে—সত্যই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে নিকট সম্পর্ক তা মনে পড়িয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ করব কেন? কিন্তু সর্ব দেশবাসীর মতো আমরাও জানি যে সবচেয়ে নিকট ও নিবিড় সম্পর্ক হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক— যে মানুষের মনে দেহে আছে আশ্চর্য শক্তি, আশ্চর্য প্রসন্নতা, আশ্চর্য নীচতা, আশ্চর্য সহনশীলতা, আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা, আশ্চর্য মহানুভবতা। মানুষে মানুষে সম্পর্ককে নতুন, সুস্থ, সুষ্ঠুস্তরে তুলবে বলেই তো সাম্যবাদের আবেদন এত বিরাট, এত গভীর, এত মর্মস্পর্শী! সেদিক থেকেই অনুশীলন হোক, বিচার হোক, কর্ম হোক—এর চেয়ে বড়ো কাজ আজ আর কিছু নেই।

রাজনীতিক্ষেত্রে বহু ক্লেদ লক্ষ করতে বাধ্য হই বলে হয়তো একথা বলছি, কিন্তু না বলে পারি না যে সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি বাক্য আমাদের বিপ্লবী শব্দকোষে যেন অবহেলিত না হয়ে থাকে—ভালো হওয়া, ভালো কাজ করা, নিজের গর্ব নিজের কাছে রেখেই যথাসম্ভব নিঃস্বার্থ ভাবে অপরের কল্যাণ সাধনে নিরত থাকা, এই সাধারণ, সহজ কথাগুলির বিপুল মূল্য যেন বিস্মৃত না হই। উপনিষদের ভাষায় যদি কেউ আশীর্বাদ করেন—"সত্যং বদ্, ধর্মং চর"—তখন মন ভরে ওঠে। এ ধরনের কথায় হয়তো আছে সেই বস্তু যাকে তিনশো বছরেরও বেশি আগে আর্চবিশপ Laud বলেছিলেন "the beauty of holiness"। মার্ক্‌স্‌বাদীরা যদি আমাদের দেশের সাধুসন্তদের নিয়ে জানবার ও ভাববার মতো দামি কিছু লেখেন তো ভারি খুশি হতে পারি—তিরুভল্লুভর, জ্ঞানেশ্বর থেকে কবীর, রামানন্দ, নানক, চৈতন্য, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির কথা ভালো করে জানা চাই, কেন আজো হিন্দীভাষী জগতে তুলসীদাস কৃত "রামচরিতমানস"-এর অপরিমিত মর্যাদা তা বুঝলে নিশ্চয়ই উপকার হবে। এই সাধুসন্তের দল যেভাবে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকলকে কাছে টেনেছেন, তা বিপ্লবের বাঁধা রাস্তা থেকে দূরে অবস্থিত হয়েও তো অল্প মূল্য নয়। জীবনকে কথঞ্চিৎ অস্বীকার করবার যে ঝোঁক আমাদের দেশের মানসে লক্ষ করা যায় তার সমাজগত ভিত্তির সন্ধানও তো মনে আবেগ সৃষ্টি করতে পারবে। হৃদয়ের যে অতৃপ্তি বিনা অপরকে হৃদয় দেওয়া যায় না, সেই অতৃপ্তির অনুভূতি কি আমাদের বাস্তবিকই আছে?

অনেককাল আগে জার্মান মনীষী নীৎচ্য (Nietzsche) একবার বলেছিলেন : "সুখ কে চায়? চায় শুধু ইংরেজ!" ("Who wants happiness? Only the Englishman does!") বলা বাহুল্য যে বেন্থামের মতবাদ সম্বন্ধেই তাঁর এই বাক্যবাণ, ইংরেজের

ব্যবসাবুদ্ধিকে বিদ্রূপ করে। আমাদের দেশের এক মহাভাগের জন্মদিনে যখন সবাই তাঁর সুখী জীবন চেয়ে বাক্যবিলাস করছিলেন, তখন সবিনয়ে আপত্তি জানিয়েছিলাম। কোনো সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল মন কি আজকের দুনিয়ায় সুখী হতে পারে; সুখ চাওয়া এমনই প্রকাণ্ড এক হুকুম যে বোধ হয় না-চাওয়াই সততার কাজ। আর প্রকৃতই কি মানুষ স্বস্তি চায়, সুখ চায়, না চায় আরো কিছু যার স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যাকে পেতে গিয়ে ঋষিকে কেবল বলতে হয়েছে "নেতি নেতি", আর কবি বলে উঠেছেন—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।" মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে : "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" কঠোপনিষদে কথিত আছে যে নচিকেতাকে যখন যম সংসারের বিবিধ সুখের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলেন তখন দৃপ্তস্বরে উত্তর আসে যে যম তার বহু অশ্ব এবং নৃত্য গীত নিয়ে তুষ্ট থাকুন, অমরত্ব যার আকাঙ্ক্ষা তার তৃপ্তি নেই ("অপি সর্বং জীবতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে")। জানি যে এ ধরনের কথা অচল, যেখানে নিদারুণ অভাব মানুষের নিরন্তর সাথী হয়ে তার সত্তাকে তিলে তিলে প্রতিদিন পিষে মারছে। প্রাচীন চীনা এক কাহিনীতে আছে যে, সম্রাট প্রকৃত সুখী যে ব্যক্তি তার কামিজের অন্বেষণ করতে গিয়ে জানতে পান যে, সব চেয়ে সুখী যে তার গায়ে কামিজ পর্যন্ত নেই! এটা নিঃসন্দেহ যে এমন গল্প তাঁরাই রচনা করেছিলেন যাদের গায়ে চড়াবার জামার কোনো অভাব কখনো হয় নি, কিন্তু কামিজহীন যারা তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার নিপুণ কায়দা তাঁরা জানতেন। দারিদ্র্যদোষ যে গুণরাশিকে নাশ করে দেয়, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু নির্জিত মানুষের যে মহিমা তা তো শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অপেক্ষাকৃত সচ্ছলতা সাধনে ফুটে ওঠে না, ফুটে ওঠে তার চিত্তবৃত্তির কুসুম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, যে বিকাশ অতি দীনহীনের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখেই তো এই দুঃখী জগৎকে এত বেশি ভালোবাসতে আমরা পারি। বলবার কথা একেবারে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে বলবার সামর্থ ও সম্ভাবনা খুঁজে না পেয়েও তাই ইচ্ছা করে আমাদেরই ঋষিদের প্রতিধ্বনি করতে—"নাল্পে সুখম্, ভূমৈব সুখমস্তি"।

হাহাকার করে নয়, গর্বভরে বলতে পারি—অল্পে সুখ নেই, ভূমাই সুখের একমাত্র ভিত্তিভূমি। যে সোশালিস্ট সমাজ আমাদের কামনা, সেখানে জৈব প্রয়োজন মিটাবার বিরাট গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও সেই প্রয়োজনাতিরিক্ত চিত্তবস্তুর জন্য লোলুপতা যেন কখনো আমাদের চিন্তা থেকে অপনীত না হয়। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে জোব্ (Job) ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : যে "খাদ্য বিনা আমার চলে না, তুমি তার চেয়েও বড়ো ("You are more to me than my *necessary* food")। খাদ্য বিনা জীবন অচল, খাদ্য ও অন্যান্য অপরিহার্য বস্তুর সংস্থান বিনা সমাজ ও সভ্যতা ব্যর্থ, কিন্তু এই প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্বেষণ যেন সোশালিস্ট কর্ম ও চিন্তাধারাকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারে। এই অন্বেষণে হয়তো তৃপ্তি নেই, কিন্তু আছে এমনই কিছুর আভাস যাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন—

> A sense sublime
> Of something far more deeply interfused,
> Whose dwelling is the light of setting suns,
> And the round ocean, and the living air,
> And the blue sky, and in the mind of man.

এই অনির্বচনীয়তার নিরন্তর সন্ধান আমাদের জীবন ও কর্মকে সৌষ্ঠব দিক, আমাদের অভাবক্লিষ্ট ভুবনকেও পূর্ণ করে দিক। বস্তুনিষ্ঠা এতে ক্ষুণ্ন হয় না, আরো ভাস্বর হয়ে ওঠে।

গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা

১। ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম বাংলা বই 'ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ' বেরিয়েছিল ১৯৪৩এ। ১৯৪৫এ বেরোয় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ। বইটির প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। গ্রন্থকার জানিয়েছেন প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ সংক্রান্ত তথ্য নীচে দেওয়া হল।

ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ / হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় / "আজ ও আগামীকাল" সিরিজ / সমবায় পাবলিশার্স / কলিকাতা / ১৯৪৫

সমবায় পাবলিশার্স, ৩৩/২, শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা / মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—১৯৪৩ / দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৪৫ / দাম ১।।.

পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৭, মধু রায় লেন, কলিকাতা / যামিনীমোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের করকমলে—

এই বই-এর প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটী কোন-না-কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, তা সহজেই পাঠকের চোখে পড়বে আশা করি। মার্কস্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে চক্ষু উন্মীলিত না হলে সমাজের ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা যে দূর হতে পারে না, তা ক্রমেই অনেকে বুঝ্‌ছেন। মার্কস্‌বাদ আয়ত্ব করার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছি বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। এ বই-এ যে তাই অনেক ত্রুটী রয়ে গেছে, তা আমি বিশেষ করেই জানি।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষে, তাড়াতাড়ি লেখা প্রবন্ধ একত্র ক'রে ছাপাতে সংকোচ বোধ করেছি। কিন্তু আমার প্রকাশক শ্রীযুত মহাদেব সরকার ও অন্য কয়েকজন বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্যে সে সংকোচ অতিক্রম করার সাহস পেয়েছি।

মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা এ ধরণের বই বাংলাভাষায় বেশি নেই ব'লে আশা করছি যে, পাঠকেরা এই প্রবন্ধ-সমাবেশের বহু ত্রুটী মার্জ্জনা করতে কার্পণ্য করবেন না।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচী

৮+১৫৭ পৃষ্ঠার বই-এ বারোটি মৌলিক প্রবন্ধ ও একটি অনুবাদ প্রবন্ধ (সোভিয়েত ঐতিহাসিক এম, এন, পক্রুভস্কির 'ইতিহাস') সংকলিত হয়েছিল। এর মধ্যে থেকে আটটি প্রবন্ধ এই সংকলনের জন্য বেছে নেওয়া হল।

আটটি প্রবন্ধের দুটি 'ভারতে জাতীয়তার জন্ম' ও 'ভারতবর্ষ ও কার্লমার্কস' বেরিয়েছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকায় যথাক্রমে ১৩৪৫ এর ও ১৩৪৭ এর চৈত্র সংখ্যায়। পরিচয় এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পরিচয়ের প্রায় সূচনা পর্ব থেকেই এবং আজও তা অব্যাহত।

আনন্দবাজার পত্রিকাতে বেরিয়েছিল 'ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য' (জানুয়ারি ১৯৪১) 'দেশের দুর্গতি ও কর্তাদের কৈফিয়ত' (১৯৪০), মানুষ খুনের ব্যবসা (২২ জানুয়ারি ১৯৩৯)। এছাড়াও ঐ সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল— 'সোভিয়েট ইতিহাসের একটি অধ্যায়' (১৩ নভেম্বর ১৯৩৮), 'লেনিন' (২১শে জানুয়ারি ১৯৪০), 'ভারতের লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য' (৯ মে ১৯৪১)। 'ভারতের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য' প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ রজনীপাম দত্তের India Today (London 1939) গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। আনন্দবাজারে প্রকাশিত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে এখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার একটি টুকরো উদ্ধার করা হচ্ছে—

> আজ তুমি চমকে উঠবে, যদি বলি, তোমার কাগজ পড়েই
> কমিউনিজমে আমাদের হাতেখড়ি হয়েছিল। একবার মনে করে

> দেখ, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় আর ডক্টর ভূপেন দত্তের সেইসব বক্তৃতা আর লেখা যা তোমার কাগজে কলমের পর কলম ছেপে বার হত। মার্ক্সবাদ ও রুশ বিপ্লবের শোনা কথাগুলো সেই সব ছাপার অক্ষরের জোরেই আমাদের মনে বিশ্বাসের জমি তৈরি করেছিল।
>
> ('কল্যাণীয়াসু'—সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২২শে নভেম্বর '৯৭—৭৫ বৎসর পূর্তি পত্রিকা—আনন্দবাজার)

'আর তরী হতে তীর' গ্রন্থে হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> সরকারী নিগ্রহের সম্ভাবনা সর্বদা থাকলেও জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক অংশের সমর্থন আমরা পেয়েছিলাম। আজকের পাঠক চমকে উঠবেন জেনে যে আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের মতো পত্রিকায় মার্কামারা কমিউনিস্ট হয়েও লেখার আহ্বান বহুবার পেয়েছি।—

'রুষ বিপ্লব ও লেনিন' প্রবন্ধটির প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য জানা যায় নি। 'সোভিয়েট রাষ্ট্র' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল 'সোভিয়েট দেশ' প্রবন্ধ সংকলন ১৯৪১ এর জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ বাহুল্য হবে না যে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা, লেনিন, রুশ বিপ্লব, সোভিয়েত রাষ্ট্র, নিয়ে গত ষাট বছর ধরে হীরেন্দ্রনাথ নিরলস-ভাবে লিখে চলেছেন—আজও সে লেখনী অক্লান্ত। 'অস্ট্রো মার্কসিজমের বিড়ম্বনা' প্রথম বেরিয়েছিল 'মন্দিরা' পত্রিকায় ১৩৪৫ এর আশ্বিনে। আজকের মার্কসচর্চার পটভূমি ভিন্ন, পরিসরও ব্যাপ্ত। অনেকেই এখন অস্ট্রোমার্ক্সীয় চিন্তাধারার বিচারে আগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি বাড়তি মনোযোগ দাবি করতে পারে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজি বই An Introduction to Socialism বেরিয়েছিল ১৯৩৮এ, China Calling ১৯৪২-এ, আর Under Marx's Banner ১৯৪৪এ। ১৯৪৩এ বেরয় একটি পুস্তিকা 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছে—

> 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' ১৯৪৩ সালে পার্টির পক্ষ থেকে, প্রখর রাজনৈতিক বাতাবরণের তাগিদে লেখা প্রায় তাৎক্ষণিক রচনা। নিজের লেখা পুরো পড়ার ধৈর্য নেই, তবু চোখ বুলিয়ে দেখলাম স্মরণীয় তেমন কিছু নেই।
>
> (বর্তমান প্রতিবেদককে লেখা চিঠির অংশ)

তাই 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'-এ এই রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হল না।

২। হিন্দু ও মুসলিম

এই পুস্তিকাটি বেরিয়েছিল ১৯৪৬এ।

হিন্দু ও মুসলিম/ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড/ ১২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রকাশক: সুরেন দত্ত/ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড/ ১২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২
প্রথম সংস্করণ/ ছয় আনা মাত্র
মুদ্রাকর: কালীপদ চৌধুরী/ গণশক্তি প্রেস/ ৮ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১
পৃষ্ঠা ৬ + ৫১

প্রকাশকের কথা

"হিন্দু ও মুসলিম" মাসিক 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করছি। 'পরিচয়'-এ প্রথম লেখাটা বা'র হওয়ার পরে (শ্রাবণ, ১৩৫৩) অনেক জায়গা হ'তেই অনুরোধ আসে যে লেখাটাকে পুস্তিকার আকারে বা'র করা হো'ক। নানা কারণে তা হ'য়ে উঠেনি। তারপরে, ফাল্গুনের (১৩৫৩) 'পরিচয়'-এ আগেকার লেখার পরিপূরক হিসাবে আরো একটি লেখা বা'র হয়েছে। এই দু'টি লেখাই একত্রে এই পুস্তিকায় ছাপা হলো।

আজকার দিনে এ পুস্তিকাটি পড়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ছাপাবার খরচ অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা দাম যথা সম্ভব কম করেছি।

'হিন্দু ও মুসলিম' পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ 'পরিচয়'-এ বেরিয়েছিল শ্রাবণ ১৩৫৩ অর্থাৎ ১৯৪৬এর আগস্টে। প্রবন্ধটি ৪৬ এর ১৬ই আগস্টের ভয়াবহ দাঙ্গার আগে লেখা। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল ফাল্গুন ১৩৫৩—ফেব্রুয়ারি'৪৭এ—সেই ভয়াবহ দাঙ্গার পরে—কিন্তু শহর জুড়ে তখনও দমবন্ধ করা পরিবেশ। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অন্তর্গত জটিলতা ও জটিলতার গ্রন্থিমোচন নিয়ে ইতিহাসের কৃতী ছাত্রও যশস্বী অধ্যাপক, কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হীরেন্দ্রনাথ গভীরভাবে ভাবেন, যন্ত্রণা পান, ক্ষুব্ধ হন, বক্তৃতা করেন, লেখেন—উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরের ঐক্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হন—তাই বিষয়টি তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে আসে। এই প্রসঙ্গে একটি লেখার উল্লেখ জরুরি মনে হয়। 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' নামের এই প্রবন্ধটি ভারত ইতিহাসের আর এক দুর্যোগের সময়পর্বে লেখা। প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় '৯০ এর জুন-এ।

৩। মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ

মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষা—তত্ত্বগতভাবে মার্কস-চিন্তার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় স্থাপনার সহায়ক গ্রন্থ।

মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ/ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক: সুরেন দত্ত/ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লি:/ ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,/ কলিকাতা-১২
১ম সংস্করণ/ এপ্রিল, ১৯৫৫/ দাম দেড় টাকা
মুদ্রাকর: সুনীল কুন্দগ্রামী/ গণশক্তি প্রিন্টার্স লিঃ/ ৩৩ আলীমুদ্দিন স্ট্রীট,/ কলিকাতা ১৬
পৃষ্ঠা ৬ + ১৩৮

ভূমিকা

যথাসম্ভব সহজ ভাষায় এবং অল্প কথায় মার্ক্স্বাদের মূল নীতি ব্যাখ্যার একটা চেষ্টা করেছি। আশা আছে যে এটা পড়ে পাঠকের মনে মার্ক্স্বাদের গভীর অনুশীলন সম্বন্ধে আগ্রহ জাগবে। আরও আশা আছে যে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় কিম্বা নিছক জ্ঞানের অভাবে মার্ক্স্বাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভুল ধারণা বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলো দূর করতে এই রচনা কিছুটা সাহায্য করবে।

মার্ক্স্বাদী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সার্থক হতে পারে। সর্বশ্রেণীর বঞ্চিত মানুষ অবশ্যই সে-আন্দোলনে সামিল হবে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর জীবন-দর্শনে উদ্বুদ্ধ না হলে আন্দোলন বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই শ্রমিক শ্রেণীরই পুরোধা হল কমিউনিস্ট পার্টি; সকল অবস্থাতেই মেহনতী জনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রেখে, কমিউনিস্ট পার্টিকে আগে চলার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে সমাজবাদের লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হতে হয়, সর্বদা স্মরণ রাখতে হয় যেন অতিরিক্ত এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়ে জনতার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি না ঘটে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কৌশল আলোচনা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। সেজন্য পাঠককে পার্টি-কংগ্রেসের বিবরণ এবং বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এখানে শুধু মূলনীতি সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে। বিষয়কে বোধগম্য করার জন্য অতীত ও বর্তমান থেকে অবশ্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কর্মনীতি সম্বন্ধে তথ্যের জন্য পাঠককে অন্যত্র যেতে হবে।

আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে মার্ক্স্বাদের মূলসূত্র স্পষ্ট করে ধরবার জন্যে আমাদেরই সাহিত্য ও ইতিহাসের শরণ প্রায়ই নিয়েছি। কোন কোন জায়গায় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুনরুক্তি ঘটেছে, কিন্তু তাতে হয়তো বুঝতেই সুবিধা হবে।

এ-ধরণের রচনা দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রয়োজন প্রভূত বলেই লেখার চেষ্টা করেছি। রচনায় অনেক রকম কাজের চাপের মধ্যে লেখার ছাপ রয়েছে আর বহু দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই থেকে গেছে; তার দায়িত্ব একান্তভাবে আমার।

একটি ছোট গ্রন্থ-পঞ্জী পরিশিষ্টে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা
১৫ই আগস্ট, ১৯৫৪

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটি। অধ্যায়গুলির শিরোনাম নীচে দেওয়া হল।

১। "সব লাল হো জায়েগা"
২। স্বপ্ন থেকে বাস্তব
৩। নাই অন্যপথ
৪। ইতিহাসের গতি
৫। শোষণ ও শাসন
৬। মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি
৭। দিন আগত ঐ

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্বপ্ন থেকে বাস্তব' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী প্রবন্ধ সংকলন 'চক্ষুষা কাণঃ'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

'মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জির অনুলিপি—নীচে দেওয়া হল।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

১। কার্ল্‌মার্কস্‌ ও ফ্রিড্‌রিশ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌—কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার
২। এঙ্গেল্‌স্‌—পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি
৩। এঙ্গেল্‌স্‌—বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা
৪। লেনিন—কার্ল্‌ মার্ক্‌সের শিক্ষা
৫। লেনিন—রাষ্ট্র ও বিপ্লব
৬। লেনিন—গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল ডেমোক্রেসীর দুই কৌশল
৭। লেনিন—"বামপন্থী কমিউনিজম্‌"—শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা
৮। লেনিন—ধর্ম
৯। স্টালিন—সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস
১০। " —লেনিনবাদের সমস্যা
১১। " —মার্ক্‌স্‌বাদ ও জাতি সমস্যা
১২। " —সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী
১৩। " —সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনবিধি
১৪। মাও সে-তুং—চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি
১৫। " —নয়া গণতন্ত্র
১৬। " —গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব
১৭। স্টালিন, মাও, ডিমিট্রভ্‌ ও কাগানোভিচ্‌— কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন
১৮। লিউ শাও-চি—সাচ্চা কমিউনিস্ট কি করে হতে হবে
১৯। হু চিয়াও-মু—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিশ বছর
২০। আমাদের লক্ষ্য কমিউনিজ্‌ম্‌—(রাজনৈতিক শিক্ষা সিরিজ)
২১। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ধনতান্ত্রিক দুনিয়া—(রাজনৈতিক শিক্ষাসিরিজ)
২২। রজনীপাম দত্ত—আজিকার ভারত
২৩। এমিল্‌ বার্ন্‌স্‌—মার্ক্‌স্‌বাদ
২৪। এম, ইলিন্‌—পৃথিবী ও মানব সমাজ

২৫। লজোভ্স্কি—বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা
২৬। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—স্টালিন
২৭। জর্ন্ টম্সন্—ধর্ম ও সমাজ
২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাশিয়ার চিঠি
২৯। নিকোলাই অস্ত্রভ্স্কি—ইস্পাত (উপন্যাস)
৩০। রেবতী বর্মণ—সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ
৩১। অমিত সেন—ইতিহাসের ধারা
৩২। অসিত মিত্র—কমিউনিজ্মের উৎপত্তি
৩৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—ভারতবর্ষ ও মার্ক্স্বাদ
৩৪। সরোজ আচার্য—মার্ক্সীয় দর্শন
৩৫। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মার্ক্স্বাদ
৩৬। রাহুল সাংকৃত্যায়ন—মানবসমাজ
৩৭। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাব
৩৮। গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব (কমিউনিস্ট পার্টি)
৩৯। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন (কমিউনিস্ট পার্টি)

৪। চক্ষুষা কাণঃ

প্রবন্ধ সঙ্কলন

চক্ষুষা কাণঃ/ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/ বাক্/ ১০ চৌরঙ্গী, কলিকাতা ১৩
প্রচ্ছদ শিল্পী: যামিনী রায়/ বাক্/ প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ ১৩৬৩
প্রকাশক: তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়/ ১০ চৌরঙ্গী, কলিকাতা ১৩
মুদ্রক: শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ মানসী প্রেস, মানিকতলা স্ট্রীট/ কলিকাতা ৬
মূল্য তিন টাকা

উৎসর্গ

স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতা যাঁকে অভিমানভরে
ত্রিশবৎসরাধিক কাল প্রবাসী করে রেখেছে,
অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কিছুকাল বাংলার
অধ্যাপক ছিলেন,
সাহিত্যবিষয়ে যাঁর গবেষণা বিদেশে বিদ্বজ্জনের প্রকৃত সমাদর পেয়েছে,
সেই ঋজুচিত্ত, স্নেহশীল, জ্ঞানব্রতী
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ-এর করকমলে

চার পৃষ্ঠার ভূমিকা
১৪ + ১৬০ পৃষ্ঠার বই।
প্রচ্ছদের পরের পৃষ্ঠায় যামিনী রায়ের আঁকা চিত্র।

'চক্ষুষা কাণা'র প্রচ্ছদ ও অলংকরণ যামিনী রায়ের

সূচী

পনেরোটি মৌলিক প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত ছিল দুটি অনুবাদ প্রবন্ধ—কার্ল মার্কস এর রচনার অনুবাদ 'ধনিকের আবির্ভাব' ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ এর প্রবন্ধের অনুবাদ 'শিল্পে বস্তুনিষ্ঠা'। এ দুটি অনুবাদ প্রথম বেরিয়েছিল যথাক্রমে চতুরঙ্গ পত্রিকায় ১৩৪৫ এর পৌষ সংখ্যায় ও ১৩৫৫ এর মাঘ সংখ্যা সাহিত্যপত্রে।

এই অনুবাদ প্রবন্ধ দুটি সংকলনভুক্ত হল না।

প্রথম প্রবন্ধ 'চক্ষুষা কাণঃ' সাহিত্যপত্র পত্রিকায় ১৩৬০ এর কার্তিক সংখ্যায় বেরিয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্বপ্ন থেকে বাস্তব' লেখকের 'মার্কস্‌বাদের অ-আ-ক-খ' গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধ— 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'এর ৮০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত।

'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র দ্বিতীয় ভূমিকা। বইটি 'কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা হইতে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত' হয়েছিল ১৩৪৬ এর শ্রাবণ—জুলাই ১৯৪০এ। প্রকাশকের নিবেদন থেকে জানা যায় বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যামিনী রায়। বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল—'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ বরণীয়েষু।'

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই বই ও তাঁর নিজের লেখা ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন

> প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূচনাকালে এবং দ্বিতীয় সর্বভারত সম্মেলনের (ডিসেম্বর ১৯৩৮) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব (পরবর্তী জীবনে প্রখ্যাত রবীন্দ্র সাহিত্য বিশারদ) এবং আমি 'আধুনিক বাংলা কবিতা' অভিহিত একটি সংকলন সম্পাদনা করি। প্রধান সহায়ক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। প্রথমোক্ত 'কবিতা ভবন' এর পক্ষ থেকে এর প্রকাশন ভার নিয়েছিলেন। সাহিত্যবিচারে আইয়ুব এবং আমার চিন্তায় বেশ কিছু প্রভেদ থাকায় দুজনে আলাদা ভূমিকা তাই আমরা লিখি। ...আইয়ুব এবং আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সংকলনটি বেশ কিছুকাল ধরে কোথাও-ই পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টায় আমার লেখাটির খোঁজ মিলেছে। পরে বুদ্ধদেববাবু একই নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন, সম্পূর্ণ নিজের বাছাই দিয়ে আর নিজের একক দায়িত্বে। আমাদের পূর্বতন সংকলনের উল্লেখ মাত্র তিনি করেননি বলে বইটির স্মৃতি একেবারে হারিয়ে গেছে। আইয়ুবও আর নেই। আশা করি উদ্যোগী হয়ে কোনও কাব্যোৎসাহী আইয়ুবের ভূমিকাটি যেন উদ্ধার করেন।
>
> (সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৯৩) পৃ ৬৭)

'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ আর একটু বিস্তৃত করে লিখেছেন তাঁর 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে—(পৃ ৩৯৫-৩৯৬)।

আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত গ্রন্থটি একাধিক কারণেই বাড়তি গুরুত্ব ও মনোযোগ দাবি করে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানি সর্বসাধারণের সমাদরের যোগ্য' মনে হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। বইটি প্রকাশের অব্যবহিত পরে ১৯৪০ এর ২০শে আগস্টে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লিখলেন—

কল্যাণীয়েষু

তোমাদের সংকলিত আধুনিক বাংলা কবিতা পাওয়া গেল। ভয় ছিল যা কিছু বিকলাঙ্গ বিকৃত যা কিছু প্রকৃতির আবর্জনা সেইগুলিকে ঝেঁটিয়ে একত্র করে তার উপরে বাঁকা দুর্বোধ্য রেখার ছাপ দিয়ে দুর্ভাগ্য সাধারণের সামনে উপস্থিত করবে, ভুলিয়ে নিয়ে যাবে তাকে মানবের চিরন্তন রুচি ও রীতির রাজপথ থেকে। আমার ক্ষীণদৃষ্টি ও ভাঙা শরীরে এই জটিল দুর্গমে প্রবেশ করতে ভয় পাই। কিন্তু তোমাদের এই সংকলন দেখে আনন্দিত ও আশ্বস্ত হয়েছি। প্রায় সবগুলিই বিশেষভাবে উপভোগ্য। এই সর্বকালীন কবিতাগুলিকে কেন তোমরা আধুনিকের কোঠায় ফেলেছ তার একটা ব্যাখ্যা দরকার। সম্ভবত ভূমিকায় তার আলোচনা আছে। ভাঙা দৃষ্টি যেন ভাঙা লাঙল, লাইনগুলোকে জোরে ঠেলা দিয়ে দিয়ে চাষ চালাতে হয়। কোনো একটা অবকাশে ভূমিকা পড়ে দেখব। আমার শ্রুতিশক্তিও তার একটা পাল্লা বন্ধ করেছে, তাই আর কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়াও আমার পক্ষে সহজ নয়। সংকলন কর্তার কাছে আমার একটা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবার আছে। দীর্ঘকাল হোলো শিশুতীর্থ বলে একটা গদ্য ছন্দের রচনা বানিয়েছিলেম। আজ পর্যন্ত সেটা কারো যে চোখে পড়েছে তার কোনো প্রমাণ পাইনি। তোমরা যে সেই কক্ষচ্যুত পথহারাকে অখ্যাতি থেকে উদ্ধার করেছ এতে খুশি হয়েছি।

একটা ঘটনার উল্লেখ করে চিঠিখানা শেষ করি। সার মরিস গোইয়ার ইতিমধ্যে যখন এখানে এসেছিলেন আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেম তাঁদের আধুনিক কবিতা অতি বিশেষ ভঙ্গিমার বেড়া দেওয়া সাহিত্য। সে কেবল বিশেষ দলের জন্য রিজার্ভ করা। তিনি হেসে বললেন সর্বজনীনতার দিন সাহিত্যে আবার ফিরবে।

এর কিছু লক্ষণ এখনি সেখানকার জনমতের মধ্যে দেখা দিচ্চে। তাহলে সেই হাওয়া বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করবে এই আশা মনে পোষণ করি।

আধুনিক বাংলা কবিতা বইখানি সর্বসাধারণের সমাদরের যোগ্য এই আমার অভিমত। ইতি রবীন্দ্রনাথ

২০।৮।৪০

এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যায় ২৯শে শ্রাবণ ১৩৪৭ (ইংরেজি ১৪.০৮.৪০)-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর লেখা চিঠির অংশ—

> আবু সয়ীদ আইয়ুব হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও আমার প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বেরিয়েছে, এতদিনে আপনি বইখানা পেয়ে থাকবেন। বইটির নামের সার্থকতা এইখানে যে প্রসঙ্গ বা আঙ্গিকের দিক থেকে যে-সব কবিতা আধুনিক শুধু তাই থেকেই এ-সংকলন করা হয়েছে। অবশ্য এখানে 'আধুনিক' কথাটির সংজ্ঞা কী, এ প্রশ্ন উঠে পড়ে, তার উত্তর সম্পাদকরা তাঁদের ভূমিকায় কিছুটা দিয়েছেন, তাছাড়া নিছক সময়ের দিক থেকে ও-কথার স্থূল একটা তাৎপর্য তো আছেই। বইখানায় যদিও রবীন্দ্রনাথের কবিতাই প্রথমও প্রধান তবু যে তা আপনাকেই উৎসর্গিত, তার পিছনে এ-কথাটাই আছে যে আমরা সকলে আমাদের সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা অপার শ্রদ্ধার সহিত আপনাকেই নিবেদন করতে চাই :......। আধুনিক বাংলা কবিতায় যে-সব নতুন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কোনগুলি খাঁটি আর কোনগুলি মেকি এ যদি আপনি আমাদের না ব'লে দেন তো কে বলবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও চিঠিতে আপনি বিক্ষিপ্তভাবে আধুনিক কবিতা বা কবিদের সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন এবইটিকে উপলক্ষ্য করে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত করলে শুধু এ-যুগের নয়, ভবিষ্যতেরও লেখকের ও পাঠকের পথনির্দেশের সুবিধে হয়।....

এই সংকলনগ্রন্থ ও তার দুটি ভূমিকা প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মনে হয়েছে—

> রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনে আধুনিক কবিদের প্রতি অসংগত অবিচার করেছেন বলে তার দুবছরের মধ্যেই ছাপা হয়েছিল 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র যে প্রথম সংস্করণ, তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই হীরেন মুখার্জী, সঙ্গে ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। একই বইয়ের এ দুই সম্পাদকের সাহিত্য আর রাজনীতির বোধ ছিল একেবারে ভিন্ন, স্বতন্ত্র দুটি ভূমিকা লেখা ছাড়া এ জন্য যে আর বড়ো রকমের কোনো অসুবিধে হয়নি তাঁদের, এই ভেবে আমরা বিস্মিত আছি তখন।

একটি সংকলন গ্রন্থে দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা কেন অনিবার্য তার ব্যাখ্যা আমরা পাই শিশিরকুমার দাশ এর বিশ্লেষণে—

> এই সংকলনে দুটি ভূমিকা আছে। তার কারণও মোটামুটি স্পষ্ট। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বহু পার্থক্য আছে বলে সস্তা বাহাদুরীর অভিযোগ অসম্ভব নয় জেনেও আমরা আলাদা

ভূমিকা লিখেছি।' এমন ঘটনা ঘটেছিল বিদ্যাকরের 'সুভাষিত রত্নকোষ'-এর সম্পাদনার ক্ষেত্রে। ইঙ্গলস এবং ডি কৌশাম্বী আলাদা ভূমিকা লিখেছিলেন। আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথের পৃথক ভূমিকা লেখার একটা কারণ বোধ হয় এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা একশিলা নয়, তার মধ্যে আছে ভিন্নমুখিতা, ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রয়োজনের বোধ।

রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্তির প্রয়াস এবং সেইসঙ্গে সমকালীন প্রতীকী ইংরেজি কবিতার প্রভাব যেমন আধুনিক বাংলা কবিতার লক্ষণ, তেমনই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সাম্যবাদী কবিতার ধারা। আইয়ুব বলেছেন যে সাম্যবাদীদের অধিকাংশই অকবি। 'কর্তব্য বোধের প্রবর্তনায় গোল দীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন।' অবশ্যই সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে তিনি প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু তাঁর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে 'আধুনিক' কবিতার প্রতিবাদী একটা ভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছিল। যদি না বলা হয় যে সাম্যবাদী ধারাটিও আসলে 'আধুনিক' কবিতারই একটি উপধারা। এই সংকলনের সমকাল থেকে বেশ কয়েকটি দশক ধরে 'আধুনিক' ও 'প্রগতিবাদী' (বা সাম্যবাদী) কবিতার ধারা পাশাপাশি বয়ে চলেছে সারা ভারতবর্ষে। আইয়ুব অবশ্য একে স্বতন্ত্র ধারা মনে করেন। কিন্তু তাঁর সন্দেহ আছে সাম্যবাদী কবিতায়, একটু অবিশ্বাসের সঙ্গে লেখেন, 'হয়তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তি চেতনা সম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।'

হীরেন্দ্রনাথ আইয়ুবের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে যেমন কতকগুলি সংস্কার পাঠক সমাজে বদ্ধ হয়ে উঠেছিল তিরিশ ও চল্লিশের দশকে, 'সাম্যবাদী' কবিতা সম্বন্ধেও তেমনই ভ্রান্তবিশ্বাস গড়তে দেরি হয়নি, আইয়ুবের মতো মনস্বীও তাতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। সেজন্যই হীরেন্দ্রনাথকে একটু রূঢ়তার সঙ্গে বলতে হয়েছিল:

'একথা স্বতঃসিদ্ধ হওয়া উচিত যে বর্তমান যুগে ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থায় পুরোনো রাস্তায় সংস্কৃতি বিকাশের আশা নেই বুঝলে, যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে আর্টিস্টের উপকরণ, সে অভিজ্ঞতার রং আর প্রকৃতিও বদলাতে বাধ্য। আর্টিস্ট কর্মিষ্ঠ না হতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অনুভূতি আর প্রকাশ তাঁর ব্যবসা। তাই বোঝা শক্ত যে

যব গোধূলি সময় গেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নবজলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি

হচ্ছে নিঃসংশয় কাব্যানুভূতি, আর আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল-মজদুরদের ধর্মঘট বা কিষাণ জমায়েতের কোনো বিশেষ ভঙ্গিমা, কবি ক্ষমতা যার আছে, তাঁর কাব্যানুভূতির সরঞ্জাম নয়।'

প্রকৃতপক্ষে হীরেন্দ্রনাথের ভূমিকার একটা বড়ো অংশেই 'সাম্যবাদী' কবিতার আবেগদীপ্ত সমর্থন এবং সেই সঙ্গে সমকালীন 'সাম্যবাদী' কবিতার critique এবং নির্দেশপত্রও। সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তাই 'প্রতি সাম্যবাদীর প্রতিপাল্য অনুশাসন' যে 'কবিতার ক্ষেত্রে অচল নয়' একথা মনে রাখতে বলেছেন, 'অনেক সময় তাঁদের কাব্য প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে', একথা জানিয়েছেন। হীরেন্দ্রনাথ শুধু আইয়ুবের কাব্যতত্ত্বকেই অস্বীকার করেননি, সাম্যবাদী কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক কালের অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন; ভাববিলাসী ধারায় 'ভালো কবিতার' সম্ভাবনা অস্বীকার না করলেও পুরোনো ধ্বংসস্তূপের থেকে নতুন কবিতার বিচ্ছিন্নতাই তাঁর কাম্য। সেজন্যই সাম্যবাদীর প্রতিপাল্য অনুশাসন সম্বন্ধে তিনি এত স্পষ্ট এবং অদ্ব্যর্থক।

'...কবির কাছে আহ্বান যাচ্ছে আর্টকে ব্যবহার করতে অস্ত্র রূপে, যে অস্ত্র হবে সর্বব্যাপ্ত রৌদ্রের নির্বিশেষ আভরণে দীপ্ত। কবি বুঝেছেন যে বিপ্লব যখন আগত বা আসন্ন তখন আর্টের চেহারা বদলাবে। সে চেহারা হয়তো মনোরম নয়। কিন্তু সামাজিক সমস্যার নির্বন্ধ লঘু না হওয়া পর্যন্ত কবিতার নতুন মূর্তি আমাদের কাছে প্রকট হবে না।'

দুই সংকলকের এমন ভিন্নতা, কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে এমন মতানৈক্য বাংলা কবিতার সংকলনের ইতিহাসে এমনভাবে কখনও দেখা যায়নি। বোঝা যায় যে সংকলকদের সমর্থিত কাব্যধারা দুটি এমনই ভিন্নমুখী যে এরা বেশিক্ষণ সহাবস্থান করতে পারে না, দুই-এর বিরোধ ক্রমশ তীব্র হবে। আধুনিক বাংলা কবিতার আধুনিকতার প্রকৃতিও যে ভিন্ন তা বোঝা গেল এই ভূমিকা থেকে। দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা অনিবার্য ছিল, কারণ এখানে দ্বন্দ্ব দুই আধুনিকতার।

শিশির কুমার দাস যখন দুই আধুনিক মননের দ্বন্দ্বের কথা স্পষ্ট করে বলেন এবং দুটি স্বতন্ত্রভূমিকার অনিবার্যতার কথা ব্যাখ্য করেন তখন আমাদের মনে পড়ে একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার কথা। 'কবিতা' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৪৭) অতুলচন্দ্র গুপ্ত যে দীর্ঘ সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করি।

...মোটামুটি বেশ বোঝা যায় গত বছর কুড়ির মধ্যে বাঙালী কবিরা যে সব কবিতা রচনা করেছেন তা থেকে বাছাই করা একশর কিছু বেশি কবিতা নিয়ে এই সংগ্রহগ্রন্থ। এতে রবীন্দ্রনাথের ৪টি গান নিয়ে মোট ১২টি কবিতা

আছে। অর্থাৎ এই দুই দশকের মধ্যে ৩৬জন বাঙালী কবি প্রায় একশ 'সার্থক' কবিতা রচনা করেছেন। কেবল তাই নয়; এ সময়ের আরও কিছু 'সার্থক' কবিতা স্থানাভাবে পুঁথির ১৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে স্থান পায় নি, সঙ্কলিত কবিতাগুলির সঙ্গে সমান "সার্থক" নয় ব'লে। বাঙালীর গর্ব্বের কথা। কোন সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সময়ে এমনটা ঘটেছে।
কিন্তু "সার্থক" কথাটার অর্থ নিয়ে খট্‌কা লাগে। এই দুই দশকের মধ্যেই পূরবী ও 'মহুয়া' প্রকাশ হয়েছে। তার কোনও চিহ্ন এ সংগ্রহে নেই। যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি" (১৯২৩), কি "আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে" (১৯২৮) সম্পাদকদের মতে এ সংগ্রহের ১০৯টি কবিতার কোনওটির তুল্য "সার্থক" কবিতা নয়।

...মোট কথা সম্পাদকেরা মনস্থির করতে পারেন নি। দ্বিতীয় সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন বটে, "যে ধরণের কবিতা কিছুকাল থেকে লেখা হচ্ছে" এবং যাকে "বিদ্রূপ করবার লোকের অভাব এদেশে নেই" তার পরিচয় দেওয়াই এ সঙ্কলনের উদ্দেশ্য"; কিন্তু কাজের সময় পিছিয়ে গেছেন। তাঁরা সাহস ক'রে বলতে পারেন নি যে তাঁদের সংগ্রহ উদ্দিষ্ট কালের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহ নয়, significant কবিতার সংগ্রহ। অর্থাৎ কেবল সেই সব protestant কবিতা যারা পূর্বতন কাব্য-প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজেদের আধুনিকত্ব বজায় রেখেছে, এবং যারা হয়ত ভবিষ্যৎ কাব্য প্রথার সূচনা (অবশ্য ভবিষ্যতের কথা কে জানে)। সম্পাদকেরা যদি সাহস ক'রে তাঁদের সংগ্রহকে শুধু এই শ্রেণীর কবিতার ভাণ্ডার করতেন তবে "বাংলা কবিতার অত্যন্ত সাম্প্রতিক হালচালের খবর" ১৯০ পৃষ্ঠায় দিতে পারতেন অনেক বেশী। ভূমিকা দুটি দীর্ঘ ক'রে, চাই কি সংখ্যা বাড়িয়ে এই নবীন কাব্যের অভিনবত্ব ও গুণ-দোষের সম্যক আলোচনায় অনেক পাঠকের বিরুদ্ধ মন এর প্রতি অনুকূল করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে সম্পাদকের প্রধান কাজ ব্যাখ্যাতা হওয়া। শ্রেণী বিশেষের কাব্যের সাধারণ আলোচনায় প্রায় সৃষ্টি হয় কাব্য-তত্ত্বের দর্শন শাস্ত্র। এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু কবিতা বিশেষের রসাস্বাদনে তার সহায়তা খুব কম। সম্পাদকেরা কবিতার পাদটিকায় কি পুঁথির পরিশিষ্টে এ সব কবিতা থেকে পাঠক সাধারণের আনন্দলাভের যে সব স্বীকৃত প্রাথমিক বাধা আছে তা দূর করবার চেষ্টা করতে পারতেন। শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভূমিকার ভাষায় এ সকল কবিতার অত্যন্ত "ক্ষিপ্রগতির জন্য" নানা দেশের সাহিত্যের যে "বিস্তৃত" "উল্লেখ ও উদ্ধৃতির" নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী কাব্য-পাঠকের যা অপরিজ্ঞাত, সম্পাদকেরা প্রয়োজন মত তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দিলে অনেক পাঠকেরই কবিতার মর্ম্মে প্রবেশের পথ অনেকটা সুগম হতো,—যদিও এটা সাহিত্যের প্রশ্নপত্রের সেই মামুলী 'explain the allusion'।

কিন্তু সম্পাদকেরা এ পথে চলেন নি। অবশ্য কারণ আছে, হয়ত একাধিক কারণ। ফলে তাঁরা যে পাঁচ-মিশেলী সংকলন করেছেন তার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠার দ্বিতীয় সম্পাদকের যে আশঙ্কা তা একেবারে অমূলক নয়।

আধুনিক বাংলা কবিদের, এমন কি তাদের প্রধানদের কাব্যেরও রীতিরূপ-মর্ম্মের বিশেষ কিছু আলোচনা সম্পাদকের ভূমিকা দুইটিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি ত সরাসরি বাদ দিতে হবে। "মার্কস্‌পন্থা" "গণশক্তি", "আজকের বিক্ষুব্ধ সমাজে চটকল-মজুরদের ধর্ম্মঘট", "বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গে কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গতি" ইত্যাদি গরম বস্তু নিয়ে তিনি এত মেতে আছেন যে কাব্য-কৌশলের মত কবোষ্ণ বিষয়ের আলোচনা তাঁর কাছে আশা করা অন্যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে বিষয়-বস্তু কাব্য নয়, তা সে বিষয় যতই গুরুতর ও উৎকট হোক না কেন। বস্তুকে ধ্বনি ও রূপে গ'ড়ে তোলাই কবিকর্ম্ম। আর তার কৌশলের আলোচনাই সমালোচনা। শ্রীযুক্ত আইয়ুবের ভূমিকা থেকে কিছু আলো পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিমের 'প্রতীকী' অর্থাৎ symbolist কবিদের কাব্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্যের কথা অল্প যা বলেছেন অনুমান হয় তাঁর মতে অল্পবিস্তর সেগুলিই বাংলার আধুনিক কবিদের কাব্য-প্রথার বৈশিষ্ট্য। মোটামুটি সেগুলি হচ্ছে এই, "এদের শব্দচয়ন নিখুঁত ও বাক্য নির্ম্মাণ অত্যন্ত ঘন, এবং ভাষা ব্যবহারে রয়েছে অভূতপূর্ব্ব নির্বাহুল্য"। "কাব্যের প্রকাশ ক্ষমতা তাঁরা অনেক বাড়িয়েছেন ভাষাগত সর্ববিধ শুচিবায়ু পরিত্যাগ করে, শুঁড়িখানার কথোপকথনের সঙ্গে রাজকীয় সালঙ্কার সম্ভাষণের নির্ভীক সমাবেশ ঘটিয়ে", অর্থাৎ চলতি গ্রাম্য কথা ও পূর্বতন সাহিত্যিক অলংকৃত ভাষা এক সঙ্গে ব্যবহার ক'রে। অল্প পরিসরে অনেকটা কাব্য-রস সৃষ্টির জন্য তাঁদের কবিতা নানা সাহিত্যের allusion এ ঠাসা, যার "ফলে কবিতার যে পূর্বতন প্রাঞ্জলতা ও অনায়াসবোধ্যতায় আমরা অভ্যস্ত তা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত"। বাহুল্য বর্জনের জন্য এঁরা "সিনেমা প্রযোজকদের cutting পদ্ধতি অনুসরণ" করেন; অর্থাৎ কবিতার আদি-মধ্য-অন্তের দৃশ্যত যোগরক্ষার দায় ঘাড়ে নিয়ে কথা বাড়ান না, সে যোগসূত্র পাঠকের নিজের আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে। এ হলো বহিরঙ্গ। মর্ম্মের দিক থেকে এঁরা "অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী"। "অনেক সময় এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাববিনিময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে"। "কোনও সুনির্দিষ্ট সাধারণের বোধগম্য অর্থ-প্রকাশ করাকে প্রতীকী কবিরা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। বরঞ্চ এঁদের বিশ্বাস যে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সঙ্গে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্তি সঙ্গত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য তার সঙ্কুচিত করা হয়।"

এই আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী উঠে আসছে বুদ্ধদেব বসুর নাম। এইখানে আমরা উদ্ধৃত করি বুদ্ধদেব বসুর মত। ১৯৫৪'র মার্চে বুদ্ধদেব বসুর একক সম্পাদনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবার প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ভূমিকার এক জায়গায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—

> এই বইয়ের পরিকল্পনা আমার মনে জেগে ওঠে আজ থেকে প্রায় পনেরো, বছর আগে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনার ফলে, এবং সহৃদয়প্রকাশকের সহযোগিতায়, কল্পনাটিকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব হয়নি। সেবার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন দুজন রসজ্ঞ সমালোচক; তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মেলবার মতো জায়গা প্রশস্ত ছিলো ব'লে বইখানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। এবারে সম্পাদনা করতে হ'লো আমাকে। কোনো পাঠক দুটি সংস্করণের তুলনা ক'রে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, পূর্ববর্তী সম্পাদকের সঙ্গে কোথায় আমার রুচির প্রভেদ।
> কিন্তু প্রভেদটা একান্তভাবে রুচি বৈষম্যের জন্যই ঘটেছে, তাও নয়। ....পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা আধুনিকতার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ স্থির ক'রে নিয়েছিলেন; সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা, এইরকম কয়েকটি চিহ্নের সাহায্যে এঁরা যাচাই এবং বাছাই করেছিলেন। .....তখনকার মতো ঐ দিকেই ঝোঁক পড়া অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু এর ফলে অন্যদিকে অসম্পূর্ণতা ঘ'টে গেলো, গীতধর্মিতার স্থান হ'লো সঙ্কুচিত : চিত্রকল্পপ্রধান কবিতা, আবেগ প্রবণ কবিতা উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আধুনিক বাংলা কবিতা এই দুই দিকেই সক্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য; আর আমার সৌভাগ্য এই যে উভয়ক্ষেত্রেই আমার আনন্দ অবারিত।....

'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' প্রবন্ধটি হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন নাভানা থেকে 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৫) বেরনোর পর। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল পরিচয় পত্রিকায় ১৩৬২র পৌষ সংখ্যায়। পরে প্রবন্ধটি পরিচয় এর বিষ্ণু দে সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

'সাম্প্রত' পত্রিকায় বিষ্ণু দে সংখ্যায় প্রবন্ধটি ভূমিকা হিসেবে ছাপা হয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 'পুনশ্চ' আখ্যায় প্রবন্ধটির সঙ্গে নীচের অংশটুকু জুড়ে দিয়েছেন—

> আমার বিপদ এই যে কিছুটা দশচক্রে কবিতা ব্যাপারে বিজ্ঞ বলে একটা ধারণা আমার সম্বন্ধে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। ১৯৩৯-৪০ সালে শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের সহযোগিতায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে আমায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল—কাজের সিংহভাগ করেছিলেন আইয়ুব এবং অপর কয়েকজন বন্ধু; আমার অংশীদারি তুলনায় অল্প ছিল। অবশ্য ভূমিকা একটা লিখেছিলাম, এবং লিখে কিঞ্চিৎ শিষ্ট বিতণ্ডারও সূত্রপাত ঘটিয়ে ফেলেছিলাম। হয়তো তার জের আজও কিছু পরিমাণে চলছে। এটা বলে রাখছি কারণ কেউ যেন আমাকে কবিতার, বিশেষ করে আধুনিক কবিতার, মস্ত এক সমঝদার মনে করার মতো ভুল না করে বসেন।

আমাদের দেশের কবিতা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত অথচ নানা কাজে ব্যস্ত সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি হিসাবেই কয়েকটি কথা বলছি।
রবীন্দ্রোত্তর বলে যে যুগের বর্ণনা করা হয়, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে সেই যুগের সম্ভার নিয়ে অহংকারের অবকাশ আমাদের আছে। এ-যুগেরই প্রধান প্রতিভূ হলেন নজরুল, যাঁর ঝড়ের-ডানায়-চড়া প্রতিভার বিভূতি বাংলাভাষার এমন ভূষণ যার তুলনা নেই। অপর যে-মহাজনদের নাম মনে আসছে তাঁদের উল্লেখ আলাদাভাবে করছি না। কিন্তু আমার ধারণা যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অপর শৃঙ্গের তুঙ্গে যদি কাউকে দেখি তো তিনি হলেন বিষ্ণু দে।
স্বর মৃদু, কণ্ঠ অনুত্তোলিত, অথচ জীবন সত্যের সন্ধানে অবিরাম, বিশ্বরূপ দর্শনে পুলকিত, চিন্তায় গভীর, চেতনায় স্বচ্ছ এই কবি শব্দের যোজনায় যে সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা বাঙালি পাঠক মাত্রেরই গর্ব।
যুক্তি দিয়ে, তথ্য হাজির করে, সাহিত্য বিচারের বিভিন্ন অভিজ্ঞানের উল্লেখ করে বিষ্ণু দের কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণের সামর্থ্য বা সময় আমার নেই। আমি শুধু এইটুকু বলে ক্ষান্ত হব যে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' গ্রন্থটি পেয়ে যা আমার মনে আলোর মতো ঝল্‌কে উঠেছিল তাই আমার শেষ কথা—বিষ্ণু দে আজ বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবি, এ নিয়ে বিসম্বাদের কোনও স্থান নেই।

'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' প্রবন্ধটি নাম পাল্টে 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' আখ্যায় বসুমতী করপোরেশন লিমিটেড থেকে ১৯৯৩এর জানুয়ারিতে হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংকলন 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ'তেও সংকলিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে বিষয়ে লেখকের অন্য দুটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে—

১। বিদায়, বিষ্ণু দে

২। চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর মুক্তি স্নান

প্রথম প্রবন্ধটি বিষ্ণু দের প্রয়াণের (৩রা ডিসেম্বর ১৯৮২) অব্যবহিত পরে New Age পত্রিকার জন্য ইংরেজিতে লেখা 'শোক লেখ'র বঙ্গানুবাদ। দেবেশ রায়ের করা অনুবাদটি পরিচয় পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৮৯) ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হীরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন '৮৯ এর ১৯শে জুলাই এ 'এবং এই সময়' পত্রিকার 'বিষ্ণু দে স্মরণ সংখ্যা' (ফাল্গুন ১৩৯৬)র জন্য।

শারদীয় স্বাধীনতা (১৩৬০)য় বেরিয়েছিল 'আমাদের ইতিহাস'।

'প্যারিস ১৯৪৪' পরিচয় পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৩৫১র শারদ সংখ্যায়।

'প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ'ও বেরিয়েছিল পরিচয়ে—বৈশাখ ১৩৫৮য়। দিগন্ত পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'কয়েকটি সোভিয়েট বই'।

'ভারত আবিষ্কার' জওহরলাল নেহরুর The Discovery of India গ্রন্থের সমালোচনা। বেরিয়েছিল দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায়।

'ফুটবল প্রসঙ্গে'ও বেরিয়েছিল দৈনিক স্বাধীনতায়।

'আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব বিরাজ', 'বাঙালীর ইতিহাস', 'কেরলে কয়েকদিন', 'মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য' ও 'সাহিত্যপত্র ও স্বদেশজিজ্ঞাসা'—এই পাঁচটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় যথাক্রমে কার্তিক ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৫৭, বৈশাখ ১৩৬১ ও শ্রাবণ ১৩৬১তে।

'কেরলে কয়েকদিন' প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় দেবেশ রায়ের মন্তব্যের কথা—যা তিনি করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথেরই বই 'তরী হতে তীর' এর আলোচনা প্রসঙ্গে—

> আর একটা কৌতূহলও অতৃপ্ত থেকে গেল। হীরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ১৯৩৫ সালের পর থেকে নানা কাজে তাঁকে বাংলাদেশের (তখনকার অখণ্ড বাংলাদেশ) প্রায় সব জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ভাবতে ক্ষোভ হচ্ছে—হীরেন্দ্রনাথ সেই ভ্রমণগুলির অন্তত কিছু বিবরণ কেন দিলেন না, মাত্র একবার এক স্টিমার যাত্রার বর্ণনা ছাড়া। তাঁর 'চক্ষুষা কাণঃ'তে আমরা তাঁর লেখা ছোট ছোট ভ্রমণোপাখ্যান পড়েছি। সেই স্মৃতিলগ্ন ভ্রমণ হয়তো আমাদের খণ্ডিত দেশ পরিচয়ে একটু সান্ত্বনা আনত!
>
> [তরী হতে তীর ঃ পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত/ দেবেশ রায়/ সাহিত্যপত্র]

'চক্ষুষা কাণঃ' গ্রন্থের দ্বিতীয় কোনো সংস্করণ হয়নি। এই গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ— 'আধুনিক বাংলা কবিতা' ও 'বাংলা কবিতা ও বিষ্ণু দে' সংকলিত হয়েছে লেখকের অন্য একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৯৩) গ্রন্থে।

১৩৮৩র বৈশাখে (এপ্রিল ১৯৭৬) হীরেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংকলন 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—

> বেশ কিছুকাল আগে 'চক্ষুষা কাণঃ' নামে আমার যে প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ হয়েছিল, তা বহুদিন দুষ্প্রাপ্য বলে পুনর্মুদ্রণের কথা কেউ কেউ ভেবেছিলেন। প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশ বিভিন্ন সাময়িকী থেকে সংগৃহীত বলে হয়তো বর্তমানে অচল মনে করে সংকোচ বোধ করলেও আমার প্রাক্তন ছাত্র ডঃ অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে বইটি আবার বার করাতে রাজি হয়েছি। নতুন করে ছাপাবার অজুহাতকে মজবুত করার জন্য অন্য কয়েকটি লেখাও খুঁজে পেতে অনিলবাবু জুড়ে দিয়েছেন।......
>
> সংকলনের নামকরণ হল 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা'। একটু কটোমটো হয়তো শোনাবে, কিন্তু ক্ষতি কি? বাক্যটি বন্ধুবর কবি বিষ্ণু দে-র খুবই প্রিয়, বলতে পারি আমারও—
>
> 'চক্ষুষা কাণঃ' যাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম, তিনি আর নেই। সম্পূর্ণ একক এবং অবহেলিত অবস্থায় প্রবাসে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। বলা যেতে পারে প্রায় ইচ্ছামৃত্যু—দেশ-মায়ের ওপর অভিমান করে

যেন দেশের বাইরে জীবনাবসানই ছিল তাঁর কাম্য। উৎসর্গ যে ভাষাতে করেছিলাম, তার কোন অদলবদল করলাম না। আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস করি না—সুতরাং জানি এতে তাঁর কোনো সান্ত্বনা নেই। তবে আমার মতো ব্যক্তি হয়তো এ থেকে একটু সান্ত্বনা পাব।

[হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৩শে মার্চ ১৯৭৬ ভূমিকা—স্বদেশ জিজ্ঞাসা]

'চক্ষুষা কাণঃ' নামে বইটির দ্বিতীয় কোনো সংস্করণ প্রকাশিত না হলেও কুড়ি বছর পরে প্রকাশিত 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' আসলে 'চক্ষুষা কাণঃ'র পরিবর্ধিত সংস্করণ। পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থের কোনো প্রবন্ধই বর্জিত হয়নি—সংযোজিত হয়েছে পাঁচটি নতুন প্রবন্ধ ও একটি অনুবাদ রচনা।

৫। অল্পে সুখ নেই

প্রবন্ধ সংকলন

অল্পে সুখ নেই/ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়/ মিত্রালয়/ ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট; কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী ১৯৬৪

চার টাকা

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে সত্যশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও রূপনন্দা প্রেস, ১৩৮/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড হইতে প্রাণ গোপাল গোস্বামী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ/ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর/ করকমলে

৬+১৩১ পৃষ্ঠার বই।

৬ পৃষ্ঠার মুখবন্ধ—নতুন দিল্লীর সংসদভবনে ১৯৬৩র ২০শে সেপ্টেম্বরে লেখা। মোট বারোটি প্রবন্ধের সংকলন।

সূচী

'অল্পে সুখ নেই' নামকরণ প্রসঙ্গে 'তরী হতে তীর'এ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন---

> কতকগুলো শোনা এবং শেখা কথার মায়া মনকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কেমন যেন ভালো লাগত নিজেকে বলতে : নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম—আজও ভালো লাগে, যার প্রমাণ রয়েছে আমার এক অকৃতী প্রবন্ধ সংকলনের 'অল্পে সুখ নেই' নামকরণে।
>
> [তরী হতে তীর পৃঃ ১২২]

'অল্পে সুখ নেই'এব বারোটি প্রবন্ধের দুটি 'মহাবীর ও বুদ্ধ' ও 'মুঘল শাসনকালের গুরুত্ব' এই সংকলনের বাইরে থাকল। এই প্রবন্ধ দুটি হীরেন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

'অল্পে সুখ নেই'এ রয়েছে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ।

যুগসন্ধি ও বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব (শারদীয় পরিচয় ১৩৬৫)

সাহিত্যে শাসন (পরিচয়, আশ্বিন ১৩৬৬)

ক্রিকেটের ইন্দ্রজাল (পরিচয়—মাঘ ১৩৬৬)

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবোধ (পরিচয় আশ্বিন ১৩৬৮)। এই প্রবন্ধটি 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ'এ সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্যপত্র পত্রিকায় বেরিয়েছিল দুটি প্রবন্ধ ইন্দ্রপাত (১৩৬৭) ও অল্পে সুখ নেই

'গল্প উপন্যাস প্রসঙ্গে' নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের কলকাতা অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি। এই প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন।

> ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে পঠিত ইংরেজি প্রবন্ধের এই অনুবাদ আমার 'অল্পে সুখ নেই' সংকলনে (১৯৬৪) প্রথম প্রকাশ হয়। তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আমার বহু গুণান্বিত বন্ধু হুমায়ুন কবির-এর আগ্রহে এই সম্মেলনে বসে। জওহরলাল নেহরু কলকাতায় এস বক্তৃতা দিয়ে যান। অবাঙালি বেশ কয়েকজন লেখক যোগ দেন। আমাকে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জোরজার করে হুমায়ুন প্রবন্ধটিকে লেখায় এবং সেটি আমাকে পড়তে হয়। এতদিন বাদে এটা ছাপবার কারণ আছে। আমার বক্তব্যে হয়তো বাহুল্য ছিল, একটু বুঝি বেয়াড়া ভাবও দেখিয়ে ফেলেছি। বেশ মনে আছে আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তির আবহাওয়া এসে নেমেছিল। বহুদিনের বন্ধু এবং প্রগতি লেখক আন্দোলনের নায়ক মূলক্‌রাজ আনন্দ নিজের বলবার পালা চুকে গেলেও আবার অনুমতি চাইলেন আমার কথার বিরোধিতার জন্য। ইঙ্গ-ভারতীয় রচনা বিষয়ে সামান্য একটু উল্লেখ এবং কটাক্ষ ছিল এর হেতু। বেশ মনে পড়ে উপস্থিত অনেকেই যেন বিচলিত। হয়তো বা বিরক্ত, ক্ষুদ্ধ। মনোজ বসুর মতো আমাদের কাছের লোকও

অখুশি। শুধু তারাশঙ্করবাবু উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার সব কথা মানছেন না জানিয়ে দিয়েই। আর যেন নীহাররঞ্জন রায় এর সকৌতুক দৃষ্টিতে একটু প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতার পরিচয় পেয়েছিলাম, যাকে অব্যক্ত অনুমোদন বলা যেতে পারে।

যদি কোনো অনভিপ্রেত রূঢ়তা থেকে থাকে এই লিখিত বিবৃতিতে, তাহলে দুঃখ বোধ করলেও না বলে পারছি না যে কিছু আতিশয্য ঘটিয়ে থাকলেও আমার সেদিনের যে-বক্তব্য ছিল তা মূলগতভাবে আজও ঘোষণা করি। এটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হবে না ভরসা করি। দৃষ্টান্তস্বরূপই বলি—অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়কে সেদিন বাংলা আকাদেমির সভায় 'বসুধাকুটুম্ব' বলে সম্বোধন করেছি তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা বহুকাল ধরে পোষণ করি বলে। আমাদের মধ্যে বয়সের তফাৎ খুব বেশি নয়। কিন্তু কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই যে পড়েছি 'পথে প্রবাসে' আর বহুজনের মতোই মুগ্ধ হয়েছি। বহু বিষয়ে ব্যবধান সত্ত্বেও বহুমানভাজন এই মানুষটির প্রতি অশ্রদ্ধা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সবাই বিশ্বাস করুন বা না করুন, এ প্রবন্ধে সুস্পষ্ট অথচ সুবিনীতভাবেই এই পুরনো লেখায়, আমার চিন্তা সন্নিবদ্ধ হয়েছে।

'কাছে দেখা রবীন্দ্রনাথ' লেখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যার জন্য। পরে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সংসদ প্রকাশিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থেও মুদ্রিত হয়েছে।

'সার্বভৌম কবি' গোপাল হালদার সম্পাদিত ও ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশিত রবীন্দ্র শতবার্ষিক প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ' এর জন্য লেখা। পরে এই প্রবন্ধের নামেই রাখা হয়েছে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'সার্বভৌম কবি ও অন্যান্য প্রবন্ধ'

'ভারতের সংহতি' ও 'অল্পে সুখ নেই' প্রবন্ধ দুটি হীরেন্দ্রনাথের 'চরৈবেতি চরৈবেতি' প্রবন্ধ গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত।

'অল্পে সুখ নেই' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। তাঁর অন্য প্রবন্ধ গ্রন্থেও সংগৃহীত হয়েছে রবীন্দ্র বিষয়ক নিবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অগ্রন্থিত রচনার সংখ্যাও কিছু কম নয়—যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায়। দুটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ বাহুল্য হবে না—

১। কোনখানে রাখবো প্রণাম (পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ১২৫ বিশেষ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় / মে-জুন '৮৬)

২। রবীন্দ্রনাথঃ রাষ্ট্রচিন্তা, দেশাভিমান, বিশ্বমানবিকতা (রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধ সংকলন/ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিজের কথায়—

সৌভাগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী এই দুই পুরুষোত্তমকে কাছে থেকে দেখেছি, একটু জানার সুযোগ পেয়েছি—এঁরা তো ক্ষণজন্মা,

প্রায় যেন এই গ্রহবাসী নন অথচ এই সুন্দর পৃথিবীর একান্ত আপনজন।

[নব্বই পেরিয়ে—২৩শে নভেম্বর '৯৭—কালান্তর]

...একান্ত শুভবুদ্ধি নিয়েই পান্নাবাবু আমাদের মতো দেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদী প্রয়াসকে সম্মিলিত করার কথা উত্থাপন করেছেন। অনেকে বিচলিত ও বিরক্ত হলেও আমার মনেও এই প্রসঙ্গ প্রায়ই ঘোরাফেরা করে।

... মার্কসের চিন্তা আর কর্মে সম্ভোগসর্বস্বতার বিপক্ষে যে বিদ্রোহ জাজ্জ্বল্যমান তার সঙ্গে সাদৃশ্য পুরোপুরি রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর ভারত চিন্তায়।.... বর্তমানে এদেশে নতুন অর্থনৈতিক অদল বদলের পরিবেশে যে সম্ভোগসর্বস্বতা আজকের ব্যাপক আর প্রায় যেন অনিবার্য নীতিভ্রংশ ও সর্ববিধ মানব কল্যাণ প্রয়াসে দেশব্যাপী অনীহার সৃষ্টি করেছে, তার বিপক্ষে মার্ক্স্‌বাদীরাই সংগ্রামে অগ্রণী হতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মতো যুগন্ধর মহাত্মার চিন্তা থেকেও অনেক কিছু আহরণ করতে পারেন।....

[উদ্বোধনীভাষণ—সার্দ্ধশতবর্ষের আলোকে কমিউনিস্ট ইস্তাহার স্মরণিকা/ ষষ্ঠ-বঙ্গীয় দর্শন সেমিনার/ দর্শন ও সমাজ

রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী হীরেন্দ্রনাথের মন ও মননের একটা বড়ো জায়গা দখল করে রেখেছেন। হীরেন্দ্রনাথের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাস্বর জীবন আর কর্মযোগ দিয়ে ছিন্নমূল বৃত্তির প্রতিরোধ করেছেন। হীরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রচিন্তা চর্চা প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষের মনে হয়েছে—

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কথা বলতে গেলে হীরেন মুখার্জির মতো মানুষদের গলায় এমন একটা স্বর এসে যায়—কেবল বাগ্মিতাতেই নয়, রচনাতেও—যাতে মনে হতে পারে তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশয়িতায়, আর সমকালীন দেশকালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীন লগ্নতার পরিমাণের কথা ভাবলে বোঝা যায় সেটা না-হওয়াই ছিল অসম্ভব। এটা স্বাভাবিক যে যাঁরা তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর সৃষ্টিতে আর তাঁর দায় বহনে, তাঁদের পক্ষে এটাই হবে ভবিতব্য। 'here is God's plenty', চসার বিষয়ে বলা ড্রাইডেনের এই উচ্চারণ তাঁর মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে......।

[মুক্ত আবেগ/ শঙ্খ ঘোষ/ জীবনের জলছবি পৃ ২৬]

হীরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্র বিষয়ক লেখায়, বক্তৃতায়, আলোচনায় এমনকী ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ঘুরে ফিরে আসে এক একটি প্রসঙ্গ—শঙ্খ ঘোষের লেখায়, একই স্মৃতির, একই ঘটনার আবেগ ভরা উল্লেখ প্রসঙ্গে আমরা পেয়ে যাই অনন্য এক ব্যাখ্যা—

> ...কতবার কতভাষায় যে এই কাহিনীটিকে ছুঁতে চেষ্টা করেছেন হীরেন মুখার্জী তা ভেবে অবাক লাগে। কিন্তু কেনই বা অবাক লাগবে যদি মনে থাকে যে এই একটি অভিজ্ঞতার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে দেশাভিমান, সত্তাভিমান আর সৃষ্টির অভিমান, এই একটি ঘটনার মধ্যে ধরা দিয়ে আছে কবিতার দিকে ঠিকভাবে পৌঁছবার যোগ্য কোনো পথের নিশ্চিত এক দীক্ষা।
>
> [মুক্ত আবেগ/ শঙ্খ ঘোষ/ জীবনের জলছবি পৃ ২৮]

একজন হীরেন্দ্রনাথের মধ্যেই আছেন অনেক হীরেন্দ্রনাথ। তিনি একইসঙ্গে বাগ্মী, সাংসদ, সুপণ্ডিত, রাষ্ট্রনেতা, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও সুলেখক। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি, অগ্রন্থিত লেখার সংখ্যাও অনেক। অনেকের মনে হয়েছে সাহিত্যই তাঁর স্বস্থান। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের আলোচনায় অনেক অজস্রপ্রসূ অথচ ছিন্নমূল লেখকদের প্রসঙ্গ নিয়তই চোখে পড়ে। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় হীরেন্দ্রনাথের মননশীলতার ওপর তীক্ষ্ণধী কোনো আলোচনার প্রয়াস পর্যন্ত নেই দেখে। এই গ্রন্থে সংকলিত মরমী মননশীল প্রাবন্ধিক হীরেন্দ্রনাথের পাঁচটি গ্রন্থের কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা সমকালীন পত্রপত্রিকায় চোখে পড়েনি। তাঁর যথার্থ আর স্বাভাবিক পরিচয় খুঁজতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ তাঁর উপরিউক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে যখন লেখেন

> 'ভালোবাসার এই আবেগেই হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমরা পাই ঠিক ঠিক চেহারায়। সে-আবেগ হতে পারে তাঁর স্বদেশকে স্বকালকে নিয়ে, সে-আবেগ হতে পারে মার্ক্স্‌বাদ নিয়ে, সে-আবেগ হতে পারে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও। বা, অন্যভাবে হয়তো বলা যায়, এই তিন প্রসঙ্গ তাঁর কাছে কোনো ভিন্ন প্রসঙ্গ নয়, পরস্পর সম্পৃক্ত এই তিন যেন একই প্রসঙ্গ হয়ে গেছে তাঁর মননে আর অনুভবে, আর এই একত্রীকরণেই হীরেন্দ্রনাথের যথার্থ আর স্বাভাবিক পরিচয়।
>
> [মুক্ত আবেগ/ শঙ্খ ঘোষ/ জীবনের জলছবি পৃ: ৩১]

তখন আমরা সামগ্রিক হীরেন্দ্রনাথের একটা স্পষ্ট ছবি দেখতে পাই যেন।

পরিশিষ্ট—

পরিশিষ্টে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভূমিকার পূর্ণপাঠ ও ''আধুনিক বাংলা কবিতা''র প্রথম সংস্করণের সূচিপত্র মুদ্রিত হল।

ভূমিকা

১

কোনো একটি ভাষায় নির্দিষ্ট কালের মধ্যে কিংবা বিশিষ্ট শ্রেণীর ভিতরে কোন্ কোন্ কবিতা ভাল, কাব্যসঙ্কলনগ্রন্থকে এই প্রশ্নের উত্তর মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ কাব্যসঙ্কলন কাব্যসমালোচনারই অন্তর্ভূক্ত। কাব্যসমালোচনা এর সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন তুলতে বাধ্য : ভাল কবিতা কোন্টা জানতে হলে জানা দরকার ভাল কবিতা কী। এ-দুটি প্রশ্ন যে পরস্পরকে এড়িয়ে চলতে পারে না সে কথা এলিয়ট্ প্রসঙ্গত স্বীকার করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হলে প্রথম প্রশ্ন সমাধানে এগুনোই যে সম্ভব নয়, তা তিনি মানেন নি; বরঞ্চ দ্বিতীয় প্রশ্নের নিরাকরণ তাঁর আয়ত্তে নয়, তাঁর আলোচনাক্ষেত্রের অন্তঃপাতীও নয়, এই সবিনয় স্বীকৃতির মধ্যে সেটাকে চাপা দিয়েছেন। তার মানে এই যে ভাল কবিতা কী তা না জেনেও আমরা চিনে নিতে পারি কোন্ কবিতাটি ভাল, সম্ভবত কোনো এক অনির্দেশ্য বুদ্ধি-অতিক্রান্ত শক্তির সাহায্যে যাকে দার্শনিকরা বোধি নামে অভিহিত করতেন, কিন্তু ''রুচি'' বলেই সাহিত্যিক সমাজে যার প্রচলন। সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই রুচিসম্পন্ন ব'লে নিজের প্রমাণ-নিরপেক্ষ পরিচয় দিয়ে থাকে; সাহিত্যিক আভিজাত্যের নীলরক্তধারা তার ধমনীতে প্রবহমান, পরের রুচিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তার বংশপরম্পরাগত। সুরুচি মানে ভাল কবিতা চিনবার শক্তি, এবং ভাল কবিতা তাই যা রুচিবানেরা বরণ করেন, এমন একটি স্থূল চক্রিক ন্যায় যে কেমন ক'রে তাঁদের সূক্ষ্ম সুকুমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তার রহস্য বাণীর বরপুত্রেরাই জানেন।

এটা অবশ্য সম্ভব যে ভাল কবিতা কী সে-বিষয়ে আমাদের মনে একটি ধারণা রয়েছে, অথচ সেটাকে আমরা পরের কাছে, এমন কি নিজের কাছেও, ভাষায় ব্যক্ত করিনি। সে ধারণা অজ্ঞাত বা আসংজ্ঞাত থেকেও কোন্ কবিতা ভাল তা বেছে নিতে আমাদের নির্দেশ দিতে পারে। সক্রেটিস যেমন ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন তুলবার সময়ে ধ'রে নিয়েছিলেন যে আমরা কতকগুলো নৈতিক ঘটনাকে ন্যায় কিম্বা অন্যায় ব'লে নিঃসন্দিগ্ধভাবে চিনি। তাঁর সমস্যা ছিল এই নির্বিবাদ দৃষ্টান্তগুলির তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে ন্যায়ত্বের ধারণায় পৌঁছানো। তেমনি হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়র, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস—এঁদের রচনা হয় তো সর্ববাদীসম্মতিক্রমে ''ভাল কবিতা''র আখ্যা পেতে পারে। সক্রেটিসের মতন, কাব্যসমালোচককেও এ সমস্ত কবিতার সামান্য ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ থেকে ''ভাল কবিতা''র সংজ্ঞা-নিরূপণের চেষ্টা করতে হবে, নইলে যখন এমন কবিতার বিচার প্রয়োজন যেখানে সর্বসম্মতির অভাব, আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা অনিবার্য্য, তখন আপন বনেদী রুচির দোহাই পাড়া ছাড়া তার গতি থাকবে না।

রুচির নির্দেশ মেনে চলতে গিয়ে সমালোচনার ইতিহাস স্বৈরাচারের তালিকায় পরিণত হয়েছে। ড্রাইডেনের মতন কবি ও সমালোচক তাঁর সমসাময়িক নগণ্য নাট্যকারগণকে গ্রীক ও এলিজবিথীয়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, এবং Measure for Measure-এর ভাষাকে "vulgar" আখ্যা দিয়ে গেছেন। কাউলির প্রতিপত্তি তাঁর সময়ে মিল্টনের চেয়ে অধিক ছিল,

মিলটন স্বয়ং তাঁকে শেক্সপীয়র ও স্পেন্সরের তুল্য জ্ঞান করতেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে পোপ্ অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন করছেন "কাউলি আজ পড়ে কে?" পিপ্স্ খুব বড় সাহিত্যিক না হলেও একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, এবং এতই বিদগ্ধ যে অথেলো নাটকখানির ইতরতা বরদাস্ত করতে পারতেন না। ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে প্রামাণ্য কাব্যসঙ্কলনের সম্পাদক পল্‌গ্রেভ্-এর রুচি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা নিশ্চয়ই মূঢ়তা। তাঁর সঙ্কলনগ্রন্থে যেখানে ক্যাম্‌বেলের এগারোটি কবিতা বিরাজমান, এবং যার পরিবর্ধিত সংস্করণে লংফেলোর ("কিছু না হোক লংফেলোদের হব আমি সমান তো"—সেই লংফেলো) তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে, সেখানে ডান্ কিম্বা ব্লেকের জায়গা হয়নি। মোট কথা ভিন্ন দেশের রুচি তো ভিন্ন বটেই, কোনো একটি দেশেও যুগে যুগে তার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের মহৎ তুচ্ছ হয়ে যায়, তুচ্ছ মহৎ। একই যুগেও রুচিবৈষম্য বড় কম নয়, তবু যে একটা ছাঁচ গ'ড়ে ওঠে সেটা স্বাধীন বিচারের পরিণাম নয়, মানুষের দাসত্বপ্রীতি ও ফ্যাশনপ্রবণতার নিদর্শন। "With the ascendency of T. S. Eliot, the Elizabethan dramatists have come back into fashion and the 19th century poets gone out. Milton's reputation has sunk and Dryden's and Pope's risen. It is as much as one's life is worth nowadays among young people, to say an approving word for Shelley or a dubious one about Donne. And as for the enthusiasm for Dante—to paraphrase the man in Hemingway's novel, there's been nothing like it since the Fratellinis. (Edmund Wilson).

একথা সত্য যে দর্শনে অনন্তকাল ধ'রে এবং পদার্থবিজ্ঞানে ইদানিন্তন প্রভূত মতানৈক্য পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তা সত্ত্বেও যখন এদের পক্ষে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান সম্ভব, তখন সাহিত্যের রুচিবৈষম্য কেন তার নৈর্ব্যক্তিকতার অপ্রমাণ। এই জন্য যে, দর্শনে বিজ্ঞানে যখন মতভেদ ঘটে তখন দুই পক্ষ পরস্পরকে আহ্বান করে তার প্রতিজ্ঞাগুলি বিচার করতে, তার যুক্তি খণ্ডন করতে, তার ভ্রান্তি উদঘাটন করতে। এ তর্কের মীমাংসা হয় তো অনেকক্ষেত্রে হয় না, কিন্তু তার সম্ভাবনা আছে, এবং সে সম্ভাবনার উপরই objectivity-র দাবী নির্ভর করে। এদিকে, সাহিত্যে যখন রুচির গরমিল ঘটে তখন একথা বলা ছাড়া উপায় থাকে না যে আমি দান্তেকে বড় কবি ব'লে জানি এবং আমার রুচি আপনার চেয়ে শ্রেয়, কি এলিয়ট অথবা অন্য কোনো সাহিত্যিকপ্রবর এমনতর মন্তব্যের পরিপোষক। এর বেশি কিছু বলতে গেলেই কবিতা কী, তার ভালমন্দ কিসে, এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

কবিতা কী, অথবা আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে আর্ট কী, এ-সমস্যা প্লেটোর সময় থেকে বহু মতবাদ ও মতবিরোধের সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে, এবং চাক্ষুষ বৈচিত্র্যের চেয়ে মর্মগত ঐক্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হলে, সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে সাজানো যেতে পারে: পারমার্থিক, সামাজিক এবং স্বাশ্রয়ী।

পারমার্থিক। আর্টের স্বাতিক্রমণশীলতায় বিশ্বাস প্রাচীন, তবে হেগেলের দুর্নিবার ব্যক্তিত্বের ছাপ পেয়ে উনিশ শতকের নন্দনশাস্ত্রে এর অসম্ভব পরিব্যাপ্তি দেখা যায়। এ, সি, ব্রাড্‌লি কাব্যের বিশুদ্ধতা ও অনন্যাধীনতার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়েও স্বীকার ক'রে ফেলেছেন যে কাব্যের মূল্য তার প্রকাশ্য রূপে নয়, সে-রূপের অতীত কোনো এক বৃহত্তর

সত্তার ব্যঞ্জনায়। এটা হেগেল-দর্শনের সেই অতিউদ্ধৃতিজীর্ণ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি যে আর্ট হচ্ছে ইন্দ্রিয়গম্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বও এই মতবাদের পরিধির মধ্যে এসে পড়ে। "আমার জন্য সমস্ত আকাশের রঙ নীল ক'রে, সমস্ত পৃথিবীর আঁচল শ্যামল ক'রে, সমস্ত নক্ষত্রের অক্ষর উজ্জ্বল ক'রে আহ্বানের বাণী মুখরিত। এই নিমন্ত্রণের উত্তর দিতে হ'বে না কি? মানুষ তাই মধুর করেই বললে, 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চিরসুন্দর, আমি স্বীকার ক'রে নিলাম'।" এই স্বীকৃতির স্বাক্ষর হচ্ছে তার কলাসৃষ্টি। তাতে সে প্রকাশ করেছে তার অন্তরতম উপলব্ধিকে, ছন্দে মিলে রঙে রেখায় রূপ দিয়েছে সুন্দরের মধ্যে সত্যের আবির্ভাবকে। সাধকের বাণী শিল্পীর বাণীও বটে ঃ তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ। একটি জায়গায় অবশ্য কবির সঙ্গে দার্শনিকের মতবৈষম্য স্বাভাবিক। হেগেল মনে করেন সেই বেদনীয় পুরুষের সম্যকজ্ঞান দর্শনেই সম্ভব, আর্টে তার পরিচয় কেবল আভাসে ইঙ্গিতে। আর্টকে তাই তিনি দর্শনের প্রাথমিক ও অপরিণত রূপমাত্র বিবেচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বলবেন যে দার্শনিকের তত্ত্বব্যবসায়ী বুদ্ধি যেখানে এক ও বহু, সামান্য ও বিশেষ, প্রমা ও প্রতিভাসের শততর্কজালে জড়িয়ে দিশাহারা হয়, সেখানে শিল্পীর রূপায়নিক উপলব্ধি সমস্ত তর্কবিতর্কের হট্টগোল থেকে দূরে সরে গিয়ে শুনতে পায়

"তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু গভীর গোপনে।"

সামাজিক। শিল্পীর উদ্দেশ্য ধর্মনীতি প্রচার, এমন কথা সোজাসুজি কেউ না বললেও, আর্টের মূল্য যে অনেক পরিমাণে নৈতিক, গত শতাব্দীতে এই মত শেলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, তল্‌স্তয় প্রভৃতির সমর্থন লাভ করেছিল। আর্টের উপর মরালিটির দাবী বিংশ শতাব্দীতেও অস্বীকৃত হয়নি, তবে তার স্বরূপ এখন ব্যক্তিক নয়, সামাজিক। ব্যক্তির চরিত্রোৎকর্ষের চেয়ে সমাজের সুনিয়ন্ত্রণকে এখন বড় ক'রে দেখা হচ্ছে। সমাজজীবনকে সব দিক থেকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে ধনবণ্টনের অব্যবস্থা এবং বৃত্তিভোগী ও শ্রমজীবীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ, এ-বিষয়ে বড় একটা মতভেদ নেই। আমাদের চিৎপ্রকর্ষের সমস্ত প্রেরণাকে আপাতত নিয়োগ করতে হবে এই বিকলাঙ্গ সমাজের পুনর্গঠনের জন্য। কাজেই শিল্পীর শুভানুধ্যানের ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক নয়।

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে আর্টের কোনো চিরন্তন প্রতিমান থাকতে পারে না। প্রত্যেক যুগের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সে যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে দেয়; তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন, আচার, ধর্মনীতি তো এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বটেই, তার দর্শন বিজ্ঞান, তার শিল্পকলা, তার অধ্যাত্মচর্চার উপরও এর ছাপ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পড়ে। ফিউডল্ যুগে যদিচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ছিল ধনীনির্ধন ও দাসপ্রভুর সম্বন্ধের দ্বারা কলুষিত, তবু তাতে একটি চিত্রল সততা এবং মানবিক সম্পর্কের বিকাশ সম্ভব ছিল ব'লে তার আর্টের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেও ফুটে উঠল অকপট প্রাণের শ্যামলিমা। রেনেসাঁসের সময়ে যখন

ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল, তখন তার নবীন রক্তে প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মানুষকে (যদিও অল্প.সংখ্যক মানুষকে) ধনশালী করবার তস্করসুলভ বলিষ্ঠ উল্লাস ছিল। সেই বলিষ্ঠতা দেখা যায় তার নবনির্মিত সংস্কৃতির বহুবিস্তৃত শাখায় প্রশাখায়, ইটালির চিত্রে, ইংলণ্ডের সাহিত্যে, সমস্ত য়োরোপের জ্ঞানার্জনস্পৃহায়। কালক্রমে এর নবীনতা ঘুচল, অগ্রগতির অনুপ্রেরণা নিঃশেষ হল, উনিশ শতকের শ্রমবিপ্লবের ফলটুকু ভোগ করবার পর এর জীর্ণ দেহ আর প্যারিসীয় প্রসাধনে ঢেকে রাখা সম্ভব রইল না। ব্যক্তিসম্পর্কের শেষ চিহ্ন মুছে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ঠেকল এসে অনাবৃত স্বার্থের সম্বন্ধে। বাণীর মন্দিরে কুবেরের সিংহাসন পাকা হল; বিংশ শতাব্দীর কবিরা Hymn to Intellectual Beauty না লিখে লিখতে বাধ্য হলেন

আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার। (সমর সেন)

এই আশুবিলীয়মান সভ্যতার ধূলিধূসরিত পটভূমিকায় কিন্তু ফুটে উঠছে নতুন এক সমাজের অরুণ রেখা। সে-সমাজের সংস্কৃতি কী রূপ ধারণ করবে, তার সাহিত্য তার শিল্প কী আদর্শ বরণ করবে, তা এখনো নিশ্চিত ক'রে বলবার সময় আসেনি। ইতিমধ্যে শিল্পীর কাজ পুরাতনের ভগ্নাবশেষ ঝেঁটিয়ে ফেলে নূতনের পথ পরিষ্কার করা। ইতিমধ্যে আর্ট শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে, সর্বদেশকালের যে অধিপতি তাকে হতে হবে সামান্য সৈনিক। এতে যদি আমাদের বিশুদ্ধ শিল্পানুরাগ পীড়িত হয়, আমাদের পরমমূল্যবোধ যদি বিক্ষুব্ধ হয়, তা হলে আমরা ত্রৎস্কির উক্তি স্মরণ করতে পারি: It is society itself which under communism becomes the work of art.

স্বাশ্রয়ী। এর প্রায় বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন ক্রোচে এবং কলিংউড্। চিত্র বা কাব্য তাঁদের কাছে বিশুদ্ধ কল্পনা, সামাজিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তো বটেই, বহির্জগতে কোনো কিছুর সঙ্গে তার ক্ষীণতম সম্বন্ধ নেই, বাস্তব অবাস্তব কোনো বিশেষণই তাতে প্রয়োগ করা যায় না। আমাদের ধ্যানদৃষ্টি যখন তাতে নিবদ্ধ তখন আমাদের চিত্ত অপরাপর সকল বিষয়ের অবগতি থেকে আকুঞ্চিত হয়ে অব্যাহত একাগ্রতা লাভ করে তারই মধ্যে, অন্য কিছুর চৈতন্যের অবকাশ তখন থাকে না। বাস্তব সে নয়, কারণ কোনো জিনিষকে বাস্তব বলা মানেই আর সমস্ত জিনিষের সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। অবাস্তবও তাকে বলা চলে না, কারণ অবাস্তব তাই যার ব্যবহার জাগতিক নিয়মের ব্যতিক্রম, যা অপ্রত্যাশিত, উৎশৃঙ্খলিত। যেমন প্রাতিভাসিক সর্প। সে-সর্প আপন জৈব ধর্ম পালন করে না, ছোবলায় না, পালায় না, কাজেই তাকে বলি অবাস্তব। কিন্তু শিল্পীর রচনাকে আমরা বস্তুবিশ্ব থেকে পৃথক ক'রে দেখি, তাতে বাস্তবের কোনো নিয়ম আরোপই করি না। অবশ্য তার সঙ্গে শিল্পীর সমাজের, সে-সমাজের আর্থিক সংস্থানের, তার পূর্ব ইতিহাসের সম্বন্ধ এক দিক থেকে ক্রোচেও স্বীকার করেন। তবে সে-সম্বন্ধের কথা যখন আমরা অবগত, তখন আমরা ঐতিহাসিক বা সমালোচক, রূপদ্রষ্টা নই। তখন শিল্পরচনা ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র, তার শিল্পরূপ আমাদের ⁻⁻থ্যসন্ধানী ও তত্ত্ববিশ্লেষণী দৃষ্টির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। কিন্তু রসানুভূতির মধ্যে

যখন তাকে পাই, তখন তার সঙ্গে সমাজের বা বস্তুজগতের কোনো যোগাযোগ নেই, সে স্বতন্ত্র, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রাণধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা দুটি দিকে মুক্তির পথ পেয়েছি, দর্শনে আর শিল্পকলায়। দর্শন বিশুদ্ধ concept-সমূহের বিন্যাসের মধ্যে অন্তঃসঙ্গতি আনতে চায়; শিল্পীর কারবার image নিয়ে। এই মানসপুতুলগুলিকে সে খুশীমত ভাঙে আর গড়ে, সাজায় আর গুছায়। সে-ভাঙাগড়ার খেলায় একমাত্র তার মনোগত সৌষ্ঠবের দাবী ছাড়া আর কিছুই সে মানে না, ব্যবহারজগতের কোনো বিধিই সে পালন করে না। জৈববিজ্ঞানের আধিপত্য থেকে সে মুক্ত। আমাদের আটপৌরে জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত উপলব্ধি উর্দ্ধতনের মৌল অনুপ্রেরণার বশীভূতঃ আমরা প্রয়োজনের দাস। সে-দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করতে পারে শিল্পী। রসের অনুভূতি মুক্তির অনুভূতি; তার সার্থকতা, তার পরিপূর্ণতা এইখানে।

বহু মতবাদেব মধ্যে তিনটি প্রতিভূ মতের উল্লেখ করা গেল। এগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা কিম্বা আপেক্ষিক বিচার এখানে সম্ভব নয়। তবে এটা নিশ্চিত যে এর কোনো নিষ্পত্তি না হলে, কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অংশতও কোনো মতস্থৈর্য না ঘটলে, কবিতার ভালমন্দ যাচাই নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বসম্মতির দাবী করতে যাওয়া হয় মূঢ়তা, নয় অহঙ্কার। সে-যাচাই আমরা যে-রূপদক্ষ রুচি দিয়ে করি তা সেই রসনা-রুচির সগোত্র যার কল্যাণে কেউ আম খেয়ে সুখ পান, কেউবা আমসত্ত পছন্দ করেন।

* * *

আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক কোন্‌খান থেকে আরম্ভ হয়েছে বলা শক্ত, প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে সব জায়গায় প্রাকৃতিক সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের কবিতা যে মোটের উপর রবীন্দ্রকাব্যেরই প্রতিধ্বনি, এতে সন্দেহ করা চলে না, এবং আক্ষেপও করা যায় না যখন আমরা স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলার মতন দীন সাহিত্যকে ঋদ্ধির কোন্ স্তরে নিয়ে এসেছে। তৃতীয় দশকে নজরুল ইসলাম, যতীন সেনগুপ্ত প্রভৃতির শক্তি ও সাহসের ফলে সে-সর্বজয়ী প্রতিভার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে নবীন বাঙালী কবিদের নিজেকে চিনবার এবং চেনাবার সুযোগ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে তাকে আশাতীত মর্য্যাদা দান করলেন। গদ্যরীতির প্রচলন ক'রে, কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন ক'রে, কবিকুলপরিত্যক্ত "অসুন্দর" প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেষকে গ্রহণ ক'রে, তিনি নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙেছেন। তার স্থানে নতুন কোনো ঐতিহ্য এখনো গ'ড়ে ওঠেনি, অদূর ভবিষ্যতে গ'ড়ে ওঠবার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধপরবর্তী মেজাজ ঐতিহ্যগঠনের অনুকূল নয়।

আধুনিক বাংলা কবিতা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এদিকে মধুসূদন দত্তই পথপ্রদর্শক। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা কাব্যে দুটি মূল ধারা প্রবাহিত ছিল, বৈষ্ণব ও মঙ্গলকাব্যের ধারা। মঙ্গলকাব্যের দেশজ রূপ ভারতচন্দ্রের হাতে সংস্কৃত হয়ে দরবারী সূক্ষ্মতা, ছন্দচাতুরী ও অলঙ্কারব্যসন লাভ

করেছিল। মধুসূদনের সময়ে ভারতচন্দ্রই সব চেয়ে প্রতিষ্ঠালব্ধ ও অনুকরণযোগ্য কবি ছিলেন। এ ছাড়া তখন দাশরথী রায়ের পাঁচালী আর রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ছিল জনপ্রিয়তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে। মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব কিন্তু প্রাদেশিকতার কোনো সীমানাই মানল না, যে-পথে বেরিয়ে পড়ল তার পাথেয় তিনি সংগ্রহ করলেন সমুদ্রের ওপার থেকে, হোমর ভ্যর্জিল্ মিল্টনের কাছ থেকে। এর জন্য তাঁকে বিস্তর গালাগাল সহ্য করতে হয়েছিল। গালাগাল কিন্তু টিকল না, টিকে রইল তাঁর দুঃসাহসিক অবদান। রবীন্দ্রনাথ এসে বাংলার প্রাচীন কাব্যের একটি ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, বৈষ্ণব ভক্তি ও ভাবার্দ্রতা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করলেন লেক্ স্কুলের প্রকৃতিবন্দনা, তাতে কিছু আমেজ দিলেন উপনিষদী অধ্যাত্মরসের। সমস্তকে নির্মল ক'রে উজ্জ্বল ক'রে রইল অবশ্য তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার রশ্মিধারা। আজ তৃতীয় দফায় বাংলা কবিতা প্রতীচীর কাছে ঋণী। এবার কিন্তু উত্তমর্ণরা সমসাময়িক, মিল্টন বা ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ II শেলি-র সার্বজনীন প্রতিষ্ঠা তাঁদের এখনো গ'ড়ে ওঠেনি।

সাম্প্রতিক য়োরোপে, অন্তত ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যে, দুটি প্রায় বিপরীত আন্দোলনের প্রভাব সব চেয়ে প্রবল, প্রতীকী (symbolist) এবং সাম্যবাদী। প্রতীকী আন্দোলন রোম্যাণ্টিসিজ্ম্-এরই পুনরাবর্ত্তন, তবে তার সঙ্গে এর মিল যতখানি, গরমিলও তার চেয়ে কম নয়। ক্লাসিক যুগের বুদ্ধিপ্রবণ ও ভঙ্গিপ্রধান সাহিত্যের প্রতিবাদস্বরূপ এসেছিল রোম্যাণ্টিসিস্ট্দের কল্পনা ও আবেগের উচ্ছ্বাস, এবং ড্রাইডেন পোপ কিম্বা রাসিন মলিয়েরের লেখার মধ্যে সমগ্র সমাজকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলবার যে চেষ্টা ছিল, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ শেলি য়্যুগো নিজের উপলব্ধিকে, নিজের বিশিষ্ট মনোভঙ্গিকে বড় ক'রে দেখলেন। ওয়াইট্হেড্ মনে করেন যে সপ্তদশ শতকের নবগঠিত জড়বিজ্ঞানের অভাবনীয় সিদ্ধির ফলে মেকানিস্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল, ক্লাসিসিজ্ম্ তারই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব। এই সূত্র ধ'রে উইল্সন্ বলতে চান যে উনিশ শতকের মধ্যভাগে জীববিজ্ঞানের পরিণতির সঙ্গে ক্লাসিসিজ্ম্-এর দ্বিতীয় অভ্যুদয় হল, এবার কিন্তু পদ্যের চেয়ে ইব্সেন ফ্লোবের্ প্রভৃতির গদ্যেই তা স্পষ্টতর। কিন্তু উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী দর্শনের আত্মম্ভরিতা এতই উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল যে অল্পকালের মধ্যে তার অনিবার্য ব্যর্থতাবোধের ফলে, বুদ্ধির সার্বভৌম শক্তির উপর ভরসা রইল না, বের্গসঁ ব্র্যাড্লি প্রভৃতি বোধির চর্চায় মনোনিবেশ করলেন। সাহিত্যে এর পরিণাম প্রতীকী আন্দোলন। বুদ্ধিকে অস্বীকার ক'রে আবার আবেগ ও কল্পনার আধিপত্য এলো, আবার ঝোঁক পড়ল শিল্পীর ব্যক্তিত্বের উপর। রোম্যাণ্টিসিস্ট্দের ভাষাগত শৈথিল্য কিন্তু গেল ঘুচে, উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে শৈলীয় অনবহিতি সযত্নে বর্জিত হল। ক্লাসিসিস্ট্দের কাছ থেকে শেখা বাক্যবিন্যাসে চোস্ত বলিষ্ঠতা অটুট রইল, এবং কাব্যকে আরও প্রকাশক্ষম করা হল ভাষাগত সর্ববিধ শুচিবায়ু পরিত্যাগ করে, শুঁড়িখানার কথোপকথনের সঙ্গে রাজকীয় সালঙ্কার সম্ভাষণের নির্ভীক সমাবেশ ঘটিয়ে। এদিক থেকে লেক স্কুলের কবিদের চেয়ে এলিজাবীথীয় নাট্যকারগণের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য অধিক।

প্রতীকী কবিদের ভাষাব্যবহারে যে-গুণটা সব চেয়ে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে তার অভূতপূর্ব নির্বাহুল্য। শব্দচয়ন এঁদের এত নিখুঁত এবং বাক্যনির্মাণ এত ঘন যে এলিয়টের পক্ষে সম্ভব হয়েছে আস্ত একখানি উপন্যাসকে Portrait of a Lady-র মত ছোট কবিতায়

সন্নিবিষ্ট করা। এতখানি ক্ষিপ্রগতির জন্য অবশ্য উল্লেখ ও উদ্ধৃতির সাহায্য প্রায়ই নিতে হয়, ইংরেজি এবং অন্যান্য প্রধান সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে কবিতার যে পূর্বতন প্রাঞ্জলতা ও অনায়াসবোধ্যতায় আমরা অভ্যস্ত তা অনেক পরিমাণে অবলুপ্ত। কোনো এক জনপ্রিয় মাসিকের সম্পাদক নাকি বিষ্ণু দের একটি কবিতার অর্থবিভ্রাটে পড়ে সেটাকে চারিদিক থেকে চৌষট্টি বার পড়েছিলেন। এই প্রশংসনীয় অধ্যবসায়টি বাহুল্য হলেও এটা সত্য যে, কোনো কোনো ইংরেজ এবং বাঙালী কবির লেখা পড়তে গেলে রসানুভূতির আনন্দের সঙ্গে হেঁয়ালি ভাঙবার কৌতুক এবং কষ্ট একাধারে ভোগ করতে হয়। এরা বাহুল্য বর্জনের ওজুহাতে সিনেমা প্রযোজকদের cutting পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে কবিতার যেখানে সেখানে কাঁচি চালিয়ে যান। সে ছেঁটে ফেলা অংশগুলি পাঠককে নিজ গুণে পূরণ ক'রে নিতে হয়, নইলে বাঙলা কবিতাও তিব্বতী মন্ত্রের মত শোনায়। এই পদ্ধতিকে আমি নিন্দার্হ বলতে চাই না, পাঠকের কাছ থেকে লেখক কিছু সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে বৈ কি। বিষ্ণু দের ক্রেসিডা বা জন্মাষ্টমীর মত অর্থঘন কবিতায় এর চরিতার্থতা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁরই কোনো কোনো দুর্বল কবিতায়, এবং তাঁর অনুকারকদের অনেক কবিতায়, এর আতিশয্য লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই শোকাবহ হয়েছে।

রচনাভঙ্গিতে রোম্যাণ্টিসিস্টদের সঙ্গে প্রতীকীদের বৈষম্য যত প্রকট হোক, বিষয়ের দিক থেকে এঁরাও অন্তরাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির পক্ষপাতী। তফাৎ বরঞ্চ এই যে এঁরা নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অধিকতর সজ্ঞান, নিজেকে নিয়ে আরও বেশী ব্যাপৃত। অনেক সময়ে এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাববিনিময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সিম্বলিজম্-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইলসন্ লিখেছেন, "It is an attempt by carefully studied means—a complicated association of ideas represented by a medley of metaphors—to communicate unique personal feelings." এই উপমাপুঞ্জের সাহায্যে কোনো সুনির্দিষ্ট সাধারণের বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করাকে প্রতীকী কবিরা অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। বরঞ্চ এঁদের বিশ্বাস যে কবিতার ধ্বনি ও রূপকল্পের সঙ্গে একটি শৃঙ্খলিত ন্যায়যুক্তিসঙ্গত অর্থ জুড়ে দিলে তার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়, বিশুদ্ধ আবেগ বহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য তার সঙ্কুচিত করা হয়। "The chief use of the 'meaning' of a poem, in the ordinary sense, may be to satisfy one habit of the reader, to keep his mind deverted and quiet, while the poem does its work upon him : much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets do not work that way; some of them assuming that there are other minds like their own, become impatient of this 'meaning' which seems superfluous, and perceive possibilities of intensity through its elimination." (T.S. Eliot)

সাধারণ অভিজ্ঞতার জগতের দিকে ভাষার সমাজপ্রদত্ত আভিধানিক নির্দেশকে বিলুপ্ত ক'রে, ভালেরি, এলিয়ট, য়েট্‌স্ প্রভৃতি তাঁদের কাব্যলোকের চারিদিকে একটি অখণ্ড শূন্যতা

রচনা করেছেন : এর ফ্রয়েডীর ব্যাখ্যাও সম্ভব, তবে মার্ক্সের অর্থনৈতিক বিশ্লেষনের মধ্যেই এর পূর্ণতর হদিস্ পাওয়া যায়। ধনতন্ত্রের সম্প্রসারণের যুগে সংস্কৃতির অবকাশ ছিল, প্রয়োজনও ছিল। আজ তাকে আগাছার মতন ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। চিত্রে কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে লোকহিতৈষণায় সর্বত্র যে-প্রাণরসধারা প্রবাহিত ছিল তার উৎস শুকিয়েছে। ধনতন্ত্রী সমাজ এখন রুদ্ধগতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তার অন্তর্নিহিত সঙ্কট তাকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করেছে, আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সে আজ অস্ত্রসজ্জিত, মারণব্রতী। বাইরের যখন এই অবস্থা, য়েট্স্-এর ভাষায় যখন

"The blood-dimmed tide is lossened, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned."

তখন যদি কবির বিভ্রান্ত দৃষ্টি আপন অন্তরলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ও আবেগের রহস্যব্যঞ্জনায় ব্যাপৃত থাকে, তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কোনো কোনো কবিতায় এই "পলায়নী" মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। তাঁর বেলায় কিন্তু সন্দেহ করবার হেতু রয়েছে যে তাঁর সমাজবিমুখতা সামাজিক কারণে নয়, স্বভাবজ। তাঁর মনের নির্মিতিই ভাবুক। 'অতএব', 'কিন্তু' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সংযোজিত পদবিন্যাস তাঁর কবিতায় আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছি, এবং সবিস্ময় আনন্দবোধ করেছি যখন তিনি রসশাস্ত্রের দাবী ও অন্বীক্ষাশাস্ত্রের বিধি যুগপৎ অক্ষুণ্ণ রেখে স্বচ্ছন্দে কাব্য রচনা ক'রে গেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আধুনিক যে-কোনো বাঙালী কবির তুলনায় গভীর এবং বাস্তব, কিন্তু অভিজ্ঞতার বিষয়ের চেয়ে অভিজ্ঞতার ভঙ্গিটাই তাঁর অনুব্যবসায়ী মনকে আকৃষ্ট করে বেশি। তবে সাম্যবাদের হাওয়া আজকাল এমনিই বেগে বইছে যে তাঁর অন্তঃসলিল মননধারাও নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনি, নিজের স্বভাবের প্রতি বিদ্রোহ ক'রে বলেছে—

তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি,
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

সুধীন্দ্রনাথের প্রতর্কোন্মুখ দৃষ্টি কিন্তু এই আসন্ন প্রলয়ের মধ্যে নবসৃষ্টির সূচনা দেখছে না, দেখছে শুধু

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি,
সবি সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি॥

বিষ্ণু দের চিন্তা এতখানি আত্মকেন্দ্রিক নয়, কিন্তু তাঁর সমাজবোধও নেতিবাচক, negetive emotion-এর দ্বারা পরিচালিত। সমাজের চেতনা হয় তাঁর বিদ্রূপের সমস্ত শাণিত অস্ত্রগুলিকে উদ্যত ক'রে তোলে, নয় তাঁর অতি-আধুনিক অতি-সাবধান মনের উপর গভীর বিরক্তি ও বিষাদের ছায়া ফেলে :

ভুলেছে কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ,
প'ড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকন্টকিত রুক্ষ দেশ।
—নিয়ে যাবে বল কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে!
মিনতি আমার
যাত্রা কর রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তি-দেশে, নব প্রতিভাসে

যাত্রা কভু যাবে না থমকি।

এই কবির রচনা ইতিমধ্যে আমরা যা পেয়েছি তার মূল্য কিছু কম নয়, কিন্তু এখনও তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না। তাঁর নিত্যনবপরীক্ষানিরত লেখনীর মধ্যে যে-মহৎ কবিতার শুধু প্রতিশ্রুতি নয় অঙ্গীকার রয়েছে, তা তাঁকে অনেকাংশে এড়িয়েই চলেছে, সম্ভবত এই জন্য যে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এখনো কোনো অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দানা বাঁধেনি।

আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে সুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে এক দল হচ্ছেন যাঁরা ভাব কিম্বা ভঙ্গি কোনো দিক থেকে কবি নন। এঁরা যে-কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি ক'রে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন। এতে তাঁদের প্রপাগ্যাণ্ডার কাজ কত খানি হাসিল হয় বলা শক্ত, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যনুরাগী ব্যক্তি তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না। অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যনুরাগকে বৃহত্তর কোনো অনুপ্রেরণার জন্য পথ ছেড়ে দিতে হতে পারে, সে সম্ভাবনার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্য দিকে সাম্যবাদী দলে সমর সেনের মত নিঃসন্দিগ্ধ কবিও রয়েছেন, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যকৌশল অত্যন্ত নির্বিকার বুর্জোয়া পাঠকদের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে। এঁরা প্রায় বালক বয়সেই অনুকারকের দল সৃষ্টি ক'রে (সমর সেনের তো রীতিমত একটি স্কুল গ'ড়ে উঠেছে) আধুনিক বাঙলা কাব্যে আসন পাকা করেছেন। এঁদের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু সিদ্ধি এখনও এতটা নিশ্চিত নয় যে তাঁদের লেখা সম্বন্ধে—তথা সাম্যবাদী বাংলা কবিতা সম্বন্ধে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। হয় তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনাসম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার জন্য কবির চাই শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়লেক্‌টিক্ দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনীতিমূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।

আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে রোম্যান্টিক্ মনোভাব অন্তর্হিত এখনও নিশ্চয়ই হয়নি, তবে অন্তর্ধানের পথে চলেছে। পূর্বতন সমস্ত প্রথার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই হালের ফ্যাশ্যান। সে-ফ্যাশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বুদ্ধদেব বসু উনিশ শতকের খেয়ালী সুরকে সাহস এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছেন। অবশ্য বিশ শতকের রোম্যান্টিসিজম্ উনিশ শতকের ধুয়োমাত্র হতে পারে না; যদি হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, কবির ইন্দ্রিয় অসাড়, তার মন অসংবেদনশীল। কবিতার প্রগতি সম্বন্ধে যতই তর্ক উঠুক, তার পরিবর্তন অবিসংবাদিত। বুদ্ধদেবের খেয়ালী মনও তাই মাঝে মাঝে বিংশ শতাব্দীর আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত হয়, অমৃতস্য পুত্রদের ভাগ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। তবে সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামজিক উপপ্লব তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করলেও তেমন ক'রে অধিকার করেনি যেমন করেছে সুধীন্দ্র দত্ত কি বিষ্ণু দের চিত্তকে। Eternal verities নিয়ে ব্যস্ত থাকবার মত মনঃসঙ্কলন এখনো তাঁর রয়েছে। বিশেষ ক'রে, তিনি যে এখনো প্রেমের কবিতা লিখছেন এটা সৌভাগ্য বলেই গণ্য কবি। বিষ্ণু দের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও যে "প্রেমে পতন ছাড়া কিছুই নেই," আশা করি আমরা এখনও প্রেমে প'ড়ে থাকি। অথচ ঐ কথাটা উল্লেখ করতে আধুনিক কবিরা ঘৃণা বোধ করেন, যদি না ব্যঙ্গের গরজ থাকে। অবশ্য যে-সাহিত্য "সখি, কী পুছসি অনুভব মোয়," "সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু," "হে নিরুপমা", "বোলো, তারে বোলো", কিংবা

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য অনবদ্য গানে সমৃদ্ধ, সে-সাহিত্যে প্রেমের কবিতার অকুলান আছে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু তাই ব'লে কি ঐ শব্দটা কাব্যসাহিত্য থেকে আজ একেবারেই নির্বাসিত হয়ে যাবে? সব জিনিসের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে যখন আমরা বিশ্বাসী, তখন কেমন ক'রে বলতে পারি যে মানুষের প্রেম বৃত্তিটাই যুগে যুগে অবিকল থাকে। নতুন কবিরা যদি নতুন ক'রে প্রেমের কবিতা না লেখেন তা হ'লে আমাদের মনের কথা যে মনেই থেকে যায়, প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন ক'রে?

আবু সয়ীদ আইয়ুব